প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রনায়ক

নীরেন্দ্রনাথ রায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

স্মৃতির উদ্দেশে

বিষয়সূচী

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে : দ্বিতীয় পর্যায় / ধনঞ্জয় দাশ

'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডটিতে মুখ্যত সংকলিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগের তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী'-র প্রথম (অক্টোবর ১৯৪৮), চতুর্থ (জুলাই ১৯৪৯), পঞ্চম (সেপ্টেম্বর ১৯৪৯) ও ষষ্ঠ (ডিসেম্বর ১৯৪৯) সংকলনে প্রকাশিত মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচার-সংক্রান্ত মোট পাঁচটি প্রবন্ধ। বীরেন পাল ও রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন, ঊর্মিলা গুহ ও প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ এবং নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গণেন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত এই প্রবন্ধগুলি সেদিন মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী—উভয় শিবিরে তুলেছিল প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড়।

এই বহুবিতর্কিত রচনাগুলির সংকলন প্রকাশ করার সময় আমি 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে' শীর্ষক শতাধিক পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ ভূমিকাও সংযোজন করে দিয়েছি। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর বাঙলা দেশের শিল্প-সাহিত্যে তথা মানস-সংস্কৃতিতে কিভাবে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং বিশ, তিরিশ ও চল্লিশের দশকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের ক্ষেত্রে বাঙলাদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং তাত্ত্বিক নেতারা যেসব বিতর্ক উত্থাপন করেন, জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে উক্ত ভূমিকায়, আমি তার একটি রূপরেখা তুলে ধরতেও যথাসাধ্য চেষ্টা করি। বস্তুত, 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর পশ্চাৎপটই বর্ণিত হয়েছিল আমার 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে' শীর্ষক ভূমিকাটিতে।

এবার আমার পূর্ব ঘোষণানুযায়ী 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হচ্ছে। এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে প্রধানত 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে ১৯৪৯-৫০ সালে রচিত বাঙলাদেশের তৎকালীন প্রবীণ ও নবীন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও তাত্ত্বিক নেতাদের অধুনা দুষ্প্রাপ্য রচনাবলী। এই রচনাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম খণ্ডটিতে সন্নিবিষ্ট কোন রচনার কোন বক্তব্যের কতটুকু সমর্থন-

সূচক কিংবা প্রতিবাদ-জ্ঞাপক, তা অনুধাবনে পাঠক-মনে যদিও বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না, তবুও এই রচনাগুলি প্রকাশের পশ্চাৎপট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য থেকেই যায়। অর্থাৎ, ১৯৪৯-৫০ এবং তারও পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত এ-দেশের প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির শিবিরে যে-মতাদর্শগত সংগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠেছিল তা জানা না থাকলে বর্তমান খণ্ডে প্রকাশিত রচনাবলীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য হয়তো অনেকখানি ম্লান হয়ে যাবে। তাই, সেই পশ্চাৎপট সম্পর্কে কিছু তথ্য বর্তমান পাঠকদের বিবেচনার্থে পরিবেশন করা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণে আছে যে, ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক থিসিসে এবং তারই ভিত্তিতে পরবর্তীকালে রচিত 'লেনিনের শিক্ষার আলোকে বর্তমান শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম', 'জনগণতন্ত্র প্রসঙ্গে', 'কৃষিসম্পর্কিত প্রশ্ন প্রসঙ্গে' এবং 'জনগণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম: রণনীতি ও রণকৌশলগত কয়েকটি প্রশ্ন' নামক দলিলগুলিতে যে 'বাম-সংকীর্ণতাবাদী, মতান্ধ-হঠকারী' নীতি তুলে ধরা হয়, বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী'-তে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের নামে তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী প্রদ্যোৎ গুহ, গণেন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেন তাঁদের রচিত প্রবন্ধাবলীতে কিছু সদর্থক বক্তব্য পরিবেশন করা সত্ত্বেও শেষবিচারে সেই 'অতিবাম-সংকীর্ণতাবাদী, মতান্ধ-হটকারী' নীতিই মূলত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

এই সময়কালের ভ্রান্ত রাজনীতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা না থাকলে বর্তমান খণ্ডের বহু বক্তব্য সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। তাই আমি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক রচিত 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের রূপরেখা' নামক পুস্তিকার 'তৃতীয় পর্ব' থেকে তৎকালে অনুসৃত নীতির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরছি।

কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক থিসিসে বলা হয়, "মাউন্ট ব্যাটন পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাদপসরণ বোঝায় না; ...মাউন্ট ব্যাটন পরিকল্পনা জনগণকে যা দিয়েছে তা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, তা হচ্ছে ঝুটা স্বাধীনতা। ব্রিটেনের আধিপত্য শেষ হয়ে যায় নি, কিন্তু আধিপত্যের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত বুর্জোয়াদের রাষ্ট্রক্ষমতার বাইরে ও তার বিরোধিতার ভূমিকায় রাখা

হয়েছিল, এখন জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব ধ্বংস ও রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য বুর্জোয়াদের রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অংশ দেওয়া হয়েছে।"[১] ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াদের দ্বৈত ভূমিকা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঐ রাজনৈতিক থিসিসে আরও বলা হল যে, "ভারতবর্ষের যুদ্ধোত্তর রাজনীতিতে যে বিরাট পরিবর্তন হয়েছে তা এই প্রধান সত্যটিকেই তুলে ধরছে যে ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা, বা অন্য কথায় তাদের প্রতিনিধি কংগ্রেস নেতৃত্ব, তার বিরোধী ভূমিকা পরিত্যাগ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সুতরাং তারা প্রতিক্রিয়াশীল।"[২]

কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বোক্ত রণনীতি কার্যকর করার জন্য রণকৌশল-সংক্রান্ত দলিলে পলিটব্যুরো ব্যাখ্যা করে জানালেন, "বুর্জোয়ারা ও তার সরকার শুধুমাত্র আপসকারী ও সহযোগীই নয়, তারা প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোর অগ্রবাহিনী। এরাই হচ্ছে প্রধান শক্তি যারা তাদের গণপ্রভাবের বলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে, জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে ও সন্ত্রাস সংগঠিত করতে সক্ষম।" ..."সুতরাং বিপ্লবের জন্যে কংগ্রেস সরকারের শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম করতে হবে"..."জনগণের চেতনায় ও বাস্তবে বিপ্লবের জন্যে সংগ্রামের অর্থ হচ্ছে কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার সংগ্রাম।"[৩]

এইসব দলিলে আমাদের দেশের মূল শত্রু সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে ভারতীয় বুর্জোয়াদের চিহ্নিত করা হল প্রধান শত্রু রূপে। আর, "সাম্রাজ্যবাদ-বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুদের মিলিত চক্রের নেতা বুর্জোয়াদের ক্ষমতাকে উচ্ছেদ" করার জন্য "প্রলেতারিয়েত কৃষিশ্রমিক ও দরিদ্র কৃষকদের সাথে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন" করার জন্য এবং "বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন...ও বলপ্রয়োগে তাদের প্রতিরোধকে চূর্ণ করার জন্য মধ্যকৃষকদেরও এই মৈত্রীর অন্তর্ভুক্ত"[৪] করার কথাও ঘোষণা করা হয়।

এই দলিলে অন্য আর একটি মারাত্মক রাজনৈতিক বিচ্যুতিও প্রকট হয়ে ওঠে। আমরা জানি, প্রাকস্বাধীনতা-পর্বে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে বিপ্লবের দুটি স্তরের তত্ত্বকে সংজ্ঞায়িত করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় কংগ্রেসে রাজনৈতিক থিসিস সম্বন্ধে বক্তৃতা করার সময় ভবানী সেন স্পষ্টভাবে বলেন, "...সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের

১. দ্র. অবতার সিং মালহোত্র, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের রূপরেখা', তৃতীয় পর্ব, বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৮৫।—সম্পাদক ২. দ্র. ঐ, পৃ. ৮৬।—সম্পাদক ৩. দ্র ঐ, পৃ. ৮৬।—সম্পাদক ৪. দ্র. ঐ, পৃ. ৮৭।—সম্পাদক

সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে সংগ্রাম জড়িয়ে গেছে এবং বিপ্লবের দুটি স্তর আর থাকতে পারে না।"[১] আর বিপ্লবের দুই স্তর পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে ও মিশে যাওয়ার তত্ত্বকে সামনে রেখে রাজনৈতিক থিসিসে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়—"গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্তব্য সম্পূর্ণ করার জন্যে ও যুগপৎ সমাজতন্ত্র গঠনের জন্যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে হবে" এবং "বিপ্লবের আশু লক্ষ্য হিসেবে" নির্ধারিত হয় "প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব।"[২]

মোটকথা, পলিটব্যুরোর বিভিন্ন দলিলে 'পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত', 'পরস্পরের সঙ্গে জড়িত,' 'পরস্পরের সঙ্গে ঘন নিবদ্ধ' ইত্যাদি শব্দ-বিন্যাস ঘটিয়ে ভারতের তৎকালীন বিপ্লবের স্তর সম্পর্কে যে শেষসিদ্ধান্ত টানা হয় তার অর্থ দাঁড়ায়—আমাদের দেশে বিপ্লবের স্তরটি হচ্ছে মিশ্র এবং যুগপৎ সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে হবে এবং সেই জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব। সুতরাং রণকৌশলগত লাইন হিসাবে পলিট-ব্যুরো নির্দ্বিধায় ঘোষণা করলেন, "বর্তমান পর্যায়ের আংশিক সংগ্রামগুলো ব্যাপক গণসংগ্রাম, ছোটখাটো গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। যখন এইসব সংগ্রামকে ব্যাপক আকারে সংগঠিত করা হবে, তখনই এইসব সংগ্রাম সহজেই রাজনৈতিক সংগ্রামে বিকাশলাভ করবে এবং ভ্রূণাকার রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটাবে (তেলেঙ্গানা)—এটাই হচ্ছে পরিস্থিতির অনিবার্য ধারা। স্থিতিশীলতার যুগের এই দুই স্তরের মধ্যেকার চীনের প্রাচীর এখন আর নেই।"[৩]

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের কমিনিস্ট পার্টির মতো একটি সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দল যখন রণনীতি ও রণকৌশল রূপে উপযু´ক্ত নীতিকে কার্যকর করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তখন সেই দলের অনুগামী সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে তার কোনো প্রতিফলন ঘটবে না, এটা মনে করা মারাত্মক ভুল। বিশেষ করে পলিটব্যুরোর অন্যতম প্রভাবশালী নেতা ভবানী সেন-এর মতো ব্যক্তিত্ব এই রাজনৈতিক তত্ত্বকে শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে চালু করার জন্য অগ্রসর হলে কী প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হতে পারে, আমরা অনেকেই তার প্রত্যক্ষদর্শী। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম খণ্ডে সংকলিত রচনাগুলির মধ্যে আজকের পাঠকেরাও তার তিক্ত-কষায় স্বাদ কিঞ্চিৎ আস্বাদন করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

১. দ্র. অবতার সিং মালহোত্র, 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের রূপরেখা' তৃতীয় পর্ব, পৃ. ৮৭।—সম্পাদক ২. দ্র. ঐ, পৃ. ৮৭-৮৮।—সম্পাদক ৩. দ্র. ঐ, পৃ. ৮৯।—সম্পাদক

যাহোক, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তই যখন ভারতের সমগ্র জাতীয় বুর্জোয়াকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করা, মিশ্র স্তরের বিপ্লবের তাৎপর্যই যখন প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা, তখন সেই তত্ত্বকে যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তানায়কদের সকল ঐতিহ্য বর্জন এবং কবি বিষ্ণু দে-র মতো তৎকালীন দোদুল্যমান পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের 'তৃতীয় শিবিরভুক্ত' মনে করে তাঁদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না।

এই প্রসঙ্গে 'মার্কসবাদী' পত্রিকার প্রকাশকালে এবং পরবর্তী বছর দুটিতে অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ-আমেরিকার রাজনৈতিক অস্থিরতার কথাও পাঠকদের একবার স্মরণ করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী যে-রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করছিল আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মননক্রিয়ায় তার প্রভাব ছিল অপ্রতিরোধ্য।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই সময় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের হুমকি দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে নিক্ষেপ করে ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবর্তে। আমেরিকার প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হয় অমার্কিন কার্যকলাপের ঘৃণ্য অভিযোগ। ম্যাকার্থির নেতৃত্বে প্রগতি-সংস্কৃতির কণ্ঠরোধের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মার্কিনী প্রশাসনযন্ত্র। এরি পাশাপাশি সেভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধজোট গঠনের জন্য মার্শাল পরিকল্পনার নামে ডলারের নাগপাশে ধনতান্ত্রিক দুনিয়াকে তথাকথিত মিত্রতার বন্ধনে বেঁধে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তও চলছিল অব্যাহত গতিতে।

অন্যদিকে, যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপের অনেকগুলি দেশে তখন শুরু হয়েছে সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় মুক্তিআন্দোলনও সে-সময় এক নতুন পর্যায়ে উন্নীত। মার্কিনী সাহায্যপুষ্ট চিয়াংচক্রের বিরুদ্ধে চীনের মুক্তিকামী জনতার বিজয়-অভিযান, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে বীর ভিয়েতনামী জনতার মরণপণ সংগ্রাম, ইন্দোনেশিয়ায় ডাচ সাম্রাজ্যবাদীদের বিপর্যস্ত অবস্থা, মালয় এবং ব্রহ্মদেশে মুক্তিকামী জনতার সশস্ত্র অভ্যুত্থান, আমাদের দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অন্তত একাংশের মনেও সৃষ্টি করছিল এক আশ্চর্য বৈপ্লবিক উন্মাদনা।

এই পটভূমিকায় আমরা দেখলাম, ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে পোল্যাণ্ডের ব্রাসলাভ (wroclaw) শহরে বিশ্বের পয়তাল্লিশটি দেশের প্রায় পাঁচশতাধিক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিজীবী সমবেত হয়ে

গঠন করলেন 'আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংযোগ সমিতি' (International Liaison Committee of Intellectuals)। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন: ক্যাণ্টারবেরীর ডীন হিউলেট জনসন, ক্যাথলিক কলেজের অধ্যাপক ধর্মযাজক জাঁ বুলিয়ে, ফরাসী মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য ইভে ফারজ, 'নিউ স্টেটসম্যান এণ্ড নেশনস' পত্রিকার সম্পাদক কিংসলী মার্টিন, বৈজ্ঞানিক জোলিও কুরী, হলডেন, প্রেনাঁ, টার্ল, বার্নাল, ওয়ালন, জুলিয়ান হাক্সলি, শিল্পী পিকাসো, লেজের, পুদভকিন, সাহিত্যিক পল এলুয়ার, বেদেল, ভেরকর, ফাদায়েভ, শোলোকভ, ইলিয়া এরেনবুর্গ, মার্টিন এ্যাণ্ডারসন নেক্সো, আনা সাগারস প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া নানা কারণে সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পেরেও আমেরিকা থেকে আইনস্টাইন, স্টাইনবেক, কলডওয়েল, পল রোবসন, হাওয়ার্ড ফাস্ট, ইংল্যাণ্ড থেকে জে. বি. প্রিস্টলি, ফ্রান্স থেকে ডুআমেল, আরাগঁ, কাসু, মাতিস, লোটে, ফুজের, শাগাল প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণ সম্মেলনের উদ্দেশে ঘোষণা করলেন তাঁদের অকুণ্ঠিত সমর্থন। বিশ্ব-বুদ্ধিজীবীদের এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট ভাষায় ধ্বনিত হল: "...আমেরিকা ও ইয়োরোপের মুষ্টিমেয় স্বার্থবাদী লোক সারা দুনিয়ায় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। তাহারা ফ্যাশিস্টদের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জাতি-গরিমা ও প্রগতি-বিরোধিতা সম্বল করিয়া আজ আবার অস্ত্রশক্তির জোরে সমস্ত কিছুর সমাধানের হুমকি দিয়া জগতের বিভিন্ন জাতির নৈতিক সম্পদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতেছে।

"মানব-সভ্যতায় ইয়োরোপের যে-দেশগুলির দান অপরিমেয়, সেই দেশগুলির সংস্কৃতি আজ তাহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছে। স্পেন, গ্রীস, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি কতকগুলি দেশের প্রগতি-বিরোধী শক্তিগুলি শুধু যে টিকিয়া আছে তাহাই নয়, তাহারা ফ্যাশিজম-এর নূতন উৎসস্থান হইয়া উঠিতেছে।

"বিচার ও বিবেককে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া মানুষের উপর নির্যাতন এবং অত্যাচারীরা যাহাদের কৃষ্ণাঙ্গ বলে সেইসব জাতিগুলির প্রতি অত্যাচার সমানে চলিতেছে এবং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্যাশিস্টদের নিকট হইতে ধার করা বিভিন্ন পন্থায় একদল লোক নিজেদের দেশের মধ্যেই জাতি-বৈষম্য চালাইতেছে এবং শিল্প-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের কর্মীদের উপর নির্যাতন চালাইতেছে। মানবকল্যাণকর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ সাধারণের নিকট গোপন রাখিয়া তাহারা মারণাস্ত্র

উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করিতেছে এবং এইভাবে বিজ্ঞানের উচ্চাদর্শকে বিকৃত ও ব্যঙ্গ করিতেছে।

"এই সকল লোকের কর্তৃত্বে মানুষের সাহিত্য ও শিল্পকে বিভিন্ন জাতির শিক্ষা ও ঐক্যবদ্ধতার জন্য ব্যবহার না করিয়া পরস্পরের প্রতি জঘন্য ঘৃণা উদ্রেক এবং যুদ্ধ-প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। শান্তি, অগ্রগতি এবং মানবজাতির ভবিষ্যতের জন্য প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সার্থকতার স্বাধীন বিকাশ ও বিস্তৃতির প্রয়োজন আছে--ইহা আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং সেই জন্যই এই স্বাধীনতার উপর কোনো প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাইতেছি। মানবসভ্যতার স্বার্থে বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয়তার উপরেও আমরা জোর দিতেছি।

"মানবজাতির মঙ্গলসাধন কিংবা ধ্বংসসাধন করিবার প্রকৃত ক্ষমতা যে আধুনিক বিজ্ঞানের আছে, এই সম্মেলন তাহা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিয়া বিজ্ঞানকে ধ্বংসকার্যে ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে এবং জগতে ব্যাপকভাবে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য, মানবসমাজের অধিকাংশের অভাব-অভিযোগ, অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য, ব্যাধি প্রভৃতির কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগাইতে তাহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে আহ্বান জানাইতেছে। যাহারা শান্তি ও প্রগতির সেবক তাহাদের স্বাধীন গতিবিধির বিরুদ্ধে নিষেধ উঠাইয়া লইবার জন্য, পুস্তকাদির অবাধ প্রকাশ ও প্রচারের জন্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ফলাফল প্রচারের জন্য, এবং বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সফলতার স্বাধীন বিকাশ প্রভৃতির জন্যও এই সম্মেলন দৃঢ় দাবী জানাইতেছে।

"পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যুদ্ধের বিরোধী। শান্তি ও সংস্কৃতির উপর নূতন ফ্যাশিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করার মতো তাহাদের যথেষ্ট শক্তি রহিয়াছে।

"দুনিয়ার বুদ্ধিজীবিগণ! আপনারা আপনাদের নিজ নিজ জাতি, সামগ্রিক মানবতা ও ইতিহাসের এক বিরাট দায়িত্বের সম্মুখীন। শান্তির জন্য, বিভিন্ন জাতির স্বাধীন সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য, তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য আমরা আওয়াজ তুলিতেছি।

"—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের বুদ্ধিজীবীরা যাহাতে আমাদের এই প্রস্তাব লইয়া আলোচনা করেন, তাহার জন্য আমরা আহ্বান জানাতেছি।

"—শান্তি রক্ষার্থে প্রত্যেক দেশের বুদ্ধিজীবীদের নিজ নিজ দেশে সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।

"—শান্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক দেশে জাতীয় কমিটি সংগঠন করিতে আমরা আহ্বান জানাইতেছি।

"—শান্তির জন্য প্রত্যেক দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সংযোগ স্থাপনের জন্য আমরা আহ্বান জানাইতেছি।"[১]

ব্রাসলাভ (wroclaw) শহরে বুদ্ধিজীবীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত 'ঘোষণাপত্র'টির প্রায় পূর্ণাঙ্গ পাঠ আমি এখানে উদ্ধৃত করলাম। এই আহ্বানের মধ্যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে, মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে, প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের উপর বিধি-নিষেধ আরোপের বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘকাল পরে পুনর্বার শুনতে পেলাম বিশ্বের বিবেকবান শ্রেষ্ঠ মানব-সন্তানদের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে ইয়োরোপে হিটলার-মুসোলিনীর ফ্যাশিস্ত তাণ্ডবের বিরুদ্ধে যেমন মনীষী রোমাঁ রোলাঁ, গোর্কি ও বারব্যুস-এর নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'ফ্যাশিজম ও যুদ্ধবিরোধী সংঘ' (League against War & Fascism) এবং ১৯৩৫ সালে প্যারিসে 'সংস্কৃতি রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলন' (International Writers Conference for the Defence of Culture), তেমনি দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর সময়ে মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের মানববিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্রাসলাভ (wroclaw) শহরে গঠিত 'আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংযোগ সমিতি'-ও সেই লক্ষ্যাভিমুখে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

আমাদের দেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এর প্রভাব অনুভূত হলেও ১৯৪৮-৪৯-এ ব্রাসলাভ-সম্মেলনের সুদূরপ্রসারী সঠিক তাৎপর্য উপলব্ধি করা তখন সত্যিই সম্ভব ছিল না। এ দেশের মার্কসবাদে বিশ্বাসী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের মন তখন আশু বিপ্লবের রঙীন স্বপ্নে বিভোর। কংগ্রেস সরকারকে তখন চিহ্নিত করা হয়েছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দোসর রূপে। তাই কংগ্রেস সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতিগুলিই ছিল তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। ১৯৪৮-এর শেষে কিংবা ১৯৪৯ সালের প্রথমে মার্কসবাদী সংস্কৃতি-

১. চিন্মোহন সেহানবীশ, 'সংস্কৃতির আহ্বান', পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫, পৃ. ৯৩-৯৬ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

বিদদের প্রচেষ্টায় 'আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংযোগ সমিতি'-র অনুকরণে পশ্চিমবঙ্গেও গঠিত হল 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ'।

এই নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠার পশ্চাৎপট এবং প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করে ১৩৫৫ সালের পৌষ-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকার 'সংস্কৃতি-সংবাদ'-এ নরহরি কবিরাজ লিখলেন," 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ' সংস্কৃতি-জগতে এক নবজাত শিশু। জনগণের বাস্তব জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা থেকে এই সংঘের জন্ম।

"যে-ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিশ্ব-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা পোল্যাণ্ডে "আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে" সমবেত হন, যে-প্রয়োজনে সোভিয়েটের অগ্রণী সাহিত্যিকরা মার্কিন সাহিত্যিকদের কাছে খোলা চিঠি দেন, সেই প্রয়োজনেই আজ দেশে দেশে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও শিল্পীরা সম্মিলিতভাবে সংগ্রামী সংগঠনের গুরুত্ব অনুভব করছেন।...

"দুনিয়ার কায়েমী স্বার্থবাদীদের ত্রাণকর্তা আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।... দেশে দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা উঠেপড়ে লেগেছে মার্কিন নেতৃত্বকে অনুসরণ করতে। ভারতের "স্বাধীন" সরকার ও প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকার এই "পবিত্র ব্রতে" পিছিয়ে থাকার পাত্র নন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ-বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দাবীও করতে পারেন। সোভিয়েট-বিরোধী মার্কিন ফিল্ম "আয়রন কার্টেন" পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশের কড়া পাহারায় "সাফল্যের" সঙ্গেই কলকাতায় দেখানো হয়েছে। বোম্বাই সরকার আর একদিকে নেতৃত্ব নিয়েছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ছিদ্রপথেও যাতে 'রাজদ্রোহ' আত্মপ্রকাশ করতে না পারে, তার সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁরা।...বোম্বাই সরকার আদেশ জারি করেন—উদ্যোক্তাদের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ইংরেজী অনুবাদ করে আগে গোয়েন্দা-বিভাগের অনুমতি নিতে হবে!

"জনসাধারণের সংগ্রামী চেতনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপনের অপরাধে কেবল "রাষ্ট্রের শত্রু" কমিউনিস্ট লেখক ও শিল্পীরাই যে আজ নির্যাতিত হচ্ছেন তাই নয়, কংগ্রেস সরকারের কায়েমী স্বার্থপ্রীতি আজ কংগ্রেসী লেখকদের স্বদেশী সাধেও বাদ সাধছে। সিনেমার মালিকগোষ্ঠী টাকার লোভে জনসাধারণের রুচি মেটাতে যেসব স্বদেশীয়ানার ভাঁওতা করতে বাধ্য হন, তাতেও আজ সরকার ভূত দেখতে সুরু করেছেন। সেন্সরের সঙীনের মুখে প্রাণ বাঁচাতে সিনেমা-মালিক ও লেখকেরা অর্ডারমাফিক বইয়ের বিষয়বস্তু রদ-বদল করতে বাধ্য হচ্ছেন।

('ভুলি নাই'-এর আগে-পিছে অহিংসার মহত্ব নিয়ে সামঞ্জস্যহীন বক্তৃতা এবং 'অঞ্জনগড়'-এ লেখককৃত কংগ্রেস সরকারের দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত নীতির স্থূল প্রচার লক্ষ্যণীয়।) কলকাতা বেতার-কেন্দ্রে শিল্প ও সাহিত্যকে যেভাবে সরকারী প্রচার যন্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে, তাতে কংগ্রেসী মনোভাব-সম্পন্ন শিল্পী ও সাহিত্যিকেরাও প্রতিবাদ না জানিয়ে আজ আর পারেন না। কলকাতা বেতারের গল্প-দাদুর আসরের পরিচালক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি এক বিবৃতি মারফৎ অভিযোগ করেছেন—বেতারের কর্তৃপক্ষ কোনো পাণ্ডুলিপিতে নেতাজীর নামোল্লেখ গর্হিত বলে মনে করেন।...

"এইভাবেই কংগ্রেসী পুলিশ আজ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মধ্যেও আবিষ্কার করে বারুদের আগুন, নেতাজীর নামেও গন্ধ পায় রাজদ্রোহের, প্রত্যেকটি প্রগতিশীল সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যেই বিভীষিকা দেখে কমিউনিজমের।

"সংস্কৃতি-জগতে বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিক্রিয়াশীলদের এই যে আক্রমণ সুরু হয়েছে, তাকে প্রতিহত করতে হলে স্থায়ী ও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনেই "সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ"-এর জন্ম।"

ব্রাসলাভ শহরে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সম্মেলন'-এর ঘোষণার মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপকভিত্তিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট গড়ে তোলার যে-ইতিবাচক নির্দেশ নিহিত ছিল, আমাদের দেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের চেতনায় তার তাৎপর্য তখন কিভাবে কতটুকু অনুভূত হচ্ছিল, নরহরিবাবুর উপরে উদ্ধৃত রচনাটি তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৪৮-৪৯ সালে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সঙ্গে যুক্ত মার্কসবাদী শিল্পী সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মনের তার কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রণনীতি ও রণকৌশলের ধ্বনি-তরঙ্গের সঙ্গেই মূলত বাঁধা ছিল। বিপ্লবের আশু প্রয়োজনে তখন দোদুল্যমান মিত্রও শত্রু রূপে চিহ্নিত। এই মানসিকতা নিয়ে 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ' যে ব্যাপক ভিত্তিতে সংগঠিত ও পরিচালিত হতে পারে না, এটাই বাস্তব সত্য। সুতরাং অচিরেই 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা পরিষদ'-এর অকালমৃত্যুই আমরা প্রত্যক্ষ করলাম।

এই সময়কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অগ্নিগর্ভ অবস্থার কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিশেষ করে চীনের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ক্রমবর্ধমান সাফল্যের

সংবাদ আমাদের দেশের অসংখ্য মানুষের বৈপ্লবিক চেতনাকে তখন উদ্দীপ্ত করে তুলছিল। তাই আমরা দেখলাম, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস 'চৈনিক বিপ্লবের পথ,' অগ্রাহ্য করে 'রুশীয় বিপ্লবের পথ' গ্রহণ করা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের দায়িত্বশীল নেতা ও কর্মীরা ১৯৪৮ সালের শেষ দিক থেকে চীনের 'নয়া গণতন্ত্র' এবং মাও সে-তুঙ-এর ইয়েনান বক্তৃতার মধ্যে সাগ্রহে অনুসন্ধান করছেন জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বৈপ্লবিক তত্ত্ব এবং শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সমস্যা সমাধানের নতুন সূত্র। গোপাল হালদার ও নীরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা এই ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে।

সৃজনশীল কবি-মনে অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাণ-স্পন্দন কিভাবে অনুরণিত হচ্ছিল তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ সম্ভবত সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'অগ্নিকোণ' কবিতাটি। 'অগ্নিকোণ'-এর তল্লাট জুড়ে কালাপানি তোলপাড় করা বিপ্লবের দুরন্ত ঝড়কে স্বাগত জানিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই পর্বে 'পেরাকে পেনাঙে টিনের খনিতে/রবারের বনে/মশলার দ্বীপে/সোনাফলা ইরাবতীর দুধারে/উপত্যকায়/বদ্বীপে, নীলকান্ত মণির/ঝিকিমিকি দেশে···ঘুম ভেঙে-ওঠা' অগ্নিকোণের মানুষদের উদ্দেশে লিখলেন: 'দিন এসে গেছে ভাইরে/রক্তের দামে রক্তের ধার/শুধবার/দিন এসে গেছে ভাইরে/বিদেশী রাজের প্রাণ ভোমরাকে/নখে নখে টিপে মারবার!'···রামেন্দ্র দেশমুখ্য-র কবি-চেতনায় উদ্ভাসিত হল: 'প্রবাল, আগ্নেয় দ্বীপে লাল তারা ওঠে,/পূব-দেশী দক্ষিণের তারা/গতি-ঝলকিত স্রোত এশিয়ার চোখের সম্মুখে/এখন যে অনন্ত/ইশারা'। ['তারকা, পরিচয়, কার্তিক ১৩৫৫]। বিমলচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'মাও সে-তুঙ' নামক কবিতায় সরাসরি নিবেদন করলেন: 'নিরাপত্তার ফাঁসে লটকানো কণ্ঠস্বর/কবি-শ্রমিকের শুনতে কি পাবে কমরেড?/মাঞ্চুরিয়ার আকাশে আকাশে/মুক্ত প্রাণের রাঙা নিঃশ্বাসে/মিলবে কি ভুখা ভারতের শ্বাস ধ্বনি-তরঙ্গে কমরেড?' [পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫]। ১৩৫৫ সালের পৌষ-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হল মৃগাঙ্ক রায়-এর 'চীন: নভেম্বর'৪৮' শীর্ষক কবিতা। মাঘ, ১৩৫৫ সালের 'পরিচয়' পত্রিকায় রামেন্দ্র দেশমুখ্য পুনর্বার লিখলেন: 'চীন থেকে আমি আসি রোজ,/বর্মার পর্বত থেকে আজকাল আমি দিই হানা,/লেখা ও চিন্তার দেনা শোধ করি পূর্বপুরুষের/আমার যে অবাক ঠিকানা।' [বেকার কবি]। ঐ একই সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হল অনিল কাঞ্জিলাল-এর কবিতা—'রোগশয্যায়'। অসুস্থ কবির অনুভূতিতে ধরা

পড়ল : 'আমার এ-রোগশয্যা এশিয়ার বিক্ষুব্ধ প্রান্তর/এক শত্রু মৃত্যু তার নানা ছদ্মবেশে/চীনে ব্রহ্মে মালয় জাভায়/বুক চিরে রক্ত খায়/যক্ষ্মার মুখোশ প'রে/রক্ত খায় ফুসফুসে আমার, প্রিয়ার।' ১৩৫৫ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ অনূদিত হল স্বয়ং মাও সে-তুঙ-এর 'বরফ' কবিতা। তৎকালীন তরুণ কবি নির্মাল্য বসু ও জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'খবর পেলাম' ও 'সংক্রামক' নামক কবিতা দুটিও প্রকাশিত হল উক্ত সংখ্যায়, আর সেই কবিতাতেও ধ্বনিত হল সংগ্রামী চীনের প্রতি কবি-হৃদয়ের উত্তপ্ত আবেগ। ১৩৫৫ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ চীনের উদ্দেশে নিবেদিত কোনো কবিতা প্রকাশিত না হলেও ঐ সংখ্যাতে সমালোচিত হল মুক্ত চীনকে অভিনন্দন জানিয়ে রচিত বাঙালী কবিদের প্রথম কাব্য-সংকলন 'মহাচীন' নামক পুস্তিকাটি।

গোপাল হালদার ও নীরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা যেহেতু ১৯৪৮-৪৯ সালে মার্কসবাদী সাহিত্য-শিবিরের মতাদর্শ প্রচারের ও প্রকাশের প্রধান বাহন রূপে কাজ করছিল, সেইহেতু আমি ঐ পত্রিকার কার্তিক থেকে চৈত্র (১৩৫৫) পর্যন্ত ছয়টি সংখ্যায় প্রকাশিত সৃজনশীল কবিতার ক্ষেত্রে কোন চেতনা সর্বাধিক ক্রিয়াশীল ছিল তার একটি দীর্ঘ বিবরণ তুলে ধরলাম। শুধু সৃজনধর্মী কবি-কল্পনার রঙীন আবেগ দিয়ে নয়, যুক্তিগ্রাহ্য মননধর্মী বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যেও চীনের মুক্তিসংগ্রামের তাৎপর্য তখন প্রকাশ করেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মহাচীনের জয়যাত্রা' নামক প্রবন্ধে।১ ১৩৫৫ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় আমরা দেখছি, ১৯৪২ সালের মে মাসে ইয়েনানের লেখক-সভায় মাও সে-তুঙ যে বক্তৃতা দেন, সাহিত্য-বিষয়ক সেই দীর্ঘ বক্তব্যের জগন্নাথ চক্রবর্তী-কৃত অনুবাদ—'সাহিত্য-কথা'কে প্রথম প্রবন্ধের মর্যাদা দিয়েই প্রকাশ করা হচ্ছে। আর, চৈত্র-সংখ্যায় (১৩৫৫) 'মহাচীন' কবিতা-সংকলনের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র মজুমদার লিখলেন : "আজকের এশিয়া-জোড়া মুক্তি-আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে চীন। বর্মা, মালয়, ভিয়েৎনাম, ভারতবর্ষ—প্রত্যেকটি দেশের সংগ্রামী মানুষ আজ অত্যাচার আর শোষণের শৃঙ্খল ছেঁড়ার দুর্জয় অভিযানে প্রেরণা পাচ্ছে চীনের মুক্তি-সেনাবাহিনীর দৃপ্ত অগ্রগতি থেকে। এই প্রেরণাতে দেশ-বিদেশের কবি-সাহিত্যিকরাও উদ্বুদ্ধ। বুঝতে বাকি নেই, চীনের জনতার সংগ্রাম মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়—ইয়েনান-

১. দ্র. পরিচয়, মাঘ ১৩৫৫, পৃ. ৩৫৬-৬৫।—সম্পাদক

নানকিং-রণাঙ্গনের সীমারেখা আজ বিস্তৃত হয়ে গেছে পেগুর টিনের খনি, সিঙাপুরের রবারের জঙ্গল ছাড়িয়ে তেলেঙ্গানা-কাকদ্বীপ-বুধাখালির ক্ষেতখামার পর্যন্ত। অমিত শক্তির অধিকারী চীনের জনতার প্রতি তাই সর্বদেশের সংগ্রামী মানুষের আন্তরিক অভিনন্দন উৎসারিত হচ্ছে, জনশক্তির অনিবার্য বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে চীনের দৃষ্টান্তে।···আমাদের দেশের জঙ্গী মানুষ যে আজ লাল চীনের মুক্তিমন্ত্রে মনেপ্রাণে দীক্ষিত, তারই ঘোষণা আছে এই সংকলনের প্রত্যেকটি কবিতায়।"

সাম্প্রতিককালের পাঠকেরা হয়তো বিশ্বাস করতে পারবেন না এবং চীনের বর্তমান নীতি যদিও আমাদের অনেকের কাছেই আজ গ্রহণযোগ্য নয়, তবু ১৯৪৯ সালের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রবাবুর ঐ বক্তব্যের মধ্যে যে অতিশয়োক্তি ছিল না, একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন চীনের মুক্তিসংগ্রাম আমাদের মনে কী প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

১৯৪৮ সালের শেষ। আজকের বাঙলাদেশ এবং তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের মুসলিম লীগ-সরকারের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে আমি তখন কলকাতায় চলে এসেছি। এখানে ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী হিসাবেই সে-সময় আমি পরিচিত। এ ছাড়া 'সপ্তর্ষি' পত্রিকার সম্পাদক এবং 'অনির্বাণ' নামক আর একটি মাসিক পত্রিকার অন্যতম পরিচালক রূপে কলকাতার তৎকালীন তরুণ লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গেও ছিল আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিশেষ করে সতীর্থ-বন্ধু মিহির সেন, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, চিত্ত পাল এবং বীরেন্দ্র নিয়োগী আর নাট্যকার গিরিশঙ্কর দাশকে কেন্দ্র করে আমাদের এক অন্তরঙ্গ সাহিত্যচক্র গড়ে উঠেছিল। তৎকালে বন্ধুবর সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ও বীরেন্দ্র নিয়োগী ছিলেন বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক দলের (আর. এস. পি) সদস্য। সুতরাং রাজনৈতিক মতাদর্শে আমাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ফারাকও ছিল। কিন্তু সাহিত্যগত মতাদর্শে আমরা ছিলাম পরস্পরের খুবই কাছাকাছি। এই সময় রয়টার-পরিবেশিত বিকৃত সংবাদের ধূম্রজাল ছিন্ন করে আমাদের দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল চীনের মুক্তিবাহিনীর বিজয়বার্তা। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা জানতে পারলাম নানকিং-এর পতন আসন্ন। আমাদের মন আনন্দে নেচে উঠল। চীন-বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য তলিয়ে বুঝবার মতো ধৈর্য ও মানসিক প্রস্তুতি তখন আমাদের

ছিল না। এশিয়ার একটি দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের পর্যুদস্ত করে জনগণের স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে চলেছে, এতেই আমরা খুশি আর উৎফুল্ল। সুতরাং সামান্য আলোচনার পর বন্ধুরা একবাক্যে ঠিক করলেন, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী চীনের উদ্দেশে বাঙলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাতে হবে। পূর্ব-বর্ণিত 'মহাচীন' কাব্য-সংকলন প্রকাশের এই হল পশ্চাৎপট।

মাত্র সপ্তাহকাল প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে, সম্ভবত ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, 'মহাচীন' কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের সম্পাদক ছিলেন বর্তমান লেখক এবং মিহির সেন। আর্থিক ও প্রকাশনার সব দায়দায়িত্ব বহন করেন বন্ধুবর গিরিশঙ্কর। প্রয়াত কথাসাহিত্যিক এবং প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের চিরউৎসাহী সহযাত্রী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অনবদ্য আবেগমণ্ডিত ভাষায় 'স্বীকৃতি' শীর্ষক একটি ভূমিকায় মহাচীনের জয়যাত্রাকে অভিনন্দিত করেন। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রমুখ আরও অনেকের কবিতায় উৎসারিত হয় সংগ্রামী চীন ও তার জনগণের প্রতি বাঙালী কবিদের বিপ্লবী অভিনন্দন। মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'লালচীন' শীর্ষক কবিতায় আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করেন: "মাও সে-তুঙ যে-এশিয়ার নেতা সেই এশিয়ার কবি আমি/আজ কবিকণ্ঠেও কামানের গান সেধে নিই/আজ বিদ্রোহী চীন স্বাধীন প্রধান লালচীন।" নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী চীনের সয়াবীন ক্ষেতের একমুঠো সয়াবীন পাওয়ার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন তাঁর কবিতায়। মোটকথা, কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ-অভিনন্দনে পূর্ণ ছিল এই সংকলনের প্রতিটি পৃষ্ঠা।

বর্তমান কালের পক্ষে 'মহাচীন' খুবই সাধারণভাবে প্রকাশিত একটি কবিতা-সংকলন মাত্র। কিন্তু সেদিন কিছু অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়েছিল এই অতি-সাধারণ সংকলনটি। কৃশকায় সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশের পর আমরা অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, কলকাতার তৎকালীন দুটি দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে 'মহাচীন' প্রকাশের সংবাদ। দৈনিক 'পশ্চিমবঙ্গ' এবং 'দি নেশন'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় 'বক্স নিউজ' আকারেই প্রকাশিত হয়েছিল মুক্তচীনের উদ্দেশে প্রেরিত বাঙালী কবিদের এই অভিনন্দন-বার্তা। অথচ ঐ দুটি সংবাদপত্রের কোনোটিই কমিউনিস্টপন্থী ছিল না। যতদুর জানি,

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা ছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের অনুগামী আর 'দি নেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা শরৎচন্দ্র বসু।

যাহোক, 'মহাচীন'-প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণণা করার সময় কুণ্ঠ এসে বারংবার আমার হাত চেপে ধরছে, তবু ঐতিহাসিক প্রয়োজনে কিছু কথা বলতেই হল। কারণ, ঘটনাগুলির সত্য-বিবরণ থেকেই সাম্প্রতিক কালের পাঠকেরা একমাত্র অনুমান করতে পারবেন ১৯৪৮-৪৯ সালে চীন-সম্পর্কে প্রগতি সংস্কৃতি-শিবিরের আবেগমথিত মনোভাবের অন্তত কিছুটা অংশ। এবং এসব জানা না থাকলে অনেক পাঠকই হয়তো সঠিকভাবে বুঝতে পারবেন না 'মার্কসবাদী' সংকলনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে১ বীরেন পাল ও রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন, উর্মিলা গুহ ও প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ এবং নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গণেন বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিচারের সময় কেন একবারও ভুলক্রমে শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের সমস্যা-সমাধানে চৈনিক ভাষ্য প্রয়োগ করলেন না, বরং তাঁদের যুক্তিকে শাণিত করার জন্য কেন তাঁরা বারংবার উদ্ধৃত করলেন ঐ সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন, এমন কি লুনাচারস্কি ও কডওয়েল-এর সাহিত্যভাষ্য। এর পরবর্তী পর্যায়ে পাঠকেরা কিন্তু বিপরীত দৃশ্যই লক্ষ্য করবেন। 'মার্কসবাদী' সংকলনের প্রবন্ধাবলীর বিরুদ্ধে,২ বিশেষ করে ভবানী সেন ও প্রদ্যোৎ গুহ-র বক্তব্যের যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করার প্রয়োজনে, মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যখন সোচ্চার হলেন তখন তাঁদের অনেকের রচনাতেই দেখা গেল মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিনের পাশাপাশি মাও সে-তুঙ ও কুয়ো মো-জো-র সাহিত্য-ভাষ্য তুল্যমূল্যেই বিবেচিত এবং কোনো কোনো রচনা মাও-বক্তব্যের অজস্র উদ্ধৃতিতে প্রায়-কণ্টকিত।

কি কারণে এসব ঘটনা ঘটতে পারল তা বিচার-বিশ্লেষণের পূর্বে আমি পাঠকদের মন আর একবার একটু পশ্চাতে ফেরাতে চাই। বর্তমান প্রসঙ্গে পৌঁছাবার পূর্বে ১৩৫৫ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'পরিচয়'-পর্যালোচনার প্রান্তসীমায় আমরা উপনীত হয়েছিলাম, আশা করি পাঠকদের তা স্মরণে আছে। গোপাল হালদার ও নীরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকা এরপর মাত্র আর দুটি সংখ্যা পর্যন্ত (বৈশাখ ১৩৫৬, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬) টিকে ছিল;

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড।—সম্পাদক ২. দ্র. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড।—সম্পাদক

তারপর কংগ্রেসী সরকারের পুলিশী সন্ত্রাস এবং দমন-পীড়নে 'পরিচয়' পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু ঐ শেষ দুটি সংখ্যা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। কারণ, ১৩৫৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'পরিচয়'-তে প্রকাশিত হয় বিষ্ণু দে প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য-পত্র'র তাত্ত্বিক মতামত ও সাহিত্য-দৃষ্টির বিরুদ্ধে নরহরি কবিরাজ-এর 'মার্কসবাদের নগ্ন ভাষ্য' নামক বহু বিতর্কিত প্রবন্ধটি, আর আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর ১৯৪৯ সালের ১০ এপ্রিল 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডায়ালেকটিকস অফ দি অ্যাটলান্টিক প্যাক্ট' রচনাটির প্রতিবাদে অনিমেষ রায় ছদ্মনামে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র "বুদ্ধিবিলাসীর 'ডায়ালেকটিস্'" নামকসেই নিবন্ধটি, যার প্রশংসায় 'মার্কসবাদী'-র চতুর্থ সংকলনে প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ বেশ মুখরই হয়ে উঠেছিলেন। 'পরিচয়'-এর পরবর্তী সংখ্যাটি ছিল জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (১৩৫৬) যুগ্ম-সংখ্যা। এই সংখ্যাটিতে প্রকাশ করা হয় ১৯৪৯ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র চতুর্থ সম্মেলনের সমগ্র কার্যবিবরণ সহ সম্মেলনে পঠিত কয়েকটি প্রবন্ধ। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র বর্তমান খণ্ডে চিন্মোহন সেহানবীশ-এর লেখা 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' এবং সম্মেলনের 'ঘোষণাপত্র'টি 'পরিচয়'-এর উক্ত সংখ্যা থেকেই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় যেহেতু 'সাহিত্যপত্র' বনাম নরহরি কবিরাজ-এর বিতর্ক-সম্পর্কিত তথ্য এবং প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র চতুর্থ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের বিবরণ আমি ইতিপূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি, সেইহেতু বর্তমানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু "বুদ্ধিবিলাসীর 'ডায়ালেকটিকস্'" এবং 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' শীর্ষক নিবন্ধ দুটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য।

'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত আইয়ুব সাহেবের নিবন্ধটির মূল বক্তব্য ছিল : যেহেতু পৃথিবী দুই যুদ্ধ-শিবিরে বিভক্ত সেইহেতু যুদ্ধ আসন্ন। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'অ্যাটলান্টিক প্যাক্ট'-এর এই নাকি ডায়ালেকটিক। আইয়ুব সাহেব তাঁর ডায়ালেকটিক অনুসারে ঐ নিবন্ধে আরও বলতে চেয়েছিলেন, ঈঙ্গ-মার্কিন মাতৃভূমিতে স্বাধীনতা আছে কিন্তু সমতা ও সৌভ্রাত্র নেই ; সোভিয়েত দেশে হয়তো সমতা ও সৌভ্রাত্র আছে কিন্তু স্বাধীনতা বস্তুটির বড়ই অভাব। সুতরাং যুদ্ধের কালো মেঘ ঘনীভূত হবেই। কিন্তু আইয়ুব

সাহেবের ডায়ালেকটিক-তত্ত্ব শেষপর্যন্ত 'সিনথিসিস' অর্থাৎ সমন্বয়সাধনে বিশ্বাসী। তাই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর মতে, আইডিয়াই যেখানে পৃথিবীকে বিভক্ত করেছে, আইডিয়াই সেখানে পুনর্বার ভাঙ্গা-পৃথিবীকে জোড়া লাগাতে পারে। সুতরাং তাঁর সমন্বয়ের সূত্র: সোভিয়েত রাশিয়া সমতা ও সৌভ্রাত্রের সঙ্গে হারিয়ে-যাওয়া স্বাধীনতাকে জুড়ে দিক এবং ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি তাদের পরম গৌরবের বস্তু স্বাধীনতার সঙ্গে সমতা ও সৌভ্রাত্রকে অঙ্গীভূত করুক, তাহলেই পৃথিবী জুড়ে আইয়ুব সাহেবের ঈপ্সিত ফরাসী বিপ্লব সমাপ্ত হবে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর নিবন্ধটি যদিও সাহিত্য-বিষয়ক নয়, তবু এর দার্শনিক তথা মতাদর্শগত বক্তব্যের সঙ্গে বিশ্বমানবের সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্পর্ক এমন নিবিড়-ভাবে জড়িত যে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক কিংবা বুদ্ধিজীবীরা তা উপেক্ষাও করতে পারেন না। অনিমেষ রায় ছদ্মনামে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র সেদিন তাই "মানুষকে ভুলিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া যেসব 'দার্শনিক'দের পেশা তাদের প্রতি সম্পূর্ণ নিষ্করুণ হওয়া প্রত্যেক মানবহিতৈষীর প্রয়োজন"—এই কথা ঘোষণা করে শাণিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও যুক্তির প্রাখর্যে আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর 'ডায়ালেকটিকস অফ দি অ্যাটলান্টিক প্যাক্ট'-এর দার্শনিক ভ্রান্তিকে খণ্ডন করেছিলেন।

আর, চিন্মোহন সেহানবীশ-এর 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' যে-বিতর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল তার মধ্যে বিধৃত আছে মার্কসবাদী সাহিত্য-শিবিরের তৎকালীন রাজনৈতিক মানসিকতা এবং সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে এর ফলিত প্রয়োগগত সমস্যা। চিন্মোহন সেহানবীশ-এর উক্ত নিবন্ধে সম্ভবত সর্বপ্রথম চীনের সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের শিক্ষাকে যান্ত্রিকভাবে এ-দেশের সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টেও প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়। বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্ট-২তে সংকলিত ঐ নিবন্ধের মধ্যে পাঠকেরা লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন চিন্মোহন সেহানবীশ প্রগতি-সংস্কৃতি শিবিরের অন্তর্ভুক্ত শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে প্রকৃতপক্ষে কোন দাবী উত্থাপন করেছিলেন।

চিন্মোহন সেহানবীশ নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রগতি-সংস্কৃতি শিবিরের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নানা ধরনের মানসিকতা ও ঝোঁকগুলিকে ভালো করেই বুঝতেন। 'গণসংগ্রামে যোগদান ছাড়া সমাজের তথা সাহিত্যের যে মুক্তি নেই'—এ সম্বন্ধে প্রায় সকল প্রগতিশীল সাহিত্যিক মোটের উপর একমত ছিলেন। কিন্তু সেই গণসংগ্রামে যোগদানের রীতি-নীতি ও পদ্ধতি

নিয়েই ছিল তাঁদের মধ্যে বিরোধ। চিন্মোহন সেহানবীশ-এর ভাষ্য অনুসারে জানা যায়, একদল মনে করতেন, "গণসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রয়োজন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য—যে অভিজ্ঞতা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ, ফলবান করে তুলবে—সে সাহিত্য আবার গণসংগ্রামকে পুষ্ট করবে, এগিয়ে দেবে নূতন কর্মোদ্যোগের পথে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন বা কিসান সভার কর্মীর মতো সাহিত্যিক বা শিল্পীর গণসংগ্রামে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ সে 'প্রলোভন' এড়াতে না পারলে সেই বিরামহীন কর্মস্রোতের অতলে তলিয়ে যাবে সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সমস্ত প্রেরণা।"১

অন্যদলের মত সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য: "মজুর-কিসানকে সংঘবদ্ধ করতে মজুর-কিসান সংগঠকেরা যে কাজ করেন, শিল্পী-সাহিত্যিককেও তা করতে হবে। করতে হবে শুধু গণসংগ্রামের খাতিরেই নয়—সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও। অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগের নামে দূরত্ব রাখা চলবে না—বিশেষ সুবিধা দাবী করা চলবে না। কারণ তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু গণসংগ্রাম নয়—সাহিত্যও, কারণ ভাসা ভাসা অভিজ্ঞতা থেকে তৈরী হবে শুধু কৃত্রিম সাহিত্য।"২

উপরে উদ্ধৃত দুটি মনোভাবের দ্বিতীয় মতের পক্ষেই ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। তিনি ফরাসী-প্রতিরোধ যুদ্ধে আরাগঁ, স্পেনের গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে কর্নফোর্ড এবং চীনের 'নবজীবনের উন্মেষে' শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকার উদাহরণ তুলে ধরে স্পষ্ট করেই বলেন: "...অফুরন্ত অবকাশ, নিস্তরঙ্গ জীবন-যাত্রার অনুকূল পরিবেশ না হলে সাহিত্যশিল্পের সৃষ্টি ব্যাহত হবে—এ ধারণাটি ঠিক নয়। বরঞ্চ আজকের মতো তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের যুগে সব থেকে অনুকূল সেই পরিবেশকেই বলব যা সাহিত্যিকের শ্রেণীসচেতনতাকে সব চেয়ে বেশী শাণিত করে তুলতে সাহায্য করবে। আর যেহেতু আমরা জ্ঞান ও কর্মের নিবিড় পারস্পরিকতায় বিশ্বাসী, তাই কর্মস্রোত থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখেও পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ সচেতনতা লাভ করা সম্ভব মনে করি না। বিশেষ করে আমাদের মতো নিরক্ষরতার দেশে লেখক ও শিল্পীরা হলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী-উদ্ভূত।...কাজেই আপন জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতই লেখকের পক্ষে তীব্র সচেতনতা অর্জন করা স্বাভাবিক নয়...। তাই আমাদের মতো লেখক ও জনগণের মধ্যে

১. দ্র. চিন্মোহন সেহানবীশ, 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম,' বর্তমান খণ্ড, পরিশিষ্ট-২, পৃ. ২৪৫। —সম্পাদক ২. দ্র ঐ, পৃ. ২৪৫-৪৬।—সম্পাদক

স্তুর ব্যবধানের দেশে কর্মের দিক দিয়ে একাত্ম না হতে পারলে সাহিত্যের মুক্তি নেই।...বাইরের খানিকটা দূরত্ব রাখতে গেলে মনের দিক থেকেও ব্যবধান ঘুচবে না।"১

এই যুক্তি-পরম্পরার হাত ধরে অগ্রসর হয়ে চিন্মোহন সেহানবীশ অবশেষে তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি জানিয়ে দিলেন: "...যদি ট্রেড ইউনিয়ন বা কিসান সভার অবিশ্রান্ত কাজকর্মের ফলে দু'চার বছর লেখা বন্ধও থাকে, তাতেই বা কি আসে যায়। ইতিমধ্যে সেই কাজের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই—আগামী দিনে সোনালী ফসলের যা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। তাই বৈশাখের রুদ্রদাহ দেখে বিহ্বল না হয়ে ভরসা রাখতে হবে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে।"২

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র চতুর্থ সম্মেলনে পঠিত এই প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে সেসময় নাকি নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। অকমিউনিস্ট অথচ প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, লেখক-প্রতিনিধি—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, আশীষ বর্মন সম্মেলন-মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রবন্ধের বক্তব্য সম্পর্কে আপত্তি না তুলেও চিন্মোহন সেহানবীশের কাছে প্রশ্ন করেন, প্রবন্ধে উল্লেখিত কার্যক্রম 'সংঘের সভ্যদের পক্ষে বাধ্যতামূলক কিনা।' উত্তরে চিন্মোহন সেহানবীশ 'না' বল্লেও প্রকৃতপক্ষে সেই 'না' ছিল সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক। চিন্মোহন সেহানবীশের অপ্রকাশিত যে-'আত্ম-সমালোচনামূলক প্রতিবেদন'-এর কথা আমি 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি, তার থেকেই এসব কথা জানা আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে।

যাহোক, পার্টি-নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে অতিবাম হঠকারী নীতি চালু করার আগেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা নাকি ঐ মারাত্মক ভ্রান্ত পথে 'বেশ সজ্ঞানে ও সোৎসাহে' অগ্রসর হচ্ছিলেন। চিন্মোহন সেহানবীশ এর একটি উদাহরণও তুলে ধরেছেন তাঁর ঐ অপ্রকাশিত প্রতিবেদনে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত তেলেঙ্গানার সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রামের অনুসরণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই সময় পর্যায়ক্রমে কয়েকটি সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে যায়। কাকদ্বীপ,

১ দ্র. চিন্মোহন সেহানবীশ, 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম,' বর্তমান খণ্ড, পরিশিষ্ট-২, পৃ. ২৪৬। —সম্পাদক ২. দ্র. ঐ, পৃ ২৪৬-৪৭।—সম্পাদক

বুধাখালি ও বড়াকমলাপুরের সশস্ত্র কৃষক-সংগ্রাম এবং তার বিরুদ্ধে তৎকালীন কংগ্রেস-সরকারের দমন-পীড়ন আর ভয়াবহ পুলিশী সন্ত্রাস কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের মনে তখন জ্বালিয়ে দেয় প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণার আগুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র কমিউনিস্ট-সদস্যরা নীরব থাকা সমীচীন মনে করেন নি। তাঁরা ঠিক করেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড়াকমলাপুরে পাঠাবেন। মানিকবাবুও নাকি যেতে রাজী হন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যান নি সেখানে। মানিকবাবুর এই 'অপরাধে'র জন্য তাঁর কাছে নাকি কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। মানিকবাবু জবাবে বলেন, "এভাবে গেলেই আমি ভালো লিখতে পারব এমন ধারণাকে আমি যান্ত্রিক মনে করি।" চিন্মোহন সেহানবীশ মানিকবাবুর জবাব শুনে বলেন, "বড়াকমালপুরে তাঁকে লেখার উন্নতি করতে পাঠানো হচ্ছে না, এই মুহূর্তে তিনি কি লেখেন বা না-লেখেন তাই নিয়ে আমরা ব্যস্ত নই, কমিউনিস্ট হিসেবেই তাঁকে সেখানে যেতে হবে।"

এই ঘটনাগুলি ঘটে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র চতুর্থ সম্মেলনের কিছুকাল আগে। সুতরাং চিন্মোহন সেহানবীশ-এর 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' নিবন্ধের নির্দেশ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মার্কসবাদী সাহিত্য ও সংস্কৃতি-শিবিরের সামগ্রিক মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটেছে উক্ত নিবন্ধে, একথা বোধহয় আমরা বলতে পারি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে এইসব ঘটনা বিন্দুমাত্র বিস্মৃত হন নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই খণ্ডে সংকলিত তাঁর 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধটিতে। 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত বীরেন পাল, প্রকাশ রায় ও রবীন্দ্র গুপ্ত-র বক্তব্য সম্বন্ধে মানিকবাবুর দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল ঐ প্রবন্ধটি পাঠ করলে পাঠকেরা যেমন তা বুঝতে পারবেন, তেমনি চিন্মোহন সেহানবীশ-নির্দেশিত 'ট্রেড ইউনিয়ন বা কিসান সভার অবিশ্রান্ত কাজকর্মের ফলে দু'চার বছর লেখা বন্ধ' থাকলে কি ক্ষতি হতে পারে এবং মানিকবাবুর বিশ্লেষণ অনুযায়ী কোন ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এই বক্তব্যের মধ্যে নিহিত আছে, তাও তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন। এ-সম্পর্কে আলোচনা আমি তাই আর দীর্ঘায়ত করতে চাই না।

পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন, ১৩৫৬ সালে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় যুগ্ম-সংখ্যা প্রকাশের পর যখন 'পরিচয়' পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেল তখন পর্যন্ত 'মার্কসবাদী'-র মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম সংকলনেই ছিল

সাহিত্য-বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ, বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন লিখেছিলেন 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' ও ঊর্মিলা গুহ ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ-র রচনা 'সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি'।১ এ-দুটি প্রবন্ধে ভ্রান্তি ও উগ্রতার প্রকাশ ঘটেছিল সত্যি কিন্তু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে সর্বাত্মক কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি ফুটে উঠেছিল যে-দুটি প্রবন্ধে—'মার্কসবাদী'তে প্রকাশ রায় ও রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ এবং ভবানী সেন-এর 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'২ শীর্ষক সেই রচনা দুটির প্রকাশ পরবর্তী কালের ঘটনা। ঐ প্রবন্ধ দুটি 'মার্কসবাদী'-র চতুর্থ ও পঞ্চম সংকলনে ১৯৪৯ সালের জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। সুতরাং ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র চতুর্থ সম্মেলন পর্যন্ত প্রগতি-সংস্কৃতি শিবিরের অন্তত একাংশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মতান্ধ উগ্র মানসিকতার যে স্ফুরণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম তা প্রকাশ রায় কিংবা রবীন্দ্র গুপ্ত-র প্রবন্ধের প্রভাবে ঘটে নি, এই মানসিকতা পরিপুষ্ট হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন রণনীতি ও রণকৌশলের লিখিত-অলিখিত নির্দেশক্রমেই।

একদিকে মার্কসবাদী সাহিত্য-শিবিরের অনুসৃত এই উগ্রনীতি, অন্যদিকে কংগ্রেসী সরকারের প্রচণ্ড দমননীতি, সংগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বহুমুখী প্রসারকে ক্রমশ সংকুচিত করে তুলছিল। ১৯৪৯ সালের রেলওয়ে ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে ৯ মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতব্যাপী যে সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানায় তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত কংগ্রেস-সরকারের দমননীতি আরও প্রচণ্ডতর রূপ ধারণ করে। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন মুখপত্র 'ক্রসরোডস'-এর ১৯৪৯ সালের ১৩ মে সংখ্যার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এই ধর্মঘটের প্রাক্কালে সারা ভারতে বিনাবিচারে নিরাপত্তা আইনে বন্দীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫,০০০ ও নির্দিষ্ট অভিযোগে আটক করা হয় ৫০,০০০ রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীকে। পশ্চিমবঙ্গেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর-এর মধ্যে অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীকেও বিনাবিচারে বন্দী করতে দ্বিধা করেন নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই সময়পর্বে এবং এর কিছু আগে ও পরে, আমরা দেখলাম, বিনাবিচারে এক একে

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১-২৬ ও ২৭-৪৩।—সম্পাদক
২. দ্র. ঐ, পৃ. ৪৪-৭৭ ও ৭৮-১২৫।—সম্পাদক

বন্দী হয়েছেন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রজ নেতা গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পারভেজ শাহেদী, দ্বিজেন নন্দী, হরিপদ কুশারী, শিবশঙ্কর মিত্র সহ অমল দাশগুপ্ত, সমরেশ বসু, কৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ আরও অনেক সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ননী ভৌমিক এবং বর্তমান লেখককেও সমসাময়িককালে একই দিনে গ্রেপ্তার করা হয়। একজনকে বিনাবিচারে, অন্যজনকে নির্দিষ্ট অভিযোগে। শিল্পী সোমনাথ হোড়-এর বিরুদ্ধেও এই সময় জারি করা হয় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। এ ছাড়া গণসংগঠনের দপ্তরে, প্রগতিশীল প্রকাশন সংস্থায় ও নানা প্রেসে প্রায় রুটিন-মাফিকভাবে চলছিল পুলিশ আর গোয়েন্দা বিভাগের যুগপৎ হানা।

ঠিক এই পরিবেশে, ১৯৪৯ সালে, সরকারী নিষেধাজ্ঞায় গণনাট্য সংঘ-র মুখপত্র 'লোকনাট্য'-র অকালমৃত্যু আমরা প্রত্যক্ষ করেছি; দেখেছি, বিমলচন্দ্র ঘোষ-এর কাব্য-পুস্তিকা 'নানকিং'-এর বাজেয়াপ্তকরণ; মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-এর 'তেলেঙ্গানা' ও রামেন্দ্র দেশমুখ্য-র 'বহ্নিবাংলা' কাব্য-পুস্তিকার সন্তর্পণ প্রকাশ। আর, কোনো নিষেধাজ্ঞা জারি না করে 'পরিচয়'-এর প্রকাশ সন্ত্রাসের মুখে কার্যত বন্ধ করে দেওয়াও ছিল সেই একই সরকারী কর্মসূচীর বিশেষ কৌশল মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে, এই সময় মার্কসবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আমাদের রাজনৈতিক উগ্রতা ও পুলিশী-সন্ত্রাসে প্রজ্বলিত সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে অকমিউনিস্ট পুরনো সহযাত্রীদের অনেকেই তখন ইতস্তত করেছেন। ১৩৫৪ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা থেকে কবি বিষ্ণু দে 'পরিচয়'-এর সঙ্গে যে-সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন, 'পরিচয়' সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সেই ছিন্নসম্পর্ক আর জোড়া লাগে নি; অনেক পুরনো বন্ধুও এই সময় ধীরে ধীরে দূরে সরে গিয়েছেন, তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা থেকেও বঞ্চিত হয়েছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। এই দুঃখজনক ঘটনার মূল দায়িত্ব মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা নিশ্চয় অস্বীকার কবতে পারেন না। তবু এই ভয়ঙ্কর সংকট-মুহূর্তে তাঁদের অনেকের মধ্যে যে দৃঢ় প্রত্যয়, কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্ম-স্বার্থ ত্যাগের মনোভাব আমরা লক্ষ্য করেছি, তাও ভুলবার নয়।

আমি নিজে জানি, 'পরিচয়' পত্রিকা প্রকাশের জন্য রবীন্দ্র মজুমদার এই সংকটময় দিনগুলিতে কী অসাধ্য সাধন করেছেন এবং ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র দপ্তরে বারংবার পুলিশী হানার মুখে মনোরঞ্জন বড়াল

কী অটল স্থৈর্যে সব কিছু হাসিমুখে সহ্য করেছেন। আর, কারাগারের বাইরে থেকে প্রকাশ রায় ও রবীন্দ্র গুপ্ত-র (প্রদ্যোৎ গুহ ও ভবানী সেন-এর ছদ্মনাম) শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের প্রশ্নে ঐকমত্য পোষণ না করেও কিংবা নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের ঘূর্ণিঝড়ে ঘুরপাক খেতে খেতেও নীরেন্দ্রনাথ রায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নরহরি কবিরাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ আরও অনেকে কিভাবে সুশৃঙ্খল সৈনিকের মতো আচরণ করেছেন, সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন প্রগতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গৌরবময় ঐতিহ্যধারা, তারও পরিচয় আমার অগোচর ছিল না। ঠিক ভিন্ন দিক থেকে দেখেছি—সরোজ দত্ত, গোলাম কুদ্দুস ও অনিল কাঞ্জিলাল-এর বৈপ্লবিক দৃঢ়তা। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন অনুসৃত নীতি ও রবীন্দ্র গুপ্ত-র সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণের প্রতি এঁদের ছিল অকুণ্ঠ আনুগত্য। এঁরা তিনজনই তাই পার্টি-নীতিকে অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেদিন বাস্তবায়িত করতে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গেব বিচার-বিশ্লেষণ সহজসাধ্য কাজ নয়। কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে তা করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই আমি শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং একক অনুভূতিটুকু লিপিবদ্ধ করে তৎকালে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরাজিত বাস্তব অবস্থার কিঞ্চিৎ বিবরণ এবার তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র পাশাপাশি গণনাট্য সংঘ বাঙলার নাট্যধারায় যে-বলিষ্ঠ ঐতিহ্য সংযোজন করেছিল, গণসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিল যে-প্রাণমাতানো মূর্ছনা, অতিবামপন্থী হঠকারী ও মতান্ধতার এই দিনগুলিতে সেই গণনাট্য সংঘ কোন নীতি নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, সমগ্র সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি অনুধাবনের পক্ষে তা একান্ত অপরিহার্য।

আমি পূর্বেই বলেছি, গণনাট্য সংঘ মুখ্যত পরিচালিত হতো সঙ্গীত ও নাট্য-জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মার্কসবাদে বিশ্বাসী কিছু নেতা ও কর্মীর অনলস নেতৃত্বে। সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর অন্যান্য ফ্রন্টের মতো গণনাট্য আন্দোলন পরিচালনাতেও উগ্রতা এবং মতান্ধতা ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এই সময় সরকারী দমননীতিও নেমে আসে গণনাট্য সংঘ-র নেতা ও কর্মীদের উপর। গণনাট্য সংঘ-র সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় স্কোয়াড ভেঙ্গে যায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য ও তৃপ্তি মিত্র নানা

কারণে এর বেশ কিছু পূর্বেই মূল সংগঠন থেকে দূরে সরে যান। শম্ভু মিত্র এই সময় গঠন করেন তাঁর নিজস্ব নাট্যসংগঠন—'বহুরূপী'। গণনাট্য আন্দোলনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য গ্রহণ করেন 'বহুরূপী'-র সভাপতির পদ ; প্রখ্যাত অভিনেতা গঙ্গাপদ বসু-ও যোগ দেন 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীতে। অন্যদিকে, গণনাট্য সংঘ-র অন্যতম প্রধান সংগঠক বিনয় রায় ও জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।

বস্তুত, ১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত গণনাট্য সংঘ-র সর্বভারতীয় সম্মেলনের পর পশ্চিমবঙ্গের গণনাট্য সংঘ-র অভ্যন্তরেও অতিবামপন্থী হঠকারিতা প্রবলতর হয়। সেই চরম উগ্রতা অনেকেই সহ্য করতে পারেন নি। ফলত, সংঘ-র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রখ্যাত অভিনেতা চারুপ্রকাশ ঘোষ গণনাট্য সংঘ থেকে পদত্যাগ করেন এবং সেই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন সজল রায়চৌধুরী। আর, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংঘ ত্যাগ না করলেও নাট্য-বিভাগের সম্পাদক পদ থেকে দূরে সরে দাঁড়ান। বর্তমান খণ্ডের পরিশিষ্ট ১-এ সংকলিত মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী ছদ্মনামে সজল রায়চৌধুরী-র 'গণনাট্য সংগঠন-১' ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'নবনাট্য আন্দোলনের সংকট' শীর্ষক রচনা দুটিতে পাঠকেরা এই সময়কার গণনাট্য আন্দোলনের চিন্তা-ভাবনা ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কিছুটা আভাস হয়তো পেয়ে যাবেন।

কিন্তু উপরের ঘটনাবলী সামগ্রিক চিত্রের একাংশ মাত্র। এই সংকট ও ভাঙনের মুখেও সেদিন গণনাট্য সংঘ তার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছিল। নাট্য-বিভাগে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র প্রমুখের অভাব অনেকখানি দূরীভূত হয়েছিল কালী সরকার, সত্য রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, শোভা সেন, সাধনা রায়চৌধুরী, প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, রেবা রায় প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বলিষ্ঠ অবদানে। সলিল চৌধুরীর অসাধারণ সঙ্গীত-প্রতিভায় সমৃদ্ধ হয়েছিল সে-সময়কার গণনাট্য আন্দোলন। তাঁর 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা, আজ জেগেছে এই জনতা', 'নাকের বদলে নরুণ পেলুম তাকডুমাডুম ডুম' কিংবা কাকদ্বীপের শহীদবীরাঙ্গনা অহল্যা মা-র কথা স্মরণ করে রচিত 'অহল্যা মা তোমার সন্তান জনম নিল না'-র মতো হৃদয়-বিদারক গণসঙ্গীতের নতুন সম্পদ তিনি তখন একে একে পরিবেশন করেছেন গণনাট্য সংঘ-র মঞ্চ থেকে।

দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে নিবেদন না করে পারছি

না। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতাব্দী পূর্তি-উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ 'কমিউনিস্ট' নামে একটি মূল্যবান স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সেই স্মারকগ্রন্থে 'বাঙলার সংগ্রামী ছাত্র-আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির অবদান' সম্পর্কে একটি 'ইতিকথা' লিখেছেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা, ঐতিহাসিক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেল, গৌতমবাবু তাঁর 'ইতিকথা'-য় ছাত্রফেডারেশনের নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্র-আন্দোলন থেকে আগত যেসব সাহিত্যিক ও শিল্পী-প্রতিভার নাম সগর্বে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে সলিল চৌধুরী নামটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। শুধু সলিল চৌধুরীই নন, সেই 'ইতিকথা'-য় ছাত্র-আন্দোলন থেকে উঠে আসা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত অন্য অনেক সহযাত্রীর নামগন্ধও নেই। এই বিচিত্র ইতিহাসচর্চা সম্পর্কে পরে হয়তো আমাকে আরও দু-চার কথা বলতে হবে। আজ শুধু বলতে পারি, গৌতম চট্টোপাধ্যায়-এর 'ইতিকথা'-য় যাই লেখা থাকুক না কেন, কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত গণনাট্য আন্দোলনে সলিল চৌধুরী একটি স্মরণীয় নাম।

যাহোক, এই সময়পর্বে হেমাঙ্গ বিশ্বাসও তাঁর সৃষ্টিশীল সঙ্গীত-প্রতিভায় সমৃদ্ধ করেছেন গণনাট্য আন্দোলন। 'মাউন্টব্যাটেন সাহেব ও, তোমার সাধের ব্যাটন কার হাতে দিয়া গ্যালা ও'-র তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের মিশ্রসুরের বৈচিত্র্য এখনও বোধহয় ভুলতে পারেন নি পুরনো দিনের অনেক সহকর্মী। নির্মলেন্দু চৌধুরীর লোকগীতি, মন্টু ঘোষ-এর সুরেলা দরদী কণ্ঠ, গীতিকার পরেশ ধর-এর গণসঙ্গীত গণনাট্য সংঘকে তখন সঞ্জীবিত করেছে। এই দুর্দিনেও গণনাট্য সংঘ-র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন নৃত্যশিল্পী শম্ভু ভট্টাচার্য, অভিনেতা মমতাজ আমেদ, নট ও নাট্যকার ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ খ্যাত-অখ্যাত অনেক নতুন প্রতিভা।

১৯৪৯-৫০ সালের মধ্যে মোটের উপর আমরা দেখলাম, গণনাট্য সংঘ অনেক ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়েও তার শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে। 'নবান্ন'-র মতো যুগান্তকারী নাট্যপ্রযোজনা হয়তো তার পক্ষে আর সম্ভব হয় নি, কিন্তু শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত মেহনতী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না, ক্রোধ ও বিক্ষোভকে কিছুটা অন্তত শিল্পায়িত করতে পেরেছে গণনাট্য সংঘ—তার

মঞ্চ থেকে পরিবেশিত সঙ্গীত ও নাটকের মাধ্যমে। এখানে একটা জটিল প্রশ্ন উঠতে পারে। মতান্ধ হঠকারী নীতি তো সংগঠন গড়ে না, ভাঙে। গণনাট্য সংঘ সেই মতান্ধ হঠকারী নীতির দ্বারা বহুলাংশে পরিচালিত হয়ে কিভাবে বিস্তৃত করল তার সাংগঠনিক ভিত্তি ?

এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আমি শুধু বলতে পারি, শিল্পগত সমস্যা সমাধানে এবং সাংগঠনিক নীতি প্রয়োগে গণনাট্য সংঘ অনেক ভুল করেছে, এ কথা সত্যি। এই ভুল না করলে সাংগঠনিক ভিত্তি হয়তো আরও বিস্তৃত হতো। কিন্তু এসব সত্ত্বেও গণনাট্যের কর্মীরা জনগণের সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিলেন, স্বার্থত্যাগে দ্বিধা করেন নি, আর প্রচণ্ড সন্ত্রাস ও নির্যাতনের মুখেও উর্ধে তুলে ধরেছিলেন সুউচ্চ মতাদর্শের এক বৈপ্লবিক পতাকা। এই বৈপ্লবিক মতাদর্শ দিয়েই তাঁরা অনুপ্রাণিত করেছিলেন অনেক তরুণ-প্রতিভাকে। আমি নিজে দেখেছি, সমসাময়িককালে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাঠশেষে বন্ধু ডেভিড কোহেন-এর সঙ্গে তৎকালীন তরুণ অভিনেতা উৎপল দত্ত ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের মায়ায় তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ নিয়েও কেমন করে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লেন এবং অবশেষে শেকসপীয়র-এর সঙ্গে মার্কসকেও বসালেন তাঁর মনের আঙ্গিনায়।

এমনি উদাহরণ ইচ্ছা করলে আরও তুলে ধরা যায়। কিন্তু যেহেতু গণনাট্য সংঘ-র ইতিহাস রচনা আমার অভিষ্ট নয়, সেইহেতু এ-প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি। তবু মূল প্রসঙ্গ, অর্থাৎ মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্কের পরবর্তী অধ্যায় পর্যালোচনার পূর্বে গণনাট্য সংঘ-র পাশাপাশি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র প্রভাবে গড়ে ওঠা তৎকালীন সাহিত্য-পরিমণ্ডল সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য পাঠকদের জানানো আমার কর্তব্য বলেই মনে হচ্ছে।

চল্লিশের দশকে প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলন গণজীবনমুখী সাহিত্য-চেতনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রগতি লেখক সংঘ যতদিন সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়, ততদিন বাঙলার তরুণ সাহিত্যিকদের অধিকাংশই ছিলেন এই সংঘের অনুবর্তী এবং সহযাত্রী। এই তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে যেমন অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, তেমনি আজ যাকে বলা হয় লিটল ম্যাগাজিন—সেই ধরনের বেশ কিছু সাংস্কৃতিক পত্রিকা প্রকাশেও উদ্যোগী হন।

১৯৪৮ সালে প্রকাশিত 'ডাক' পত্রিকায় অভিব্যক্ত হয়েছিল এই ধরনেরই এক-

বলিষ্ঠ প্রয়াস। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত মার্কসবাদে বিশ্বাসী তরুণ সাহিত্যিকদের অনেকেই যুক্ত ছিলেন 'ডাক' পত্রিকার সঙ্গে। যতদুর জানি, রোহীন্দ্র চক্রবর্তী, বিনয় ভট্টাচার্য, জ্যোতি রায়, বিমল ভৌমিক, রাম বসু, অসীম রায়, শান্তি বসু, সনৎ বসু, ছবি রায়, শান্তা বসু প্রমুখ তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিক-প্রতিভার আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে 'ডাক' পত্রিকা তখন প্রবীণ ও নবীনের দরবারে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের অনেকেই আজ খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত। রোহীন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন 'ডাক' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক।

'ডাক'-এর মতো 'ইস্পাত' পত্রিকার প্রকাশও সমসাময়িককালের ঘটনা। সুকান্ত ভট্টাচার্য-প্রতিষ্ঠিত 'কিশোর বাহিনী'-র সঙ্গে যুক্ত একদল ছাত্রই ছিলেন 'ইস্পাত' পত্রিকা প্রকাশের প্রধান উদ্যোক্তা। অধুনা চলচ্চিত্রখ্যাত শচীন ভৌমিক ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক। প্রয়াত অভিনন্দন সরকার ছাড়া এই পত্রিকার পরিচালকগোষ্ঠীতে ছিলেন জ্যোতির্ময় গুপ্ত, রবিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুপ্ত, দীপক মজুমদার প্রমুখ আরও অনেক তরুণ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মী। প্রথম দিকে 'ইস্পাত' মূলত কিশোরদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্র রূপেই পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে, খুব সম্ভব ১৯৪৯-৫০ সালে, 'ইস্পাত' রূপান্তরিত হয় প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র রূপে। প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনের প্রায় সকল পুরোধা ব্যক্তির রচনাই তখন প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকার পৃষ্ঠায়। মার্কসীয় মতাদর্শের প্রতিই ছিল 'ইস্পাত'-এর আনুগত্য।

এই সময়, ১৯৫০ সালে, 'ফতোয়া' নামে আর একটি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী অন্য একদল তরুণ ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীর প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয় এই পত্রিকাটি। 'ফতোয়া'-র সম্পাদক ছিলেন ক্ষেত্র গুপ্ত ও সত্যব্রত ঘোষ। এর সম্পাদকমণ্ডলী ও পরিচালকগোষ্ঠীতে ছিলেন নিমাই চক্রবর্তী, মিহির সেন, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, প্রসূন বসু, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্বাস, দ্বারিক গুপ্ত, ধনঞ্জয় দাশ প্রমুখ তৎকালীন ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মীরা। প্রয়াত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রজ নেতা অনিল কাঞ্জিলাল ছিলেন এই পত্রিকার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সাহিত্য-আন্দোলনে নবাগত ঋত্বিক ঘটক-এর রচনাও

প্রকাশিত হয় 'ফতোয়া'-র প্রথম সংখ্যায়।

'অঙ্গীকার' নামে একটি কবিতা-পত্রিকার প্রকাশও এই সময়কালের উল্লেখ্য ঘটনা। শচীন ভট্টাচার্য ছিলেন পত্রিকাটির সম্পাদক। মার্কসবাদে বিশ্বাসী প্রগতিশীল প্রায় সকল তরুণ কবির রচনাই প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকাটিতে। আজকের প্রখ্যাত শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী 'অঙ্গীকার' পত্রিকার একটি চমৎকার প্রচ্ছদপট অঙ্কনের মাধ্যমেই তখন অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আমি এ-পর্যন্ত যেসব পত্রিকার বিবরণ তুলে ধরলাম, ১৯৪৯-৫০ সালে মুখ্যত সেগুলিই ছিল প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্টিশীল রচনা প্রকাশের এবং মননচর্চার প্রধানতম বাহন। এই পত্রিকাগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই মতাদর্শের ক্ষেত্রে ছিলেন একে অন্যের খুবই কাছাকাছি। তাই এঁরা স্বচ্ছন্দে নিজের পত্রিকার চাহিদা মিটিয়েও অন্য পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করতে কখনো ইতস্তত করেন নি।

কবি বিষ্ণু দে-র নেতৃত্বে 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশের ঘটনাবলী আমি ইতিপূর্বে 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সেই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি বাহুল্য মাত্র। বিষ্ণুবাবুর 'সাহিত্যপত্র'-র সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন সেই আমলের মার্কসবাদে বিশ্বাসী অন্য কয়েকজন তরুণ বুদ্ধিজীবী। এঁদের মধ্যে অশোক সেন, বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেযোগ্য।

কিন্তু এই সময়কালে যে-পত্রিকাটির সৃষ্টিশীল অবদান প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলনকে যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্জীবিত করেছিল, একদল প্রগতিশীল নতুন সাহিত্যিকের সৃজনধর্মী প্রতিভার পরিপুষ্টির অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল, সেই পত্রিকাটির কথা আমি এবার উল্লেখ করতে চাই।

এই পত্রিকাটির নাম 'অগ্রণী'। ১৯৩৯-৪০ সালে 'অগ্রণী'র প্রথম প্রকাশকালের ঘটনাবলী এবং প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলনে তার নিজস্ব সক্রিয় ভূমিকা পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণে আছে।[১] স্বাধীনতার পরবর্তীকালে, ১৯৪৮ সালে, দেবকুমার গুপ্ত ও প্রফুল্ল রায়-এর পরিচালনায় সেই 'অগ্রণী' পত্রিকা প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলনের অগ্রজ নেতা স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য-র সম্পাদনায় পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করে। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য এই সময় ছিলেন প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র যুগ্ম-সম্পাদক। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. কুড়ি-বাইশ।—সম্পাদক

বুঝেছিলেন, প্রতিভাবান একদল নতুন লেখক সৃষ্টি করতে না পারলে যেমন কোনো সাহিত্যপত্রিকা পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য, তেমনি প্রগতি সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটাতে হলেও প্রয়োজন নতুন রক্তের যোগান—প্রতিভাবান তরুণ লেখকদের সক্রিয় সহযোগিতা। তাই, প্রথম দিন থেকেই তিনি 'অগ্রণী'-র পৃষ্ঠা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তরুণ সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশের মাধ্যম রূপে। তাঁর সস্নেহ পরিচর্যায় 'অগ্রণী'-কে ঘিরে এই সময় গড়ে ওঠে এক নতুন সাহিত্যিক-গোষ্ঠী। পূর্বে আমি যেসব পত্রিকার কথা বলেছি, সেইসব সাহিত্য-পত্রিকা থেকে 'অগ্রণী'র আড্ডায় এসে জমায়েত হন অনেকেই। এঁদের মধ্যে রাম বসু, সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যব্রত ঘোষ, আশীষ বর্মন, মিহির আচার্য, মিহির সেন, মিহির মুখোপাধ্যায়, সত্যপ্রিয় ঘোষ, বিমল ভৌমিক, গুণময় মান্না, প্রভৃতি সাহিত্যিক-বন্ধুদের নাম আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। আর, মফঃস্বল থেকে এই সময় যুগান্তর চক্রবর্তী ও আলাউদ্দিন-আল-আজাদ প্রমুখ অন্য কয়েকজন তরুণ কবির কবিতাও এসে পৌঁছাচ্ছিল আমাদের হাতে। সত্যিকথা বলতে কি, ১৩৫৬ সালে 'পরিচয়' পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হওয়ার পর এই 'অগ্রণী'-ই হয়ে ওঠে 'পরিচয়'-লেখকগোষ্ঠীর অনেকেরই প্রধান আশ্রয়স্থল।

'সাহিত্যপত্র' ব্যতীত উপর্যুক্ত অন্যসব পত্রিকাই ছিল মোটের উপর তৎকালে অনুসৃত কমিউনিস্ট পার্টির নীতির প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু 'সাহিত্যপত্র'-র মতো আর একটি পত্রিকাও তখন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। এই পত্রিকাটির নাম 'ক্রান্তি'। আর. এস. পি. দলের সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের অঘোষিত মুখপত্র রূপে ড. নীহাররঞ্জন রায়-এর সম্পাদনায় এবং জ্যোৎস্না সিংহ রায় ও ড. অরবিন্দ পোদ্দার-এর সহযোগিতায় 'ক্রান্তি' পত্রিকাতেও তখন মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্যের বিচারবিশ্লেষণমূলক বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু এই পত্রিকার বিচারবিশ্লেষণের সুর ছিল স্বতন্ত্র। বলা যায়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের (আর. এস. পি) যতখানি রাজনৈতিক পার্থক্য, ঠিক তত দূরেই অবস্থান করত 'ক্রান্তি'-র শিল্প-সাহিত্যগত ভাষ্য। ১৩৫৫ সালের শারদীয় সংখ্যা 'ক্রান্তি' পত্রিকায় ত্রিদিব চৌধুরী লিখিত 'সাহিত্য-বিচারে মার্কসবাদ' প্রবন্ধটি পাঠ করলে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন 'সাহিত্যপত্র'-র তাত্ত্বিক বক্তব্যের প্রশংসায় 'ক্রান্তি' তখন কতখানি অকুণ্ঠ।

যাহোক, এই উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহাওয়ায়, সাংগঠনিক নানা ভাঙা-

গড়ার মধ্যেই প্রকাশিত হল বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক পত্রিকা—'মার্কসবাদী'। ঐ পত্রিকার প্রথম সংকলনে বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' কিংবা উর্মিলা গুহ ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ-র 'সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি'১ মার্কসবাদী শিবিরের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সকলের পক্ষে সমান গ্রহণযোগ্য না হলেও মোটের উপর তা প্রবল বিরোধিতারও সম্মুখীন হয় নি। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, প্রদ্যোৎ গুহ-র রচনার ব্যক্তিগত আক্রমণ যদিও-বা কিছুটা বিরূপতা সৃষ্টি করেছিল, ভবানী সেন-এর রচনাটি কিন্তু তা না করে প্রায় সকলের মনেই সঞ্চারিত করেছিল কিঞ্চিৎ উৎসাহ আর উদ্দীপনা। শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক ব্যাপারে পার্টি-নেতৃত্বের একটানা ঔদাসীন্যের এই হঠাৎ-ব্যতিক্রমে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের প্রায় সব নেতা ও কর্মীই সেদিন খুশি হয়েছিলেন, অন্তত নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই একথা বলা যায়।

কিন্তু বিরোধের সূত্রপাত ঘটে পরবর্তী রচনাগুলি থেকে। 'মার্কসবাদী'-র চতুর্থ সংকলনে (জুলাই, ১৯৪৯) প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ লিখলেন 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'।২ আত্মসমালোচনার নামে প্রদ্যোৎ গুহ উক্ত প্রবন্ধে 'পরিচয়', 'অগ্রণী' ও 'লোকনাট্য' পত্রিকায় প্রকাশিত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের রচনাগুলির বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি ১৩৫৫ সালের কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত গোপাল হালদার-এর 'সংস্কৃতির সংকট' নামক প্রবন্ধটিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "গোপালবাবু পা দিয়েছেন শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে ঠিকই; কিন্তু মাথা রয়ে গেছে বুর্জোয়া শিবিরেই।……বুর্জোয়া ভাবধারা তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই বুর্জোয়া সংস্কৃতিবিদদের সম্পর্কে তাঁর লেখনী শাণিত হয়ে ওঠে না, সে সময় তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে।"৩

ঐ একই সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত নরহরি কবিরাজ-এর 'বিবেকানন্দের মত ও পথ' শীর্ষক প্রবন্ধটির দৃষ্টিভঙ্গি যে মার্কসবাদসম্মত নয়, একথা প্রমাণ করতে প্রদ্যোৎবাবু চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন নি এবং বিবেকানন্দ সম্পর্কে নরহরিবাবুর 'বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মোহ' দূর করার জন্য তিনি চূড়ান্ত রায় দিয়ে জানালেন,

---

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রথম খণ্ড, পৃ. ১-২৬ ও ২৭-৪৩।—সম্পাদক

২. দ্র. ঐ, পৃ. ৪৪-৭৭।—সম্পাদক ৩. দ্র. ঐ, পৃ. ৫০।—সম্পাদক

"বিবেকানন্দের মত ও পথকে মার্কসবাদের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখলে নরহরিবাবুরা কখনই শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়া ঐতিহ্যের এই জঞ্জাল বহনের পরামর্শ দিতেন না। শ্রমিকশ্রেণী এই জঞ্জাল বয়ে বেড়াতে রাজী নয়—এর যথাযোগ্য স্থান ইতিহাসের ডাস্টবিন।"[১]

এমনিভাবে প্রদ্যোৎ গুহ 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ-এর 'টি. এস. এলিয়ট ও নোবেল পুরস্কার' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫) ও 'সরোজিনী নাইডুর কবিতা' নামক নিবন্ধে (বৈশাখ, ১৩৫৬) এবং সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত নরেন্দ্রনাথ মিত্র-র 'দ্বীপপুঞ্জ' উপন্যাসের সমালোচনায় (ফাল্গুন, ১৩৫৫) মধ্যে খুঁজে পেলেন 'লেজুড় মনোভাবের কদর্য ও উৎকট প্রকাশ' আর চিন্মোহন সেহানবীশ লিখিত 'সংস্কৃতির আহ্বান' (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫) নিবন্ধে এবং ননী ভৌমিক-এর 'বাদা' (কার্তিক, ১৩৫৫) গল্পের মধ্যে আবিষ্কার করলেন 'আত্মশক্তিতে অনাস্থা'। জ্‌দানভ ও ফাদায়েভ-এর সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত না-হওয়ায় প্রদ্যোৎবাবু 'পরিচয়'-এর 'চরম দায়িত্বহীনতা'কে তিরস্কৃত করে এই মনোভাবকে ব্যাখ্যা করলেন 'আদর্শগত সংগ্রামে অনিচ্ছা' রূপে।

প্রদ্যোৎ গুহ তাঁর প্রবন্ধে 'পরিচয়'-এর উপর্যুক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে যেমন সোচ্চার হয়েছেন, তেমনি অনিমেষ রায় ছদ্মনামে লিখিত অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র "বুদ্ধিবিলাসীর 'ডায়ালেকটিকস'" (বৈশাখ, ১৩৫৬), নরহরি কবিরাজ-এর 'মার্কসবাদের নয়া ভাষ্য' (বৈশাখ, ১৩৫৬), পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'সোভিয়েট বায়োলজি' (চৈত্র, ১৩৫৫) শীর্ষক প্রবন্ধগুলির মধ্যে 'সংগ্রামী ঐতিহ্যের উজ্জ্বল ধারা' লক্ষ্য করেও উল্লাস প্রকাশ করেছেন।

এরপর 'লোকনাট্য' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে প্রদ্যোৎবাবু তাঁর মতামত জানাবার সময় মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী ছদ্মনামে লিখিত সজল রায়চৌধুরীর 'গণনাট্য সংগঠন-১' ও সলিল চৌধুরীর 'আধুনিক বাংলা গানের ভবিষ্যৎ' নামক রচনা দুটিকে 'সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য' রূপে অভিহিত করার সঙ্গে সঙ্গে সুরপতি নন্দীর 'গণনাট্য সংগঠন-২' নামক আলোচনার মধ্যে দেখতে পেলেন 'সংস্কারবাদের ভূত'।[২] শেষোক্ত নিবন্ধটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে প্রদ্যোৎ গুহ গণনাট্য সংঘ-প্রযোজিত 'নবান্ন' সম্পর্কে মন্তব্য করলেন, "'নবান্ন' নাটকে যে-কৃষককে আমরা

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫৪।—সম্পাদক
২ দ্র. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিশিষ্ট ১, পৃ. ২৩৫-৩৮।—সম্পাদক

দেখি, দুর্ভিক্ষপীড়িত সে-কৃষক মরে কিন্তু লড়ে না, লড়াইয়ের চিন্তাও করে না। 'নবান্ন' নাটক কাঁদায়, কিন্তু দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ উদ্দীপ্ত করে না। কি করে করবে? দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী প্রধান আসামী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই যে সেখানে অনুপস্থিত।······আসলে জনতাকে নিয়ে লিখলেই বিপ্লবী নাটক বা বিপ্লবী উপন্যাস হয় না। জনতাকে নিয়ে কি লেখা হল, সে-জনতার শ্রেণীচরিত্র যথার্থ-ভাবে ফুটছে কিনা, শত্রুর বিরুদ্ধে সে-নাটক হাতিয়ার হয়ে ওঠে কিনা—এইটাই বিপ্লবী নাটকের মূল কথা। এইভাবে বিচার করলে, 'নবান্ন'কে কি বিপ্লবী নাটক বলা যায়? না তা নিয়ে গর্ব করা শোভা পায়?১ আর, 'ভারতের মর্মবাণী' সম্পর্কে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে তিনি জানালেন, "এই নৃত্যনাট্যের 'মর্মবাণী' আসলে জওহরলাল 'আবিষ্কৃত' ভারতেরই প্রেতাত্মা।"২

সর্বশেষে, প্রদ্যোৎ গুহ 'লোকনাট্য' পত্রিকায় প্রকাশিত লোককবি গুরুদাস পাল-এর 'কলকাতার খবর'৩ শীর্ষক কবিতাটির 'সংগ্রামী চেতনাকে' মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করে বলেন, "বিষ্ণুদের মত তথাকথিত 'ভদ্র' কবিরা রচনা করুন তো দেখি এমন কবিতা, তাঁদের মুরোদ বুঝি! কিন্তু বিষ্ণুবাবুদের তা সাধ্যাতীত—কোথায় পাবে বুর্জোয়াদের বশংবদ সংস্কৃতিবিদেরা এই প্রাণশক্তি?"৪

এই হল প্রদ্যোৎ গুহ রচিত এবং 'মার্কসবাদী'-র চতুর্থ সংকলনে প্রকাশিত 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধটির সারাৎসার। পাঠকেরা সহজেই বুঝতে পারবেন, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ও অনুসৃত রণনীতি এবং রণকৌশলকে প্রদ্যোৎ গুহ কী মারাত্মক হঠকারিতার সঙ্গেই প্রয়োগ করতে চেয়েছেন তাঁর উক্ত প্রবন্ধে। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতা ও কর্মীরা যতই উগ্রতা ও মতান্ধতার শিকার হোন না কেন, এতখানি তীব্র গরল হজম করা তাঁদের অনেকের পক্ষেই সে-সময় অসাধ্য ছিল। তাই আমরা দেখলাম, প্রদ্যোৎবাবুর বক্তব্যের পক্ষে একদিকে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক সমর্থন, অন্যদিকে ঐ বক্তব্যের বিরুদ্ধে নীরেন্দ্র-নাথ রায়, নরহরি কবিরাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি বসু প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী নেতা ও কর্মীর সরব প্রতিবাদ।

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৪।—সম্পাদক ২. দ্র. ঐ, পৃ. ৭৪। —সম্পাদক ৩ দ্র. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪৩-৪৪।—সম্পাদক ৪. দ্র. ঐ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৭।—সম্পাদক

যতদূর জানি, কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলাবোধের জন্য এই মতবিরোধ নিয়ে আলোচনা প্রথম দিকে পার্টির অভ্যন্তরেই পরিচালিত হয়েছে। নীরেন্দ্রনাথ রায় আন্তঃপার্টি আলোচনায় প্রদ্যোৎ গুহ-র বক্তব্যের বিরোধিতা করলেও লিখিতভাবে তিনি বক্তব্য পেশ করেন পরবর্তীকালে, 'মার্কসবাদী'-র পঞ্চম সংকলনে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯) রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর। কিন্তু 'পরিচয়'-সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে নরহরি কবিরাজ এবং প্রগতি লেখক সংঘ-র নবনির্বাচিত সম্পাদক মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'মার্কসবাদী'-র সম্পাদক-মণ্ডলী তথা পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছে দেন তাঁদের লিখিত প্রতিবাদপত্র। আর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট পার্টি-সেলের তৎকালীন সম্পাদক, তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী শান্তি বসু ১৩৫৬ সালের শারদীয় সংখ্যা 'ডাক' পত্রিকায় স্বদেশ বসু ছদ্মনামে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'১ নামে একটি প্রবন্ধ লিখে বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন ও প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ লিখিত 'মার্কসবাদী'-র প্রথম ও চতুর্থ সংকলনের প্রবন্ধ দুটিকে প্রকাশ্যে প্রথম আক্রমণ করেন।

এইসব সমালোচনাকে গ্রাহ্য করা কিংবা যথাযথ মর্যদা দেওয়ার মনোভাব সে-সময় পার্টি-নেতৃত্বের মধ্যে ছিল না বল্লেই চলে। পার্টি-নেতৃত্বের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কেউ সামান্য কথা উচ্চারণ করলে তাঁকে প্রায়শই তখন চিহ্নিত করা হতো 'বুর্জোয়া-সংস্কারপন্থী' রূপে। তাই প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ-র বক্তব্যের বিরুদ্ধে নরহরিবাবু ও মঙ্গলাচরণ-এর প্রতিবাদপত্রকে নাকচ করার জন্য রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য, 'মার্কসবাদী'-র প্রধান সম্পাদক ভবানী সেন স্বয়ং কলম হাতে তুলে নিলেন। 'মার্কসবাদী'-র পঞ্চম সংকলনে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯) তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া-ঐতিহ্যের গ্রহণ-বর্জন এবং সিপাহী-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ প্রভৃতি গণ-বিদ্রোহ-গুলির মধ্যে প্রগতির মূল উৎস অনুসন্ধান করা সম্পর্কে প্রদ্যোৎ গুহ-নির্দেশিত বক্তব্যের বিরুদ্ধে নরহরি কবিরাজ ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নগুলি সরাসরি নাকচ করে দিয়ে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধে প্রদ্যোৎ গুহ-র সমর্থনে লিখলেন, "৪নং মার্কসবাদীতে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের যে আত্মসমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে 'পরিচয়'-এর

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১-২২।—সম্পাদক

সম্পাদকমণ্ডলী এবং প্রধান প্রধান লেখকগণ তীব্র প্রতিবাদ তুলেছেন।...

"মার্কসবাদীর প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রগতির উৎস খুঁজতে হবে সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি যে গণ-বিদ্রোহ দেখা গিয়েছে তার ভিতর। কয়েকজন লেখক মার্কসবাদীতে প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, প্রগতির উৎস খুঁজতে হবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের ভিতর। উক্ত লেখকগণ সিপাহী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি গণ-বিদ্রোহের বিপ্লবী ভূমিকা অস্বীকার করেছেন। তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, মার্কসবাদীর ঐ চিন্তাধারা "অতিবামপন্থী" এবং মার্কসবাদ বিরোধী। মার্কসবাদী ঘোষণা করছে যে, এই লেখকগণের চিন্তাধারা বুর্জোয়া-সংস্কারপন্থী এবং হিন্দু 'রিভাইভালিস্ট'। ৪নং মার্কসবাদীতে প্রকাশ রায় 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-য় যা যা লিখেছেন তার সমস্ত খুঁটিনাটি যে নির্ভুল, তা নয়, কিন্তু তাঁর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সঠিক।"১

প্রকৃতপক্ষে, প্রদ্যোৎ গুহ-র বক্তব্যের উগ্রতা সত্ত্বেও যা তিনি প্রসঙ্গক্রমে এবং ভ্রূণাকারে মাত্র উত্থাপন করেছিলেন, ভবানী সেন-এর মতো সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক নেতা সেই 'প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়গুলির'র যাথার্থ্য বিচারের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর বুর্জোয়া-ঐতিহ্য এবং গণ-বিদ্রোহগুলির চরিত্র মার্কসীয় যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে এমন বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন যাতে প্রমাণিত হল—রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য মূলত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সিপাহী-বিদ্রোহ সহ অন্যান্য গণ-বিদ্রোহগুলির 'আকৃতি' ও 'প্রকৃতি' (form & content) উভয়তই প্রগতিশীল। এই সূত্র ধরেই ভবানীবাবু ঘোষণা করলেন, "ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ এবং নীলকরওয়ালা সাহেবদের বিরুদ্ধে খেতমজুর ধর্মঘটের ভিতর দিয়েই ভারতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য তৈরী হয়েছিল—এই সত্য কথাটা অস্বীকার ক'রে সে গৌরব ইংরেজ-শাসনের অনুগত বঙ্কিম-বিবেকানন্দের উপর চাপালে শুধু মার্কসবাদ বর্জন করা হয় না, ভারতীয় জনসাধারণের নিকট ইতিহাস বিকৃত করার অপরাধে অপরাধী হতে হয়।"২

যাহোক, ভবানী সেন-এর এই প্রবন্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করল। এটাই তখন হয়ে দাঁড়াল

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৮।—সম্পাদক

২. ঐ, পৃ. ৭৯-৮০।—সম্পাদক

মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সাহিত্য-বিচারে কমিউনিস্ট পার্টির চূড়ান্ত দলিল। ভবানীবাবুর এই প্রবন্ধ পার্টি-প্রকাশনালয় থেকে পৃথক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়ে পৌঁছে গেল অসংখ্য মানুষের হাতে। তবু যে-মুষ্টিমেয় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও পার্টি-সদস্য ভবানীবাবুর বক্তব্য তখনও গ্রহণ করতে পারছিলেন না কিংবা বিরোধী বক্তব্য রাখতে ইচ্ছুক ছিলেন, তৎকালীন প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশে তাঁদের কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ করা হল।

সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের যেসব নেতা এই সময় পর্যন্ত জেলের বাইরে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ রায়, নরহরি কবিরাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ও সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীই সম্ভবত ভবানী সেন-এর বক্তব্য মনপ্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। আর, সদ্যকারামুক্ত গোপাল হালদারকেও দেখেছি এই বক্তব্যের বিরোধিতা করতে। শুনেছি, কমিউনিস্ট পার্টির সহযাত্রী, প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সুশোভন সরকারও সে-সময় ভবানীবাবুর ভ্রান্ত সিদ্ধান্তগুলির বিপক্ষে ছিলেন ; কিন্তু তিনি নাকি 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-র মধ্যে ভবানীবাবুর কিছু সদর্থক পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং ভবানীবাবুর মার্কসীয় বিচার-বিশ্লেষণের প্রতিও নাকি ছিল তাঁর অনুরক্তি।

এই সময় চূড়ান্ত বিভ্রান্তির মধ্যে যাঁরা দিন কাটাচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র অন্যতম। তাঁর এই বিভ্রান্তির কথা আমি নিজের কানে শুনেছি! অমরেন্দ্রপ্রসাদ একটি নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার জন্য সে-সময় আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনে দিনে-রাতে ছুটে গিয়েছেন কখনো সুশোভনবাবুর কাছে, কখনো সদ্যকারামুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, আবার কখনো নরহরি কবিরাজ-এর বাড়িতে। অবশেষে, ভবানীবাবুর পক্ষে গোপাল হালদার-এর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতে করতেই তিনি গোপাল হালদার-এর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত যুক্তিজালের বন্ধনে ধরা পড়েছেন, বুঝতে পেরেছেন ভবানীবাবুর মতান্ধ হঠকারী নীতির মারাত্মক ভ্রান্তিগুলি।

মোটকথা, প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ-র প্রবন্ধটিকে যাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি, রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-রচিত প্রবন্ধটি পাঠের পর তাঁদের কেউ কেউ মত-বদল করতে বাধ্য হন, যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পক্ষে-বিপক্ষে যিনি যে-মত পোষণ করুন না কেন, প্রকাশ্যে 'মার্কসবাদী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে ১৯৪৯ সালের শেষ দিন পর্যন্ত কেউ কোনো বিতর্কে প্রবৃত্ত হন নি।

এর একমাত্র ব্যতিক্রম তৎকালীন তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা শান্তি বসু।

আমি পূর্বেই বলেছি, ১৩৫৬ সালে 'ডাক' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় স্বদেশ বসু ছদ্মনামে শান্তি বসু যে-প্রবন্ধটি লেখেন সেটাই ছিল এই পর্যায়ের প্রথম প্রকাশ্য সমালোচনা। শান্তি বসু তাঁর রচিত 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'য়[১] 'মার্কসবাদী'-র প্রথম ও চতুর্থ সংকলনে প্রকাশিত বীরেন পাল ও প্রকাশ রায় ছদ্মনামে লিখিত ভবানী সেন এবং প্রদ্যোৎ গুহ-র প্রবন্ধ দুটি সম্পর্কে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বর্তমান খণ্ডে সংকলিত শান্তিবাবুর প্রবন্ধটি পাঠ করলেই পাঠকেরা তাঁর প্রশ্নগুলি অনুধাবন করতে পারবেন এবং ভবানীবাবু ও প্রদ্যোৎবাবুর শিল্প-সাহিত্য-বিচারের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কোথায় শান্তিবাবুর বিরোধ, তাও পাঠকদের অজানা থাকবে না। সুতরাং আমি এ নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করছি না। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধটি সম্পর্কে দু-একটি প্রাসঙ্গিক কথা পাঠকদের জানানো কর্তব্য বোধ হয়।

প্রথমত, শান্তি বসু তাঁর প্রবন্ধে ধনতান্ত্রিক সমাজের অবক্ষয়, হতাশা ও জীর্ণ জীবনবোধ কিভাবে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয় এবং মানুষ কিভাবে একক বিচ্ছিন্ন মানুষে পরিণত হয় তা মার্কস-এর 'বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব' সহযোগে যেমন বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি সম্ভবত তিনিই প্রথম ব্যাপকভাবে মাও সে-তুঙ-এর শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত রচনা থেকে উদ্ধৃতি বেছে নিয়ে সেগুলিকে ভবানীবাবু ও প্রদ্যোৎবাবুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে নানা ভাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, প্রদ্যোৎবাবু লোককবি গুরুদাস পাল-এর যে-কবিতাটিকে শ্রেষ্ঠত্বের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন, শান্তিবাবু সেটিকে কবিতা পদবাচ্য বলে স্বীকার তো করেনই নি, বরং উল্টে বলেছিলেন, "কবিতা যদি স্পষ্ট ভাষণ বা directness-এর ওপরেই নির্ভর করে তাহলে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'কে পয়ারে লিখলেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কবিতা হবে।"[২] আর, শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী কবিতার নিদর্শন রূপে তিনিই সম্ভবত এই পর্যায়ে প্রথম দৃঢ়তার সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্য-র কবিতার কথা তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। তৃতীয়ত, ব্যাপক নিরক্ষরতার এই দেশে শিল্প-সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য, কিংবা

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১-২২।—সম্পাদক

২. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৩।—সম্পাদক

শ্রমিক-কৃষককে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিল্পী-সাহিত্যিকরা কি শুধু ভবানীবাবু-কথিত 'সহজ সরল উদ্দীপনাশীল কলাকৌশল' অথবা প্রদ্যোৎবাবু নির্দিষ্ট লোককবির 'সহজ কথাকে সহজ করে বলা'-র স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষণকেই একমাত্র আদর্শ রূপে গ্রহণ করবে, এবং বিপ্লব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আর তুমি-কলম ধরবে না, শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন বা কৃষক-কর্মী হয়ে কাজ করে 'অভিজ্ঞতা' সঞ্চয় করে যাবে—শান্তিবাবু তাঁর প্রবন্ধে এইসব কূট প্রশ্নও উত্থাপন করেছিলেন।

যেহেতু ভবানীবাবু ও প্রদ্যোৎবাবুর প্রবন্ধে শান্তি বসু এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পান নি, সেইহেতু তিনি অজ্ঞ ও নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকদের জন্য 'পাখি সব করে রব'-এর মতো সহজবোধ্য এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টিকে সাময়িকভাবে কাম্য বলে মানেন, আবার মাও সে-তুঙ নির্দেশিত 'Literature on a higher level is absolutely necessary for them''—এ কথাটির প্রতিও যথারীতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সূত্রেই শান্তিবাবু শেষপর্যন্ত ভবানীবাবু ও প্রদ্যোৎবাবুর বক্তব্য নাকচ করে দিয়ে স্পষ্টভাবেই বলেন, "সুভাষ-সুকান্তর কবিতা সংগ্রামী, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য বিপ্লবের হাতিয়ার।"[১]

১৯৪৯ সালের শরৎকালে পশ্চিম বাঙলার রাজনৈতিক পরিবেশ, কমিউনিস্ট পার্টির উগ্র কঠোর মনোভাব, পার্টি-সদস্যদের শৃঙ্খলাপরায়ণতা ইত্যাদি কথাগুলি স্মরণে রাখলে মানতেই হয়, শান্তি বসু ঐ সমালোচনামূলক প্রবন্ধটি প্রকাশ করে সেদিন নিদারুণ দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে, 'মার্কসবাদী'-র পঞ্চম সংকলনে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯) রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় এবং শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে ভবানীবাবুর বক্তব্যকেই পার্টি-নেতৃত্ব গ্রহণ করেন চূড়ান্ত পথপ্রদর্শক দলিল রূপে। এরি-পরিণাম স্বরূপ কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন প্রাদেশিক কমিটিও এক সার্কুলার দিয়ে ভবানীবাবুর প্রবন্ধে ব্যক্ত মতাদর্শকে সাগ্রহে গ্রহণ করলেন এবং বলা যায়, বিরুদ্ধ সমালোচকদের কণ্ঠরোধ করে তাঁদের উপরেও জোর করে চাপাতে চাইলেন সেই মতাদর্শ। এই প্রসঙ্গে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রজ নেতা গোপাল হালদার আমাকে বলেছেন, কারামুক্তির পর তিনি একের পর এক চিঠি দিয়ে পার্টি-

১. দ্র মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১।—সম্পাদক

নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছেন, বলতে চেয়েছেন তাঁর বক্তব্য, কিন্তু নেতৃত্বের তরফ থেকে কোনো প্রত্যুত্তর আসে নি, বরং তাঁকে 'সাময়িকভাবে বহিষ্কার' করা হয়েছে—এমন ফিসফিসানী প্রচার ও রটনায় তিনি যথেষ্ট বিচলিত ও সংকুচিত হয়ে পড়েন। তাঁর কাছে আরও শুনেছি যে, সভ্যকারামুক্ত অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কেও একই দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ও নাকি ছিলেন তৎকালে পার্টি-নেতৃত্বের বিরাগভাজন এবং অপপ্রচারের শিকার।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের দুই প্রবীণ নেতার যখন এই দুর্দশা, তখন শান্তি বসু-র দুঃসাহসের পরিণাম কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। প্রকৃতপক্ষে, শান্তি বসু-র স্বাধীন মতামত প্রকাশের 'ধৃষ্টতা' পার্টি-নেতৃত্ব ক্ষমা করেন নি। তিনি হয়তো জানতেন তাঁর এই সমালোচনার ফলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। এই কারণেই সম্ভবত শান্তিবাবু উক্ত প্রবন্ধের রচনাকার রূপে স্বদেশ বসু ছদ্মনামটি ব্যবহার করেছিলেন। 'ডাক' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় 'আমাদের বক্তব্য' নামে যে-সম্পাদকীয় মন্তব্য পরিবেশন করেন তাতেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে লেখকের প্রকৃত নামটিকে আড়াল করার জন্য তাঁরাও গ্রহণ করেছেন এক সুকৌশলী সতর্কতা। ঐ 'বক্তব্যে' সেদিন 'ডাক'-এর সম্পাদকমণ্ডলী স্পষ্টই জানিয়েছিলেন, "প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা—দিনাজপুর থেকে আমাদের হাতে এসেছে। লেখক স্বদেশ বসু-র সব সিদ্ধান্ত আমরা না মানলেও একথা সত্য, তাঁর প্রবন্ধ প্রগতি সাহিত্য বিষয়ে অনেকগুলো মূল প্রশ্নের অবতারণা করেছে। সাহিত্য-বিচারে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগ নিয়ে হাল আমলে যেসব আলোচনা চলছে তার মধ্যে স্বদেশবাবুর প্রবন্ধ অনেকাংশে দুঃসাহসিক। আমরা তরুণ লেখকের এই প্রবন্ধ এ-কারণেই প্রকাশ করছি যে এই প্রবন্ধটির মাধ্যমে আরো সৎ এবং বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই মূল প্রশ্নটির মীমাংসা হয়ে যাবে যা আজকের দিনে প্রত্যেক প্রগতিশীল সাহিত্যিককে চিন্তান্বিত করে তুলেছে।"

যাহোক, কোনো আড়াল রচনার প্রচেষ্টাই শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নি। স্বদেশ বসু যে শান্তি বসু-র ছদ্মনাম, একথা কিছুদিনের মধ্যে আমরা যেমন জেনেছিলাম, তেমনি পার্টি-নেতৃত্বেরও তা অগোচর থাকে নি। শুনেছি, শান্তিবাবুর প্রবন্ধ নিয়ে 'ডাক' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতেও মতপার্থক্য ঘটে। এই

সময় রাম বসু নাকি শান্তিবাবুর প্রবন্ধটি প্রকাশের পক্ষে ছিলেন, আর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন বিমল ভৌমিক ও জ্যোতি রায়।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, শান্তিবাবুর প্রবন্ধটি নিয়ে ছাত্রফ্রন্টে বেশ সোরগোল ওঠে। সেই আমলের মানসিকতা নিয়ে আমরা সেদিন অধিকাংশ ছাত্রকর্মীই শান্তিবাবুর বক্তব্য এবং 'ধৃষ্টতা' সমর্থন করতে পারি নি। শেষপর্যন্ত, ১৯৪৯ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পার্টি-বিরোধী কাজের অভিযোগে তাঁর বিচার হয় এবং ছাত্র-ফ্রাকশনের অনুমোদনক্রমে প্রাদেশিক নেতৃত্ব পোস্টগ্রাজুয়েট পার্টি-সেল ভেঙে দিয়ে শান্তি বসুকে পার্টি-নীতি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পার্টি থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তটি ঘোষণা করেন। যেকালে সন্দেহ-অবিশ্বাসের আবহাওয়ার মধ্যে পার্টি-নেতৃত্ব গোপাল হালদার ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মতো প্রবীণ নেতাদের প্রতি বিরূপ হন, সেকালে শান্তি বসু-র মতো একজন তরুণ সদস্যের বিরোধী মনোভাবকে সহ্য করার ধৈর্য ও সহনশীলতা তাঁদের কাছে আশা করাই বৃথা।

'মার্কসবাদী'-র পঞ্চম সংকলনে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯) রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর প্রবন্ধ প্রকাশের পর প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে বিরাজিত মনোভাবের কথা আমি একটু আগেই উল্লেখ করেছি। এই আলোড়ন ও চাঞ্চল্য বাইরের মুক্তজীবনে যেমন অনুভূত হয়েছিল, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দীমনের তটেও তা আছড়ে পড়েছিল।

চিন্মোহন সেহানবীশ লিখিত প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের আত্মসমালোচনামূলক যে-প্রতিবেদনটির কথা আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, সেই প্রতিবেদনে ভবানী সেন-এর প্রবন্ধটি সম্পর্কে কারাগারে বন্দী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীদের তৎকালীন মনোভাব লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়—চিন্মোহন সেহানবীশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পারভেজ শাহেদী, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রায় সকল বন্দী-নেতাই তখন দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়েছেন ভবানীবাবুর বক্তব্য। দমদম জেল থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সময় ভবানী সেন-এর বক্তব্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এবং আত্মসমালোচনা করে একটি চিঠিও পাঠান বাইরের কমরেডদের উদ্দেশে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর এই চিঠি সে-সময় বাইরের দ্বিধান্বিত বেশ কিছু পার্টি-সদস্যকে ভবানী সেন-এর বক্তব্য গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। আর,

কারাগারে বন্দী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে দু-একজন নেতা ভবানীবাবুর বক্তব্য আদৌ মেনে নিতে পারেন নি তাঁদের মধ্যে সুধী প্রধান ও দ্বিজেন নন্দীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

প্রসঙ্গক্রমে পূর্ববাঙলার কারাগারে বন্দী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মনোভাব সম্পর্কেও দু-চারটি কথা বলা প্রয়োজন। ভবানীবাবুর প্রবন্ধটি পশ্চিম বাঙলার কারাগারে বন্দী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পূর্ববাঙলার কারাগারেও তার ব্যতিক্রম ঘটায় নি। ১৯৫১ সালে পুনর্বার বন্দী হয়ে আমি যখন ঢাকা ও রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারে বছরের পর বছর কাটাতে বাধ্য হই তখনও দেখেছি বহু বন্দী-কমরেডের মনে ভবানীবাবুর শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের সেই হঠকারী ঝোঁক কত ক্রিয়াশীল। আমি যেহেতু ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় ছিলাম এবং এই ঝোঁকের বিরুদ্ধে তৎকালীন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মতামত জানতাম, সেইহেতু নিজেকে কিছুটা সংশোধন করতে পেরেছিলাম। আর, ঠিক এই কারণেই ঢাকা জেলে আমার লেখা 'প্রগতি সাহিত্যের ভূমিকা' এবং 'রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ প্রসঙ্গে' নামক দুটি দীর্ঘ রচনাকে অবলম্বন করেই শুরু হয় প্রকাশ রায় ও রবীন্দ্র গুপ্ত-র মতবাদ খণ্ডনের জন্য আন্তঃপার্টি আলোচনা। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ যেসব পাঠকেরা জানতে ইচ্ছুক, তাঁরা অনুগ্রহ করে 'আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাঙলাদেশ' গ্রন্থখানি পাঠ করে দেখতে পারেন।[১]

মোটকথা, রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানীবাবুর প্রবন্ধ অধিকাংশ মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের বহুকালের লালিত বিশ্বাসকে টলিয়ে দিতে সক্ষম হয়। পূর্বেই বলেছি, শান্তি বসু-র প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্র গুপ্ত-র প্রবন্ধ প্রকাশের প্রাক-মুহূর্তে। যতদূর জানি, পার্টি-নেতৃত্ব বিরুদ্ধ সমালোচনা বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও একমাত্র নীরেন্দ্রনাথ রায় ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে ভবানীবাবুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত সুচিন্তিত মতামত পেশ করেছিলেন সর্বোচ্চ পার্টি-নেতৃত্বের কাছে। কিন্তু সেই রচনাটিকেও দীর্ঘকাল যথারীতি চেপে রাখা হয়। এই সময় পার্টি-নেতৃত্ব শিল্প-সাহিত্য ফ্রন্টে তাঁদের মতামত

১. দ্র. ধনঞ্জয় দাশ, 'আমার জন্মভূমি : স্মৃতিময় বাঙলাদেশ' ; তৃতীয় সংস্করণ ; মুক্তধারা, ৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৯। —সম্পাদক

প্রচার করার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া 'পরিচয়' পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করেন।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সমালোচক সরোজ দত্ত এবং কবি-সাংবাদিক গোলাম কুদ্দুস-এর যুগ্ম-সম্পাদনায় নবপর্যায়ে 'পরিচয়' পত্রিকা পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করে ১৩৫৬ সালের পৌষ মাসে (জানুয়ারি, ১৯৫০)। পার্টি-নেতৃত্ব তখন সরোজ দত্ত, গোলাম কুদ্দুস ও অনিল কাঞ্জিলাল-কেই তাঁদের নীতি ও আদর্শ প্রচারের যোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। কুদ্দুস সাহেবের মুখে শুনেছি, নবপর্যায়ে 'পরিচয়'-সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের আগে তাঁর এই নতুন কর্ম-নিযুক্তি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁকে ও কৃষকনেতা আবদুল্লাহ্ রসুলকে ১৯৫০ সালে ঢাকায় পাঠানো হয় পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টির কাজে। ঢাকায় অবস্থানকালেই কুদ্দুস সাহেব কলকাতায় ফিরে আসার জন্য পার্টির জরুরি নির্দেশ পান। এখানে ফিরে আসার পরই তিনি জানতে পারেন, তাঁকে এবং সরোজ দত্তকে দেওয়া হয়েছে 'পরিচয়' সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব। অনিল কাঞ্জিলাল এই সময় বেশ অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস-এর সঙ্গে 'পরিচয়' সম্পাদনার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও দায়িত্বশীল অংশীদার।

এই পর্বের বহু ঘটনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমিও অনেকখানি জড়িত। বিশেষ করে নবপর্যায় 'পরিচয়' পত্রিকার একজন 'নৈষ্ঠিক' তরুণ কর্মী ও 'প্রতিশ্রুতিবান' লেখকরূপে তখন আমি সরোজ দত্ত, গোলাম কুদ্দুস এবং অনিল কাঞ্জিলাল-এর প্রায় নিত্যদিনের সঙ্গী। মনে পড়ে, ডাফরিন হাসপাতালের বিপরীত দিকে চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই-লেন-এর দ্বিতলে, অনিল কাঞ্জিলাল-এর বাসায়, 'পরিচয়'-এর অঘোষিত সম্পাদকীয় দপ্তরটির কথা। অনিলদা অসুস্থ, প্রায় শয্যাশায়ী। অথচ অক্লান্ত। এই বাড়িতেই দেখেছি, কখনো আসছেন সরোজ দত্ত-কুদ্দুস সাহেব, কখনো গোপাল হালদার-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, আবার কখনো আসছেন নীরেন্দ্রনাথ রায় আর অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র কিংবা অন্য কোনো লেখক। এখানেই আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে লোককবি গুরুদাস পাল-এর সঙ্গে। অনিল কাঞ্জিলালই এই পরিচয় করিয়ে দেন। এই বাড়িতে বসেই একদিন কথাপ্রসঙ্গে গোপাল হালদার ও অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র 'মার্কসবাদী'-র পঞ্চম সংকলনে প্রকাশিত রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর বক্তব্য তাঁরা

প্রথমদিকে কে কিভাবে গ্রহণ বা বর্জন করেছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করেন। আর সেই সূত্রেই গোপাল হালদার-এর যুক্তির প্রভাবে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র মত-পরিবর্তনের কথা আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়। এখানে এসেই একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'মার্কসবাদী'তে প্রকাশিত 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা' সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য বলেন এবং সেই বক্তব্য নবপর্যায়ের 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশের বাসনা ব্যক্ত করেন। মানিকবাবু তখন বরানগরের ১৮৬-এ গোপাললাল ঠাকুর রোডে একটা ভাড়াবাড়িতে বাস করতেন এবং আমি থাকতাম দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ায়। সম্ভবত এই কারণেই পরিচয়-সম্পাদক সরোজ দত্ত আমাকে মানিকবাবুর লেখাটা সংগ্রহ করে আনার জন্য অনুরোধ জানান। অস্পষ্ট মনে পড়ছে, রুলটানা একটা এক্সারসাইজ খাতায় লেখা মানিকবাবুর রচনাটি আমিই তাঁর কাছ থেকে এনে সরোজ দত্ত কিংবা অনিল কাঞ্জিলাল-এর হাতে পৌঁছে দিই। ১৩৫৬ সালের পৌষ মাসে সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস-সম্পাদিত নবপর্যায় 'পরিচয়' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'১ শিরোনামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ঐ রচনাটি প্রকাশিত হয়।

'মার্কসবাদী'-র বক্তব্যকে কেন্দ্র করে 'ডাক' পত্রিকায় স্বদেশ বসু ছদ্মনামে শান্তি বসু-র রচনাটি প্রকাশের পর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধটিই যে ঐ সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রকাশ্য আলোচনা, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

মানিকবাবুর প্রবন্ধটি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। পাঠকেরা প্রবন্ধটি পাঠ করলে স্পষ্টই বুঝতে পারবেন, 'মার্কসবাদী'-র চতুর্থ সংকলনে প্রদ্যোৎ গুহ-র রচনাটি প্রকাশের পর মানিকবাবু ঐ প্রবন্ধটিকে কেন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন নি। আবার, 'মার্কসবাদী'-র পঞ্চম সংকলনে ভবানী সেন-এর প্রবন্ধটি প্রকাশের পর তিনি কিভাবে সংশয় মুক্ত হয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণে ভবানীবাবু-নির্দেশিত পথকেই মোটের উপর অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছেন, সেকথাও অনুধাবন করতে পাঠকদের বিশেষ অসুবিধা হবে না।

এসব সত্ত্বেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মনে হয়তো কিছু 'কিন্তু' এবং 'প্রশ্ন' ছিল। তাই তিনি রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সে-নএর মত কিভাবে গ্রহণ করেছেন এবং ভবানীবাবুর প্রবন্ধ পাঠের পূর্বে তাঁর নিজস্ব মত ও দৃষ্টিভঙ্গি কোন

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩-৫৪।—সম্পাদক

খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল, সে-সম্পর্কে আত্মসমালোচনামূলক একটি দীর্ঘ ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন। পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন, উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং গণবিদ্রোহগুলি সম্পর্কে ভবানীবাবুর বক্তব্য এবং মানিকবাবুর ঐ আত্মসমালোচনামূলক ব্যাখ্যা সর্বক্ষেত্রে একই কণ্ঠস্বরে বিলীন হয়ে যায় নি। যদিও শেষপর্যন্ত মানিকবাবু স্বীকার করেন, "সিপাহী-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ প্রভৃতির ঐতিহ্য বহন করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথক কোনো ধারা সৃষ্টি হয় নি, এই ধারণাই রামমোহন-রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করে শুধু দীনবন্ধু-নজরুলকে প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করার পক্ষে বাধা ছিল। এইরূপ পৃথক ও বিপ্লবী ধারা যে বাঙলার সংস্কৃতিতে আছে, রবীন্দ্র গুপ্ত তার ভিত্তি সরবরাহ করেছেন। সুতরাং আমি আগ্রহের সঙ্গে এই ভিত্তি গ্রহণ করেছি। অবশ্য এই ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আরও বিচার ও অনুসন্ধান প্রয়োজন।[১]

উদ্ধৃতাংশের শেষ পংক্তিটির প্রতি আবার আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ভবানী সেন-এর মূল প্রতিপাদ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও মানিকবাবুর সংশয় যে সম্পূর্ণ ঘোচে নি, 'ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আরও বিচার ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন'—এই কথা উচ্চারণের সঙ্গে আমাদের মনে সেই সংশয়ই তিনি জাগ্রত করে দেন।

এছাড়া, মানিকবাবু তাঁর প্রবন্ধে প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ করেন তা সমর্থন করেছেন কিন্তু 'ছদ্মবেশী বামপন্থী সংস্কারবাদ'কে উপেক্ষা করায় তিনি প্রদ্যোৎ গুহ-র সমালোচনাও করেছেন। এই সূত্রেই প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র চতুর্থ সম্মেলনে পঠিত এবং ১৩৫৬ সালের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত চিন্মোহন সেহানবীশ-এর 'সাহিত্য ও গণসংগ্রাম' নিবন্ধটিকে ছদ্মবেশী 'বামপন্থী বিপ্লববাদের নমুনা' রূপেই মানিকবাবু চিহ্নিত করেছেন এবং চীনের বাস্তবতা আর এদেশের বাস্তবতার মধ্যে যে গরমিল রয়েছে তাও তাঁর প্রবন্ধে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

সর্বশেষে, মানিকবাবু তাঁর প্রবন্ধে আঙ্গিকগত সমস্যার প্রশ্নটি উত্থাপন করে বলেছেন, '...আঙ্গিক সহজ হবে, আঙ্গিকের বিশেষ মূল্য নেই এই ধারণাও প্রগতি সাহিত্যকে ব্যাহত করছে।... অধ্যাত্মবাদ, রহস্যবাদ, দুঃখবাদ ইত্যাদির

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২।—সম্পাদক

জন্য যে আঙ্গিক, আঙ্গিক-সর্বস্বতার সাহায্যে এলোমেলো অর্থহীন চিন্তা নিয়ে উচ্চচিন্তার ভাঁওতা সৃষ্টির জন্য যে আঙ্গিক, বলিষ্ঠ সংগ্রামী বস্তুবাদের তা কোনো কাজেই লাগতে পারে না। এই আঙ্গিক-প্রীতি নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রতি আনুগত্য, সংস্কারবাদ।

"কিন্তু সোজা সহজভাবে বিপ্লবী ভাবচিন্তাকে প্রকাশ করার আঙ্গিকই প্রগতি সাহিত্যের আঙ্গিক হবে, একথা বলাও বুর্জোয়া-প্রতিক্রিয়া, ছদ্মবেশী সংস্কারবাদ। এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে দু'ভাবে, বুর্জোয়া আঙ্গিক-সর্বস্বতার প্রতিক্রিয়ায় আঙ্গিককে বাতিল করতে চাওয়ার ঝোঁক এবং অজ্ঞ অশিক্ষিত মজুর-কিষাণের সহজিয়া সাহিত্যই কেবল গ্রহণীয়—এই লেনিনবাদ-বিরোধী যান্ত্রিকতা থেকে।"১

'মার্কসবাদী' সংকলনে আঙ্গিক সম্পর্কে ভবানীবাবু-কথিত 'সহজ সরল উদ্দীপনাশীল কলাকৌশল' এবং প্রদ্যোৎবাবু-নির্দেশিত 'লোকনাট্যে'র লোককবির 'সহজ কথাকে সহজ করে বলা'-র প্রকরণকলাকে মানিকবাবু সীমিত ক্ষেত্রে স্বীকার করে নিয়েও—আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এটাই যে একমাত্র আদর্শ হতে পারে না, সেই কথাও বলার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, আঙ্গিকের প্রশ্নে মানিকবাবু ঠিক ভবানীবাবু ও প্রদ্যোৎবাবুর বক্তব্য হুবহু গ্রহণ করতে পারেন নি। এ-সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মত স্পষ্ট প্রকাশ করে বলেছেন, "...প্রগতি সাহিত্যের আঙ্গিক এখনো জন্মেনি, জন্মাচ্ছে—নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যেই জন্মাচ্ছে। বাঙলার শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির প্রাণবস্তু যেমন হবে নতুন, আঙ্গিকও হবে তেমনি নতুন—কারো সাধ্য নেই আজ বলে দেয় সে আঙ্গিক কি হবে।"২

এই পরিপ্রেক্ষিতে, পার্টি-প্রদত্ত নির্দেশ এবং সেই নির্দেশের প্রতি অনুগত সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস-সম্পাদিত নবপর্যায়ের 'পরিচয়' পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ ভিন্ন অবস্থানসূচক রচনাটির প্রকাশ, নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সঠিক সংবাদ জানিনা তবে অনুমান করতে পারি, মানিকবাবুর প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে 'পরিচয়'-সম্পাদকমণ্ডলী হয়তো পার্টি-নেতৃত্বের অনুমোদন গ্রহণ করেছিলেন। যখন ভবানী সেন-এর প্রবন্ধ নিয়ে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে মতপার্থক্য বিরাজমান তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো সৃজনশীল সাহিত্যিক-প্রতিভা ও সাংস্কৃতিক

---

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১-৫২।—সম্পাদক

২. দ্র. ঐ, পৃ. ৫৪।—সম্পাদক

আন্দোলনের সুপ্রতিষ্ঠিত নেতাকে দিয়ে, কিঞ্চিৎ ভিন্ন সুর থাকা সত্ত্বেও, ভবানীবাবুর মূল প্রতিপাদ্যের সমর্থনে একটি রচনার প্রকাশ পার্টি-নেতৃত্বের পক্ষে কম প্রয়োজন ছিল না। তাই দেখা গেল, মানিকবাবুর প্রবন্ধটি 'আলোচনার জন্য' প্রকাশ করে রচনাটির শিরোনামের উপরে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হল, "প্রবন্ধটির বক্তব্যের সঙ্গে সম্পাদকীয় মতের বিরোধ আছে। আলোচনার জন্য প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হল— পঃ সঃ।"১

প্রসঙ্গত, সমকালের কয়েকটি বিশেষ ঘটনার কথা পাঠকদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন। ১৩৫৬ সালের পৌষ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ, অর্থাৎ ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে, যে-সময় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধটি প্রকাশিত হচ্ছে সে-সময় বি. টি. রণদিভের নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক অনুসৃত 'অতিবামপন্থী মতান্ধ হঠকারী' নীতির ফলে পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংকট প্রায় চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করতে চলেছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এই সংকট থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে উদ্ধার করে ঠিক পথে পরিচালনার জন্য কমিনফর্ম-এর (ইনফরমেশন ব্যুরো অফ দি কমিউনিস্ট এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টিজ) মুখপত্র '*For a Lasting Peace, For a People's Democracy*'তে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। ১৯৫০ সালের ২৭ জানুয়ারি 'Mighty Advance of the National-Liberation Movement in the Colonies and Dependent Countries' শিরোনামে উক্ত সম্পাদকীয় রচনাটি '*Lasting Peace*'-এ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিচার-বিশ্লেষণান্তে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে বলা হল, "ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে জনগণের আন্দোলন, যে-আন্দোলন যুদ্ধের পর বড় আকার ধারণ করে এবং সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়, সেই আন্দোলনের ফলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা রণকৌশলগত পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষকে মেকী স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ 'পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়' রয়েছে। মাউণ্টব্যাটেনরা চলে গিয়েছে কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রয়েছে এবং অক্টোপাসের মতো তার রক্তপিপাসু শুঁড় দিয়ে ভারতবর্ষকে জড়িয়ে ধরেছে।

"এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় কমিউনিস্টদের স্বাভাবিক কর্তব্য হচ্ছে চীন ও

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পাদটীকা, পৃ. ৫৪।—সম্পাদক

অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, সমস্ত কৃষকের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী শক্তিশালী করা, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৃষিসংস্কার প্রবর্তন করার জন্য সংগ্রাম করা—নির্যাতনকারী ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে ও তাদের সহযোগী প্রতিক্রিয়াশীল বৃহৎ পুঁজিপতি ও সামন্তরাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অভিন্ন সংগ্রামের ভিত্তিতে—সমস্ত শ্রেণী, পার্টি, দল ও সংগঠন, যারা ভারতবর্ষের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাদের ঐক্যবদ্ধ করা।"[১]

এছাড়া কমিনফর্ম-এর উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে চীনের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বিজয় যে ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশসমূহের মুক্তি-সংগ্রামকে শক্তিশালী করার পক্ষে এক অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—তা বলা হয় এবং পিকিং-এ অনুষ্ঠিত এশীয়-অস্ট্রেলেশীয় দেশসমূহের ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে প্রদত্ত লিউ শাও-চি-র ভাষণ উদ্ধৃত করে চীনের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশল থেকে শিক্ষা গ্রহণেরও ইঙ্গিত দেওয়া হয়। লিউ শাও-চি তাঁর ভাষণে বলেন, "The path taken by the Chinese people...is the path that should be taken by the people of many colonial and dependent countries in their struggle for national independence and people's democracy". [দ্র. *Documents of the History of the Communist Party of India*, Vol VII, P. 611, Edited by M. B. Rao.]

যাহোক, 'পরিচয়' পত্রিকায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনা এবং কমিনফর্ম-এর মুখপত্র '*Lasting Peace*'-এ পূর্বোক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির প্রকাশ, প্রায় একই কালের ঘটনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রবন্ধ যেমন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বহু নেতা ও কর্মীকে হতচকিত করে, তেমনি কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় বি. টি. রণদিভে-অনুসৃত 'অতিবামপন্থী মতান্ধ হঠকারী' নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির বহু নেতা ও কর্মীর হাতে তুলে দেয় এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

যতদুর মনে পড়ে, 'লাস্টিং পীস' আমাদের হাতে পৌঁছবার আগেই শরৎচন্দ্র বসু পরিচালিত 'দি নেশন' পত্রিকা মারফৎ উক্ত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রিত রূপ আমাদের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু ঐ সম্পাদকীয় প্রবন্ধের গভীর তাৎপর্য আমরা

---

১. দ্র. অবতার সিং মালহোত্র, 'ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাসের রূপরেখা, তৃতীয় পর্ব, বাংলা সংস্করণ, পৃ. ৯১-৯২।—সম্পাদক

অনেকেই তখন বুঝতে পারি নি কিংবা আমাদের দীর্ঘলালিত চণ্ডমানসিকতার জন্য অতি দ্রুত তা বুঝে ওঠাও সম্ভব ছিল না। আর, এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাবার বদলে ১৯৫০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো যে-বিবৃতি পার্টি-সদস্যদের উদ্দেশে প্রচার করলেন তাতে আমাদের অনেকের মনে স্থিতিশীলতাই বরং আরও কিছুকাল আসন পেতে বসল

অথচ কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় থেকে আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে, ভারতবর্ষের বিপ্লব এখনও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে এবং তার চরিত্র মূলত সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী। এটা বুঝতে পারলে রণদিভে-যুগের স্থিতিশীলতা আর বজায় থাকে না, দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর পলিটব্যুরো কর্তৃক গৃহীত রণনীতিকেও বাতিল বলে গণ্য করতে হয়।

অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা ১৯৫০ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত 'Statement of the Polit-Bureau on the Editorial Article of the Organ of the Information Bureau on the National Liberation Movement in the Colonies' শীর্ষক দলিলটি[১] পাঠ করলে বুঝতে পারবেন কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আলোকে ভুল-ত্রুটি সংশোধনের নামে পলিটব্যুরো ঐ বিবৃতিতে কী চমৎকারভাবে তাঁদের অনুসৃত পথের সাফাই গেয়েছিলেন। কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় থেকে পলিট-ব্যুরো শুধু বুঝেছিলেন, ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী সংগ্রাম যে-বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে এবং তার থেকে যে-প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা উচিত, সেই অনুপাতে কমিউনিস্ট পার্টি পশ্চাতে পড়ে রয়েছে (lagging behind)। আর, বুঝেছিলেন— সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে পলিটব্যুরো মাত্র দুটি গুরুতর ভুল করেছেন। সেই ভুল দুটি হল: ১. সাম্রাজ্যবাদ-বুর্জোয়া ও সামন্তপ্রভুদের মিলিত চক্রের নেতা রূপে জাতীয় বুর্জোয়াকে প্রধান শক্তিরূপে গণ্য করা ২. বৃহৎ বুর্জোয়া এবং অন্যান্য বুর্জোয়াদের মধ্যে পার্থক্য না টানা এবং সামন্তপ্রভু ও ধনী কৃষককে একই পর্যায়ভুক্ত করা।

উক্ত বিবৃতির মাধ্যমে এই ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে পলিটব্যুরো জানালেন,

---

১. দ্র. '*Documents of the History of the Communist Party of India*', vol. VII, pp. 614-27, Edited by M. B. Rao.—সম্পাদক

"...the character of the struggle still remained in the main anti-imperialist, anti-feudal and national-liberationist". "...imperialist constitute the leading force in the block composed of the imperialists and their Indian satellites". "...various sections of the bourgeoisie, i.e. mainly belonging to undeveloped nationalities, can still at one time or another play the role of "fellow-travellers" in the national-liberation struggle..." "...the polit-bureau, instead of emphasising the antifeudal character of the workers' and peasants' alliance, wrongly lumps the rich peasants with the landlords..."১

উপর্যুক্ত বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিগুলিই পলিটব্যুরোর বিবৃতির ইতিবাচক দিক। কিন্তু ঐ উদ্ধৃতির প্রতিটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে বসে পলিটব্যুরো একই নিঃশ্বাসে তাঁদের অনুসৃত পথের 'শুদ্ধতা' প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং এমন বক্তব্য উপস্থিত করেছেন যার থেকে পুরনো পথকে সম্পূর্ণ বাতিল করার কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় না। ফলে, পার্টির প্রতি অনুগত অনেক প্রাজ্ঞ এবং আমার মতো বহু অর্বাচীন, ১৯৫০ সালের মে-জুন পর্যন্ত যে-তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলেন।

আমার এই বক্তব্যের প্রমাণ ১৩৫৬ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা (মার্চ, ১৯৫০) 'পরিচয়' পত্রিকা। 'পরিচয়'-সম্পাদকমণ্ডলীও যে কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে তখন পর্যন্ত কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তব্যের প্রতিবাদে শীতাংশু মৈত্র-র 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি ফাল্গুন-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশ করায় আমাদের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

শীতাংশুবাবু তাঁর প্রবন্ধে, ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহগুলির প্রগতিশীল সাহিত্যের ভিত্তি রচনাকারী ভূমিকা সম্পর্কে মানিকবাবুর সংশয় প্রকাশের বিরুদ্ধে, ভবানীবাবুর বক্তব্যকেই দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গেই শীতাংশুবাবু প্রখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নেতাদের নানা রচনা থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করে প্রমাণ করেন যে, "আমাদের দেশে বুর্জোয়ারা চিরকাল ইংরেজের সঙ্গে রফা করেই বেড়ে উঠেছে—

১ দ্র. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬`৭-২১।—সম্পাদক

এখন অবশ্য রাঘবান্বিত বুর্জোয়ারা কংগ্রেসী আমলের ব্রিটিশ-বিরোধিতার সেই পাতলা মুখোশখানাও খুলে ফেলেছে।"১ তাই শীতাংশুবাবুর সিদ্ধান্ত : "এই বুর্জোয়াদেরই মুখপাত্রদের সৃষ্ট সাহিত্য ব্রিটিশ-বিরোধী অর্থে প্রগতিশীল হতে পারে না ; এবং সেইজন্যেই কোনো অর্থেই হতে পারে না।"২

প্রকৃতপ্রস্তাবে, কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জাতীয় বুর্জোয়াদের সম্পর্কে যে-দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছিল, শীতাংশুবাবু তা নস্যাৎ করে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর তাত্ত্বিক বক্তব্য, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় বুর্জোয়াদের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য মূলত প্রতিক্রিয়াশীল, 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় সেটাই পুনর্বার প্রমাণ করলেন। এছাড়া 'বামপন্থী বিপ্লববাদ', 'সাহিত্যিকের গণসংগ্রামে যোগদান', 'দু-চার বছর লেখা বন্ধ' রাখার দাবি এবং 'সোজা সহজভাবে বিপ্লবী ভাবচিন্তাকে প্রকাশ করার আঙ্গিক' ইত্যাদি সম্পর্কে মানিকবাবু যে-বক্তব্য রেখেছিলেন, শীতাংশুবাবু এর প্রত্যেকটিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং 'শ্রেণীসংগ্রামে সাহায্য করাই হল সাহিত্যিকের কাজ'—এই অবস্থান থেকে প্রায় যান্ত্রিক উগ্রতার সঙ্গেই তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে সচেষ্ট হন।

প্রসঙ্গক্রমে অন্য একটি বিষয়ের প্রতি আমি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শীতাংশু মৈত্র-র প্রবন্ধটি প্রকাশের পর মানিকবাবু ক্ষুব্ধ হয়ে ঘোষণা করেন, "...'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধটি আমি সমগ্রভাবে প্রত্যাহার করছি।"৩ এই ঘোষণা প্রকাশের হয়তো কোনো প্রয়োজন হতো না, কারণ কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত নীতির ভুল-ভ্রান্তিগুলি যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন মানিকবাবু সঙ্গতভাবেই মনে করেছিলেন, "...নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল বিষয়টি সমগ্রভাবে পুনর্বিবেচনাসাপেক্ষ এবং এ লেখাটিও বাতিল বলে বিবেচিত হবে।" তবু তিনি ঘোষণাটি করলেন, কেননা, "অনেকের ধারণা এই যে, আমি এখনও উপরোক্ত প্রবন্ধের মতামত আঁকড়ে আছি। পুনর্বিবেচনার জন্য তাই এই প্রত্যাহার ঘোষণার প্রয়োজন হলো।"৪

এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে শীতাংশুবাবু-কর্তৃক উত্থাপিত

---

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৯।—সম্পাদক
২. দ্র. ঐ, পৃ. ৬০।—সম্পাদক
৩. দ্র. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'লেখকের কথা', পৃ. ১২৮।—সম্পাদক
৪. ঐ, পৃ. ১২৮।—সম্পাদক

অভিযোগগুলি সম্পর্কে মানিকবাবু তীব্র ক্ষোভের সঙ্গেই জবাব দিয়েছেন এবং শীতাংশুবাবুর লেখাটিকে 'মার্কসবাদের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা পদ্ধতিকে, বৈঠকী তার্কিকের যেন-তেন-প্রকারেণ বিপক্ষকে (?) ঘায়েল করার স্তরে নামিয়ে আনার একটি নিদর্শন বলে' তাঁর মনে হয়েছে।

যাহোক, শীতাংশু মৈত্র-র প্রবন্ধটি যখন 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে তখন কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জরুরী প্রসঙ্গ বিচ্ছিন্ন-ভাবে হলেও উঠতে শুরু করেছে।

সম্ভবত এই সময়, অর্থাৎ ১৯৫০ সালের মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে আমাদের হাতে কমিনফর্ম-এর মুখপত্র 'লাস্টিং পীস'-এর সম্পাদকীয়, সোভিয়েত ভারততত্ত্ববিদ বালাবুশেভিচ-এর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ এবং 'চায়না ডাইজেস্ট' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত লিউ শাও-চির উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের মুক্তি সংগ্রামের রণনীতি ও রণকৌশল সংক্রান্ত রচনাটি পৌঁছে যায়। প্রধানত এই রচনাগুলির সাহায্যেই কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে শুরু হয় আন্তঃপার্টি সংগ্রাম।

সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের নেতা এবং কর্মীদের মধ্যেও তখন অবস্থা বেশ জটিল ও বিভ্রান্তিকর হয়ে উঠেছে। উপরের দলিলগুলিকে কেন্দ্র করে নানা গোষ্ঠীর নানা ব্যাখ্যা যেমন সে-সময় প্রচলিত, তেমনি মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত কলহ-বিদ্বেষও ক্রম-ধূমায়মান।

এই সময় 'পরিচয়'-সম্পাদকমণ্ডলী কিছুটা নমনীয় কৌশল অবলম্বন করে পরিস্থিতি অনুধাবনের চেষ্টা করেন। এরি ফলে, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর ১৯৪৯ সালের ৪ নভেম্বর লেখা যে-প্রবন্ধটি এতকাল পার্টি-নেতৃত্ব প্রকাশযোগ্য বলে বিবেচনা করেন নি, রবীন্দ্র গুপ্ত ও প্রকাশ রায়-এর বক্তব্যের সমালোচনামূলক 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক সেই প্রবন্ধটি ১৩৫৬ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় (এপ্রিল, ১৯৫০) প্রকাশ করা সম্ভব হয়। ইতিমধ্যে রণদিভে-নীতির কট্টর অনুসরণকারী রূপে 'পরিচয়'-সম্পাদক সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস-এর বিরুদ্ধে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, নরহরি কবিরাজ, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অনিল সিংহ প্রমুখ সোচ্চার হতে শুরু করেন। এঁরা তখন পূর্বোক্ত দলিলগুলির ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের বিভিন্ন কর্মীদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে আলাপ-আলোচনা যেমন চালু করেছেন, তেমনি

ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে প্রগতি লেখক সংঘ-র দপ্তরে আধিপত্য বিস্তারের জন্যও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ।

আজ কালের দূরত্বে দাঁড়িয়ে এই প্রসঙ্গে অকপটে কিছু বক্তব্য আমি নিবেদন করতে চাই। বিপুল ক্ষয়-ক্ষতি ও তিক্ততার পরিবেশে, অত্যন্ত এলোমেলোভাবে যেহেতু পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের একাংশের নেতৃত্বে এই আন্তঃপার্টি সংগ্রাম শুরু হয় সেইহেতু প্রথম স্তরে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের প্রধান ঝোঁকটি ছিল কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে 'টিটোবাদী-ট্রটস্কিবাদী' রূপে চিহ্নিত করা। কারণ, পার্টি-নেতৃত্বের একাংশ তখন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক বিচ্যুতিকে 'ট্রটস্কি-বাদী' বিচ্যুতি রূপে অভিহিত করতে শুরু করেছেন এবং রণদিভে-অনুসৃত সাংগঠনিক পদ্ধতিকে চিহ্নিত করেছেন 'Titoite-Turkish Methods' রূপে। এইসব শব্দগুচ্ছের নিহিতার্থ কে কতটুকু বুঝেছিলেন জানি না, তবে যাঁরা নতুন পার্টি-লাইনের প্রবক্তা রূপে নিজেদের মনে করছিলেন, তাঁরা তখন প্রতিপক্ষকে প্রায় নির্বিচারেই আক্রমণ করেছেন 'টিটোবাদী-ট্রটস্কিবাদী' রূপে। সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে এই আক্রমণ প্রধানত কেন্দ্রীভূত হয় 'পরিচয়'-সম্পাদক সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস এবং তাঁদের অনুগামী কিছু কর্মী ও লেখকের বিরুদ্ধে। বলতে দ্বিধা নেই, 'পরিচয়'-এর কর্মী-লেখক রূপে সরোজ দত্ত, গোলাম কুদ্দুস ও অনিল কাঞ্জিলাল-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার অপরাধে আমার মতো নগণ্য ব্যক্তিও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় নি। আন্তঃপার্টি সংগ্রাম যখন তুঙ্গে তখন নরহরিবাবুদের পক্ষভুক্ত দিলীপ চৌধুরী নামে একজন তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী নবযুগ চৌধুরী ছদ্মনামে, রবীন্দ্র গুপ্ত-প্রকাশ রায়-এর নির্দেশ অনুসরণে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে-সর্বনাশানীতি গোলাম কুদ্দুস-অনিল কাঞ্জিলাল চালু করেছিলেন বলে তাঁর ধারণা—সেই রীতি-নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় শচীন ভট্টাচার্য ও পূর্ণেন্দু পত্রী-সম্পাদিত ১৩৫৭ সালের শারদীয়-সংখ্যা 'অঙ্গীকার' পত্রিকায়। উক্ত প্রবন্ধে গোলাম কুদ্দুস, অনিল কাঞ্জিলালকে আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্পষ্টতই লেখেন, "...ধনঞ্জয় দাশের কবিতায় এই অতিবামপন্থী বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। কুদ্দুস সাহেবেরা যে-School গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ধনঞ্জয় দাশ, খুব সম্ভব, তার আনুগত্য স্বীকারে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকবেন।"[১]

---

১. দ্র. 'পাঠকের চোখে সাম্প্রতিক কবিতা', অঙ্গীকার, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ৬৩-৬৪। —সম্পাদক

আন্তঃপার্টি সংগ্রামের নামে এই সময়, অন্তত কিছুকালের জন্য, প্রগতি সংস্কৃতি-শিবির দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। 'পরিচয়'-এর বিরুদ্ধে নতুন পার্টি-লাইনকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কার্যকর করার জন্য ১৩৫৭ সালের বৈশাখ মাসে অনিল-কুমার সিংহ-এর সম্পাদনায় 'নতুন সাহিত্য' আত্মপ্রকাশ করে। আর, একই সময়ে, 'পরিচয়'-এর অনুগামী রূপে তরুণ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মুখপত্র রূপে সত্যব্রত ঘোষ ও ক্ষেত্র গুপ্ত-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ফতোয়া' পত্রিকাটি। 'ফতোয়া'-র অন্যতম পরিচালক রূপে বলতে পারি, আমরাও চেয়েছিলাম নতুন পার্টি-লাইনকে ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুনতর বক্তব্য পরিবেশন করতে। এমন কি, 'পরিচয়'-সম্পাদকমণ্ডলীও আন্তরিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন নতুন পার্টি-লাইনের তাৎপর্য। সেই অনুযায়ী পুরনো দৃষ্টিভঙ্গির রচনার সঙ্গে শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির রচনাও তাঁরা 'পরিচয়'-এ প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। 'নতুন সাহিত্য' কোন পথে চলবে সেই সম্পর্কে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে যখন লেখা হল, "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যুগ পাল্টাচ্ছে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট হচ্ছে সমাজ-বিপ্লবের স্তর। কাজেই বর্তমান সমাজ-বিপ্লবের স্তরে সাহিত্যের প্রকৃতি কি হবে তা নিয়ে আজও সন্দেহের নিরসন ঘটে নি। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া সত্ত্বেও বিভ্রান্তির অবকাশ থাকা সম্ভব। ...এ সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত হিসাবে 'নতুন সাহিত্যে'র এই সংখ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ চীনা ঐতিহাসিক, সমালোচক ও সাহিত্যিক কুয়ো মো-জোর 'সাহিত্য ও শিল্পে যুক্ত ফ্রণ্ট' শীর্ষক অনবদ্য রচনাটি আমরা প্রকাশ করলাম।... 'নতুন সাহিত্য' সানন্দে ঘোষণা করছে যে উপরোক্ত প্রবন্ধের নির্দেশিত পথই তার পথ"—[দ্র. নতুন সাহিত্য, প্রথম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ. ৬৮-৬৯]—তখন পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন, কুয়ো মো-জো-র ঐ একই প্রবন্ধ 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশের অন্তত দু-মাস আগে, ১৩৫৬ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'চীনের সাহিত্যে ও শিল্পে সংযুক্ত ফ্রণ্ট' নামে অবিকৃতভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য উক্ত সংখ্যাতেই রবীন্দ্র গুপ্ত-র বক্তব্যের সমর্থনে এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্ব-আলোচিত শীতাংশু মৈত্র-র প্রবন্ধটিও প্রকাশিত হয়। আর, এর পরবর্তী সংখ্যা 'পরিচয়'-এ (চৈত্র ১৩৫৬) আমরা মুদ্রিত আকারেই পাই রবীন্দ্র গুপ্ত-র বক্তব্যের বিরুদ্ধে রচিত নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর প্রবন্ধটি।

এর থেকে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? সত্যিই কি কোনো টিটোবাদী-ট্রটস্কিবাদী নেতা সচেতনভাবে, স্বেচ্ছায় কিংবা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে বিপথে চালিত করেছিলেন? যাঁরা রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণকে সম্পূর্ণ কিংবা বহুলাংশে অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই নীতিকে কার্যকর করার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতেও কোনো দ্বিধা করেন নি, তাঁরা কি টিটোবাদী-ট্রটস্কিবাদী ছিলেন? এইসব প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করলে, পুরনো ভুলের প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতিকে বিন্দুমাত্র লঘু না করে আমরা সকলেই বোধহয় বিনীতভাবে স্বীকার করতে পারি: টিটোবাদী-ট্রটস্কিবাদী বুলি ছিল আমাদের অপরিণত রাজনৈতিক চেতনার সাময়িক আশ্রয়ভূমি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত ঝোঁক এবং গ্রহণক্ষমতার তারতম্য থাকা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের কেউ-ই সেদিন অভ্রান্ত ছিলেন না, সকলের দৃষ্টিই ছিল কম-বেশি অস্বচ্ছ এবং কুয়াশাচ্ছন্ন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন পার্টি-লাইনের চ্যাম্পিয়ন রূপে যাঁরা কাজ শুরু করলেন তাঁদের আচার-আচারণেও প্রতিফলিত হল এক ধরনের পেটিবুর্জোয়া ঝোঁক, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। সরোজ দত্ত, গোলাম কুদ্দুস এবং তাঁদের অনুগামীরা তো বটেই, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো সৎ-সংগ্রামী লেখকও অন্তত কিছুকাল এই বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হলেন। ১৩৮১ সালের বিশেষ সংখ্যা 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি' পাঠ করলে আমার কথার সত্যতা পাঠকেরা উপলব্ধি করতে পারবেন। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমি মানিক-বাবুর 'ডায়েরি' থেকে দিনপঞ্জীর অংশবিশেষ এবার পরিবেশন করছি।

১৪. ২. ৫০ তারিখে মানিকবাবু তাঁর ডায়েরিতে লিখলেন: "...কমিনফর্ম। আলোড়ন। সংশোধন—দিকপরিবর্তনের সূচনা।"

১৯. ৪. ৫০ তারিখের ডায়েরিতে লেখা আছে: "নারায়ণ গঙ্গোর বাড়ী। প্রগতির Ex. [Executive ?] বিভ্রান্তি ও হতাশা—সুবিধাবাদ। শুধু আলোচনাই হল, সিদ্ধান্ত কিছুই নয়। প্রত্যেকে নিজের কথা ভাবছে।"

৪. ৬. ৫০ তারিখের ডায়েরি থেকে আমরা জানতে পারছি: "46-এ ইকহল্‌ম্‌ আবেদন সভা। স্টেশনে দেখে গেলাম।... নরহরিবাবুরা এগিয়ে সভার [?] করায় নেতৃত্ব দখল করেন। অমর মিত্রের পাশে বসলাম— সরে গেলেন। তিনি হলেন সভাপতি!"

৫. ৬. ৫০ তারিখে মানিকবাবুর ডায়েরিতে লেখা হয়েছে: "নরহরির বাড়ীতে নতুন কমিটির সভা। কনভেনার ডাকে নি—কুদ্দুস ডেকে নিয়ে গেল।

"অমর মিত্র নতুন সাহিত্যে রবীন্দ্র গুপ্তের জবাব লিখেছে। তারই সংক্ষিপ্তসার বক্তৃতায়। কি রাগ, কি ঝাঁঝ, কি গালাগালি! নতুন সাহিত্য বেরিয়েছে আমায় বাদ দিয়ে—পরিচয়ে লেখার অপরাধে! স্পষ্ট হয়ে উঠছে সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে নিজেদের জোট বাঁধছে। গোপালবাবু নেতা হতে উদ্যোগী। হীরেন-বাবুর ওপর অমরবাবু চটা।

"নতুন সাহিত্যের বদলে পরিচয়ে লেখা গেলে ভাল হত শুনেই-অমরবাবুর কি গর্জন—"কান নেই, শুনতে পান না পরিচয়ে লেখা ছাপা বারণ ছিল? এসব আর চলবেনা মানিকবাবু।"

"ভাল! ভাল!"

১৪. ৬. ৫০ তারিখে মানিকবাবু ডায়েরিতে লিখেছেন: "ফতোয়া থেকে ধনঞ্জয়। 46-এ General Body meeting—গেলাম। আধচেনা অচেনা মুখ 46 দখল করে আছে। সভা বাতিল। বুঝলাম—নরহরিবাবুরা যাতে দখল না করতে পারেন।"

এর প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে মানিকবাবুর ৪. ১০. ৫০ তারিখের ডায়েরি থেকে আমরা জানতে পারছি: "মঙ্গলা পরিচয়ের গল্প দাবী করেছিল। আজ 'উপায়' গল্পটি 46-এ বুধবারের বৈঠকে পড়লাম। মঙ্গলা সভাপতি। বড়রা কেউ আসে না—ছেলেমানুষদের রাজত্ব! মধ্যবিত্ত 46 দখল করছে—পিছনে থেকে সামনে রেখেছে নরহরিদের। বর্জনের ভয় দেখিয়ে আমায় অনুগত করার নরহরির পলিসি আজও স্পষ্ট—সে বা মঙ্গলা গোড়ায় আমায় এড়িয়ে চলেছে! নরহরি গল্প পড়ার সময় অন্য কাজে ব্যস্ত রইল! অল্পবুদ্ধি, অল্প অভিজ্ঞতা, ভাবে যে নেতৃত্ব দখল করলেই নেতা হওয়া যায়।

"খুব খাটছে—আন্তরিক চেষ্টা—কিন্তু সঙ্কীর্ণতা ও যান্ত্রিকতা কাটিয়ে উঠতে পারে না। পিছনে অমরেন্দ্র ইত্যাদি আড়াল থেকে চালাচ্ছে বোঝা যায়!"[১]

আমি যে-কথা ইতিপূর্বে বলতে চেয়েছিলাম, মানিকবাবুর 'ডায়েরি'-র টুকরো টুকরো সংক্ষিপ্ত বাক্য বা বাক্যাংশ প্রায়-নিঃশব্দে সেই কথাগুলি বলে দিয়েছে।

মানিকবাবুর ব্যক্তিগত অভিমান কিংবা ক্ষোভ তাঁর নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু আন্তঃপার্টি সংগ্রামের নামে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে যে-মানসিকতা তখন বিরাজমান তার সত্য বিবরণ নিঃসন্দেহে লিপিবদ্ধ হয়েছে 'ডায়েরি'-র ঐ দিনপঞ্জীতে।

যাহোক, ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে, পুলিশী হামলা একটু হ্রাস পেলে, ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের প্রগতি লেখক সংঘ-র অফিসে যাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন তাঁদের ভিতর এই লেখকও একজন। ১৯৫০ সালে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম শুরু হলে ঐ অফিসে আধিপত্য বিস্তারের জন্য এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা যে চলেছিল, একথার মধ্যে সত্যের অপলাপ নেই। প্রকৃতপক্ষে, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, নরহরি কবিরাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্র মজুমদার, অনিল সিংহ, নীহার দাশগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী, চিত্ত বিশ্বাস, হরিদাস নন্দী, ধীরেন রায়, নিমাই চক্রবর্তী, মিহির মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চৌধুরী, দীপক মজুমদার, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য প্রমুখ প্রবীণ ও নবীন মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই আমি তখন প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে উপস্থিত হতে দেখেছি। ১৯৫০ সালে অনিয়মিতভাবে আসতে দেখেছি—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, অমল দাশগুপ্ত, অসীম রায়, বিমল ভৌমিক, সিদ্ধেশ্বর সেন, মিহির সেন, কৃষ্ণ ধর, কল্পনা ধর প্রমুখ আরও অনেক সহযাত্রীকে। আর, মনোরঞ্জন বড়াল-এর সর্বক্ষণের আস্তানাই তো ছিল ঐ ছেচল্লিশ নম্বরের অফিস ঘর। বুধবারের বৈঠকে আসতেন আরও অনেক প্রবীণ ও নবীন শিল্প-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী। তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আমাদের বন্ধুরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই তাঁরা ছড়িয়ে ছিলেন। প্রয়োজন মতো আমাদের ডাকে তাঁরাও এসে জড়ো হতেন ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে। তাই, আন্তঃপার্টি সংগ্রামে জোট-বাঁধার প্রচেষ্টায় অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, নরহরি কবিরাজ, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আর মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় খুব তৎপর হলেও আমাদের একেবারে উপেক্ষা করতে পারতেন না। সত্যিকথা বলতে কি, নতুন পার্টি-লাইনের ভিত্তিতে আমাকে পক্ষভুক্ত করার জন্য নরহরিবাবু কয়েকবার চেষ্টাও করেছেন কিন্তু তাঁর ঐ কৌশলী প্রচেষ্টার প্রতি বিরূপ থাকায় আমি তখন প্রতিবারই তাঁর সঙ্গে আলোচনা এড়িয়ে চলেছি। অবশেষে সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর

প্রচেষ্টা সফল হয়। শেষপর্যন্ত আমরা কয়েকজন তাঁর বাড়িতে এক আলোচনা-সভায় মিলিত হই।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য—একটাই। অর্থাৎ, মানিকবাবু তাঁর 'ডায়েরি'-র পৃষ্ঠায় যে-বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তার সত্যাসত্য যাচাই করে নেওয়া। সেটা যাচাই করতে বসে আজ স্পষ্ট মনে পড়ছে—মানিকবাবু-বর্ণিত ঘটনাবলী, এমনকি নরহরিবাবুদের সভা বানচাল করার জন্য আমাদের তরুণ মনের সেই চাপা উত্তেজনাময় মুহূর্তগুলিও।

সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অভ্যন্তরে সংঘটিত এইসব টানা-পোড়েন জানা না থাকলে নতুন প্রজন্মের পাঠকদের পক্ষে মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্কের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত হয়তো অনেক সময় ঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হবে না। এই কারণে, সচেতন থাকা সত্ত্বেও, আমাকে কিছু বাড়তি প্রসঙ্গের অবতারণা করতে হল।

যাহোক, রবীন্দ্র গুপ্ত-র বক্তব্যের বিরুদ্ধে নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর যে-প্রবন্ধটি 'পরিচয়' পত্রিকায় (চৈত্র, ১৩৫৬) প্রকাশিত হয়, আমার বিবেচনায়, মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সেটি এক উল্লেখযোগ্য রচনা। নীরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর প্রবন্ধে 'ভারতে ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে মার্কস-এর অভিমত' উদ্ধৃত করে মার্কস-এর নামে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন যে-ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন তার প্রায় বিপরীত সিদ্ধান্তই তুলে ধরেন। রবীন্দ্র গুপ্ত বলেছিলেন, "ভারতের ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তা প্রগতিশীল ধারা নয়, বরং তার উল্টো ধারা। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ-শাসন প্রগতির সূত্রপাত করেছিল—একথা যদি সত্য হয়, তবেই এদের ধারাকে প্রগতিশীল বলা যায়। ···কিন্তু মার্কস কখনও একথা বলেন নি যে ভারতে ইংরেজ-শাসন একটি প্রগতিশীল শক্তি।"[১] নীরেন্দ্রনাথ রায় বল্লেন, "এই উক্তি গ্রহণে আমার বাধা আছে।" তারপর ভারত-সম্পর্কে মার্কস-এর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে এবং মার্কস-এর সেই বিখ্যাত উক্তি, "···ইংলণ্ড যত পাপই করুক না কেন, সে এই বিপ্লব ঘটাইয়া নিজের অজ্ঞতাসারে ইতিহাসের কাজ সম্পন্ন করিয়াছে" তুলে ধরে নীরেন্দ্রনাথ স্পষ্টই জানালেন, "ইহার পরে কি করিয়া বলা চলে যে, মার্কস কখনও বলেন নাই যে ভারতে ইংরেজ-শাসন একটি প্রগতিশীল

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫।—সম্পাদক

শক্তি।"১ এছাড়া "ভারতের অধিবাসীগণের ভিতর হইতে কলিকাতায় ইংরেজের তত্ত্বাবধানে, অনিচ্ছায় ও কৃপণভাবে শিক্ষিত হইয়া উদ্ভূত হইতেছে একটি **নূতন শ্রেণী** যাহারা ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশ-শাসনের উপযুক্ত শক্তি অর্জন করিতেছে"—মার্কস-এর এই উক্তির সূত্র ধরেই নীরেন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে রবীন্দ্র গুপ্ত-র বক্তব্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "এই শেষ লক্ষণটি একান্ত প্রযোজ্য কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম রামমোহন ও হিন্দুকলেজের বিস্ময়কর প্রতিভাশালী তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওর অনুবর্তীগণের পক্ষে। তাই ভারতের নবজীবন সৃজনে রামমোহন ও ডিরোজিওর প্রভাব প্রগতিশীল নয়, প্রতিক্রিয়াশীল—এই মন্তব্য মার্কসবাদ-সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা পাইতে হয়।"২

এমনিভাবে প্রায় অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে নীরেন্দ্রনাথ রায় সিপাহী-বিদ্রোহের সঙ্গে নীল, সন্ন্যাসী, সাঁওতাল, ওয়াহবি প্রভৃতি আন্দোলনের সুস্পষ্ট পার্থক্য টেনে রবীন্দ্র গুপ্ত-বিশ্লেষিত সিপাহী-বিদ্রোহের শ্রেণীচরিত্র ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করলেন। আর, এই পরিবেশে, 'আচারে-বিচারে, কর্মে-বিশ্বাসে, পুরাতনকে পরিত্যাগ ও নতুনকে গ্রহণ মার্কসীয় বিজ্ঞানসম্মত প্রগতির এই চিরন্তন উৎস হইতে বাঙলা দেশে তথা ভারতে বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রথম উদ্ভব' সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করলেন, "ঔপনিবেশিক পরিবেশে এই উৎস স্বভাবতই স্বল্পপ্রাণ, তথাপি ইহার ছিল গুণগত উৎকর্ষ, ভবিষ্যতে প্রসারিত হইবার অমোঘ নিয়তি। এবং ইহারই শিল্পগত প্রকাশ, বাঙলা দেশের বুর্জোয়া সাহিত্য। তাই, যতই তাহার অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তাহাকে প্রগতিশীল বলিয়া স্বীকার না করা, তাহাকে সমগ্রভাবে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলিয়া নিন্দা করা—মনে হয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসীয় বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ।"৩

বাংলা সাহিত্যের বিচারে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন যে-নিরিখ প্রয়োগ করেছিলেন নীরেন্দ্রনাথ তাকে সাহিত্যিক নিরিখ রূপে গ্রহণ করেন নি, তাঁর মতে সেটি ছিল খণ্ডিত দৃষ্টির রাজনৈতিক নিরিখ। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য-বিচারে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের মূলসূত্র' প্রয়োগ করা সম্পর্কে নীরেন্দ্রনাথ রায়

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৭৩।—সম্পাদক
২. দ্র. ঐ, পৃ. ৭৪।—সম্পাদক
৩. দ্র. ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৮২।—সম্পাদক

প্রখ্যাত সোভিয়েত-সমালোচক মিখাইল লিফশিৎস-এর লেনিনবাদী সাহিত্য-বিচারের দৃষ্টান্ত বারংবার তুলে ধরেন এবং রবীন্দ্র গুপ্ত-র প্রায় সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করে প্রমাণ করেন যে, রামমোহন-মাইকেল থেকে শুরু করে দীনবন্ধু-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অতীতের সকল মহৎ মানবতাবাদী লেখকই তাঁদের কিছু দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা সত্ত্বেও মূলত প্রগতিশীল।

সর্বশেষে, নীরেন্দ্রনাথ রায় 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট' গঠন সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের দেশে সমাজবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হইলেও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যবনিকা পতন হয় নাই। ...ঔপনিবেশিক দেশসমূহে এই ফ্রন্ট সংগঠনের কৌশল হিসাবে কমিণ্টার্নের ষষ্ঠবিংশ কংগ্রেস যে নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহার কার্যকারিতা এখনও বাতিল হইয়া যায় নাই।... আমাদের দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এখনও চূড়ান্ত সাফল্য না হওয়ায় মার্কসবাদীগণের এই সকল কর্তব্য এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। এই কর্তব্য সম্পাদনে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রচলিত বুর্জোয়া সাহিত্যকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়; কারণ, এই করণীয়গুলির প্রত্যেকটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। ...কমিণ্টার্নের এই সঠিক নির্দেশ বিস্মৃত হইলেই হয় মার্কসবাদ খণ্ডিত ও ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট বিকলাঙ্গ।"[১]

অতি সংক্ষেপে আমি নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর মূল বক্তব্যের সারাংশটুকুই শুধু তুলে ধরলাম। এই খণ্ডে সংকলিত মূল প্রবন্ধটি পাঠ করলে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন একজন প্রকৃত মার্কসবাদী সমালোচকের দায়িত্ব কত নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গেই সেদিন নীরেন্দ্রনাথ রায় পালন করেছিলেন। এই প্রবন্ধটি একটি নির্দিষ্ট যুগে, নির্দিষ্ট বক্তব্যের প্রতিবাদে রচিত হওয়া সত্ত্বেও, আমার ধারণা, মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারের স্বল্পপুঁজি ভাণ্ডারে এখনও মূল্যবান সংযোজন রূপে বিবেচিত হবে।

এরপরে সরোজ দত্ত-গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার সম্ভবত একটি মাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। সেই অন্তিম সংখ্যায় (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭) প্রকাশিত হয় সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখিত 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্ম-সমালোচনা' শীর্ষক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। সতীনবাবু তাঁর প্রবন্ধের শুরুতে

---

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৯৪। —সম্পাদক

রবীন্দ্র গুপ্ত-র সমর্থনে লিখিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীতাংশু মৈত্র-র বক্তব্য উত্থাপন করে দু-জনকেই তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। তারপর তিনি 'রবীন্দ্র গুপ্ত ও তাঁর ভক্তদের দৌলতে মার্কসবাদ যেরকম বিকৃত হয়েছে, মার্কসবাদের নামে তাঁরা কি মারাত্মক ট্রটস্কীবাদী চোরাকারবার করেছেন' এবং 'মার্কসবাদের নামে ভবিষ্যতে আর তাঁরা ভেজাল জিনিস [যাতে] চালু করতে না পারেন' সেদিকে লক্ষ্য রেখেই যে ঐ প্রবন্ধটি লিখছেন, তা ঘোষণা করেন।

একথা নিশ্চয় স্বীকার্য যে, সতীনবাবুর প্রবন্ধটিই কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের নির্দেশিত পথকে অবলম্বন করে নতুন পার্টি-লাইন সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য দলিল। তিনি এই প্রবন্ধে দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত ও পুরনো পার্টি-লাইনের ভিত্তিতে রচিত রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন এবং তাঁর অনুগামীদের প্রধান পাঁচটি বক্তব্য-বিষয়কে চ্যালেঞ্জ করেন। এই পাঁচটি বিষয় হল, যথাক্রমে ১) ১৮৫৫-৫৯-এর ভারতীয় সংগ্রামগুলো "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব" কিনা এবং এসব সংগ্রামের নেতৃত্ব কাদের হাতে ছিল? ২) ১৮৫৫-৫৯-এ ভারতের আর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থা যা ছিল তাতে "কৃষক-বুর্জোয়া"র বিকাশ সম্ভব কিনা এবং আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের এ বিষয়ে বক্তব্য কি? ৩) ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের ভূমিকা কি ছিল? বাঙলার ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়াশ্রেণীর 'মনস্বী'দের সাথে রুশদেশের উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সাদৃশ্য টানা মার্কসবাদসম্মত কিনা? ৪) ঐতিহ্যবিচারে, প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের সমন্বয় সম্পর্কে, মার্কসবাদের শিক্ষা কি? ৫) বিপ্লব কোন্ শ্রেণী করে? এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে পেটিবুর্জোয়াদের ভূমিকা কি? পেটিবুর্জোয়ারা কি বিপ্লব-ভাঙাদের দলে, না পেটিবুর্জোয়ারা 'শ্রেণী' হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী?

প্রশ্নবোধক উপর্যুক্ত পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ থেকে পাঠকেরা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন, এর প্রত্যেকটির সদুত্তর খোঁজার পশ্চাৎপটে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এক তীব্র-তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণ। সতীনবাবু এই কাজ যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি কার্ল মার্কস, লেনিন, স্তালিন, মাও সে-তুঙ, ডিমিট্রভ, রজনী পাম দত্ত, কার্দেলি প্রমুখ তাত্ত্বিক নেতাদের বক্তব্য যথাস্থানে যথাযোগ্যভাবে উদ্ধৃত করে তাঁর বক্তব্য শুধু প্রতিপন্নই করেন নি, রবীন্দ্র গুপ্ত এবং তাঁর অনুগামীদের 'টিটোবাদী-ট্রটস্কিবাদী' রাজনৈতিক অবস্থানের

ভিত্তিকেও টলিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর প্রবন্ধটি যেমন ছিল মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্যগত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভবানীবাবুর বক্তব্য খণ্ডন, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি তেমনি ছিল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নেতাদের বক্তব্যের সাহায্যে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা, বিপ্লবের স্তর ইত্যাদি নির্ধারণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণ করে মূলত রাজনীতিগত ভাবে ভবানীবাবুদের 'টটস্কিবাদী' নীতির ভ্রান্তি অপনোদন। সতীনবাবুর প্রবন্ধটিকে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনার পরিবর্তে আমি এই খণ্ডে সংকলিত সমগ্র প্রবন্ধটির প্রতিই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত নীরেন্দ্রনাথ রায় ও সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী-র প্রবন্ধ দুটি সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম পরিচালনার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়। এই সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরেও অন্ধ্রের সম্পাদকমণ্ডলীর দলিলের ভিত্তিতে শুরু হয়ে যায় সমগ্র পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন মূল্যায়ন এবং নেতৃত্ব-বদলের জন্য অস্থিরতা। ১৯৫০ সালের মে-জুন মাসে দীর্ঘকাল পরে দ্বিতীয় কংগ্রেসে নির্বাচিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এক অধিবেশনে মিলিত হন। তাঁরা অন্ধ্র-সম্পাদকমণ্ডলীর দলিলে বর্ণিত 'ভারতের বিপ্লবের স্তর গণতান্ত্রিক' —এই যুক্তি স্বীকাব করার সঙ্গে সঙ্গে 'চীনের পথ' যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করার যে-আকুতি উক্ত অন্ধ্র-দলিলে লিপিবদ্ধ হয়েছিল সেটিকেও অনুমোদন জানিয়ে ঘোষণা করেন, "'চীনের পথ' অর্থাৎ সশস্ত্র পার্টিজান যুদ্ধের পথ খোলাখুলিভাবে গ্রহণ করা ছাড়া সংগ্রামের অন্য কোনো বিকল্প পথ নেই। মুক্তাঞ্চল ও মুক্তিবাহিনী তৈরী করার জন্যে এই পার্টিজান যুদ্ধের সাথে কৃষিবিপ্লব যুক্ত হবে এবং সেই সঙ্গে শত্রুকে পরাস্ত ও জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যে জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করতে হবে।"১

১৯৫০ সালের এই মে-জুন অধিবেশনেই পুরনো কেন্দ্রীয় কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে মাত্র ১১ জন সদস্যকে নিয়ে পুনর্গঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। বি. টি. রণদিভে, ভবানী সেনসহ অনেক নেতাকেই বাদ দেওয়া হয় নতুন কমিটি থেকে। বি. টি. রণদিভের জায়গায় সাধারণ সম্পাদক রূপে কমিউনিস্ট পার্টিব

১. দ্র. অবতার সিং মালহোত্র, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের রূপরেখা, তৃতীয় পর্ব, পৃ. ৯৩।—সম্পাদক

কার্যভার গ্রহণ করেন সি. রাজেশ্বর রাও। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে পালাবদল ঘটে, শুরু হয়ে যায় পর্বান্তর যাত্রা।

এই পর্বান্তরের ইতিহাস 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে' যতটুকু প্রয়োজন হবে পরবর্তীকালে আমি সেটুকু তুলে ধরতে নিশ্চয় চেষ্টা করব। প্রসঙ্গক্রমে, আমি পাঠকদের শুধু একটি কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে 'চৈনিক বিপ্লবের পথ' বর্জন করে 'রুশীয় বিপ্লবের পথ' গ্রহণ করা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে যে-বক্তব্য রেখেছিলাম, পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি (জুন-সি. সি. নামে পরিচিত) কিন্তু সেই নীতির পরিবর্তন ঘটালেন। তাঁরা 'চৈনিক বিপ্লবের পথ' অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ বলে মনে করলেন। এর ফলে, এই সময় রচিত পার্টির সমস্ত দলিলে যেমন প্রাধান্য পেল চৈনিক নেতাদের তাত্ত্বিক বক্তব্য, তেমনি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামে এবং ভবানী সেন-এর 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-র প্রতিবাদে লেখা মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নানা প্রবন্ধেও মাও সে-তুঙ, কুয়ো মো-জো প্রমুখ চৈনিক নেতাদের সাহিত্যভাষ্য প্রায় চূড়ান্ত নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করল। ইতিপূর্বে আলোচিত সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধে এর সাক্ষ্য পাঠকেরা অবশ্যই খুঁজে পাবেন। আর, নতুন পার্টি-লাইনের ভিত্তিতে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে আন্তঃপার্টি সংগ্রাম চালাবার জন্য সদ্য প্রকাশিত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকা-র সম্পাদক তো ঘোষণাই করলেন, "কুয়ো মো-জো-র প্রদর্শিত পথ"-ই তাঁদের পথ। ১৩৫৭ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য অনিমেষ রায় ছদ্মনামে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র 'মার্কসবাদ ও বাংলা সাহিত্য' শিরোনামে যে-প্রবন্ধটি প্রকাশ করলেন তার পাদটীকাতেও তিনি স্পষ্ট লিখলেন, "৫নং "মার্কসবাদী" সংকলনে রবীন্দ্র গুপ্তের "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কসবাদের প্রয়োগ নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে, মাও সে-তুঙের নিউ ডিমোক্রেসি ও ১৯৪২ সালের ইয়েনান বক্তৃতা, এই দুইটি প্রামাণ্য দলিলের সাহায্যে সেই বিতর্কের মীমাংসা করতে চেষ্টা করাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। চীন সম্বন্ধে মাও-য়ের মূল বিশ্লেষণ ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।"১

একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক যুগের নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১২৬।—সম্পাদক

তথা সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির বিচার-বিশ্লেষণে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃষ্টিশীল তত্ত্বের অমোঘ প্রয়োগ-কৌশল আয়ত্ত করার চেয়ে আমরা যে বিভিন্ন সময়ে মূলত বিভিন্ন রাজনৈতিক ঝোঁকের দ্বারাই চালিত হয়েছি, 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র ইতিহাস-পর্যালোচনায়, দুঃখের হলেও, সেই সাক্ষ্য অপ্রতুল নয়। আর, ঠিক এই কারণেই পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমার কর্তব্য বলেই মনে করছি।

যাহোক, 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত অনিমেষ রায় ছদ্মনামে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র 'মার্কসবাদ ও বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক রচনাটি ভবানীবাবুর বক্তব্যের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। এই প্রবন্ধে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকেই মার্কসবাদীদের আশু কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছেন। আর, নয়া গণতন্ত্রের শিল্প-সাহিত্যে তিনি দেখতে চেয়েছেন সাম্রাজ্যবাদ ও ফিউডাল-বিরোধী কনটেণ্ট। মূলত এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই অমরেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর প্রবন্ধে নয়া গণতন্ত্রের ভাবাদর্শ, সাহিত্যের ডেমোক্রেটিক ফ্রণ্ট, শিল্পরূপ ও ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং রবীন্দ্র গুপ্ত-র অনুসৃত পথকে চিহ্নিত করেছেন মার্কসবাদ-বিরোধী রূপে।

কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের ১ জুনের (১৯৫০) চিঠিতে[১] সকল পার্টি-সদস্য ও সমর্থকদের কাছে যে-বক্তব্য তুলে ধরেন সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করলে, বলতেই হয়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র নিষ্ঠার সঙ্গেই সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে নতুন পার্টি-লাইনকে সেদিন কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অমরেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর প্রবন্ধে যদিও রাজনীতিগত নিরিখই প্রধানত ব্যবহার করেছিলেন তবু সাহিত্যগত নিরিখেও তিনি মাইকেল, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সৃজনশীল অবদান সম্পর্কে এমন কিছু মন্তব্য রেখেছিলেন, যা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর বক্তব্যের বিরোধী। এছাড়া, যেহেতু অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র Polemical রচনায় সিদ্ধহস্ত, সেইহেতু তাঁর প্রবন্ধটি বেশ

---

১. দ্র. 'Letter of the New Central Committee to All Party Members and Sympathisers', '*Documents of the History of the Communist Party of India*', Edited by M. B. Rao, pp. 628-68, Issued on 1 June, 1950.—সম্পাদক

চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠে এবং তৎকালে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অনেকের কাছেই অবশ্য পাঠ্যরূপেই বিবেচিত হয়। অমরেন্দ্রপ্রসাদ-এর মূল প্রবন্ধটি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে। সুতরাং সেটি পাঠ করে সহৃদয় পাঠকেরা নিজস্ব মতামত গঠন করতে পারবেন, এই বিশ্বাস থেকেই আমি উক্ত প্রবন্ধের বিস্তারিত আলোচনায় আর প্রবেশ করছি না। কিন্তু উপসংহার-পর্বে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র এমন একটি মন্তব্য করেছিলেন যার মধ্যে দিয়ে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন 'বামপন্থী সংকীর্ণতা'র বিরুদ্ধে লড়াই করতে অগ্রসর হয়েও একজন মার্কসবাদীর পক্ষে গোষ্ঠীগত সংকীর্ণ মনোভাব বর্জন করা কতখানি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। 'অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পরবর্তী যুগে নতুন স্তরের সাহিত্য, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক অগ্রণী সাহিত্য' যাঁরা রচনা করেছেন, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী তাঁরা হলেন—'সুভাষ-সুকান্ত-মঙ্গলাচরণ-ননী ভৌমিক-সুশীল জানা-সলিল চৌধুরী প্রভৃতি।' পাঠকেরা দয়া করে লক্ষ্য করুন, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র তাঁর পরিবেশিত তালিকা থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো একজন বিশিষ্ট সৃজনশীল মার্কসবাদী সাহিত্যিকের নাম কত অনায়াসে লুপ্ত করে দিয়েছেন।

আমি ইতিপূর্বে 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি' থেকে যে-বিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেছিলাম এবং তার মধ্যে মানিকবাবুর যে-মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, তা যে কার্যকারণসম্পর্কহীন ছিল না, পূর্বোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকেরা নিশ্চয় সেকথা অনুধাবন করতে পারছেন।

এসব সত্ত্বেও 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত মার্কসবাদী লেখকগোষ্ঠী আন্তঃপার্টি সংগ্রামে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঐ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় সংস্কৃতি-সাময়িকী বিভাগে 'পঁচিশে বৈশাখ' শীর্ষক নিবন্ধে গোপাল হালদার কোনো নাম উচ্চারণ না করেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভবানীবাবুর উক্তি খণ্ডন করে বলেন, "...যখন দেখছি বাংলা সাহিত্য 'ঔপনিবেশিক অভিশাপে' কতটা ব্যাহত ও বিকৃত, আর রবীন্দ্রনাথও সেই পরিবেশেরই মানুষ হিসাবে কোথায় অসম্পূর্ণ ও কতটা অবাস্তব, তখনও জানি—মোটের উপর এই বাংলা সাহিত্য এই ভাঙন-ধরা বাঙালী জাতির এক প্রধান আশ্রয়, আর রবীন্দ্রনাথ তার মানবতাবাদ শুদ্ধ এক অনলস অগ্রগামিতার প্রতীক!" [দ্র. নতুন সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃ. ৬৮-৬৯]

ঠিক এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভবানীবাবুর বক্তব্য খণ্ডন করার জন্য

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত '*The Golden Book of Tagore*' নামক স্মারকগ্রন্থ থেকে প্রখ্যাত সোভিয়েত মনীষী অধ্যাপক পি. এস. কোগান-এর রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধটি 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার ১৩৫৭ সালের শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। অধ্যাপক কোগান-এর প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েট রাশিয়া' শিরোনামে অনুবাদ করেন রবীন্দ্র মজুমদার। এই অনূদিত প্রবন্ধটি প্রকাশের প্রকৃত উদ্দেশ্য একটুও গোপন করা হয় নি। অনূদিত প্রবন্ধটির শেষে 'অনুবাদকের কথা'-য় রবীন্দ্র মজুমদার খোলাখুলিভাবেই লেখেন: "'মার্কসবাদী' সংকলন-গ্রন্থের গত চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা দুটিতে বাংলা সাহিত্য তথা রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক প্রকাশ রায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র গুপ্ত এক কিম্ভূত ব্যাখ্যা দেন; স্বভাবতই, বাংলা সাহিত্যের যথার্থ মার্কসবাদী বিশ্লেষণে যাঁরা সচেষ্ট, সেইসব সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। মার্কসবাদের নামে নির্লজ্জ ট্রটস্কিবাদের চোরা-কারবার চালিয়ে রবীন্দ্র গুপ্ত-প্রকাশ রায় আর তাঁদের কয়েকজন সহযোগী মার্কসবাদ-জিজ্ঞাসু তরুণদের মনে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সফল হয়েছিলেন, 'পরিচয়'-এর চৈত্র-সংখ্যায় এবং 'নতুন সাহিত্য'-র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী নীরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রী অনিমেষ রায়ের প্রবন্ধ দুটি সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার কাজে মূল্যবান নির্দেশ দিয়েছে। 'পরিচয়'-এর পরবর্তী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধটিও অত্যন্ত মূল্যবান; অকাট্য যুক্তি দিয়ে আর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে রবীন্দ্র গুপ্তের সমস্ত ভ্রান্তিবিলাসগুলিই সত্যেন্দ্রবাবু সুন্দরভাবে উদ্ঘাটন করেছেন। রবীন্দ্র গুপ্তের বিরুদ্ধে সেই প্রতিবাদের যুক্তিকেই বলিষ্ঠতর করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েটের মার্কসবাদী মনীষী অধ্যাপক কোগান-এর প্রবন্ধের অনুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল।...

"যথার্থ সাহিত্যবুদ্ধি-সম্পন্ন যে-কোনো পাঠকই রবীন্দ্র গুপ্ত-প্রকাশ রায়ের লেখা পড়ে বুঝবেন—রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে সামান্যতম অনুশীলন তো দূরের কথা সাধারণভাবে সাহিত্য-বিচারেও এঁরা দুজন অসহ্য রকম অজ্ঞ। এবং এই অজ্ঞতা থেকেই এসেছে রবীন্দ্রনাথকে "ফ্যাশিস্টদের দীক্ষাগুরু", "সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলে ঘোষণা করার মতো বীভৎস স্পর্ধা। রবীন্দ্রনাথকে "সাম্রাজ্যবাদে কোলাবরেটর" বলার মতো নিদারুণ ধৃষ্টতা প্রকাশ রায় আর রবীন্দ্র গুপ্তের মতো সাহিত্য ব্যাপারে অর্বাচীন ব্যক্তিদের পক্ষেই সম্ভব।

"রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে যে অনেক জায়গায় সীমাবদ্ধতা, অসম্পূর্ণতা আর স্ববিরোধিতা আছে, অনেক রচনায় ধর্মের আর ভাববাদের আবিলতা আছে, মার্কসবাদীরা নিশ্চয়ই সে কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদীর বিচারে কেন মহৎ সে প্রশ্নের উত্তরে 'নতুন সাহিত্য'-র জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় শ্রী গোপাল হালদার অতি সংক্ষেপে এবং সুন্দরভাবে একটি বিচার-সূত্র ধরে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রগতিশীল ঐতিহ্যকে সরাসরি বাতিল করে দিয়ে তাকে প্রতিক্রিয়ার আবর্জনায় ছুঁড়ে ফেলাটা প্রকাশ রায়-রবীন্দ্র গুপ্তের এক স্বেচ্ছাকৃত (deliberate) সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনারই পরিচয়।

"কিন্তু সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে এইসব অতি-বামপন্থী নির্দেশ অনুযায়ী কিছু দিন যে কী কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যাপার চলেছিল, তার নমুনা পাওয়া যাবে "আমি কি ডরাই কভু রাবীন্দ্রিক নপুংস বিড়াল ছানাকে" ইত্যাদি "কবিতার" অশ্লীল আস্ফালনে, কিংবা রবীন্দ্রনাথের "উর্বশী"-কে "চিৎপুরের গণিকা" বলে ঘোষণা করার কল্পনাতীত ইতরতায়।

সেই সঙ্গে, আমরা অবশ্যই মনে রাখব যে কোগান-এর এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নয়, শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র; মার্কসবাদীর শ্রদ্ধা-নিবেদনে যে-বিচারবুদ্ধি জাগ্রত থাকে সেই সুস্থ বিচারবুদ্ধিটুকুই কোগান-এর এই ক্ষুদ্র রচনাটি থেকে গ্রহণীয়।"[১]

'অনুবাদকের কথা'-য় রবীন্দ্র মজুমদার যে-বক্তব্য রেখেছিলেন আমি তার পূর্ণাঙ্গ পাঠই এখানে তুলে ধরলাম। এই বক্তব্যের মধ্যে আন্তঃপার্টি সংগ্রামের কয়েকটি ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র গুপ্ত ও প্রকাশ রায় ছদ্মনামে ভবানী সেন এবং প্রদ্যোৎ গুহ-র বক্তব্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র মজুমদার যাঁদের রচনাকে 'বিভ্রান্তি কাটিয়ে ওঠার কাজে মূল্যবান' বলে মনে করেছেন তাঁরা হলেন—নীরেন্দ্রনাথ রায়, অনিমেষ রায় (অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র), সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং গোপাল হালদার। অর্থাৎ, জোট-বাঁধার ক্ষেত্রে আমরা এখানে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার নাম একত্রে উচ্চারিত হতে দেখছি। আবার, 'ট্রটস্কিবাদী' বিচ্যুতির যে-কথা তখন সর্বত্র চালু, তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি 'অনুবাদকের কথা'-য়। 'রবীন্দ্র গুপ্ত-প্রকাশ রায় আর তাঁদের কয়েকজন সহযোগী'-র বিরুদ্ধে রবীন্দ্রবাবু 'নির্লজ্জ ট্রটস্কিবাদের চোরাকারবার'চালাবার অভিযোগ দ্বিধাহীনভাবেই উত্থাপন

১. দ্র. নতুন সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ. ১৮-১১।—সম্পাদক

করেছেন। আর, ঐ 'কয়েকজন সহযোগী' যে 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত কবি-সাহিত্যিক, রবীন্দ্রবাবু তা স্পষ্ট করে না বল্লেও, তাঁর রচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত উদাহরণ থেকে আমরা সে কথা সহজেই বুঝতে পারি। অর্থাৎ, আন্তঃপার্টি সংগ্রামে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে রবীন্দ্র গুপ্ত, প্রকাশ রায় ব্যতীত 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত লেখকগোষ্ঠীকেই মুখ্যত চিহ্নিত করা হয়েছে।

আন্তঃপার্টি সংগ্রাম পরিচালনার নামে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের অভ্যন্তরে বিরাজিত যে-পরিবেশের কথা আমি এর আগে উল্লেখ করেছি, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি'-তে যা লিপিবদ্ধ হয়েছে, রবীন্দ্র মজুমদার-এর 'অনুবাদকের কথা'-য় মোটের উপর সেই সত্যই উদ্ঘাটিত।

এই সময়পর্বে, উল্লিখিত 'ইস্পাত', 'ফতোয়া' ও 'ডাক' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেও আন্তঃপার্টি সংগ্রামের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে যায়। শচীন ভৌমিক-সম্পাদিত 'ইস্পাত' পত্রিকা ছিল 'পরিচয়'-এর অনুবর্তী। সুতরাং 'ইস্পাত' বেশ কিছুকাল রবীন্দ্র গুপ্ত ও প্রকাশ রায়-এর নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হয়। আন্তঃপার্টি সংগ্রাম শুরু হলে, ১৩৫৭ সালের বৈশাখ-সংখ্যা থেকে 'ইস্পাত'-এর ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে। উক্ত সংখ্যার মলাটে 'প্রসঙ্গত' শিরোনামে 'ইস্পাত'-সম্পাদকমণ্ডলী একটি ঘোষণায় জানান, "…'ইস্পাত' মার্কসবাদে বিশ্বাসী। রাজনীতিক্ষেত্রে যে মারাত্মক ট্রটস্কীপন্থী বিচ্যুতি ঘটেছে, মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্টালিন-মাও-এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর যে চূড়ান্ত অপপ্রয়োগ হয়েছে—তারই কুফল সহজভাবেই এসে বর্তেছে সাহিত্যে-শিল্পে-সংস্কৃতিতে। আমাদের 'ইস্পাতের' গত শান্তি-সংখ্যায় এবং এ সংখ্যায় তার স্বাক্ষর মিলবে। এই দুটি সংখ্যার কয়েকটি রচনা নিঃসন্দেহে ট্রটস্কী-বাদের ঔরসজাত। বাংলা সাহিত্য বিচার করতে বসে রবীন্দ্র গুপ্ত ভারতবর্ষ যে একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ এই চরিত্রটাকে ভুলে বসে আছেন আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফলে সংস্কৃতিক্ষেত্রে ট্রটস্কীবাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। অপরাজেয় মার্কস-বাদের বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আমরা আমাদের সমস্ত বিচ্যুতিজনিত ত্রুটি স্বীকার করছি এবং এই সঙ্গে ঘোষণা করছি এই ট্রটস্কীবাদের বিরুদ্ধে লেনিন-স্টালিন মাও-এর নির্ভুল পথ-নির্দেশে আমরা ক্ষমাহীন সংগ্রাম চালাতে বদ্ধপরিকর।

"এই সংখ্যায় প্রকাশিত শান্তি বসু-র প্রবন্ধটি ছাপা হল আলোচনার জন্য। রচনাটি সম্পর্কে কারো কোন যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য থাকলে আমরা তা সানন্দে প্রকাশ করব।"

'ইস্পাত'-সম্পাদকমণ্ডলীর এই আত্মসমালোচনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু এখানেও সেই একই তোতাপাখি-মনোভাব বিদ্যমান। অর্থাৎ, ভুল সম্পর্কে পার্টি-নেতৃত্বের 'ধরতাই বুলি' যান্ত্রিকভাবে গ্রহণ করতে প্রবীণ ও নবীন সকল পক্ষই যেন সমান উদগ্রীব। এসব সত্ত্বেও স্বীকার্য যে, তরুণ মার্কসবাদীদের মধ্যে 'ইস্পাত'-গোষ্ঠীই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে তাদের বিচ্যুতির কথা বলার মতো সৎসাহস প্রদর্শন করেন। এবং এই কারণেই পুরনো পার্টি-নেতৃত্ব কর্তৃক লাঞ্ছিত শান্তি বসু-র 'সংগ্রামী সাহিত্য'[১] শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে 'ইস্পাত'-গোষ্ঠীর নতুন পথযাত্রা শুরু হয়।

বর্তমান খণ্ডে শান্তি বসু-র উক্ত প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। এবার আর ছদ্মনাম নয়। শান্তি বসু স্বনামেই 'সংগ্রামী সাহিত্য'-র নামে 'নিকৃষ্ট মার্কবাদী'-রা কিভাবে 'রবীন্দ্রনাথের মহৎ কীর্তিকে......কলংকিত' করে, 'সাহিত্যিক মূল্য-নিরূপণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে,' 'সাহিত্য ও রাজনীতিকে বীজগণিতের সমীকরণে পর্যবসিত' করেছেন—তা নানা উদাহরণ সহযোগে তুলে ধরেছেন। শান্তিবাবু কোনো নাম উচ্চারণ না করেই তাঁর প্রবন্ধে প্রধানত আক্রমণ করেছিলেন ভবানী সেন ও প্রদ্যোৎ গুহ-র 'মার্কসবাদী' সংকলনে প্রকাশিত বক্তব্যগুলি।

পরবর্তীকালে, ১৩৫৭ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'ইস্পাত' পত্রিকায় ঊর্মিলা গুহ ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ এর জবাব দেন। প্রদ্যোৎবাবুর প্রবন্ধটিরও শিরোনাম ছিল 'সংগ্রামী সাহিত্য'।[২] বর্তমান খণ্ডে সংকলিত উক্ত রচনাটি পাঠ করলে পাঠকেরা বুঝতে পারবেন—আন্তঃপার্টি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রদ্যোৎবাবু তাঁর অতীত ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন সত্যি, কিন্তু শান্তি বসু-র সাহিত্যগত চিন্তা-ভাবনা এবং বিচার-বিশ্লেষণের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য তখনও পর্যন্ত পর্বতপ্রমাণ। 'ভারতের মার্কসবাদী-নেতৃত্ব ভারতবর্ষের আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র···ভুলে গিয়ে সমাজবাদী বিপ্লবের শ্লোগান তুলেছিলেন'—শান্তি বসু-র এই অভিযোগের যাথার্থ্য প্রদ্যোৎবাবু স্বীকার করেন। কিন্তু 'শান্তি বসুও এই বাস্তব অবস্থাটিকে ভুলে বসে আছেন' বলে প্রদ্যোৎবাবু পাল্টা অভিযোগও উত্থাপন করেছেন। শান্তি বসু যখন 'সহজ-সরল উদ্দীপনাময় কলাকৌশল' গ্রহণ করার

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৭-১৫।—সম্পাদক
২. দ্র. ঐ, পৃ. ২১৬-২৩।—সম্পাদক

প্রবক্তারূপে প্রদ্যোৎবাবুদের 'নিকৃষ্ট মার্কসবাদী' রূপে অভিহিত করেন তখন প্রদ্যোৎবাবু তার জবাবে লেখেন, "সাহিত্যক্ষেত্রে ও সাহিত্যের মান উঁচু করার নাম করে জনতার রুচিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর প্রচেষ্টা—আসলে ট্রটস্কিবাদই। ...শান্তি বসু যতই না কেন ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে হাওয়ায় তলোয়ার চালান—তার এই ট্রটস্কিবাদী স্বরূপ ঢাকা পড়েনি।"[১] এছাড়া, শান্তি বসু বেলিনস্কি-র উদ্ধৃতি দিয়ে কবিতা সম্পর্কে যে-কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন প্রদ্যোৎ গুহ মাও সে-তুঙ-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে তার বিপরীত সিদ্ধান্ত টেনেছেন। এমনি ধরনের বাদ-প্রতিবাদ, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ এবং একে অন্যকে 'ট্রটস্কিপন্থী' রূপে চিহ্নিত করা অন্তঃপার্টি সংগ্রামের কালে এক চালু রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এসব সত্ত্বেও প্রদ্যোৎ গুহ তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে আন্তরিকভাবে অতীত বিচ্যুতি সম্বন্ধে আত্মসমালোচনার মনোভাব থেকে সর্বপ্রথম স্পষ্ট ঘোষণা করেন, "আমাদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার গুরুতর বিচ্যুতি ছিল। তার জন্য সংস্কৃতি-আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ সবই সত্য। 'ইস্পাত'-এর সম্পাদক-বর্গের সাথে আমিও একমত যে এই সব ট্রটস্কিবাদী বিচ্যুতির মূল খুঁজে বের করে তা উৎপাটন করা দরকার। আর তা না করে 'ট্রটস্কিবাদ' 'ট্রটস্কিবাদ' বলে হাওয়ায় তলোয়ার চালালে—আসল কাজ এতটুকুও এগুবে না। আঘাত করতে হবে ঠিক জায়গায়, আঘাত করতে হবে মার্কসবাদের প্রহরণ দিয়ে—তবেই ট্রটস্কিবাদ পরাভূত হবে—অন্যথায় নয়।

"আমাদের বর্তমান লক্ষ্য যে-সমাজ, তা নয়া গণতান্ত্রিক সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নয়। আমাদের সংস্কৃতিও তাই হবে নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতি নয়। আমরা প্রথমে কিন্তু সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতির কথা বলেছিলাম, এটা নিঃসন্দেহেই ট্রটস্কিবাদী বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি ঐতিহ্য-বিচার এবং সংযুক্ত ফ্রন্ট সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিকৃত করেছিল। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার দরকার আছে—আর সে-সংগ্রামে আমি অন্তত শান্তিবাবুদের প্রতিপক্ষ নই, তাঁদেরই সহযোদ্ধা।"[২]

মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিচারে যিনি ছিলেন

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৯।—সম্পাদক
২. দ্র. ঐ, পৃ. ২২৩।—সম্পাদক

অতি-বামপন্থী নীতির অন্যতম প্রবক্তা, তাঁর পক্ষে সেই ভুলের স্বীকৃতি প্রদান সৎ কমিউনিস্টসুলভ আচরণরূপে অবশ্যই কীর্তিত হওয়া উচিত। কমিউনিস্টরা ভুল করতে পারে কিন্তু সেই ভুল ধরা পড়লে তা লুকাবার জন্য তাঁরা চেষ্টা করে না, ভুল সংশোধন করে পুনর্বার ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়—মার্কসীয় নীতিশাস্ত্রের এই বিধি প্রদ্যোৎ গুহ-র পূর্বোক্ত বক্তব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, একথা আমরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে পারি।

প্রদ্যোৎ গুহ-র ঐ বক্তব্য যখন প্রকাশিত হয় তখন সত্যব্রত ঘোষ ও ক্ষেত্র গুপ্ত-সম্পাদিত 'ফতোয়া' পত্রিকার সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত ছিলাম তাদের মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ১৩৫৭ সালের বৈশাখ মাসে 'ফতোয়া' পত্রিকার প্রকাশকালে. রাজনৈতিক বিচ্যুতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা মোটেই স্বচ্ছ ছিল না। তাই নীতি হিসাবে "দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ ও উগ্র বামপন্থী বিপ্লববাদের প্রভাব এড়িয়ে যাঁরা সুস্থ ও বলিষ্ঠ গণ-সংস্কৃতি রচনা করতে চান 'ফতোয়া'...তাঁদেরই মুখপত্র" —একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও আমরা 'প্রগতি-সাহিত্যের শিবিরে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রভাবের বিরুদ্ধে' শীর্ষক অনিল কাঞ্জিলাল-এর যে-রচনাটি প্রকাশ করলাম তার মধ্যেও প্রকটিত হল অতি-বামপন্থী উগ্র মনোভাব। ভাবাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার জন্য অনিল কাঞ্জিলাল-এর নির্দেশিত পথ ও বক্তব্যের মধ্যে অনেক আপাত-সত্য হয়তো নিহিত ছিল। কিন্তু তাঁর সমগ্র বক্তব্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নতুন রাষ্ট্র ও নতুন সংস্কৃতি গঠন করার প্রতিজ্ঞা থেকেই অগ্রসর হয়। ফলে, গোপাল হালদার-এর 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন সংস্কারবাদ, নরহরি কবিরাজ-এর 'মধ্যবিত্ত কোন পথে ?' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে খুঁজে পান বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতিফলন। এই সূত্রেই, 'রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের যে প্রচণ্ড প্রভাব পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের আচ্ছন্ন করে আছে' তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে অনিল কাঞ্জিলাল বলেন, "রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে প্রগতিশীলতার পরিচয় নেই, একথা অবশ্যই বলা হচ্ছে না। প্রগতির সুর তাঁর কাব্যে নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু শুধু এইটুকু বলে চুপ করে গেলে তাঁর ঐতিহ্যকে খণ্ডিতভাবে বিচার করা হয়। প্রত্যেক বড় শিল্পীকেই বিচার করতে হবে তাঁর সমগ্রতা দিয়ে। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের সমগ্রতা, রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর প্রতিক্রিয়াশীল। সমগ্র

সত্তার প্রতিক্রিয়াশীলতাকে গোপন করে শুধু খণ্ডিত সত্তার প্রগতিশীলতাকে প্রচার করলে প্রগতির শিবিরে প্রতিক্রিয়ার প্রভাবকেই জোরদার করা হয়।"১

প্রগতি-সাহিত্যের শিবিরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের প্রভাবপুষ্ট পেটি-বুর্জোয়াদের ভিড় বেশী করে জমেছে বলেই অনিলবাবু মনে করেন। শত্রু-শ্রেণীর এই প্রভাব থেকে প্রগতি-শিবিরকে রক্ষা করার জন্য তাই তিনি অসংকোচে বলেন, 'নিজের মনের মধ্যে শত্রু-শ্রেণীর গুপ্তচর যদি ঘাপটি· মেরে থাকে' তবে তাকেও 'অসংকোচে উপড়ে ফেলতে হবে।' "মজুরশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে পরমতসহিষ্ণুতার নামে মজুরশ্রেণীর স্বমতের প্রতিকূলতা বরদাশ্‌ত্‌ করা মানে শত্রু-শ্রেণীর মতের প্রাধান্যকে স্বীকার করে নেওয়া, বুর্জোয়া ভাবধারাকে আমল দেওয়া—নিজের হাতে নিজের গলা কাটা।" সুতরাং মার্কসবাদী প্রগতি-সাহিত্যিককে "সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, চিন্তায় ও মননে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের জড় ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রতি 'আসক্তির কাঙাল শিকড়জাল'···ছিঁড়ে ফেলতেই হবে।"২

অনিল কাঞ্জিলাল-এর প্রবন্ধটির এই হল সংক্ষিপ্তসার। বক্তব্যকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-এর রচনাবলী থেকে অজস্র উদ্ধৃতিও তিনি ব্যবহার করেছেন। তবু অতিবামপন্থী সংকীর্ণতার ছাপ তাতে ঢাকা পড়ে নি। আর, নরহরি কবিরাজ-এর তৎকালীন মতামতকে যেহেতু গ্রহণ করতে পারি নি, সেইহেতু তাঁকে 'সংস্কারবাদী' রূপে চিহ্নিত করায় আমরা বেশ খুশি হয়েছিলাম, একথাও আজ অকপটে স্বীকার করছি। 'ফতোয়া'-র এই দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাটি অতিসম্প্রতি আমি খুঁজে পেয়েছি। ফলে, বর্তমান খণ্ডে মূল প্রবন্ধটি সংযোজন করা সম্ভব হল না। এজন্য সত্যিই আমি দুঃখিত।

'ডাক' পত্রিকার ১৩৫৭ সালের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত সনৎকুমার বসু-র 'প্রগতি সাহিত্যের বিচার-পদ্ধতি ও বাঙলার প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্য-সন্ধান'৩ শীর্ষক প্রবন্ধটি কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। সনৎবাবু তাঁর রচনায় প্রগতি সাহিত্য-বিচারে সমাজের মূল ভিত্তি এবং সেই ভিত্তির উপর গড়ে

১. দ্র. ফতোয়া, বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ. ৩৪-৩৫।—সম্পাদক

২. দ্র. ঐ, পৃ. ৩৮।—সম্পাদক

৩. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৫-২০৬।—সম্পাদক

ওঠা উপরি-কাঠামো, অর্থাৎ basis and superstructure-এর প্রশ্নটি সঙ্গতভাবেই বিচার-বিবেচনা করেছেন। তিনি মার্কসবাদকে 'dogma' হিসাবে দেখতে চান নি, দেখেছেন 'guide to action' রূপে। সাহিত্যের আলোচনায় নন্দনতাত্ত্বিক (aesthetics) বিচার-বিশ্লেষণ যে এক অপরিহার্য অঙ্গ, এই সত্যও সনৎবাবু বিস্মৃত হন নি। ফলে, তাঁর রচনাটিতে অন্যান্য লেখকের বিতর্কিত রচনার তুলনায় কিঞ্চিৎ ভিন্ন স্বাদ এবং গভীরতার স্পর্শ পাঠকেরা অনুভব করতে পারবেন বলে আমার ধারণা।

এছাড়া, সনৎবাবু যেহেতু মানেন যে—'কোনো বিশেষ যুগের সাহিত্য-বিচারে সেই যুগের সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা বাদ দেওয়া যায় না,' সেইহেতু তিনি 'রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ' পর্যন্ত যুগটির সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক ইতিহাসের পর্যালোচনাতেও বেশ যোগ্যতার সঙ্গে অগ্রসর হন। এই সব কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেই তিনি শেষপর্যন্ত বলেন, "...রামমোহন প্রমুখ মনীষীদের কার্যকলাপ প্রতিক্রিয়াশীল অথবা প্রগতিশীল না বলে, বলা ভালো যে তাঁরা পুরোপুরি বিপ্লবী ছিলেন না। এবং তা হওয়াটাও অসম্ভব ছিল।" কিংবা, "সিপাহী-বিদ্রোহ ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিদ্রোহ নয়," "...সিপাহী-বিদ্রোহকে কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লব বলাটাও অনৈতিহাসিক।" আবার, সিপাই-বিদ্রোহের শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করে সনৎবাবু জানান, "...সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর এইটিই ছিল শেষ সশস্ত্র সংগ্রাম—এ-সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল হলেও সমগ্রভাবে এ-বিদ্রোহকে প্রগতিশীল বলতেই হয়।"[১]

এরপর বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য নিয়ে মার্কসবাদীদের মধ্যে যে-সমস্যা এবং বিতর্ক চলছিল সনৎবাবু সেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন। তিনি বাঙলার রেনেসাঁস সম্পর্কে বল্লেন, "বাঙালীর মনের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয়ে যে-নতুন চেতনার সৃষ্টি হল, সে চেতনার বিকাশ আংশিক বিকাশ। সমাজের সমস্ত স্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার বা সংস্কৃতির ধাক্কা এসে লাগে নি।...তাই, বাঙলার নব্য সভ্যতাকে Renaissance বলা বা ইউরোপীয় Renaissance-এর সঙ্গে তুলনা করা বাহুল্য। সেখানে যে-নবচেতনার জোয়ার এসেছিল, সেটা সমাজের নিজের ধর্মে, নিজের স্বাধীন তাগিদে। আর এদেশে তার হল

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৭-৮৯।—সম্পাদক

আমদানি, এবং তাও এদেশীয় সমাজের স্বাধীন তাগিদে নয়।"১ সুতরাং সনৎবাবুর বক্তব্য, শুধু কলকাতা কেন্দ্রিক সমাজ এবং তার নেতা রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজকে দেখে নবজাগরণের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা মার্কসবাদসম্মত নয়; কলকাতার বাইরে অবস্থিত বিশাল বাঙালী সমাজকে ভুলে থাকাও অনুচিত।

এই সূত্র ধরেই সনৎবাবু গ্রামবাঙলার লোকসাহিত্য, রূপকথা, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, গাজন, কবিগান প্রভৃতির মধ্যে লোকসংস্কৃতির প্রাণবন্ত ঐতিহ্য অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট অভিমত: দু-শ বছরের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারেও এই সংস্কৃতির মৃত্যু ঘটে নি; বাঙালীর এই একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতির জন্মভূমি কলকাতা নয়, তার জন্মদাতা কলকাতার মুষ্টিমেয় এক গোষ্ঠীও নয়। সুতরাং অনিমেষ রায় ছদ্মনামে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র 'মার্কসবাদ ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধে 'নব্য বাঙলার সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল পুরনো বাঙলার বা ফিউডাল বাঙলার সাহিত্য-কে সম্পূর্ণ উৎখাত করে'—এই-যে উক্তি করেছিলেন, সেই উক্তিটি তিনি অগ্রাহ্য করে পাল্টা প্রশ্ন তুললেন, "প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-ব্যবস্থা হলেই কি সেখানে প্রগতিশীল সাহিত্য হতে পারে না? তাহলে Gorky তাঁর 'Mother' লিখলেন কি করে?...প্রাচীন গ্রীক-সমাজে দাসপ্রথার আমলে গ্রীক নাটক সৃষ্টি হল কি করে?"২

ইতিপূর্বে 'মার্কসবাদী' সংকলনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে এবং তার পক্ষে-বিপক্ষে রচিত প্রবন্ধগুলিতে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের বিপরীত ধারার পথিক রূপে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্নর নাম অনেকেই উচ্চারণ করেছিলেন। এই সম্পর্কে সনৎ বসু-র মত হল, "উভয় ভাবধারাই নব্য বাঙলার ভাবধারা, উভয় ভাবধারাই ইংরাজ-পুষ্ট নব্য বাঙালী সমাজের ভাবধারা।...তাঁদের মধ্যে যে-প্রভেদ, সেটা তাঁদের নিছক সাহিত্যিক পারদর্শিতার প্রভেদ। উভয়েরই সামাজিক আদর্শ compradore bourgeois আদর্শ—পাশ্চাত্য বুর্জোয়া আদর্শের অনুকরণ।"৩

'বঙ্কিমের মারফতই নারী প্রথম বাংলা সাহিত্যে এল ব্যক্তিরূপে'—অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র এই উক্তির 'কোনো বিশেষ সার্থকতা নেই' বলেও সনৎবাবু মনে করেন। তাঁর মতে, "বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯২।—সম্পাদক

২. দ্র. ঐ, পৃ. ১৯৩।—সম্পাদক

৩. দ্র. ঐ, পৃ. ১৯৪।—সম্পাদক

উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টা।" কিন্তু, "বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শের দার্শনিক ভিত্তি নিঃসন্দেহেই হিন্দু-revivalist"—এই কথা বলতেও সনৎবাবু দ্বিধা করেন না। মাইকেল মধুসূদনকে তিনি 'তৎকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' রূপে গণ্য করে বলেন, "তাঁর সাহিত্য নিঃসন্দেহেই প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরাট স্তম্ভ।" বিদ্যাসাগরের শ্রেষ্ঠত্ব তুলনাহীন এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা—বিষ্ণু দে-র এই মতের সঙ্গে সনৎবাবু যেমন ঐকমত্য ঘোষণা করেন, তেমনি বিবেকানন্দ যে 'পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল'—রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর এই মতের সঙ্গেও তিনি নির্দ্বিধায় সায় দেন।

সর্বশেষে, সনৎ বসু নানা দিক থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের মূল্য-নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমেই তিনি বলে নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ মূলত সমাজসংস্কারক বা রাজনীতিবিদ ছিলেন না, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি সুতরাং প্রাথমিকভাবে সেই দিক থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিচার হওয়া উচিত। রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন রবীন্দ্রনাথের এই দিকটি উপেক্ষা করে প্রধানত রাজনৈতিক ও দার্শনিক দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের মতামত বিশ্লেষণ করে তাঁর ভাবাদর্শকে প্রতিক্রিয়াশীল এবং তাঁকে জওহরলাল, সাভারকরের গুরু বলে অভিহিত করায় সনৎবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সনৎবাবু রবীন্দ্রকাব্য আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, 'বাংলা কাব্য-জগতে রবীন্দ্রনাথ···বিপ্লব' এনেছিলেন। তাঁর মতে, 'বুর্জোয়া আদর্শের প্রধান সামাজিক দান ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার মুক্তি'। কিন্তু যেহেতু 'দেশের নতুন অর্থনৈতিক বিকাশটাই ছিল আংশিক' সেইহেতু 'রবীন্দ্রকাব্যে ব্যক্তিত্ববোধের স্বীকৃতিও আংশিক স্বীকৃতি আর তাই তিনি "Faust" সৃষ্টি করতে অসমর্থ' হয়েছিলেন। 'কিন্তু যে-আংশিক চেতনা তিনি সৃষ্টি করলেন, সে-চেতনাকে যতদূর ঐ পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন। তাছাড়া একটি নতুন দিক তিনি খুলে দিলেন। তা হল "human values"-এর আশ্চর্য স্বীকৃতি।'

সনৎ বসু এই প্রসঙ্গে 'উর্বশী' কবিতার অপব্যাখ্যা করার জন্য গোলাম কুদ্দুস ও সরোজ দত্তকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। কিন্তু এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। গোলাম কুদ্দুস এবং সরোজ দত্ত যৌথভাবে কোনো রচনায় 'উর্বশী' কবিতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন কোনো দৃষ্টান্ত তৎকালীন নানা পত্র-পত্রিকা অনুসন্ধান করেও আমি আবিষ্কার করতে পারি নি।

একটি মাত্র জায়গায় অন্য প্রসঙ্গে গোলাম কুদ্দুস তাঁর বক্তব্য জানাবার সময় রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' কবিতার 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী'—এই পংক্তিটি ব্যবহার করেছিলেন। কুদ্দুস সাহেবের এই প্রবন্ধটি ১৩৫৬ সালের মাঘ-সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় "সাহিত্যে তথাকথিত 'তৃতীয় শিবির'" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই সময় আবু সয়ীদ আইয়ুব, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব বক্তব্য প্রকাশ করছিলেন গোলাম কুদ্দুস-এর মূল আক্রমণ ছিল তাঁদের সেই বক্তব্যের বিরুদ্ধে। কুদ্দুস সাহেব মনে করতেন, ঐসব "তথাকথিত তৃতীয়পন্থীদের কাজ হল বুর্জোয়া-বিরোধী ভূমিকার ভান করে মার্কসবাদীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা, সমাজতন্ত্রী ভূমিকার ভান করে শ্রেণীসংগ্রামকে পিছন থেকে ছুরি মারা এবং 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' (!) বুলি নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতন্ত্রকে আক্রমণ" করা। উক্ত প্রবন্ধে কুদ্দুস সাহেব 'তৃতীয় শিবির'-ভুক্ত ঐ সব সাহিত্যিক কেন এই কাজ করছেন তা ব্যাখ্যা করার জন্যই লেখেন, "শ্রেণী-সত্যকে যারা গোপন করে, 'স্বাধীনতা'-র নামে যারা প্রকৃত স্বাধীনতাকে খুন করে তারা তো সাহিত্যের স্বকীয়তা চাইবেই। এই সমাজ-নিরপেক্ষ 'স্বকীয়' সাহিত্য যে কাদের ভোগে আসে—সে আমাদের জানা আছে। 'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী' 'বৃন্তহীন' অবস্থায় সমাজ-নিরপেক্ষভাবে বুর্জোয়া ভোগের জন্য চিৎপুরের গলিতে বাস করে, আর বাস করে নগ্ন ছবির আকারে মার্কিন পত্রিকাগুলিতে।"১

'উর্বশী' কবিতার 'ব্যাখ্যা'-র সঙ্গে এইটুকুই হচ্ছে গোলাম কুদ্দুস-এর সম্পর্ক। সুতরাং সরোজ দত্ত-র নাম এই প্রসঙ্গে উঠতেই পারে না, আর 'উর্বশী' কবিতার অপব্যাখ্যাতা রূপে গোলাম কুদ্দুসকে চিহ্নিত করা কতখানি সমীচীন, পাঠকেরাই তা বিচার করে দেখবেন। সনৎ বসুর মতো 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় রবীন্দ্র মজুমদারও 'অনুবাদকের কথা'-য় নাম না করে ঐ একই ইঙ্গিত করেছিলেন,২ প্রসঙ্গক্রমে সে কথাটাও আমি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

যাহোক, সনৎবাবু অতঃপর রবীন্দ্রকাব্যের সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতাগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেখেন, "তৎকালীন 'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের' যে-গলদ ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সে-গলদ অনেকাংশে থেকে গেছে। তিনিও বাঙালী

১. দ্র. পরিচয়, মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ৩৮।—সম্পাদক

২. দ্র. নতুন সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩৫৭, পৃ. ১০-১১।—সম্পাদক

সমাজের দৈন্য, অসম্পূর্ণতা বা একপেশেমি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ...তিনি ছিলেন তাঁর নিজস্ব সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের Victim।"

"উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ এবং নিজস্ব সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ— এই দুই ভাবধারার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগত। তাই সে-জগত শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আবদ্ধ হয়ে গেল lyric-এ। আর তাই অপূর্ব এবং আশ্চর্য হলেও lyric ছাড়িয়ে যেতে অসমর্থ হল তাঁর কবিতা। এ-যুগপৎ অপূর্বতা ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার না করে উপায় কি?"১

সনৎবাবু রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস ও ছোটগল্প সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে 'উঁচুদরের' রচনা রূপে গণ্য করে বলেছেন, "গোরা, চোখের বালি, যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।" 'মার্কসবাদী'-র প্রথম সংকলনে বীরেন পাল ছদ্মনামে ভবানী সেন 'চোখের বালি' উপন্যাসের আলোচনাকালে 'অমিত-লাবণ্য-র মিলনের অন্তরায়' খুঁজতে বসে উভয়ের যে-সামাজিক বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সনৎবাবু সেই ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত মনে করে অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য: "গোরা, যোগাযোগ বা চোখের বালি ইত্যাদি পড়লেই দেখা যায় যে, যথেষ্ট সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ যে এ-ধরনের উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন, তার প্রধান কারণ ছিল তাঁর উদার মানবতাবোধ। রবীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব এই মানবতাবোধেই।"২

অনিমেষ রায় ছদ্মনামে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র যে-দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'মার্কসবাদ ও বাংলা সাহিত্য'৩ নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে প্রগতিশীল বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তার মধ্যে সাহিত্যগত আলোচনার চেয়ে রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা প্রাধান্য লাভ করায় সনৎবাবুর কাছে সেই আলোচনার 'সার্থকতা' 'স্পষ্ট নয়'। আর, সমালোচক হিসাবে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে ভবানী সেন-এর দৃষ্টিভঙ্গি যে বিকৃত সে-কথাও তিনি তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি।

'মার্কসবাদী'-র প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম সংকলনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে-বিতর্কের ঝড়

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২০২-৩।—সম্পাদক

২. দ্র. ঐ, পৃ. ২০৪।—সম্পাদক

৩. দ্র. ঐ, ১২৬-৬৪।—সম্পাদক

উঠেছিল সনৎ বসু-র প্রবন্ধটির সারাৎসার পরিবেশন করে এবার আমরা তার উপসংহার-পর্বে উপনীত হয়েছি। সনৎবাবুর প্রবন্ধটিকে আমি যে একটু বিস্তারিতভাবেই তুলে ধরলাম, তার কারণ—'মার্কসবাদ আপ্তবাক্য নয়'—এই প্রতিজ্ঞা থেকে অগ্রসর হয়ে তৎকালে সনৎ বসুই সম্ভবত মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডটি, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সাধ্যমতো প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আজকের পাঠকেরা তৎকালীন মার্কসবাদীদের অজস্র ভ্রান্তিজাল ছিন্ন করে এই প্রবন্ধটির মধ্যেই হয়তো সাহিত্য-জিজ্ঞাসার কিছু সদর্থক উত্তর খুঁজে পাবেন। একথা স্বীকার্য যে, মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্কের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আলোচিত সকল প্রবন্ধই প্রাসঙ্গিক; কিন্তু ইতিবাচক ভবিষ্যৎ ভূমিকা রচনার ক্ষেত্রে, আমার বিবেচনায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র এবং সনৎকুমার বসু-র প্রবন্ধগুলি থেকেই পাঠকেরা কিছু মূল্যবান রসদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন।

আমার এ-পর্যন্ত আলোচনায় মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মহলে ১৯৪৯-৫০ সালে রাজনৈতিক প্রশ্নে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচার-প্রসঙ্গে যে বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয় তার পশ্চাৎপটসহ প্রায় সকল তথ্যই পাঠকদের গোচরীভূত করার চেষ্টা করেছি। তবু যতদূর মনে পড়ছে, এই সময়কালে কমিউনিস্ট নেতা এস. এ. ডাঙ্গে লিখিত '*India : From premitive Communism to Slavery*' গ্রন্থখানিকে কেন্দ্র করে 'অগ্রণী' পত্রিকায় আর একটি তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রখ্যাত মনীষী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'ভারতবর্ষ: আদিম সাম্যতন্ত্র থেকে দাসত্ব' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে এস. এ. ডাঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করেন। সেদিন এই বিতর্কিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে অনেক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী পক্ষে-বিপক্ষে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। দুঃখের কথা, 'অগ্রণী'-র উক্ত সংখ্যাগুলি আমি বহু চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারি নি। ফলত, এই বিতর্কটির সংবাদ পাঠকদের কাছে শুধুমাত্র জ্ঞাপন করেই আমি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে বাধ্য হচ্ছি।

যাহোক, ইতিপূর্বেই সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অভ্যন্তরে নতুন পার্টি-লাইনের ভিত্তিতে পরিচালিত আন্তঃপার্টি সংগ্রামের কিছু বিবরণ আমি পরিবেশন করেছি।

[illegible] ১৯৫০ সালের মে-জুন মাসের অধিবেশনে অন্ধ্র রাজ্য থেকে নির্বাচিত

ছিলা ঝব

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা "Report on Left-Deviation Inside the C. P. I."১ শীর্ষক যে খসড়া দলিলটি পেশ করেন তা পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন করেন এবং সেই দলিলটি মে মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। উক্ত অধিবেশনে অন্ধ্র থেকে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটির তিনজন সদস্য 'Report on Left-Sectarianism in the Organisational Activities of the Polit-Bureau and the Main Organisational Tasks before the C. C. and Directives for the Proper Functioning of the C. C. and P. B. in Future,২ নামে অন্য একটি দলিল পেশ করেন। এই দলিলটি পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক সংশোধনান্তে গৃহীত হয়। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি এটি প্রকাশ করেন এবং সমস্ত রাজ্যের পার্টি-সদস্যদের কাছে তা যথারীতি পৌঁছে যায়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক বিচ্যুতি-সংক্রান্ত এই দলিল দুটি হাতে পাওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টেও আন্তঃপার্টি সংগ্রাম চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে।

এই রাজনৈতিক বিচ্যুতির পরিপ্রেক্ষিতে, যতটুকু জানি এবং শুনেছি, 'পরিচয়'-সম্পাদক সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সম্ভবত মে-জুন মাসেই এই ঘটনা ঘটে। কিন্তু তৎকালীন প্রাদেশিক নেতৃত্ব তাঁদের উভয়কেই দায়িত্ব থেকে মুক্তি না দিয়ে আরও কিছুকাল কাজ চালিয়ে যাবার পরামর্শ দেন। অথচ এই সময় সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে যাঁরা নতুন পার্টি-লাইনের চ্যাম্পিয়নরূপে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা 'ট্রটস্কিবাদী বিচ্যুতি'-র অন্যতম হোতা রূপে সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস-এর বিরুদ্ধেই প্রধানত তাঁদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। নতুন পরিস্থিতিতে, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টির প্রয়োজনে সরোজ দত্ত এবং গোলাল কুদ্দুস স্বেচ্ছায় 'পরিচয়'-সম্পাদনার দায়িত্ব অন্যের হাতে সমর্পণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন এবং অবশেষে তাঁরা পার্টি-নেতৃত্বের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে অতীত ভুল-ভ্রান্তির স্বীকৃতি স্বরূপ 'পরিচয়'-সম্পদনার দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান।

১. দ্র. *Documents of the History of the Communist Party of India,* Edited by M.B. Rao, p.p. 745-944—সম্পাদক

২. দ্র. ঐ, পৃ. ৬৬৯-৭৪৪।—সম্পাদক

এই পরিবেশে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনা এবং পরিচালন-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা একটি গোপন সভায় মিলিত হন। আমার স্মৃতিতে সেই সভার কথা এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। সম্ভবত জুলাই মাসের মাঝামাঝি কিংবা শেষ সপ্তাহে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের একটি বাড়ির এক তলার প্রশস্ত ঘরে. সন্ধ্যার পর একে একে মিলিত হয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ দত্ত, গোলাম কুদ্দুস, অনিল কাঞ্জিলাল, নরহরি কবিরাজ, সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মজুমদার, অনিল সিংহ, ব্রজেন সাহা, শীতাংশু মৈত্র, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, সলিল চৌধুরী, নিমাই চক্রবর্তী প্রমুখ আরও অনেকের সঙ্গে বর্তমান লেখকও। সুশীল জানা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কিনা তা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কিন্তু নানা আলোচনার পর স্থির হয়—সুশীল জানা এবং মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'পরিচয়' পত্রিকা-সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং এই লেখক ও ধীরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদনা ও পরিচালনার কাজে উক্ত সম্পাদকদ্বয়কে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করবেন।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই সিটি কলেজের কাছাকাছি ১৬ বিদ্যাসাগর স্ট্রীটের নতুন অফিস থেকে সুশীল জানা ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় ১৩৫৭ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে 'পরিচয়' পত্রিকার বিবর্তিত প্রকাশ শুরু হয়। সরোজ দত্ত-গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত যে-'পরিচয়' পত্রিকা এতদিন ছিল উত্তেজনার এক প্রধান উৎসভূমি, এই পরিবর্তনের ফলে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের অভ্যন্তরে সেই উত্তেজনা ও তিক্ততা স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হ্রাস পায়।

'মার্কসবাদী'-পত্রিকার সাহিত্য-বিতর্ককে কেন্দ্র করে এতসব অঘটন ঘটা সত্ত্বেও, বিশেষ করে মারাত্মক রাজনৈতিক বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে এবং প্রায় প্রত্যেকে কম-বেশি বিভিন্ন পেটিবুর্জোয়া ঝোঁকের কাছে মাথা নত করেও, আমরা যে শেষপর্যন্ত অতি দ্রুত শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম, নিঃসন্দেহে তা মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এক আশ্চর্য প্রাণশক্তির পরিচায়ক। এই প্রাণশক্তির মধ্যে নিহিত ছিল সামগ্রিকভাবে আমাদের নিষ্ঠা, সততা ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব। এছাড়া, আমাদের দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা-বোধ, শ্রমিকশ্রেণীর ভাবাদর্শের প্রতি আনুগত্য এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতি

জলন্ত ঘৃণাই প্রগতি-সংস্কৃতি শিবিরকে ঘনায়মান সংকট থেকে সেদিন উদ্ধার করেছিল বলে আমার বিশ্বাস। এই প্রসঙ্গে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় হবে।

আমি এই ভূমিকার প্রথম দিকে ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে পোল্যাণ্ডের ব্রাসলাভ (wroclaw) শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে 'আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংযোগ সমিতি' গঠনের কথা উল্লেখ করেছিলাম, আশাকরি পাঠকদের তা মনে আছে। তৃতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্ব-বিবেককে জাগ্রত করতে ব্রাসলাভ সম্মেলনের পর আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী সংযোগ সমিতি' এবং 'আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রী নারী সংঘ' যুগ্মভাবে ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিস শহরে একটি বিশ্বশান্তি সম্মেলন আহ্বান করেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-বৈজ্ঞানিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, যুব ও নারী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ প্যারিস সম্মেলনে মিলিত হয়ে গঠন করেন বিশ্বশান্তি কংগ্রেস। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ-র পক্ষে থেকে মুলকরাজ আনন্দ, কৃষণ চন্দর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গণনাট্য সংঘ-র পক্ষ থেকে আন্নাভাও শাঠে ও ওমর শেখ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রিত ও নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার এঁদের কাউকে ছাড়পত্র না দেওয়ায় এঁরা কেউ-ই প্যারিস সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারেন নি।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আহ্বানে সেদিন সাড়া দিতে ভোলেন নি আমাদের দেশের মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা। বামপন্থী হঠকারিতা ও সংকীর্ণতার মধ্যেও আমাদের সমবেত প্রচেষ্টা প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই তখন এই শান্তি আন্দোলনের মঞ্চে টেনে আনতে পেরেছিল। ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম সারা ভারত শান্তি সম্মেলন। সেই সময়ের সরকারী দমননীতি ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেই ২৪ ও ২৫ নভেম্বর দেশপ্রিয় পার্কে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় শান্তি সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের সভা। ২৬ নভেম্বর ময়দানের প্রকাশ্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন লক্ষাধিক মানুষ। এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাঙলার মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ডায়েরিতে তার অভ্রান্ত স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ আছে।

২৪. ১১. ৪৯ তারিখের ডায়েরিতে মানিকবাবু লিখেছেন, "...দেশপ্রিয় পার্কে ১টা থেকে সারা ভারত শান্তি সম্মেলন। মহম্মদ আলি পার্কে হত—প্যাণ্ডেল বাঁধা নিষিদ্ধ হওয়ায় এখানে হচ্ছে। খোলা সামিয়ানা, সামনে ডায়াস।... বিকালের দিকে ৪।৫ হাজার লোক হয়।...সোভিয়েট প্রতিনিধি টিকোনভ প্রভৃতি ৩ জন ভারত প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে করাচী থেকে ফিরে গেছেন। বিশ্বশান্তি স্থায়ী-কমিটির প্রতিনিধিরও প্রবেশ নিষেধ। অন্য প্রদেশের কয়েকজন ডেলিগেট রাস্তায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। পল রবসন সভাপতি—তাঁর কাছ থেকে টেলিগ্রাম বা চিঠির কোন জবাব এদেশে আসে নি। প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা।...৭টায় সম্মেলন ভাঙ্গল।"

২৫. ১১. ৪৯ তারিখের ডায়েরিতে লেখা আছে, "...আজ সম্মেলন ঘিরে আরও বেশী লোক। একটি অল্পবয়সী গ্রাম্য চাষী বৌ মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে এমন চমৎকার বক্তৃতা করলেন—দ্বিধা ভয় সঙ্কোচ নেই, স্পষ্ট সরল ভাষা, পরিষ্কার ধারণা! কি রেটে সব বদলে যাচ্ছে তিনি যেন তার জীবন্ত প্রতীক! আজ আরও বেশী ভিড়। সরকারী বিরোধিতা, খবরের কাগজের অসহযোগিতা, তবু সম্মেলনের অসাধারণ সাফল্য।"

২৬. ১১. ৪৯ তারিখে মানিকবাবু লিখেছেন, "ময়দানে প্রকাশ্য সম্মেলন। একটা দেড়টা থেকে ছোট বড় প্রসেসন এসে জমছে। এমনি লোকও আসছে। মহিলা প্রচুর। মেয়েরা বেশী নির্য্যাতিতা—মেয়েদের জাগরণও তাই অদ্ভুত রেটে ঘটছে। লাখের উপর জমায়েৎ। সন্ধ্যার পর সম্মেলন শেষে শোভাযাত্রা। প্রায় ২ মাইল লম্বা। ঐতিহাসিক ব্যাপার—কলকাতায় আগে আর এতবড় প্রসেসন হয় নি।"[১]

মানিকবাবুর ডায়েরি-র বক্তব্য থেকে পাঠকেরা নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন একজন সৃজনশীল সাহিত্যিকের স্বতঃস্ফূর্ত মনোভাব। ঐ হঠকারিতা ও সঙ্কীর্ণতার দিনগুলিতেও মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা যে সম্পূর্ণ ভোঁতা হয়ে যায় নি, বিশ্বশান্তি আন্দোলন এই দিক থেকে যে প্রগতি-সংস্কৃতি শিবিরকে বিপুল পরিমাণে সাহায্য করেছিল, একথা

আজ কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করা উচিত।

এর পরবর্তীকালে, আমাদের অন্তঃপার্টি সংগ্রাম যখন তুঙ্গে, তখন সুইডেনের স্টকহোম্ শহরে ১৯৫০ সালের ১৫ থেকে ১৯ মে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠক শেষে ফ্রেডারিক জোলিও কুরী, জে. বোগী, আলেকজান্দার ফাদায়েভ, জে. ডি. বার্নাল, পিয়েত্রো নেনী, লুইস্ সেইল্যান্ট, এমি সিয়াও, টমাস মান, ইলিয়া এরেনবুর্গ, পাবলো নেরুদা, হিউলেট জনসন প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য মনীষীরা বিনা শর্তে আনবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার দাবীপত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য বিশ্বের প্রতিটি শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী এবং বৈজ্ঞানিকের কাছে যে-আবেদন জানান তাতেও সাড়া দিতে কার্পণ্য করেন নি মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা। কিছু মতপার্থক্য, ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝি, রাজনৈতিক ঝোঁকের তফাৎ ইত্যাদি আমাদের মধ্যে অবশ্যই ছিল। কিন্তু তা সত্বেও বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের স্টকহোম্ আবেদন নিয়ে আমরা সৎ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গণতন্ত্রপ্রিয় সকল স্তরের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-বিজ্ঞানীর কাছে যেতেও দ্বিধা করি নি। এইভাবে বিশ্বশান্তি আন্দোলন আমাদের সংকীর্ণতার পথ থেকে যেমন সরিয়ে এনেছে, তেমনি কাজের মাধ্যমে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা আর মত-বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক নানা ঝোঁককেও ক্রমশ অপসারিত করেছে। এর জলন্ত প্রমাণ—১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে ভবানীপুরের স্মার্টা গ্রাউণ্ডে সপ্তাহব্যাপী শান্তি-সংস্কৃতি সম্মেলনের অনুষ্ঠান এবং তার আগে ১৯৫০ সালের ১৩ অক্টোবর বরাহনগরে প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের সম্মেলন।

এই পর্বে অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও নরহরি কবিরাজ সত্যিই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অতীতে নরহরিবাবুকে এড়িয়ে চললেও বরাহনগর-সম্মেলনের অন্যতম আহ্বায়ক এবং সংগঠক রূপে এই সময় আমি প্রায় প্রতিদিন নরহরিবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে সম্মেলনের দৈনন্দিন কর্মসূচী ঠিক করেছি। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র দ্বিতীয় খণ্ডে 'কলকাতার তরুণ লেখক সম্মেলন'[১] শীর্ষক যে-প্রতিবেদনটি সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লিখিত ঘোষণাপত্রটি নরহরিবাবুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও পরামর্শ করেই লেখা হয়েছিল।

১. দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৬-৬১।—সম্পাদক

বরাহনগর-সম্মেলনটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের ভ্রান্ত-নীতির বিরুদ্ধে এবং কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের ভিত্তিতে, নতুন পার্টি-লাইনের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা ক্রমশ যেপথ অনুসরণ করতে চাইছিলাম, বরাহনগর-সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে সেই পথ-নির্দেশটিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে তুলে ধরা হয়। বরাহনগরের গণসংস্কৃতি পরিষদ-এর সহযোগিতায় বন্ধুবর ক্ষেত্র গুপ্ত, অজয় ভট্টাচার্য, দীনেন রায়, রেবা বসু, জ্যোৎস্না গুপ্ত (বসু), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, রাম বসু, নিমাই চক্রবর্তী, সত্যব্রত ঘোষ, মিহির সেন, চিত্ত পাল, সুশীল গুপ্ত প্রমুখ তৎকালীন তরুণ সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রচেষ্টায় সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। পাঠকেরা উক্ত প্রতিবেদনটি পাঠ করলে বুঝতে পারবেন, নরহরি কবিরাজই ছিলেন এই সম্মেলনের প্রধান আলোচক ও বক্তা। তিনি তাঁর বক্তৃতায় আমাদের অতীত ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিচার, রাজনীতি আর সাহিত্যের সমন্বয়-সাধন ইত্যাদি প্রশ্নেও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলে ধরেন। সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন 'দি নেশন' পত্রিকার সম্পাদক মোহিত মৈত্র। কমিউনিস্ট কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত কোনো সম্মেলনে মোহিতবাবুর যোগদান সম্ভবত এই প্রথম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রকাশ্য সম্মেলনের সভাপতি এবং সম্মেলনে উপস্থিত থেকে সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকে ঘোষণাপত্রটিকে সমর্থন জানিয়ে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকদের জীবনধর্মী হতে আহ্বান জানান।

এমনিভাবেই শুরু হয় নতুন পর্বে মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের নতুন কর্মোদ্যোগ। এই পর্বান্তর যাত্রার ইতিহাস নির্দিষ্ট কালের নির্দিষ্ট কার্যকারণসম্পর্কের সূত্রে যতটুকু উদ্ঘাটন করা উচিত বলে মনে হয়েছে, এই ভূমিকায় আমি সেটুকুই শুধু প্রকাশ করেছি। আমার বিশ্বাস, বর্তমান বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে অতীত ইতিহাসের সবলতা-দুর্বলতা, ভুল-ভ্রান্তি, গৌরব-অগৌরব সব কিছু মোহমুক্ত দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণের পর যদি ইতিবাচক শিক্ষা গ্রহণ করা না যায় তবে ভবিষ্যৎ পথপরিক্রমা সহজসাধ্য হবে না। তাই আমি মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলন এবং মার্কসবাদী সাহিত্য-শিবিরের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য বিতর্ক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের পশ্চাৎপট

তথ্যনিষ্ঠভাবেই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এই সূত্রেই দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছি, মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা কোনো কোনো সময় যেমন ভুল করেছেন তেমনি তাঁরাই আবার সাধ্যমত তাঁদের ভুলের উৎস খুঁজে খুঁজে শুদ্ধতর পথে রক্তাক্ত দেহমন নিয়ে কেমন করে নির্ভীকভাবে ঐতিহ্যের পতাকা হাতে অগ্রসর হয়েছেন। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত প্রবন্ধাবলী থেকে পাঠকেরা নিশ্চয় অনুধাবন করতে পারবেন আমার এই কথার সত্যতা।

আমি জানি, আমার ভূমিকাটিতে বারংবার আলোচিত হয়েছেন মার্কসবাদী শিবিরের এমন সব প্রধান পুরুষ, যাঁরা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। ইতিহাসের দর্পণে শুধুমাত্র তাঁদের অতীতকে দাঁড় করিয়ে আমি আমার কোনো গোপন ইচ্ছা পূর্ণ করতে চাই নি। আমি ভালো করেই জানি, এই সব ব্যক্তিত্বের শুধু অতীতই ছিল না, তাঁদের সকলেরই আছে এক সুমহান বর্তমান এবং নিঃসন্দেহে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎও। কিন্তু যাঁরা অতীতকে চাপা দিয়ে শুধু বর্তমান ইতিহাসকেই ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের দলে নাম লেখাতে না পারার জন্য আমি দুঃখিত। ইতিমধ্যেই যখন দেখতে পাচ্ছি, ইতিহাসে নিজের নাম খোদাই করার জন্য মার্কসবাদীদের কেউ কেউ অর্ধ-সত্যকে সত্য এবং বিকৃত ইতিহাসকে সত্য ইতিহাসের মর্যাদা দিতে শুরু করেছেন তখন আমি তথ্যের ভিত্তিতে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাহায্যে মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক এবং প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অতীত ইতিহাসের এক অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য বলে মনে করেছি। আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও বলছি—এই ইতিহাস কোনো একক মানুষের পক্ষে রচনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। আমার এই আলোচনার মধ্যেও হয়তো কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু আমি সজ্ঞানে ও ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বকে বিকৃত করি নি, একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পারি। যদি কোনো সহৃদয় পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ী আমার ভুল-ভ্রান্তি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে কোনো আলোকপাত করেন তবে আমি বিশেষ উপকৃত হব এবং ভবিষ্যতে সেই ভুল-ভ্রান্তি অবশ্যই সংশোধন করব।

সর্বশেষে আর দু-একটি কথা নিবেদন করেই আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম খণ্ড সম্পাদনাকালে আমি যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম এবার সে-পদ্ধতি অনুসরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

প্রথম খণ্ডে আমি প্রতিটি রচনার যথাযথ পাঠই পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলাম এবং মুদ্রণপ্রমাদগুলি সংশোধন করে গ্রন্থশেষে সংযোজন করেছিলাম একটি 'শুদ্ধিপত্র'। বর্তমান খণ্ডের রচনাগুলি বাছাই করার সময় অধিকাংশ রচনার মধ্যে এত বেশি মুদ্রণপ্রমাদ আমার দৃষ্টিগোচর হয় যে, সেগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ করার অর্থ দাঁড়ায় পাঠকদের অকারণ বিড়ম্বনার সম্মুখীন করা। আর, যেহেতু অনেকগুলি পৃষ্ঠাব্যাপী 'শুদ্ধিপত্র' সংযোজন করেও মূল রচনার মুদ্রণপ্রমাদ-ঘটিত ত্রুটি পরিহার করা যেত না, সেইহেতু এবার আমি প্রতিটি মূল রচনাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রেখে সর্বক্ষেত্রেই বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন এবং পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। তবু, পুনর্মুদ্রণের সময়, সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও, দু-একটি মুদ্রণপ্রমাদ ঘটায় আমি আন্তরিকভাবেই দুঃখিত। এই মুদ্রণপ্রমাদগুলি পাঠকেরা অনায়াসে সংশোধন করে নিতে পারবেন মনে করে বর্তমান খণ্ডে আমি আর নতুন কোনো 'শুদ্ধিপত্র' সংযোজন করলাম না। এছাড়া, বর্তমান খণ্ডে সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে লেখক যেসব প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, কিংবা রচনাংশ উদ্ধৃত করেছেন, তার প্রাসঙ্গিকতা এবং মূল রচনার অনুল্লেখিত উৎসগুলিকে, প্রথম খণ্ডের মতো এবারও আমি 'পাদটীকা'-য় যথাসাধ্য সংযোজন করে দিয়েছি। লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলিকেও আমি মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি এবং অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে মূল পাঠের সাহায্যে সেগুলি সংশোধনান্তে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছি কিংবা পাদটীকায় প্রয়োজনীয় বক্তব্য নিবেদন করেছি। একমাত্র ঊর্মিলা গুহ ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ-রচিত 'সংগ্রামী সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে মায়াকোভস্কি-র কবিতার উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমি এই নীতিটি প্রয়োগ করতে পারি নি। কারণ, প্রদ্যোৎবাবু মায়াকোভস্কি-র কবিতাগুলি যে-ইংরেজী-সংস্করণ থেকে গ্রহণ করেছেন, সেটি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই এক্ষেত্রে যদি কোনো ত্রুটি ঘটে থাকে তবে তার দায়িত্ব প্রবন্ধকারের, আমার নয়। এসব সত্ত্বেও, অসাবধানতাবশত এই গ্রন্থের সম্পাদনায় অন্য কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকলে তার জন্য মূলত আমিই দায়ী এবং সহৃদয় পাঠকের কাছে অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

এই গ্রন্থ সম্পাদনাকালে অনেক বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীই আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের মধ্যে আমার সহপাঠী-বন্ধু মিহির সেন ও লক্ষ্ণৌবাসী সুহৃদ দিলীপ বিশ্বাস-এর নাম আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করছি। আমি যখন

স্বদেশ বসু ছদ্মনামে শান্তি বসু-র রচনাটির জন্য ১৩৫৬ সালের শারদীয়-সংখ্যা 'ডাক' পত্রিকার অনুসন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি এবং সম্ভাব্য সকল স্থান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছি, তখন বন্ধুবর মিহির সেন তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ থেকে এই দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাটি উদ্ধার করে আমার হাতে তুলে দেন। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত 'লোকনাট্য'-র সংখ্যা দুটিও কলকাতার কোনো বন্ধুর কাছে আমি খুঁজে পাই নি। আমার অনুরোধে লক্ষ্ণৌবাসী বন্ধু দিলীপ বিশ্বাস তাঁর নিজস্ব সংগ্রহ থেকে 'লোকনাট্য'-র ঐ দুষ্প্রাপ্য সংখ্যা দুটি নিজে কলকাতায় এসে আমার হাতে পৌঁছে দিয়েছেন। এঁদের দুজনের এই উদার সহযোগিতা ব্যতীত 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র ছিন্নসূত্র জোড়া লাগানো সম্ভব হতো না, একথা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করছি।

প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রজ নেতা চিন্মোহন সেহানবীশ-এর কাছেও আমি নানাভাবে ঋণী। তিনিও তাঁর গ্রন্থাগার থেকে অনেক দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা ও বই দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের 'আত্মসমালোচনামূলক অপ্রকাশিত প্রতিবেদন'টি থেকে এবারও আমি অনেক বিষয় আমার এই ভূমিকায় ব্যবহার করেছি। চিনুদার এই ঋণ সত্যিই অপরিশোধ্য।

'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র প্রথম খণ্ডটি প্রকাশের পর প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের যে-দুজন প্রখ্যাত নেতা তাঁদের মহৎ ঔদার্যে আমার আরব্ধ কাজকে লঘু করে না দেখে কাজটি দ্রুত শেষ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছেন, অগ্রজপ্রতিম সেই গোপাল হালদার এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। এই সূত্রে প্রখ্যাত গবেষক বিনয় ঘোষ-এর উৎসাহব্যঞ্জক একখানি চিঠির কথাও আমার মনে পড়ছে। আর, 'পরিচয়'-কর্তৃপক্ষ, এবং 'চতুষ্কোণ'-সম্পাদকমণ্ডলীসহ দিলীপ বসু, বীরেশ্বর ঘোষ প্রভৃতি যেসব শুভানুধ্যায়ী আমাকে পত্র-পত্রিকা, বই ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশেও জানাচ্ছি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বর্তমান খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির একঘেঁয়ে কাজে যাঁরা আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের মধ্যে বন্ধুবর সতীন্দ্রনাথ মৈত্র, নির্মল সাহা, সহধর্মিণী শ্রীমতী গীতা দাশ এবং আমার একান্ত প্রিয়জন শ্রীমতী বেণু ভৌমিক (সোম) ও

সুস্নাত দাশ-এর অক্লান্ত শ্রমের কথাও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

যাহোক, 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-র দ্বিতীয় খণ্ডটিও আমি নানা বিঘ্ন-বাধা এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই সম্পাদনা করলাম। পরিকল্পিত তৃতীয় খণ্ডটি সম্পাদনার জন্যও আমি কৃতসঙ্কল্প। এ দেশের প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনকে প্রসারিত করার কাজে এ-গ্রন্থ যদি বিন্দুমাত্র সাহায্য করে তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে। আমি জানি, প্রগতিশীল পাঠকসাধারণই আমাদের মতো লেখকের শেষ আশ্রয়। কামনা করি, সেই আশ্রয়ভূমির আচ্ছাদনছায়া থেকে আমি যেন কোনো-দিন বঞ্চিত না হই।

ধনঞ্জয় দাশ

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা / স্বদেশ বসু

সাহিত্যে প্রগতিবাদের কথা উঠেছিল মাত্র কয়েক বছর আগে। সচেতনভাবে সাহিত্যকে জনগণের কাজে লাগানো যায় এবং তাই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য, একথা প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী আমাদের কবি-সাহিত্যিকেরা বোঝেন নি। এলিঅট ও মার্কস—এই দুইজনের মধ্যে দোল খেয়ে ফিরছিলেন তাঁরা। আভাসে বুঝেছিলেন জীবনের বিরাট ফাঁকগুলোর কথা—এলিঅটের 'হলোমেন' যা, হয়তো তার কারণগুলো ছিল আলো-আঁধারে জড়ানো; তবু শেষ পর্যন্ত মহানুভবতার সঙ্গে ঘোষণা করতেন—নতুন সমাজব্যবস্থা তৈরী হবে, সমাধান হবে সমস্ত সমস্যার। সমর সেনের কবিতা হল তার স্পষ্ট প্রমাণ :

"আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীব্র প্রহার।"

অথবা,

"মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
আর দিন
সমস্ত দিনভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।"

তারপরেই অতি স্বাভাবিকভাবে আগামী দিনের আশ্চর্য এক মহানগরীর কল্পনা :

"সেখানে নীল জল, ফেনায় ধূসর সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে

লাল সূর্যাস্ত,

আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—"

আসলে তখন ঝোঁকটা ছিল আদর্শবাদী কল্পনায় অপরূপ একটা সোনার দেশ গড়বার। স্বপ্নের মতো এক দেশ, ধূসর-সবুজ জল, লাল সূর্যাস্ত আর সবার মাঝে বলিষ্ঠ মানুষ: টুকরো টুকরো কথায় নিটোল একটা ছবির মতো কল্পনা। কোনো মহানগরীতে বিবর্ণ দিন, আলকাতরার মতো রাত্রি—রাত্রি একটা মুখর দুঃস্বপ্ন, সমর সেনদের জানবার কথা নয়। সেকথা জানতে হলে ওই পিচ-গলা পথে যে-মানুষেরা ডেরা বেঁধেছে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাদের সুখ-দুঃখের অংশ নিতে হয়; এককথায় দুরান্তরালবর্তী নিজেদের জীবনের দেয়ালগুলোকে দিতে হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে। সমর সেনরা তা মেনে নিতে রাজী নন বলেই যে-সেতুপথে স্পন্দমান জীবনের সঙ্গে তাদের সংযোগ তা এতো দুর্বল, ক্ষণভঙ্গুর, প্রতিক্রিয়াশীল। তাই মহৎ কল্পনা ভবিষ্যতের, সুন্দর করে বলবার সযত্ন প্রয়াস।

আজকাল একথা নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। দীর্ঘ সংগ্রাম ও প্রভূত রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তটা আমরা পেয়ে গেছি। সাহিত্যে জীবন প্রতিফলিত হয় আবার সাহিত্য জীবনকে নতুন উত্তরণে এগিয়ে দেয়। জীবনকে এভাবে নিশ্চিত স্বীকৃতির মধ্যে নীতিবোধ আছে, আছে দায়িত্ব; এবং সে-দায়িত্ব সামাজিক। সাহিত্যে যারা 'অন্যফল নিরপেক্ষতা'র ঘোষক ছিলেন—'সমাজ', 'জীবন', 'দায়িত্ব' শব্দগুলো শুনলে তাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হবে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাদের খুশি করবার জন্যই তো আর ভোলা চলে না:

"The blood-dimmed tide loosned, and everywhere
The ceremoney of innocence drowned." [Yeats]

২

সাহিত্য যে সমাজের ছবি এ-কথা নতুন নয়। সচেতনভাবে না হলেও, আমরা জানি, মহৎ সাহিত্যে সামাজিক জীবন ছাপ ফেলেছে। জীবনের প্রবহমান স্রোত থেকে যেখানেই সাহিত্যকার সরে এসেছেন সেখানেই সাহিত্যের অপমৃত্যু। সাহিত্যের এই সামাজিক দায়িত্বের কথা স্বয়ং এ্যারিস্টটলও Catharsis-এর উল্লেখের মধ্যে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কথাটা তেমন স্পষ্ট নয়। সাধারণভাবে 'জীবন' বললে তার ব্যাপ্তি ও পরিসরের কথা বুঝে ওঠা যায় না—কারণ জীবন তো সব মানুষের, কিন্তু সব মানুষই সব যুগে সাহিত্যের

সামগ্রী হয় নি। চিরকালই বিশেষ মানুষ, বিশেষ গোষ্ঠী তার ধ্যান-ধারণা, তার রীতি-নীতি নিয়ে সাহিত্যের দরবারে এসেছে। মার্কস দেখিয়েছেন—প্রত্যেক যুগের উৎপাদন ও তার বণ্টন-পদ্ধতি সে যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে দেয়; তার রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন, আচার, ধর্মনীতি তো এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বটেই, তার দর্শন-বিজ্ঞান, তার শিল্পকলার ওপরেও এর ছাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পড়ে। ফিউডাল যুগে সাহিত্যের যে-ফসল ফলেছিল তার সীমা-পরিসীমা নির্ধারিত হয়েছে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবেশেই। সেই যুগে যদিচ মানুষের সম্পর্ক ধনী-নির্ধন ও দাস-প্রভুর সম্বন্ধের দ্বারা কলুষিত, তবু তাতে মানবিক সম্পর্ক বিকাশের সুযোগ ছিল বলেই এই সঙ্কীর্ণ পরিসরেও জন্মাতে পেরেছিল মহৎ সাহিত্য। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধানে যখন সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে ঘুণ ধরল, মানবিক সম্পর্কের অবকাশ ততোই ক্ষয়ে ক্ষয়ে গিয়ে রুদ্ধ করল নতুন সৃষ্টির পথ। নবীন ধনতন্ত্রের প্রবাহ তারপর এলো সামন্ততন্ত্রের ছোট্ট গণ্ডীকে ভেঙে দিয়ে। জীবনের প্রবাহকে যে-বাঁধগুলো ঘিরে রেখেছিল—বৃহত্তর মুক্তির আদর্শ তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। নতুন জীবনের প্রকাশ হল তখন, সাহিত্য-শিল্প এগিয়ে চললো স্বচ্ছন্দ উল্লাসে। রেনেসাঁসের বলিষ্ঠতাই যার প্রকাশ। শেষ পর্যন্ত এরও নবীনতা ঘুচল, অগ্রগতির অনুপ্রেরণা নিঃশেষ হল, উনিশ শতকের শ্রমবিপ্লবের ফলটুকু ভোগ করবার পর এর জীর্ণ দেহ আর ঢেকে রাখা সম্ভব হল না। ব্যক্তি-সম্পর্কের শেষচিহ্ন মুছে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক ঠেকল এসে অনাবৃত স্বার্থের সম্বন্ধে। বহু মানুষের মুক্তির স্বপ্ন মুষ্টিমেয় ধনিকের স্বার্থবাদের পাঁকে গেল তলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন সৃষ্টির সমস্ত সম্ভাবনা, হতাশা ও জীর্ণ জীবনবোধে এসে সমাপ্ত হল ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত বিরোধ থেকে। সমস্ত কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে, আশা করার মতো আর কিছুই নেই—

"মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট,
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।" [সুধীন দত্ত]

'সংক্রমিত মড়কের কীট'—কারণ ধনতন্ত্র "estranges man from nature, from himself, his own active functioning···from his universal essence. ···It makes his essence into a mere means for his exis-

tence...it estranges...his spiritual, his human Essenee (it results in) the alienation of man from man." [Marx] এবং এই 'alienation of man from man' যতোদিন চলবে ততোদিন হতাশা ও অবসাদ, গ্লানি ও নির্জীবতা ছাড়া আর কিছুই আশা করতে পারা যাবে না জীবন ও সাহিত্যের কাছে। এ থেকে বাঁচতে হলে একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে "to organize the empirical world in such a manner that (man) experiencces in it the truely human, becomes accustomed to experience himself as man···to assert his true individuality."

খুব স্পষ্টতই তাই জীবন ও সাহিত্যকে বাঁচাতে হলে ধনতন্ত্রের শ্বাসরোধ-কারী প্রাকারকে ধ্বংস করে ফেলতে হবে, মানুষকে তার ব্যক্তিস্বরূপ উপলব্ধি করবার অবকাশ দিতে হবে। মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থবাদ থেকে যে সমাজ-কাঠামোর সৃষ্টি হয়েছে তাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, এবং সেই সমাজ-কাঠামোর সৃষ্টিকর্তা হবে নিপীড়িত জনসাধারণ। কিন্তু এই জনসাধারণেরও বিশেষ চেহারা বিশেষ চরিত্র আছে। ধনতন্ত্র তার আত্যন্তিক প্রয়োজনে যে শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম দিয়েছে তারাই হবে নতুন সমাজ-বিপ্লবের উদ্যোক্তা। তাদের সাহচর্য দেবে কৃষক ও মধ্যবিত্ত। যেহেতু মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যে সবার আগে প্রয়োজন ধনতন্ত্রকে চূর্ণ করা এবং যে-কারণে মুক্ত-স্বচ্ছন্দ জীবন ছাড়া সাহিত্য-শিল্পের সৃষ্টি হতে পারে না ; সেইজন্য আজকে আর অতীত যুগের মতো অচেতনভাবে সাহিত্য জীবনের প্রতিফলন হবে না, সচেতনভাবে সাহিত্যকে সমাজ-বিপ্লবের কাজে লাগাতে হবে। মাও-সে-তুঙ এই প্রয়োজনেই লিখেছেন, "what we want to do is to make literature an integral part of the complete machinery of revolution."

সমাজ-বিপ্লবকে সাধিত করতে হবে—যতো সহজে সিদ্ধান্তটা আমরা নিয়ে নিলুম ততো সহজেই ছেড়ে দেবে না ধনতান্ত্রিক সমাজের কর্ণধাররা। শুধুমাত্র শোষণযন্ত্র ও অত্যাচারের বীভৎস রূপ নিয়ে তারা আসছেন না, তাদের ভাড়া করা চিন্তাজীবীরা সাধারণ মানুষকে বিপথে চালনা করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। মুহূর্তের অসতর্কতায় তাদের মোহজালে জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা অত্যধিক। অতীতের মোহ বিস্তার করে বর্তমানের সমস্ত আশা ও আন্দোলনকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চান এলিঅট :

"Because these wings are no longer wings to fly
But merely vans to beat the air
The air which is now thoroughly small and dry
Smaller and drier than the will
Teach us to care and not to care
Teach us to sit still". [Ash Wednesday]

আর ফিলিপ টএনবী দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করছেন, "Put the lesson of all the great novels in detail, detail, detail....No writer should deceive himself that he owes any immediate obligation to society." বাঙালী কবিও পিছিয়ে নেই :

"মৃত্যু, শুধু মৃত্যুই ধ্রুব সখা,
বেদনা, শুধুই বেদনা সুচির সাথী।" [অর্কেস্ট্রা, সুধীন দত্ত]

বর্তমান কালের সাহিত্যে কী হবে কথাবস্তু, তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা হল। কিন্তু কথাবস্তুর ধারণা থেকেই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। এককালে কিছু প্রগতিবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক ভেবেছিলেন শ্রমিক-কৃষক নিয়ে লিখলেই সেটা সত্যিকারের গণসাহিত্য হল। শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সঙ্গে কোনো যোগ নেই, তাদের চিন্তা-ভাবনার স্বরূপ জানা নেই, অথচ কবিতা-গল্প লিখতে হবে শ্রমিক-কৃষক নিয়ে! ফলে কবিতার নামে শুধু 'কাস্তে-হাতুড়ি'ই হয়েছে, হয়নি সার্থক কবিতা রচনা। এই ধরনের লেখকদের সম্পর্কে এক সমালোচক অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন :

"'Sermons in stones' says Shakespeare. The trouble with Left wing poets is that they hear the sermons before seeing the stones, and then try to deduce the stones and their feelings about them, from what has been said." সুতরাং যাদের নিয়ে লিখতে হবে তাদের না জানলে কিছু লেখা যাবে না এবং লিখতে গেলে এই সমালোচক-কথিত অবস্থার সূচনা হবে। "But what we want is a vision or the stones themselves ; the stones realized more deeply than our own mental habits and re-created as an unique and individual experience." তাদের জানতে হবে এই সিদ্ধান্ত থেকে

অনেকগুলো কথার সূত্রপাত হল। পুরনো প্রগতিবাদীরা দূরে, কাগজে-পত্রে শ্রমিক-কৃষকের জীবনের কথা পড়ে সাহিত্যে তাদের পাত্রস্থ করতে চেয়েছেন। লেখক ও লেখার বস্তুর মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই অথচ নির্ভাবনায় লেখক নিজেকে প্রগতিবাদী বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। হাল আমলে অবশ্য বেশ বোঝা যাচ্ছে আত্মস্থ অনুভব এবং যে-অনুভব জীবন সংযোগের মধ্য দিয়েও উৎসারিত হয়—তা ছাড়া লেখা সাহিত্য হয়ে ওঠে না। বিশেষত, সমাজবিজ্ঞান স্পষ্টই নির্দেশ দিচ্ছে জীবনে অর্থনীতির যে-পর্যায়ে যে-রয়েছে তার ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা সমস্ত কিছুই অন্যদের থেকে তফাৎ। মধ্যবিত্তদের জীবনে যে-সমস্যা সবচেয়ে বেশি ছায়া ফেলেছে এবং সমস্যার ফলে নানা চিন্তা, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের, গড়ে উঠছে; শ্রমিকদের জীবনেও হয়তো সেই একই কারণ সমস্ত সমস্যার উৎস, কিন্তু তাদের সাড়া, তাদের অনুভব সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। তাই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সাহিত্যিক গোড়াতেই ভুল করে বসেন—তার নিজস্ব ভঙ্গি ও বক্তব্য সবকিছুই বিনা দ্বিধায় শ্রমিক-কৃষকের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন। ফলে যে শ্রমিক-কৃষক সাহিত্যে এলো তারা না-শ্রমিক না-কৃষক, এমন কি তারা খাঁটি মধ্যবিত্তও নয়; সবকিছুরই একটা উদ্ভট সংমিশ্রণ। তাই এই অবস্থার যদি মূলোচ্ছেদ না করা যায় তাহলে প্রগতি-সাহিত্যের দুর্দিন অনিবার্য। মূলোচ্ছেদ করতে হলে মাও-সে-তুঙের কথা মেনে নিতে হবে:

"The reading public of our writers are the workers, the peasants, the soldiers, and their caders, and since this is so there arises the problem of understanding and getting to know these people. And to do this, to become familiar with the different party organisations, and with rural life, factory life, and army life, means very hard work....

"If you want the people to understand you, and if you wish to merge yourselves with the masses, then you must with the greatest determination pass through a long and even painful period of schooling···

"This is what we call a *transformation of sentiments, a changing over from one social class to another.*"

কিন্তু এ-কথাই পুরো নয়। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য, কিন্তু সেই অপরিহার্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই কবিতা নয়। প্রবন্ধে যেমন একরাশ মালমশলা যোগাড় করে গুছিয়ে বসালেই সব কথা বলা হয়ে যায়, কবিতা-গল্পে তা নয়। কবিতায় ওই অভিজ্ঞতাকেই যখন ব্যক্তি-কবির অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, তখনই তা হয় কবিতা, তার আগে নয়। তাই শ্রমিক-কৃষকের জীবন জানাই বড় কথা নয়, তাকে প্রকাশ করাই সাহিত্যিকের দায়িত্ব এবং তখনই তিনি সাহিত্যিক। সমালোচক সত্য কথাই লিখেছেন: **"By 'experience' I do not mean action and participation, I mean the ability of the artist** ***to imagine and re-create life in a idiom which is unique to him and for that very reason entirely convincing to the audience which enters into his mind."*** এই উক্তি থেকে প্রগতি-সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে কতকগুলো প্রশ্ন উঠবে। যেহেতু সাহিত্য ব্যক্তি-কবির বোধি ও বোধের সমন্বয়, সুতরাং সাহিত্যিকের যথেচ্ছাচারের ক্ষমতাই কী পাবেন তাঁর সাহিত্যে? শ্রমিক-কৃষক নিয়ে লিখেও ব্যক্তি-কবি দুর্বোধ্যতা ও আঙ্গিক-সর্বস্বতার শিখরে পৌঁছুতে পারেন। শুধুমাত্র বিদগ্ধজনের জন্যই তাঁদের কবিতা হতে পারে, কারণ, 'সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ না করলে কাব্যের কল্পতরু আর জন্মায় না' (সুধীন দত্ত)—বিষ্ণু দে ও সুধীন দত্ত মাঝে মাঝে যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছেন। তাহলে আধুনিক কবিতার শিল্পরীতি কী হবে? কবিতা, হেনরী জেমস যাকে বলেছেন, **felt-life**, তা কী অতীত দিনের শিল্পরীতির ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণই অস্বীকার করে পুরোপুরি নতুন ভঙ্গির সৃষ্টি করবে? অথবা, শিল্পনীতির কোনো চর্চারই প্রয়োজন নেই বিপ্লবী কবিতার জন্যে? মাও-সে-তুঙ বলেছেন, **"It is true that a writer must learn** ***more about the art of writing···***

সমাজ-বিপ্লবের কথা থেকেই আঙ্গিকের প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠেছে। যাদের নিয়ে বিপ্লব এবং যাদের বন্ধনমুক্তির মধ্যে সমগ্র সমাজের কল্যাণ ও মুক্তি, সাহিত্য নিঃসন্দেহেই তাদের জন্য হবে। কিন্তু এই শ্রমিক-কৃষকেরা ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি অশিক্ষিত, প্রায় প্রত্যেকেই নিরক্ষর, সুতরাং এই অবস্থায় শিল্পরীতি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ অত্যন্ত স্বাভাবিক। বাঙলাদেশের মার্কসবাদীরা এ বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে না এলেও বিশেষ একটা দিকে ঝুঁকছেন।

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক২

১নং 'মার্কসবাদী'তে বীরেন পাল তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা'য়[১] স্পষ্টই লিখেছেন: "সহজ-সরল এবং উদ্দীপনাশীল কলাকৌশলের সাহায্যে সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবধান ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে, যে কলাকৌশল সংস্কৃতির দিকে সাধারণ মানুষের মন টেনে নিয়ে আসে, সাধারণ মানুষের ঘুমন্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে সেই কলাকৌশল সৃষ্টি করতে হবে।" বীরেনবাবু প্রত্যক্ষ উদাহরণ বিশেষ না-দিয়ে যে-কথাগুলো বললেন তা থেকে তিনটি মূল সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসছে:

ক) 'সহজ-সরল উদ্দীপনাশীল কৌশল'।

খ) 'সংস্কৃতির দিকে সাধারণ মানুষের মন' টেনে আনা।

গ) 'সংস্কৃতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের ব্যবধান' ভেঙে 'ঘুমন্ত অনুভূতিকে জাগিয়ে' তোলা।

বীরেনবাবু 'সাধারণ মানুষ' বলতে কী বুঝেছেন জানি না, যতদূর মনে হচ্ছে, তিনি শ্রমিক-কৃষককেই নির্দেশ করছেন এবং তাদের জন্যই লিখবার কথা বলছেন। অর্থাৎ এমন কৌশলে লিখতে হবে যা সহজেই শ্রমিক-কৃষক বুঝবে, তারা জেগে উঠবে এবং সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের যোগসূত্র স্থাপিত হবে। বীরেনবাবু শুধু কাদের নিয়ে লিখতে হবে বলেই শেষ করেন নি, কাদের জন্য লিখতে হবে সে কথাও জানিয়েছেন। কিন্তু মূল প্রশ্ন তো তা নয়। প্রগতি-সাহিত্যের সমস্যা হল এই যে, শ্রমিক-কৃষক তাদের নিরক্ষরতার বোঝা নিয়ে সাহিত্য পড়বে কী করে? তাদের মন যে সংস্কৃতির দিকে টানা হবে তা কিসের মাধ্যমে? এক হতে পারে অত্যন্ত সাধারণ কথায় কবিতা লিখে শ্রমিক-কৃষকদের শোনানো এবং সব সময়েই চেষ্টা রাখা যেন তারা তা বুঝে নিতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই—তাহলে কী গল্প-উপন্যাস লেখা বন্ধ করতে হবে? দ্বিতীয়ত, বীরেনবাবুর লেখা থেকে এই ধারণা হবে যে সংস্কৃতি বলতে তিনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যকেই বুঝছেন। অথচ নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষককে কেমন করে গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় করানো যায় তা আমরা বুঝতে পারছি না। তাহলে বীরেনবাবু কী এই কথাই বলতে চান যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে আমরা ওদের বোঝাবার জন্য নতুন করে লিখব? জঙ্গী কবিতার

১. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

নিদর্শন হিসেবে বীরেনবাবু সিমোনভের যে-কবিতাটির উল্লেখ করেছেন তা এখানে তুলে দিচ্ছি :

"প্রতীক্ষায় স্থির থেকো আসব আবার
অনেক মৃত্যুর মুখে তুড়ি দিয়ে আবার আসব।
ওরা বলে বলুক—জানি কেউ কেউ বলবে,
কি কপাল দেখো ! বেঁচে গেলো শেষ পর্যন্ত।
ওরা কি কখনও বুঝবে—
ওরা কখনও প্রতীক্ষায় মন বাঁধেনি—
কেমন করে তুমি আমার ভাগ্য দিলে ঘুরিয়ে
তোমার এই মৃত্যুহীন প্রতীক্ষায়,—
কেমন করে পেরিয়ে এলুম প্রত্যক্ষ নরক !
সে শুধু জানব তুমি আর আমি
—তুমি, তোমার তুলনাহীন প্রতীক্ষায়
বৃষ্টি আর তুষারে, দিনের পর দিন।"

বীরেনবাবুর মতে এই কবিতা 'বলিষ্ঠ কলাকৌশলে' লেখা। কবিতাটি যে অপূর্ব সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বীরেনবাবু একে 'বলিষ্ঠ কলাকৌশল' বললেন কাদের রসাস্বাদনের মানের সঙ্গে মিলিয়ে? 'জনসাধারণে'র ? কিন্তু তারা তাঁরই মতে শ্রমিক-কৃষক—যারা সংস্কৃতির ছোঁয়া পায়নি, যারা আজও সভ্যতা, সংস্কৃতির সবচেয়ে নীচু মহলে ! শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের কাছেই যদি এই কবিতা সহজবোধ্য হয় এবং এই কলাকৌশল 'সহজ-সরল উদ্দীপনাশীল' হয়ে থাকে তাহলে আমার কিছুমাত্র বক্তব্য নেই। শুধু তা-ই নয়, ওপরে ভাগ করে দেখানো বীরেনবাবুর বক্তব্যের 'খ' ও 'গ' অংশের কোনো অর্থই থাকে না। অর্থাৎ পরস্পরবিরোধী উক্তির সংঘর্ষে বীরেনবাবুর মূল বক্তব্য চাপা পড়ে যায়। বীরেনবাবুর অসুবিধে আমি বুঝি : তিনি একদিকে অমরপ্রসাদ মিত্র-র[১] উদ্ধৃতি তুলে বলছেন, "টেকনিক ও কলাকৌশল আয়ত্ত" করবার চেষ্টা করতে হবে, অন্যদিকে আবার 'জনগণের' জন্য বিপ্লবী কাব্যের কথা বলছেন যা হবে সহজ-সরল ও উদ্দীপনাশীল। সিমোনভের

১. প্রকৃত নাম : অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র।—সম্পাদক

কবিতাকে বলিষ্ঠ বলছেন, আবার বিষ্ণু দে-র ‘সাত ভাই চম্পা’কে বলছেন দুর্বোধ্য, —কিন্তু সমস্যাটির উৎস ধরতে পারছেন না। সিমোনভের কবিতাও যেমন বুঝবার জন্যে যথেষ্ট শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রীতির প্রয়োজন, বিষ্ণু দে-র কবিতা বুঝতেও সেই একই শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রীতির প্রয়োজন। বিষ্ণু দে-র কবিতার চেয়ে সিমোনভের কবিতাটি যে অনেক ভালো এসব প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে এ-কথা বলা যায় যে, ‘জনগণের’ কথাই যদি ওঠে তাহলে দুটোর কোনটাই সহজবোধ্য নয়, কোনটাই শ্রমিক-কৃষকের আশু সংগ্রামে হাতিয়ার হবার উপযুক্ত নয়।

বীরেনবাবুর চেয়ে প্রকাশ রায়[১] এ-বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ও স্পষ্টবাক্। দ্বিধাহীন ভাষাতেই তিনি ৪নং ‘মার্কসবাদী’তে নির্দেশ দিচ্ছেন কোন্ পথে আধুনিক সাহিত্যকে চলতে হবে। শুধুমাত্র মুখে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে উড়িয়ে দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, শ্রেষ্ঠ প্রগতিবাদী কবিতার ছকও দিয়েছেন। কবিতাটি এই:

> “নির্বিচারে নর-নারী ছাত্র-ছাত্রী হত্যা
> এই যদি হয় শিশু রাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
> তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
> পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।”

প্রকাশবাবু কবিতাংশটি তুলে দিয়ে বিষ্ণু দে-র এ-ধরনের কবিতা লিখবার ‘মুরোদ’ আছে কিনা জানতে চেয়েছেন। আমরা অবশ্য সে তর্কের মধ্যে না গিয়ে ওই ছকটা থেকে প্রকাশবাবুর যে-সিদ্ধান্তগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা নিয়েই আলোচনা করব।

উদ্ধৃত কবিতাটির সবচেয়ে বড়ো গুণ, যা প্রকাশবাবু অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দাবী করছেন, হল স্পষ্টবাদিতা। অর্থাৎ যা ঘটেছে তাকেই সেই অবস্থায়, কোনো কিছু কাব্যিক কলাকৌশল না-মিশিয়ে, সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে, নিরপত্তার ফাঁস লাগানো হচ্ছে, তাই লেখক সোচ্চারে ঘোষণা করছেন—এমন যদি হয় শিশুরাজ্যের অবস্থা তাহলে তিনি সহস্রবার বিদ্রোহী। ছাত্রদের হত্যা করা এবং নিরাপত্তার ফাঁস লাগানো

১. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ঘটনা—এর মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই এবং তাকে রোজ প্রতিমুহূর্তে বিভিন্ন মানুষের জীবনে প্রতিফলিত করে তুলে ধরা হচ্ছে না। যে-ঘটনা ঘটছে ও ঘটেছে তাকেই বলা হল আমাদের কাছে। অর্থাৎ যা আমরা আগেভাগেই জানি, এবং জানতে পারতাম তাই আরো একবার কানের কাছে বলা হল। কিন্তু এই কী কবিতা? বিপ্লবী সিদ্ধান্ত থাকতে পারে কিন্তু তা কবিতা না হলে বিপ্লবী-সাহিত্য হবে কি করে? প্রকাশবাবু অবশ্য একেই কবিতা বলছেন, কারণ এতো উচ্চকণ্ঠ ও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ কথা আর তিনি শোনেন নি। এমন করে সত্যিই কেউ চীৎকার করে বলেনি, তারা হাজার বার বিদ্রোহী। এবং এ-কারণেই এই কবিতাংশ বিপ্লবের সাচ্চা হাতিয়ার। এই কবিতাংশটি বিপ্লবের সাচ্চা হাতিয়ার কিনা আপাতত বলছি না কিন্তু কবিতা যে নয় সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেন নয় সে-কথাই আর একবার বলছি। বীরেনবাবু তাঁর প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন: "তিনি (মার্কসিস্ট লেখক) বাস্তবের 'নিরপেক্ষ' সংবাদদাতা নন, তিনি নূতন জীবনের সৃষ্টিকর্তা, অতীতের মৃত্যু, বর্তমানের প্রলয় এবং অনাগত ভবিষ্যতের সূচনা এই তিনটি-ই ফুটে উঠবে তাঁর সাহিত্যে।" বীরেনবাবু বেশ সুন্দরভাবেই বলতে পেরেছেন সাহিত্যিকের কাজের কথা। তিনি সাংবাদিক নন। সাংবাদিকের কাজ হল ঘটনা পরিবেশন করা—যখন-যেমন যে-অবস্থায় যে-ঘটনা পাওয়া যাচ্ছে তাকেই তুলে ধরা। সাহিত্যিকের কাজ তা নয়। সাহিত্যকার বিভিন্ন ঘটনাস্তূপের মধ্য থেকে ঘটনা বেছে নেন তাঁর বক্তব্যের জন্য, এবং যখন সেটা প্রকাশ করা হয়, পূর্ববর্তী ঘটনার চেহারা যায় বদলে। সাধারণ ঘটনার ওপরে সাহিত্যিকের নিজস্ব দান সেটুকু। কবিতা Statement of facts নয়, কবিতা প্রকাশ। অর্থাৎ ঘটনাই কবিতা নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। কডওয়েল অত্যন্ত চমৎকার করে লিখেছেন: "Poetry obeys the rules of grammar, and is generally capable of paraphrase, i. e. the series of propositions of which it consists can be stated in different prose forms in the same or other languages. But whereas the philosophy of Spinoza remains the philosophy of Spinoza when explained by a disciple, and a novel of Tolstoi remains a novel of Tolstoi when translated, and a fairy tale

is the same fairy tale by whomsoever is told, a paraphrase of of a poem, though still making the same statements as the original. is no longer the same poem—is probably not, a poem at all." অনুবাদের কথা ছেড়ে দিয়েও কডওয়েলের কথা সর্বাংশে সত্য যে, সার্থক কবিতাকে বিভিন্ন অংশে হয়তো অর্থানুযায়ী ভাগ করা যায় কিন্তু তখন আর তার কাব্যগুণ থাকে না। এখানে প্রকাশবাবু যে অংশটুকু নজীর হিসেবে তুলেছেন তাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করলে কী কাব্যগুণ নষ্ট হচ্ছে আমি জানি না। অর্থাৎ পঙক্তিটা মেলালে সব মিলে নতুন কিছু গড়ে উঠছে না বলেই এতো সহজ ওটা ভাগ করা ও মেলানো। ওখানে যা আছে তা-ই আছে, নতুন কিছুই সৃষ্টি হয় নি। আরো বলা যায়, প্রকাশবাবুর লোককবি ওই কথা কটা পয়ারে মিলিয়েছিলেন কেন? নিশ্চয়ই পাঠকের মনে সঞ্চারিত করবার উদ্দেশ্যে, তাই যদি হয় তাহলে প্রশ্ন—ওই কবিতাংশ থেকে পাঠকের মনে কী অনুভব সঞ্চার হচ্ছে? 'ছাত্রহত্যা'র নৃশংসতা? নিরাপত্তার ফাঁসের ওপর জনসাধারণের অদম্য ঘৃণা? একটিমাত্র কথা আমরা বুঝতে পারি—এবং তা হল এই যে, এই লোককবি নিজেকে হাজার বার বিদ্রোহী ঘোষণা করছেন। অথচ এ-কথাই কী সব? এই কবিতা পড়ে আমরাও যদি হাজার বার বিদ্রোহী না হতে পারি তাহলে 'বিপ্লবী কবিতা' কথাটার তাৎপর্য কী?

কবিতা কেমন করে লেখা হয় সে সম্পর্কে প্রকাশবাবুর অজ্ঞতা থেকেই তিনি মারাত্মক সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বুধাখালিতে বিধান-নলিনী সরকারের পুলিশ গুলি করে কয়েকটি কৃষক হত্যা করেছে একথা জানা গেল। এই জানাটাই কবিতা নয়। এই সংবাদ হল কবিতার কাঁচা মাল। বুধাখালিতে এই কৃষক হত্যার খবর আমরা দু-রকমে ব্যবহার করতে পারি: (১) শ্লোগানে এই কবিতা তুলে ধরে আমরা মিছিল বের করব (২) মিছিলের শ্লোগান ছাড়াও কবি কবিতা রচনা করবেন।

শ্লোগানের কাজ হল সেই মুহূর্তের প্রতিবাদ, সেই মুহূর্তের বক্তব্যকে ভাষা দেওয়া। বিশেষ মুহূর্তের বিশেষ বক্তব্য সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরতে পারলেই শ্লোগানের কাজ শেষ হয়ে গেল। সেই শ্লোগান পরবর্তী ঘটনার সঙ্গে খাপ না খেলে নতুন কোনো শ্লোগান তৈরী করতে হবে। কৃষক-হত্যা বিষয়ে যে-শ্লোগানগুলো

লেখা হবে তার কাজ হল পরবর্তী কটা দিন ওগুলো বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। বুধাখালি—বিশেষ স্থানটি কোথায় কারো জানবার দরকার নেই, শুধু মিছিলের প্রত্যেকটি মানুষ কৃষক-হত্যার সংবাদে বিক্ষুব্ধ হলেই হল। প্রয়োজন মতো পথ চলতে তাদের কাছে আরো বহুবার শ্লোগানগুলো ঘোষণা করা হবে, তাদের অনুভূতিকে হত্যার সংবাদে জাগিয়ে রাখা হবে। কিন্তু নিঃসংশয়েই এমন একটা সময় আসবে, দুদিন পরেই হোক আর পাঁচদিন পরেই হোক, যখন শ্লোগানটার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। এবং সেদিন থেকে ওই শ্লোগানটা আর কোনো অনুভূতি আমাদের মনে সঞ্চার করবে না, কারণ তার আসল পটভূমিটি গেছে নষ্ট হয়ে। যেমন ধরা যায়, আমরা আওয়াজ তুলেছি—'বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদ চাই—' আজকে যতোদিন না জমিদারি উচ্ছেদ হবে ততোদিন এই আওয়াজের মূল্য আছে কিন্তু যে-মুহূর্তে সমস্ত জমি আসবে রাষ্ট্রের হাতে তারপর থেকেই এই ধ্বনির পরিবেশ যাবে বদলে এবং কেউ পরবর্তীকালে একে স্মরণে রাখবে না। অথচ বুধাখালিতে কৃষক-হত্যা নিয়ে যদি আমি সার্থক কবিতা সৃষ্টি করতে পারি, অর্থাৎ শ্লোগানের মতো সোচ্চারে ঘোষণা করেই নয়, কৃষক-হত্যার সমস্ত বেদনা, সমস্ত ঘৃণা ও ক্রোধ ব্যক্তিক অনুভূতির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি এবং সেই ব্যক্তিক অনুভব অন্য মানুষের মনে সঞ্চারিত হয়, তাহলেই কবিতার আসল উদ্দেশ্য সফল হল। বুধাখালিতে কৃষক-হত্যার এই ঘটনাকে যদি আবেগের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে তা শ্লোগানের মতো একবার মিছিল বা বিক্ষোভের সাহায্য করেই শেষ হয়ে যাবে না; আরো পাঁচদিন পাঁচমাস পাঁচবছর আমাদের নাড়া দেবে; আমাদের মন, যতোবার আমরা পড়ব, বিক্ষোভে ও ক্রোধে ভরে উঠবে। ঘটনাটা পুরনো হয়ে যাবে কিন্তু কবিতা নিঃশেষ হবে না। সূর্য ওঠা তো আবহমানকালের পুরনো নিত্য দেখা ঘটনা, তবু সূর্যকিরণ কি কখনো পুরনো হয়ে গিয়েছে? রামধনুর সাতটি রঙের উজ্জ্বলতা কী বারেকের জন্যও কমেছে আমাদের চোখে? আর তা যদি না হয়, কবিতা যদি স্পষ্ট ভাষণ বা **directness**-এর ওপরেই নির্ভর করে তাহলে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'কে পয়ারে লিখলেই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী কবিতা হবে।

সাহিত্যে '**directness**'—এই সিদ্ধান্ত থেকেই আরো একটা কথা বানিয়ে

নিয়েছেন তথাকথিত প্রগতিবাদীরা। তা হল—অবস্থা থাক-বা-না-থাক, পরিবেশ তৈরী হোক বা না-হোক, আগামী বিপ্লবের, অথবা চূড়ান্ত সংগ্রামের একটা পরিশিষ্ট জুড়ে দেওয়া। ঘটনার অনিবার্যতায় যেখানে চোখে জল আসা স্বাভাবিক সেখানে জোর করেই চোখে আগুনের হল্কা জাগাতে হবে, কারণ তাঁদের ধারণা—নইলে 'সংগ্রামী গল্পে' বিচ্যুতি দেখা দেবে। অর্থাৎ সংগ্রামী গল্প সব সময়েই হাতিয়ার উঁচিয়েই আছে। অথচ সংগ্রামী গল্প যে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ নেবে—এ-কথা তাদেরকে বুঝিয়ে দেবে, নজীর যদিও স্বয়ং গোর্কির-ই গল্পে রয়েছে, 'ছাব্বিশটি পুরুষ ও একটি মেয়ে' অথবা 'নবজাতক'। 'লোকনাট্যে'র লোককবির কবিতা যে সংগ্রামী মনোভাব থেকে তৈরী হয়েছে গল্প-উপন্যাস লিখিয়ে প্রগতি সাহিত্যিকরা সে-কারণেই তাদের লেখায় অমন পরিশিষ্ট জুড়ে দিচ্ছেন। এখানে সার্থক সংগ্রামী কবিতার একটি নিদর্শন তুলছি :

সিবাস্টোপোলের পতন হয়েছে। নিজেদের হাতে-গড়া নগর ধ্বংস করে অবশিষ্ট সৈন্যরা জাহাজে উঠেছে। কিছু নাগরিক আশ্রয় নিয়েছে তাদের জাহাজে :

> "Evening slips from the shoulders of the sky ;
> Slowly the city falls behind, and its flame
> Stands on the horizon like foundering ship.
> All the rains of the world could not put it out.
>
> "Into the screen of night this last rescue
> filled with wounded, the dying, labors.
> Women and children stare at the water
> Somewhere an accordion weeps.
>
> "Inside a cabin, the young woman moves
> and cries out ; She bites the bedsheet.
> The smell of birth is heavier than the sea's
> and the child is pressed forward gently,
> towards the blind cold world.
> Let her legs open, open gently,
> open this door of the cathedral;
> let the blood come, and pain,

**let the tearing of the flesh take place
for a child is born.**

**"Soldiers gather at the door.
The wounded lift their heads as to a sunrise.
They listen to the child wailing.
The sea hums beneath the ship.
Somewhere in the night a harbor waits
for the arrival of man." [Norman Rosten]**

ইংরেজী কবিতা ছাড়াও সুকান্তর 'বোধন' কবিতাটির উল্লেখ করা চলবে। 'বোধন' একবার যে পড়বে তার মনে স্বজন-হারানোর ব্যথা ও শত্রুর প্রতি ঘৃণা দাগ কেটে বসে যাবে। অথচ লোককবির কবিতাটি আমাদের মনে সাড়াই তুলতে পারে না। বিশেষ করে এখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছোট্ট একটি কবিতা উদ্ধৃত করব—যা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে বিদ্রূপ বর্ষণের মধ্যে দিয়ে সমস্ত জ্বালা ও ক্রোধকে প্রকাশ করছে :

"ক্ষেত জ্বলছে মাঠ জ্বলছে
কে খাজনা শু'ধবে
প্রভু, এবার না বাঁচালে
আগুন জ্বলে উঠবে।" [চিরকূট]

'হত্যা', 'নিরাপত্তা' ও সহস্রবার 'বিদ্রোহী'র ঘোষণা না থাকলেও এই ছোট্ট কবিতাটুকু লোককবির কবিতার চেয়ে অনেক বেশি সার্থক। বিপ্লবকে তাড়াতাড়ি কায়েম করার ইচ্ছা থেকে প্রকাশবাবু কবিতা ও শিল্পরীতির মূল কথাগুলোই ভুলে বসে আছেন। আমার তো ভয় হচ্ছে প্রকাশবাবু যেমন রবীন্দ্রনাথকে নাকচ করেছেন এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আমল দেন নি, তেমনি তাঁর নিজের কথা থেকেই যে আরাগঁ, এ্যালুআর ও নেরুদা বাতিল হয়ে যাবেন সংগ্রামী কবির তালিকা থেকে। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ের কথা হল সুকান্ত-র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কারণ 'সহজ-সরল উদ্দীপনাশীল কলাকৌশল'—যা জনগণ অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষককে উদ্বুদ্ধ করবে—স্বয়ং সুকান্ত-র কবিতাতেই তার স্পষ্ট ব্যতিক্রম। সুকান্তর কিছু কবিতা তুলছি আমি :

১) 'চলে যাবো—তবু আজ যতোক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ;" [ছাড়পত্র]

২) "আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়
দিগন্তে প্রত্যাসন্ন সর্বনাশের ঝড় :
আজকের নৈঃশব্দ হোক যুদ্ধারম্ভের স্বীকৃতি।
দুহাতে বাজাও প্রতিশোধের উন্মত্ত দামামা,
প্রার্থনা করো :
হে জীবন, হে যুগ-সন্ধিকালের চেতনা—
আজকে শক্তি দাও, যুগ যুগ বাঞ্ছিত দুর্দমনীয় শক্তি,
প্রাণে আর মনে দাও শীতের শেষের
তুষার গলানো উত্তাপ।" [বোধন]

৩) "শুনেছি তুমি এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড,
তোমার কাছে উত্তাপ পেয়ে
একদিন হয়তো আমরা প্রত্যেকে এক একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডে
পরিণত হবো,
তারপর সেই উত্তাপে যখন পুড়বে আমাদের জড়তা,
তখন হয়তো গরম কাপড়ে ঢেকে দিতে পারবো
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে। [প্রার্থী]

৪) "স্বচ্ছরাত্রি এনেছে প্লাবন, উষ্ণ নিবিড়
ধূলিদাপটের মরুচ্ছায়ায় ঘনায় নীল
ক্লান্ত বুকের হৃদস্পন্দন ক্রমেই ধীর
হয়ে আসে তাই শেষসম্বল তোলো পাচিল।
ক্ষণভঙ্গুর জীবনের এই নির্বিরোধ—
হতাশা নিয়েই নিত্য তোমার দাদন শোধ ?" [পরিখা]

উদ্ধৃত কবিতাগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই সুকান্ত-র শ্রেষ্ঠ রচনা থেকে—
অথচ এগুলো কী বীরেনবাবু এবং প্রকাশবাবু-কথিত 'সহজ-সরল উদ্দীপনাশীল'

কলাকৌশলে রচিত ? এই সব কবিতার পেছনে শিল্পরীতি এবং শিল্পবোধের যে-ইতিহাস বর্তমান তা ছাড়াই কী এদের রসাস্বাদন করা যায় ? তাছাড়া, কতকগুলো কবিতায় এতো অধিক পরিমাণ সংস্কৃতশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও প্রথমপাঠে অস্বস্তি বোধ করবেন। সুকান্ত-র চারটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'ছাড়পত্র', 'বোধন', 'চিল' ও 'প্রার্থী' জনগণের কোন অংশ উপলব্ধি করেন তা আমরা জানি, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারিনে শ্রমিক-কৃষকের বোধগম্য হবে কী করে সুকান্ত-র এই কবিতা ! অথচ সুকান্তকে তো জনগণের কবি বলা হচ্ছে ! প্রকাশবাবুর কাছে আমার তাই একটা প্রশ্ন : সত্যিই সুকান্ত-র কবিতা কী কোনোদিন বাঙলাদেশের শ্রমিক-কৃষকের কাছে পড়ে শোনানো হয়েছে ? যদি সত্যিই তা হয়ে থাকে এবং তাঁরা সুকান্ত-র কবিতার রসাস্বাদন করে থাকেন তাহলে প্রগতিবাদী বাংলা কবিতার ইতিহাস থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছেঁটে দেওয়া হল কেন ? এবং কেনই বা লোককবির 'হত্যা' 'নিরাপত্তার' পঙ্‌ক্তি-মেলানোকে এতো প্রশংসার ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে ?

প্রকাশবাবু বোধহয় জানেন না, সুকান্তকে বাঙলার ঐতিহ্যসৃষ্টিকারী কবি-সাহিত্যিকদের অন্যতম বললে লোককবির কবিতাকে আর কাব্যপদবাচ্য বলে স্বীকার করা যায় না। আর লোককবিকেই যদি চরম রায় দেওয়া হয় তাহলে নিজের কথার জালেই প্রকাশবাবু জড়িয়ে পড়বেন। কারণ, প্রকাশ-বাবুর পরস্পরবিরোধী উক্তি থেকে প্রশ্ন উঠবে : তাহলে ভালো কবিতা কী ? সুকান্ত-র কবিতা ভালো কেন ? এবং কেনই বা লোককবির কবিতা এতো প্রশংসা পাবার যোগ্য ? শেষপর্যন্ত সুকান্তই আদর্শ, না আদর্শ হলেন ওই লোককবি ?

প্রকাশবাবুর আলোচনা থেকেও প্রগতি-সাহিত্যের সমস্যার সমাধান হল না। কাদের নিয়ে লিখতে হবে স্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু কাদের জন্য লিখতে হবে এই প্রশ্নতেই সমস্ত সমস্যা আটকে আছে। বীরেনবাবু অতীত ও বর্তমান সাহিত্যের চমৎকার বিচার করে শেষ বক্তব্যে এসে তার পথ খুঁজে পেলেন না—কারণ 'সাহিত্য জনগণের জন্য' কথাটা তাঁর কাছে খুব স্পষ্ট নয়। জনগণের জন্য লিখতে হবে এই স্পষ্ট ধারণা থেকে তিনি কলাকৌশলের প্রশ্নটাকে স্থির বুদ্ধিতে মীমাংসা করতে পারেন নি। প্রকাশবাবু কাদের জন্য লিখতে হবে কথাটা অনেকটা বোঝেন, তবু মূলে পৌছতে পারেন নি। ফলে, রবীন্দ্রনাথকে

বাতিল করে দিয়ে সুকান্ত ও লোককবিকে আশ্রয় করেছেন, কিন্তু সুকান্ত ও লোককবির কবিতার বৈপরীত্যকে দূর করতে পারছেন না।

সাহিত্যের উপজীব্য কী হবে সে সম্পর্কে বীরেনবাবু চমৎকার নির্দেশ দিয়েছেন: "মার্ক্সিস্টের কাজ হল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, তাঁর নীতি হল নির্যাতিত শ্রেণীসমূহের জীবনের ভাষায় রূপ দেওয়া, তাঁর ব্রত হল সমাজের ভিতরকার সংঘর্ষকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলা। তিনি বাস্তবের 'নিরপেক্ষ' সংবাদদাতা নন, তিনি নূতন বাস্তবের স্রষ্টিকর্তা, অতীতের মৃত্যু, বর্তমানের প্রলয়, এবং অনাগত ভবিষ্যতের সূচনা এই তিনটিই ফুটে উঠবে তাঁর সাহিত্যে। সংস্কৃতি যাতে নির্যাতিত জনগণের প্রেরণার বস্তু হয়, সংস্কৃতিতে যাতে তাদেরই সত্যিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা স্থান পায়, সংস্কৃতি যাতে তাদেরই জীবনের সত্যকার বহুমুখী দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত হয় সেই প্রচেষ্টাই হল মার্কসবাদী সাহিত্যিকের লক্ষ্য।" এই বক্তব্য থেকেই বীরেনবাবু ও প্রকাশবাবুরা প্রশ্ন তুলেছেন—যাদের নিয়ে সাহিত্য লেখা হবে তাদেরও কী সাহিত্য বিপ্লবী অনুপ্রেরণায় উন্মোথিত করবে না? যেহেতু আজকে সমাজ-বিপ্লব ছাড়া জীবনের সমস্ত অগ্রগতির দ্বার রুদ্ধ এবং সেই সমাজ-বিপ্লব সংঘটিত করবার মতো ক্ষমতার অধিকারী বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষকশ্রেণী—তখন সাহিত্যিকের কর্তব্য সমাজ-বিপ্লব সাধনে তৎপর হওয়া। অর্থাৎ প্রগতিবাদী সাহিত্যিকের রচনায় শ্রমিক-কৃষক দেখবে আগামী দিনের উজ্জ্বল পরিবেশ। বর্তমানের সংগ্রাম এবং তাদের অপরিমেয় শক্তির ফল্গুস্রোত। সেই সাহিত্য তাদের উদ্বুদ্ধ করবে বিপ্লবী কর্মপ্রেরণায়। এককথায় সাহিত্যকে হতে হবে বিপ্লবের হাতিয়ার।

সাহিত্য যদি বিপ্লবের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে এবং যা হতেই হবে, তাহলে প্রগতিবাদী আন্দোলনের অনেক প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে। কিন্তু ভারতবর্ষে বা বাঙলাদেশে সাহিত্য শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর হাতে আজও অস্ত্র হয়ে উঠতে পারছে না, পারছে না যে তার একমাত্র কারণ ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা। পৌনে দুশোবছর বিদেশী শোষণের ঘাঁটি হয়ে থাকায় দেশের দরিদ্র জনসাধারণ শিক্ষার মুখ দেখে নি। উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদেরই একটা অংশ মাত্র শিক্ষার আলো পেয়েছে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষকের আজও নিরক্ষরতা দূর হয় নি। সুতরাং এই নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষক কী করে সাহিত্যের আস্বাদ পাবে এবং উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে তা জানা নেই। এই সমস্যা থেকেই অবশ্য

প্রকাশবাবু সিদ্ধান্ত করেছেন লোককবির কবিতাই খাঁটি কবিতা, কারণ তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ ভাষায় লেখা হয়েছে। অথচ প্রকাশবাবু বলতে পারেন নি বা বলেন নি—নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষক কী করেই বা লোককবির কবিতা পড়বে। এক্ষেত্রে তাই নতুন করে প্রশ্ন উঠবে: তাহলে বিপ্লবসাধনের জন্য শিল্পী-সাহিত্যিকরা কী করবে? তারা কি বিপ্লব হয়ে শিক্ষা প্রসার হওয়া পর্যন্ত আর কলম-তুলি ধরবে না? তারা কী শুধুমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন-কর্মী কিংবা কৃষক-কর্মী হয়েই কাজ করে যাবে এবং 'অভিজ্ঞতা' সঞ্চয় করবে? না, খুব বেশি হলে, 'লোকনাট্যে'র লোককবির মতো 'হত্যা' 'নিরাপত্তা'র লাইন মেলাবে?

বীরেনবাবু ও প্রকাশবাবু দুজনেই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নি। বীরেনবাবু কী জবাব হবে জানেন না, আর প্রকাশবাবু একটা মারাত্মক উত্তর খাড়া করেছেন। প্রকাশবাবুর ভঙ্গিটা এই যে শ্রমিক-কৃষক যতোই নিরক্ষর হোক সুকান্ত আর লোককবির কবিতা তারা বোঝে এবং ভবিষ্যতে প্রগতিবাদী কবিদেরও লোককবির মতোই কবিতা লিখতে হবে কারণ ওটাই শ্রেষ্ঠ কাব্যকৌশল! ওপরে আমরা দেখিয়েছি লোককবির লাইন মেলানো কোনো কবিতা নয় এবং এখানে বলছি এটা বিপ্লবের হাতিয়ারও নয়, কারণ শ্রমিক-কৃষক আজও এসব পড়তে পারে না। একথা খুব স্পষ্ট যে আজকে প্রগতিবাদীদের কবিতা-গল্প সার্থক রচনা হবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিক-কৃষকের হাতে হাতিয়ার হতে পারে না। যতোদিন না তাদের শিক্ষার মান তোলা যাবে ততোদিন সার্থক সংস্কৃতি ও সাহিত্যের সঙ্গে তাদের যোগ ঘটবে না। তাই আজকে প্রগতিবাদী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের কর্তব্য দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেছে। সাহিত্যিককে আজকে সর্বপ্রথম বিপ্লবে শামিল হতে হবে, কারণ বিপ্লব ছাড়া এবং বিপ্লবী মানুষ ছাড়া এখন আর কোনো কিছুই সৃষ্টি করা অসম্ভব; এবং এই সঙ্গেই তাদের নিজস্ব মান অনুযায়ী শিল্প সৃষ্টি করে যেতে হবে। বিপ্লবে শামিল হলে তাদের সর্বপ্রথম কাজ হবে শ্রমিক-কৃষকের জীবনকে জানা এবং তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি মুহূর্ত কাজ করে তাদের শিক্ষার মানকে উঁচু করা। এই প্রয়োজনে যে-ধরনের কাজ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী তাঁদের তা করতে হবে এবং শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবের কাজ এগিয়ে নিতে হবে। মা-ও-সে-তুঙ আমাদের কথা সমর্থন করেছেন: "Now that the workers, peasants and soldiers—*illiterate, ignorant and uncultured* because they have for so long

been governed by a feudal or a bourgeois ruling class—are locked in a life and death struggle with an enemy who gives no quarter, *their most urgent demand is some sort of easily digestible literature or art to initiate them into the life of culture*, so that their confidence may be strengthened, their fighting enthusiasm heightened and their unity consolidated, to enable them to carry on the struggle against the enemy with one will and one mind." আপাততঃ আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের শ্রমিক-কৃষকের জন্য 'অ' 'আ' 'ক' 'খ'-র প্রথম পাঠ তৈরী করতে হবে। কিন্তু সব সময়েই একথা বুঝতে হবে, এই প্রয়াস 'সাহিত্য-সৃষ্টি' নয়। শ্রমিক-কৃষকের বুঝবার সুবিধের জন্য (অ-আ ক-খ নিয়ে) হয়তো লাইন মেলানো যায়, কিন্তু নিঃসংশয়েই তা কবিতা হবে না। ছোটবেলায় আমরা কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম 'পাখী সব করে রব'-এর মারফৎ, কিন্তু আজকে আমরা ওটাকে আর কবিতা বলি না। অথচ প্রথমপাঠ হিসেবে ওটার গুণাবলীতো আজও শেষ হয় নি। আশু বিপ্লব সাধনের জন্য এবং শ্রমিক-কৃষকের শিক্ষার মান তুলবার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী হবে গণনাট্যের মতো প্রতিষ্ঠানের গান, ছায়ানৃত্য, ইত্যাদি—সুকান্ত বা রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়। মাও খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন :

"Our literary experts ought to pay more attention to the wall-newspapers of the masses, and to correspondence from peasants and soldiers; our experts in dramatic art to the amateur performances in the army and in the villages; our musical experts to the songs sung by the ordinary people; our fine art experts to popular artistic production. All these comrades ought to work in the closest collaboration on with those comrades who work for the *popularisation* of lower grade of art and literature."

কিন্তু এই কাজের সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দিয়ে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করবার চেষ্টা করতে হবে। যাতে শ্রমিক-কৃষক তাদের উন্নীত সংস্কৃতি-বোধের মান নিয়ে সার্থক শিল্প-সাহিত্যের অভাব বোধ না করেন। এবং এমনি করেই সাহিত্যসৃষ্টি ও বিপ্লবসাধনের দুটো পর্যায় দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধে বিপ্লবোত্তর যুগে নতুন একটা ঐক্যরূপ ধারণ করবে। কবি-সাহিত্যিকদের তাই এই দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে, কারণ

"Literature on a higher level is absolutely necessary for them." [Mao]. অর্থাৎ বিপ্লবের আশু প্রয়োজনে ভারতবর্ষের মতো দেশে 'লোকনাট্য'র লোককবির পংক্তি মেলানো সাহিত্যের শুধু মাত্র spade work। কিন্তু বিপ্লবী-সাহিত্যের দুটো পর্যায় না-বুঝে যদি রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অস্বীকার করা হয়, যেমন করেছেন প্রকাশ রায়, তাহলে বলব পণ্ডিতদের লেনিন কপচানোই সার, তলাতে পারেন নি তারা। কেন না, " On the technical side, everything which is more artistic, which contains more elements of beauty, is good, is always better than other things which are less artistic and less well done." [Mao] এই সঙ্গেই তাই প্রকাশবাবুদের প্রশ্ন করা চলবে, লেনিন কেন "What is to be done" নিয়েই থেমে যান নি, কেন তিনি দর্শনের নিগূঢ় সব কূট প্রশ্নের জবাব দেবার জন্য 'মেটেরিআলিজম এ্যাণ্ড এমপিরিও ক্রিটিসিজম' লিখেছিলেন? যতোদূর জানা গেছে তৎকালীন রাশিয়ায় তো খুব কম সংখ্যক শ্রমিক-কৃষকই ওটা পড়ে বুঝতে পারত, তাহলে লেনিন ওটা লিখলেন কেন? এই প্রশ্নের জবাব আছে আমাদের সিদ্ধান্তে এবং সে কারণেই সুভাষ, সুকান্ত-র কবিতা সংগ্রামী, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্য বিপ্লবের হাতিয়ার।

বিপ্লবের আশু প্রয়োজনের কথা ভেবে প্রকাশবাবু আরো অনেকগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস ভুলে গেছেন। প্রথমত, বাঙলাদেশের শ্রমিক-কৃষক নিরক্ষর, লোককবির কবিতাটিও তারা পড়তে পারবে না; দ্বিতীয়ত, বাঙলাদেশের শ্রমিক প্রধানতই হিন্দী-ভাষাভাষী; তৃতীয়ত, এক বাঙলাদেশেই এতো বেশি স্থানীয় ভাষার বিভিন্নতা যে এক অঞ্চলের কথা অন্য অঞ্চল বুঝবে না। ফলে, আমাদের কবি-শিল্পী শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে থাকতে গিয়ে প্রচুর অসুবিধের সম্মুখীন হবেন। দিনাজপুরে যিনি যাবেন—বিপ্লবসাধনের জন্য তাকে 'বাহে' ভাষাতে কথা বলতে হবে এবং লিখতে হবে, নোয়াখালি-চট্টগ্রামে যিনি যাবেন তাকেও স্থানীয় ভাষাতেই লিখতে হবে, ফলে এক জায়গার রচনা অন্য জায়গায় চলবে না, যতোদিন না অবশ্য সাহিত্যে চলতি ভাষার প্রচলন শেখানো হচ্ছে। সুতরাং একটা ঐক্যবদ্ধ সাহিত্য গড়ে উঠতে পারছে না। বীরেনবাবু ও প্রকাশবাবু এই সমস্যা সমাধানের জন্য কী 'সহজ-সরল' কলাকৌশল বাতলে দেবেন আমার জানা নেই, আমি শুধু ওঁদের চিন্তার আলোয় পথ খুঁজছি।

কৃষক-ফ্রন্টের সমস্যার সমাধান হলে বাকী রইল শ্রমিকদের কথা। হিন্দী-ভাষাভাষী শ্রমিকদের জন্য বাঙালী সাহিত্যিকরা কী করতে পারেন সে-সম্পর্কেও আমার অনেক জিজ্ঞাস্য আছে। প্রকাশবাবুর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আমি যতোটা ভেবেছি, এই সমস্যার কোনো সমাধানই নেই। আমরা যেমন করে দুটো পর্যায় ভাগ করে দেখিয়েছি এবং সমাধান দেবার চেষ্টা করেছি তা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। প্রকাশবাবুর কথা মেনে চললে সাহিত্য-শিল্পকে শিকেয় তুলে রেখে শুধুমাত্র পোস্টার লিখতেই বসে যেতে হবে—যতোই তিনি সুকান্ত-র কথা বলুন না কেন! কোনো সৎ এবং বোধযুক্ত শিল্পী-সাহিত্যিক তা হতে দিতে রাজী হবেন না নিশ্চয়ই।

এই সঙ্গেই আবার ঘোষণা করছি তাদের উদ্দেশ্য করে—যারা কল্পনা করেন 'আমার রাজত্ব হবে উচ্চাকাশে'—যে তারা যদি আগামী সমাজ-বিপ্লবে শামিল না হতে পারেন তবে প্রিয়ার নরম মুখ, 'সেই ছোট ঘর', 'নীল চাঁদ' ও 'সাতটি তারার তিমিরে' সমস্ত কবিতা হারিয়ে ফেলবেন,—একটি কলমও লিখতে পারবেন না—চর্বিতচর্বণ ছাড়া, যতোই কেননা 'মিশর' 'মমি' 'কাফনের ঘ্রাণ' 'কংকাবতী,' 'জাহাজের ডাক'কে কবিতায় স্থান দিন। কারণ, জীবনে দর্শকের স্থান নেই, কেন না এই লড়ায়ে কোনো অংশ বেছে নিতেই হবে। আর জয় হবে আমাদেরই—আমরা ইতিহাসের অমোঘ গতিকে স্বীকার করে নিয়ে নতুন ভবিষ্যৎ গড়বার সংগ্রামে নেমেছি।*

* ডাক, দ্বিতীয় বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৬, পৃঃ ৭৩-৯৫; স্বদেশ বসু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী-অধ্যাপক শান্তি বসু-র ছদ্মনাম। প্রবন্ধের বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো পরিমার্জিত হয়েছে। —সম্পাদক

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" / মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪নং 'মার্কসবাদী'তে প্রকাশিত 'বাংলা প্রগতিসাহিত্যের আত্মসমালোচনা' সম্পর্কে আমার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছিল অথচ এ পর্যন্ত (৫নং 'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্র গুপ্তের আলোচনা প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত) আমি কোনো লিখিত মতামত জানাই নি।

কারণ, আমি একটি সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলাম। সে সমস্যা ছিল এই যে, ৪নং 'মার্কসবাদী'র আত্মসমালোচনার সঙ্গে আমার গুরুতর মতভেদ ছিল, আবার লেখাটির মূল উদ্দেশ্য এবং কতকগুলি বক্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সমর্থনও ছিল। সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কারকদের বিরুদ্ধে এই যে প্রথম জোরালো অভিযান শুরু হল, একে ব্যাহত না করে, দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কে যে অত্যন্ত সঠিক ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এর মধ্যে আছে তার গুরুত্ব খেলো না করে, কিভাবে আত্মসমালোচনার মারাত্মক ভুল ও অসম্পূর্ণতার সমালোচনা উপস্থিত করা যায় —এই ছিল আমার সমস্যা।

শুধু ভুল দেখানো বা প্রতিবাদ জ্ঞাপন আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সংস্কারবাদের একটা বিপজ্জনক দিক উপেক্ষিত হওয়ায় আত্মসমালোচনা যে খণ্ডিত ও এক-পেশে হয়ে গেছে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাও আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি বিশ্বাস করি, আমার বক্তব্য সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানকে শক্তিশালী করবে, এক স্তর এগিয়ে নিয়ে যাবে। অবশ্য আমার এ ধারণা ভুলও হতে পারে।

সংক্ষেপে আমার বক্তব্য ছিল এই :

১) ৪নং 'মার্কসবাদী'র আত্মসমালোচনা সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে নির্ভীক ও বলিষ্ঠ আক্রমণ। কয়েক সংখ্যা 'পরিচয়' অবলম্বন করে লেখাটিতে বুর্জোয়াপ্রীতি ও সংগ্রাম-বিমুখতার—দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের স্বরূপ তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে নগ্ন করে ধরা হয়েছে, যা আমাদের চোখ খুলে দেয়।

২) কিন্তু দুঃখের বিষয় আত্মসমালোচনায় বাংলা সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে,

ইতিহাস সম্পর্কে এমন ভ্রান্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করা হয়েছে যা সমগ্র লেখাটির আবেদন নষ্ট করে দেয়। 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় ঐতিহ্যবিলাস প্রচুর কিন্তু স্বরূপ নির্দেশ করার বদলে, রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথকে নির্বিচারে ভক্তিসহকারে প্রগতিশীল বলার নিন্দা করার বদলে, একটি মনগড়া সংগ্রামী ঐতিহ্য খাড়া করে সমগ্র ঐতিহ্যকেই বর্জন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩) তাছাড়া, সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের সমগ্র চেহারা খোঁজা হয় নি, সমগ্রভাবে সংস্কারবাদকে আক্রমণ করার বদলে একটা দিককে মাত্র আক্রমণ করা হয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের আজ মিলিত রূপ —দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী—দুটি রূপই সুস্পষ্ট। প্রকাশ রায় শুধু দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদটাই দেখেছেন। এই খণ্ডিত দৃষ্টির ফলে আত্মসমালোচনায় বামপন্থী সংস্কারবাদের কিছু কিছু সমর্থন রয়ে গেছে।

তার চেয়ে বড় কথা, খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে সংস্কারবাদকে আঘাত করার অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, ছদ্মবেশী বামপন্থী সংস্কারবাদ এই আঘাতেরই সুযোগ গ্রহণ করে; সংস্কারবাদ এই পথ খোলা পেয়ে বামপন্থী ভেক ধারণ করে টিকে থাকতে চায়।

৪) দক্ষিণপন্থী ও ছদ্মবেশী বামপন্থী সংস্কারবাদ অতীতের সংস্কারবাদী যান্ত্রিকতারই জের। আমরা প্রায় সকলেই কমবেশী এই রোগে ভুগছি। ৪নং 'মার্কসবাদী'র আত্মসমালোচনায় অসম্পূর্ণতা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গুরুতর ভুল এই যান্ত্রিকতারই প্রভাবের দরুণ।

সংস্কারবাদী যান্ত্রিকতার মূল কথা—মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং শ্রেণী-সংগ্রামের জটিলতা ও শ্রেণীসম্পর্কের বাস্তবতাকে পরস্পর-নিরপেক্ষ করার ঝোঁক। জোশীবাদের ভিত্তি ছিল মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃত করা, সুবিধামত ঢেলে সাজা। সংস্কৃতি-ফ্রণ্টে তার প্রত্যক্ষ ফল দেখা গিয়েছিল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও সংস্কৃতি-আন্দোলনের বাস্তবতার মধ্যে ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্ক গড়ে ওঠায়। প্রত্যক্ষ আন্দোলনের মধ্য থেকে যে কোনো বাস্তব প্রশ্ন উঠুক, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ প্রয়োগ করে তার বাস্তব সমাধান খোঁজা যতই জরুরী হোক, আলোচনা সেই বাস্তব প্রকৃত সমস্যার পাশ কাটিয়ে উঠে যেত মার্কসীয় দর্শনের মূলতত্ত্বের বিচারে এবং শেষপর্যন্ত সেইখানেই আটকে থাকত। একটা জীবন্ত আন্দোলনের জীবনটাই নির্ভর করে শত শত প্রশ্ন ও সমস্যার

আদর্শগত সঠিক সমাধান খুঁজে তা প্রয়োগ করার উপর—এ দাবী মেটার বদলে পাওয়া যেত মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পক্ষে অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যহীন ওকালতি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে স্বয়ং বিষ্ণু দে—একজন জ্যান্ত প্রগতিগর্বী কবি ও বিশিষ্ট মার্কসবাদী (!)—যখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন, তখন পর্যন্ত বিষ্ণু দের লিখিত কবিতা ও লিখিত মতামতের বাস্তব দলিল বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি প্রগতি-শীল অথবা প্রতিক্রিয়ার দালাল এটা স্থির করার কোনো চেষ্টাই হল না—বিচারটা পরিণত হল সাহিত্য ও সমাজ সম্পর্কে মার্কসীয় মূলনীতি নিয়ে সূক্ষ্ম ও জটিল তর্কে। মার্কসবাদের একটা ভুল কিন্তু জটিল ব্যাখ্যা দিয়ে বন্ধুভাবে আমাদের তুমুল বিতর্কে নামিয়ে আসল কাজ নষ্ট করা ও বিভ্রান্তি বিস্তারের কী সহজ কৌশল!

আমরা নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিলাম বলেই এ কৌশলে ভুলেছিলাম মনে করলে ভুল হবে। বিষ্ণু দে-দের মার্কসবাদ না শেখালে আমাদের মোক্ষলাভ হবে না (শত শত জঙ্গী শিখুক বা না-শিখুক, প্রশ্ন করে জবাব পাক বা না-পাক) এরূপ মনে করার দরকার আমাদেরও কম ছিল না, নইলে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বাস্তবতা থেকে পৃথক করে রাখা যায় না!

এই 'থিয়োরি নিয়ে কচকচি' জঙ্গীদের মনে থিয়োরি সম্পর্কে কৃত্রিম বিতৃষ্ণা ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। যে-থিয়োরি ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই এক পা এগোতে পারে না তার সম্পর্কে এমন ধারণাও জন্মায় যে থিয়োরি আন্দোলনকে ব্যাহত করছে। এরূপ ধারণা অমূলক ছিল না। সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োগের পরিবর্তে থিয়োরি পৃথক ও বিচ্ছিন্নভাবে চর্চার জন্য রাখলে এরূপ অনেক ক্ষতিকর ফলাফল অবশ্যম্ভাবী।

জোশীবাদের গোড়া কাটা গেছে, কিন্তু এখনো মূলোচ্ছেদ বাকি। স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে এমনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বাস্তবতাকে সম্পর্কহীন করে রাখা যায় না, কিন্তু জেরটা এখনো চলছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১নং 'মার্কসবাদী'তে প্রকাশিত 'বাংলা-সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' প্রবন্ধটিতে সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও বাস্তবতার দূরত্ব ঘুচিয়ে দেবার প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হয়। এই প্রবন্ধেই বিষ্ণু দের কবিতা ধরে তার 'তৃতীয়পক্ষের' ছদ্মবেশ উন্মোচন করে সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দেওয়া হয়। শ্রেণী-সংগ্রাম ও সামাজিক রূপান্তরের ভিত্তিতে বাংলা

সাহিত্যের মূল ধারাগুলির শ্রেণী-পক্ষপাতিত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে, ধনবাদী সভ্যতার শেষ যুগে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া সাহিত্য, উঠ্‌তি প্রগতি সাহিত্য ও প্রগতি-মার্কা দালালী সাহিত্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি এই প্রবন্ধেই আমরা প্রথম পাই। সংস্কারবাদকে খণ্ডিত দৃষ্টিতে দেখা—আত্মসমালোচনার এই দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিপূরক, এই সমালোচনা ব্যাহত করার বদলে অভিযানকে শক্তিশালী করবে। কিন্তু ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার যে মত তদনুসারে প্রকাশ রায়ের ভুলটি এমনি মারাত্মক, এটি সমস্ত প্রবন্ধের এমন একটি মূল ভিত্তি যে এই ভুল দেখিয়েও সঠিক বক্তব্যগুলি বাঁচিয়ে আমার সমালোচনা যোগ করার বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে কিনা বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

৫নং 'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্র গুপ্ত দেখিয়েছেন যে ঐতিহ্য সম্পর্কে আমার ধারণাই ভুল, প্রকাশ রায়ের বক্তব্য সঠিক। রবীন্দ্র গুপ্তের মত আমি গ্রহণ করেছি। আমার মতটা কি ছিল এবং কিভাবে আমি রবীন্দ্র গুপ্তের মত গ্রহণ করেছি একটু বলা দরকার। রবীন্দ্র গুপ্তের মতের সঙ্গে আমার মতের মূল পার্থক্য কি ছিল? আমি জানতাম, বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ পৃথক কোনো প্রগতিশীল ধারা পূর্বে গড়ে ওঠে নি, শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান সংগ্রামের মধ্যেই এরূপ স্বাধীন ও আত্মসম্পূর্ণ প্রগতিশীল ধারা সৃষ্টি হচ্ছে। রবীন্দ্র গুপ্ত দেখিয়েছেন, রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মূল ধারার পাশা-পাশি একটি স্বতন্ত্র প্রগতিশীল ধারা ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যায়, সিপাহী-বিদ্রোহ নীল-বিদ্রোহ প্রভৃতি ব্রিটিশ-বিরোধী গণসংগ্রামের প্রভাব ও মর্মকথা যার ভিত্তি।

ইতিহাসের বাস্তব বিচার ও শ্রেণীগত বিচারে এই পার্থক্যের মোট তাৎপর্য কি?

প্রথমেই বলা দরকার, সিপাহী-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ প্রভৃতির বিপ্লবী ভূমিকা অস্বীকার করে আমার মত গড়ে নি, বরং তার বিপরীত। পরাধীন দেশে বিদেশী শাসকের বিরোধিতাই যে প্রগতি বিচারের মূল কথা, আমিও এই নিরিখেই ঐতিহ্যের বিচার করেছিলাম।

আমার অবশ্য ধারণা ছিল, সিপাহী-বিদ্রোহের নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী থেকে এসেছে। কিন্তু সেজন্য এই বিদ্রোহকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে করার

কোনো কারণ দেখি নি। নেতৃত্বের শ্রেণী-প্রকৃতি যাই হোক, যোদ্ধার বেশধারী কৃষকশ্রেণীর ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের আদর্শের সঙ্গে এই নেতৃত্বের শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ ছিল না। কারণ, ব্রিটিশ শাসনে ফিউডাল রক্ষণশীল শ্রেণীর একাংশ অর্থসম্পদ ও ক্ষমতা সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়, ব্রিটিশের বিশ্বস্ত ও কৃপাপুষ্ট রাজা-মহারাজা-নবাবদের সঙ্গে এদের স্বার্থের মিল ছিল না। যদিও এই অংশের পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে বাহাদুর শাহ-র বাদশাহী সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনা কিন্তু এদের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ও কৃষকশ্রেণীর উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন—বলপূর্বক ব্রিটিশ শাসনের অবসান। সুতরাং এদের নেতৃত্বের শ্রেণী-উৎস সত্ত্বেও সিপাহী-বিদ্রোহের বিপ্লবী ভূমিকা মূলত অপরিবর্তিত থাকে।

ফিউডাল রক্ষণশীল শ্রেণীর একাংশ যে এরূপ দুরবস্থায় পতিত হন স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহের পরিবারের নিম্নলিখিত অবস্থার বিবরণ থেকেই তা অনুমান করা যায়। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ২য় খণ্ড ৩৫৪ পৃষ্ঠায় ১৮৩৩ সালের ২১শে ডিসেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' থেকে উদ্ধৃতিতে আছে :

> "ঐ পত্রের লেখক আরও লেখেন যে বর্ত্তমান বাদশাহের পৌত্রেরদের মধ্যে কেহ কেহ মাসিক এক শত টাকার অধিক প্রাপ্ত হন না এবং বাদশাহের ভ্রাতৃপুত্র এবং মাতৃস্বস্রীয় ও পিতৃস্বস্রীয় ও অন্যান্য বহিরঙ্গ কুটুম্বেরা তৈমূর বংশ হইয়াও একজন মসাল্চির মাহিয়ানার তুল্য বেতন এবং বাদশাহের বাবুর্চিখানা হইতে কিঞ্চিৎ ২ পোলাও পাইয়া কোনরূপে কালযাপন করিতেছিলেন।"

ইতিহাসের সমসাময়িক বাস্তব অবস্থার হিসাব না ধরে যান্ত্রিকভাবে সিপাহী-বিদ্রোহের নেতৃত্বের শ্রেণীচরিত্র বিচার করতে অগ্রসর হওয়ায় বিদ্রোহের শ্রেণীভিত্তি সম্পর্কে কয়েকজন ভুল করেছেন। শ্রেণী হিসাবে ফিউডাল রক্ষণশীল শ্রেণী এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করে নি, এই শ্রেণী ইংরাজদের সঙ্গে আপোস করে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকাই নিয়েছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের নেতৃত্ব যাদের ছিল তারা এই শ্রেণী থেকে এসেছিল শুধু এইটুকু ধরলে ভুল সিদ্ধান্ত করতে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা শ্রেণীচ্যুত হয়েই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সুতরাং সিপাহী-বিদ্রোহকে সম্পূর্ণরূপে কৃষক-বুর্জোয়া-বিদ্রোহ বলে গণ্য করতে দ্বিধার

কারণ থাকতে পারে না।

রবীন্দ্র গুপ্ত ঠিকই বলেছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহের নেতৃত্ব ফিউডাল রক্ষণশীল শ্রেণীর ছিল না, কিন্তু নেতৃত্ব যে এই শ্রেণী থেকেই শ্রেণীচ্যুত অংশের ছিল তিনি তা বলেন নি। কৃষকশ্রেণী থেকেই সিপাহী-বিদ্রোহের নেতৃত্ব আসে, তাঁর এই মত এখন পর্যন্ত আমি মানতে পারছি না। সেটা তথ্যাদি অনুসন্ধান সাপেক্ষ।

কিন্তু সেজন্য মূল প্রশ্নের ব্যতিক্রম ঘটে না, ফিউডাল প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী থেকে শ্রেণীচ্যুত হয়ে নেতৃত্ব এসেছে অথবা কৃষকশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়েছে তাতে সিপাহী-বিদ্রোহের স্বরূপ বদলায় না। সিপাহী-বিদ্রোহ এদেশে প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

সিপাহী-বিদ্রোহের এই বিপ্লবী স্বরূপ মেনেও এই গণ-বিদ্রোহের ঐতিহ্য বহনকারী ধারা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছিল মনে করতে পারি নি। কিছুকালের জন্য সংস্কৃতির উপর এই বিদ্রোহের জোরালো প্রভাব পড়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু এমন একটি বিপ্লবী ধারা সৃষ্টি হয় নি যা অব্যাহতভাবে বয়ে এসেছে। ইতিহাসের বাস্তবতা বলপূর্বক ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের আদর্শ নিয়ে এরূপ গণবিদ্রোহ অসম্ভব করে দেয়।

নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল-বিদ্রোহ নিঃসন্দেহ গণ-বিদ্রোহ। কিন্তু এসব বিদ্রোহ ছিল আঞ্চলিক ও সীমাবদ্ধ এবং মূলত ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ এসব বিদ্রোহের আদর্শ ছিল না। ইংরাজের শোষণ ও অত্যাচার বিশেষ ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেলে তারই বিরুদ্ধে এই সব গণ-বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। এসব বিদ্রোহের যে প্রতিফলন ঘটে সাহিত্যে ঐতিহ্য হিসাবে তা প্রগতিবাদীর কাছে খুবই মূল্যবান কিন্তু সাহিত্যে এসব বিক্ষিপ্ত।

সিপাহী-বিদ্রোহের ঘা খেয়ে ইংরেজ এদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে আপোস করে নি, রাজা-মহারাজা-নবাব-উজিরদের সঙ্গে তারা আগেই আপোস করেছিল—তাদের পদানত কুকুর বানিয়েছিল। সিপাহী-বিদ্রোহ ইংরেজকে আতঙ্কে কাঁপিয়ে মর্মে মর্মে টের পাইয়ে দেয়, শুধু প্রতিক্রিয়ার এই কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আপোস করেই এদেশে টেকা যাবে না, আরও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াকে নিজের স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে এবং শাসনব্যবস্থার শক্ত কাঠামো গড়ে তারই আশ্রয়ে শোষণ চালাতে হবে।

১৮৫৩ সালের লেখা কার্ল মার্কসের 'ভারতের গবর্নমেণ্ট' প্রবন্ধে (ভারত সম্পর্কে রচনাবলী) বিলাতের ব্যবসাদারী বোর্ড ও সরকারের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণে ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হত তার স্বরূপ খুলে ধরা হয়েছে। সারা দেশে যে অরাজকতা বিরাজ করত তার যেসব বিবরণ পাওয়া যায় তার চেহারা সত্যই ভয়াবহ। মানুষের ধনসম্পত্তি ও জীবনের কোনো নিরাপত্তাই ছিল না। পুলিশ পর্যন্ত রাত্রে ডাকাতি করত, দিনে সেই ডাকাতির জন্য দলে দলে লোক পাকড়াও করে ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দিত। অর্থাৎ এককথায়, রাষ্ট্র শুধু নামেই ছিল, শোষণের জন্য যে রাষ্ট্রশক্তি আবশ্যক তাও ইংরেজ খাড়া করতে সময় পায় নি, এতই সে ব্যস্ত ছিল লুণ্ঠনে।

সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ নূতনভাবে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করে, 'আইন ও শৃঙ্খলা' বজায় রাখার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ তাদের সাথে সাথে অসংখ্য দেশী চোর-ডাকাত-খুনেদেরও যে লুটতরাজ ও হত্যা চালিয়ে যাবার অবাধ অধিকার ছিল সেটা সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ব্যবসা ও রাজনীতি পৃথক করে দেয়।

ব্যাপক অরাজকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কবল থেকে সাধারণ লোক মুক্তি পায়। এই যে নিরাপত্তা, দেশের দরিদ্রতম লোকটির প্রতি এই যে আশ্বাস—তুমি শোষিত হও, নিপীড়িত হও, রোগে-দুর্ভিক্ষে মরে যাও, একটা নিয়মতান্ত্রিকতার ভিতর দিয়ে মরবে, তোমারও বেঁচে থাকার, কাজ করার, কোটিপতি হবার সমান অধিকার আইনে স্বীকৃত—এটাই হল বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল কথা। সিপাহী-বিদ্রোহের পর এদেশে প্রথম বিদেশীর ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র স্থাপিত হয়।

রেলপথ, টেলিগ্রাফ, শিল্পশ্রমিকের সৃষ্টি ইত্যাদি পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে নূতন ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনার উন্মেষ হওয়ার আগে বলপূর্বক ব্রিটিশ-শাসন উচ্ছেদের জন্য ব্যাপক বিদ্রোহ অসম্ভব হয়ে যায়।

বিশেষত, ব্রিটিশের একটি মূল রাজনীতি ছিল প্রাচীন সমাজব্যবস্থা ও সংস্কার প্রাণপণে বজায় রাখা। তারা জানত, দেশ যত পশ্চাৎপদ থাকবে, তাদের শাসনও তত দীর্ঘস্থায়ী হবে।

নীল-বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, এ বিদ্রোহ ছড়ায় নি। অন্যান্য বিদ্রোহ সম্পর্কেও একই কথা।

পুরনো ফিউডাল ব্যবস্থা ও সংস্কার-ভাঙ্গা এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে জাতীয় চেতনার বিকাশকে এগিয়ে নেওয়া, প্রগতির ভিত্তি ছিল এই। ইংরেজ শাসনকে সাহায্য করার পাশাপাশি এই ভবিষ্যতে, ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীন হবার এই ধারাকেই প্রগতিশীল বলে ধরে নিয়েছিলাম।

অর্থাৎ রামমোহন-বিবেকানন্দ-কালীপ্রসন্ন-দীনবন্ধু-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল সকলের ভিতর দিয়ে একটিই প্রগতির ধারা। কম অথবা বেশী।

তাই নির্বিচারে কাউকেই শ্রমিকশ্রেণী যে গ্রহণ করতে পারে না—এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম। প্রত্যেককে যাচাই করে বেছে নিতে হবে, কি ও কতটুকু কার প্রগতিশীল।

যেমন, রামমোহন। রামমোহনের ধর্মসংস্কার নয়, পুরনো প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইটাই প্রগতিশীল। এ লড়াই এদেশকে পুরনো দিনের অন্ধকারে আটকে রাখার যে রাজনীতি ইংরেজের, তার বিরুদ্ধেও লড়াই।

যেমন, বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের মতামত চুলোয় যাক, শ্রমিকশ্রেণী শুধু দেখবে যে তিনি সে-যুগে এদেশের প্রথম প্রকৃত সংগঠক। সেবাধর্মের ভিত্তিতে হলেও সত্য সত্যই 'কর্মের' জন্য এরূপ সংগঠন তাঁর আগে কেউ গড়তে পারেন নি (ইংরেজ আমলে)। এই সংগঠনের বহু কর্মী পরে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান করেন।

নীলদর্পণকেও আমি সাহিত্যের মূল প্রগতিশীল ধারায় একটি বিশেষ বস্তু বলে ধরেছিলাম, পৃথক গণনা করি নি। নীলদর্পণ ঘৃণা ও বিক্ষোভ জাগায়, কিন্তু জাগায় অত্যাচারকে বড় করে তুলে ধ'রে, বিদ্রোহকে নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রগতিশীলতা দুটি ভিন্ন খাতের, আমি তাও ধরি নি। রবীন্দ্রনাথের রচনা যতখানি প্রগতিশীল, তার যে মূল সুর নজরুলে সেটাই আরও তীব্র ও স্পষ্ট হয়েছে, এই ছিল আমার ধারণা। তাছাড়া নজরুলের ফুলেল গান ও কবিতাগুলিও আমি গণ্য করেছিলাম।

রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা পড়ে খুঁজে দেখতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মিলের মধ্যেও আমি একটি মৌলিক পার্থক্য দেখতে পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।

ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
তত‌ই মোদের আঁখি ফুটবে ॥
আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—
এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে ॥
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়ব ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে।

নজরুলের—

এই শিকল পরা ছল, মোদের শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।
তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুটিই ধরব টিপে, করবো তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনবো বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আন্‌বো হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।

নজরুল অনেক বেশী লড়ায়ে কিন্তু মূল সুরটা একই। পার্থক্যটা মৌলিক হয়ে ওঠে শেষের বাকী লাইনগুলিতে।

রবীন্দ্রনাথের গানের শেষ—

তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎপ্রভু—
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলোয় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলোয় ধ্বজা লুটবে ॥

নজরুলের গানের শেষ—

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা
সে যে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণবন্দনা,
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

বিদ্রোহের সুরে নজরুলের গান শেষ হল, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি উর্ধ্বে উঠে গেল তাঁর সদাজাগ্রত জীবন-প্রভুর কাছে ভরসা চাওয়ার জন্য।

বঙ্কিমকে আমি চিরদিন প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল বলেই জেনে এসেছি। কিন্তু বঙ্কিমের মধ্যেও প্রগতির কিছু কিছু চমক আছে।

সিপাহী-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ প্রভৃতির ঐতিহ্য বহন করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পৃথক কোনো ধারা সৃষ্টি হয় নি, এই ধারণাই রামমোহন-রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে বর্জন করে শুধু দীনবন্ধু-নজরুলকে প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করার পক্ষে আমার বাধা ছিল। এইরূপ পৃথক ও বিপ্লবী ধারা যে বাঙলার সংস্কৃতিতে আছে, রবীন্দ্র গুপ্ত তার ভিত্তি সরবরাহ করেছেন। সুতরাং আমি আগ্রহের সঙ্গে এই ভিত্তি গ্রহণ করেছি। অবশ্য এই ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আরও বিচার ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সেটা অন্য কথা।

আমার মূল বক্তব্যের ২নং বক্তব্যের মীমাংসা হয়েছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের 'সমগ্র চেহারা' সম্পর্কে আলোচনায় নামার আগে রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধকে ভিত্তি করেই প্রকাশ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যান্ত্রিকতার প্রভাব সম্পর্কে, অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সার্থক প্রয়োগে বাস্তবতা সম্পর্কে উদাসীনতার বিষয়ে একটু আলোচনা করব।

আমি চুলচেরা বিচারে নামছি না, বা কথার মারপ্যাঁচ কষছি না। এই পার্থক্যটুকুই মার্কসবাদী বিচারে আকাশ-পাতাল তফাৎ ঘটিয়ে দেয়। কারণ, বিচারের মূল ভিত্তিটা জানিয়ে দিয়ে বিচারে নামার অর্থই বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দান, পুরনো বিভ্রান্তি যে কতদূর ব্যাপক ও দৃঢ়মূল এ সত্যকে এড়িয়ে না যাওয়া, যাদের জন্য আত্মসমালোচনা তাদের চেতনাকে পাশ না কাটানো : অন্যথায় সোজাসুজি বিচারে নামার অর্থই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, যান্ত্রিকতা।

রবীন্দ্র গুপ্ত দেখিয়েছেন, ঐতিহ্য সম্পর্কে প্রকাশ রায়ের বক্তব্য সঠিক। আমার মতে, এটা মানতে কোনো মার্কসবাদীরই এখন—অর্থাৎ রবীন্দ্র গুপ্তের আলোচনা পড়বার পর, দ্বিধা হবে না।

কিন্তু এ থেকেই কি বেরিয়ে আসে না প্রকাশ রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে যান্ত্রিকতার প্রভাব? তিনি সঠিক কথাই বলেছেন কিন্তু বাস্তবতা খেয়াল রেখে এমনভাবে বলেন নি যাতে তার বলাটাও সঠিক হয়, সার্থক হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগের উপরেই যে সবকিছু নিভর করে—এবং প্রয়োগের অর্থই বাস্তবতাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়া—এবিষয়ে তাঁর উদাসীনতার দরুণ আমরা কেউ ধরতেও পারি নি তিনি ঠিক কথা বলছেন, বরং উল্টোটা ভাবতেই বাধ্য হয়েছিলাম।

এমনভাবে তিনি সংস্কৃতি-আন্দোলনের একটি মূল প্রশ্ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন

অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আমাদের চেতনার উপর দিয়ে চলে গেছে।

১নং 'মার্কসবাদী'র 'বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা' মূলত সংস্কারবাদের বিরুদ্ধেই প্রথম অভিযান। এই প্রবন্ধের পরোক্ষ আঘাতেই সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ বামপন্থী সংস্কারবাদের খোলস গ্রহণের চেষ্টা করে।

প্রকাশ রায় সংস্কারবাদের রূপান্তর গ্রহণের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার একটি দুর্বল উদাহরণ দিয়েছেন—যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের বামপন্থী রূপ গ্রহণের প্রচেষ্টা হিসাবে নয়। এদিকটা তাঁর চোখেই পড়ে নি।

১নং 'মার্কসবাদী' প্রকাশিত হবার (অক্টোবর, ১৯৪৮) কিছুদিন পরেই 'পরিচয়'-এ (কার্তিক, ১৩৫৫) গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির সংকট' প্রকাশিত হয়।

"তাই গোপালবাবু এই প্রবন্ধে বুর্জোয়া রাজনীতিকদের সম্পর্কে যতখানি নির্মম হতে পেরেছেন—এই রাজনীতিকদের সাংস্কৃতিক মুখপাত্রদের সম্পর্কে তার সিকিমাত্র কঠিন হতে পারেন নি। নেহরু-প্যাটেল-কিরণ-বিধানচন্দ্রকে গোপালবাবু সঙ্গতভাবেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন, কিন্তু তারাশঙ্করের 'ফিউডাল আধারের মোহ' এবং বনফুলের 'ন্যাশনালিজমের প্রতারণা'র উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার, তাও বন্ধনীর মধ্যে ক্ষীণ কণ্ঠে। এ-কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বুর্জোয়া ঐতিহ্যের মোহ। বুর্জোয়া ভাবধারা তাঁর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে বলেই বুর্জোয়া সংস্কৃতিবিদদের সম্পর্কে তাঁর লেখনী শাণিত হয়ে ওঠে না, সে সময় তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে। **অথচ এই সংস্কৃতি আন্দোলনই তাঁর সংগ্রাম ক্ষেত্র। এখানকার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে সাধারণভাবে সরকারের রাজনৈতিক সমালোচনা করা আসলে সংগ্রাম এড়িয়ে যাবারই একটা কায়দা। এই আস্ফালনে বীরত্ব কিছু নেই, আসলে তা সংগ্রাম বর্জন।**" (বড় হরফ আমার) ৪নং মার্কসবাদী, পৃঃ ১১৫।

এই প্রবন্ধটির আগে গোপালবাবু যত লেখা লিখেছেন সে-সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও বুর্জোয়া রাজনীতিকদের 'সঙ্গতভাবেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত' করার আস্ফালন পাওয়া যাবে না। প্রকাশ রায় ঠিকই ধরেছেন যে এটা 'আসলে সংগ্রাম এড়িয়ে যাবারই একটা কায়দা'। কিন্তু যেহেতু তিনি সংস্কারবাদকে দেখেছেন একপেশে দৃষ্টিতে শুধু দক্ষিণপন্থী রূপে, পরিচয়ের পৃষ্ঠায়

বাইরে সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রের দিকে তাকান নি, সংস্কারবাদের অতীত রূপ যাচাই করেন নি, সেইহেতু সংগ্রাম এড়িয়ে যাবার এই কায়দার মধ্যে 'সংস্কৃতির রূপান্তরের' মতো দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ কিভাবে বামপন্থী রূপান্তর লাভের চেষ্টা করছে সেটা তিনি ধরতে পারেন নি।

নিজ সংগ্রামের ক্ষেত্রের দায়িত্ব বর্জনের এটা নরম কায়দা, কারণ এটা বুর্জোয়াপ্রীতির সংগ্রামী ছদ্মবেশ ধারণের চেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই ঝোঁকটাই উগ্র হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে যাদের বুকে প্রকৃত ক্ষোভ ও ঘৃণার আগুন জ্বলছে।

মার্কসবাদী নেতৃত্ব লিখেছিলেন :

"এ সবগুলিই দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের প্রকাশ্য অভিব্যক্তি। এর সঙ্গে এক নূতন ব্যাধির যোগ হয়েছে—তা হল চোরা সংস্কারবাদ। এই চোরা সংস্কারবাদ বামপন্থী বিপ্লববাদের ভেক ধারণ করেছে—সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রাম প্রচেষ্টা হিসাবে নিজেকে চালু করেছে।

"এই ঝোঁক অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ অনেক ভাল ভাল কর্মী—যাঁদের সত্যিকারের বিপ্লবী সংস্কারবাদের কবল থেকে বেরিয়ে এসে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনার ইচ্ছা কারুর থেকে কম নয়—তাঁরাও দমননীতির বিরুদ্ধে ক্রোধে এবং ঘৃণায় উদ্দীপিত হয়ে এবং অস্থিরতার দরুণ এই ব্যাধির কবলে পড়ে যাচ্ছেন।"

বাঙলার প্রগতি লেখকদের গত ৪র্থ বার্ষিক সম্মেলনে এর নমুনা দেখতে পাওয়া যায়।[১] 'ঘোষণাপত্রে'র খসড়া নিয়ে সংস্কারবাদ ও বামপন্থী বিপ্লববাদের টাগ-অব-ওয়ারে! সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্রে সংস্কারবাদের সন্ধান শুধু পরিচয়ের পৃষ্ঠায় না করে এই সম্মেলনের দিকে তাকালে সংস্কারবাদের বামপন্থী চেহারা প্রকাশ রায়ের চোখ এড়িয়ে যেত না। ঘোষণাপত্রের খসড়াটি ছিল সংস্কারবাদের সংগ্রাম-বিমুখতার দলিল—চোস্ত ভাষায় ছকে ফেলা প্রাণহীন আহ্বান। আজকের দিনের সংস্কৃতির সমস্যা ও প্রগতিবাদী লেখকশিল্পীর কর্তব্যকে যখন তুলে ধরাটাই বড় প্রয়োজন, বুর্জোয়া-সংস্কৃতি ও শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির উপর বুর্জোয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ও শাণিত আহ্বান দেওয়া একান্ত-ভাবে জরুরী—প্রগতি লেখক সম্মেলনের ঘোষণাপত্র তখন বুর্জোয়া ঘোষণাপত্রের

১. ১৯৪৯ সালের ২২ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল কলকাতায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্র. 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক', প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৪-৯৬।—সম্পাদক

বিশুদ্ধ ফর্ম বজায় রাখতে সচেষ্ট। এদেশে ইংরেজ আগমনের ফলে ফিউডাল যুগের অবসান, সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ, ধনবাদী সভ্যতার প্রগতিশীল যুগ—এই অতীত থেকে ঘোষণাপত্র বর্তমানে এসেছে, বর্তমান যুগের সমস্যা ও প্রগতিবাদীর দায়িত্বের নিষ্প্রাণ তালিকা দাখিলে শেষ হয়েছে। সম্মেলনের তীব্র প্রতিবাদের সঙ্গে আপোস করে অনেক রদবদলের পরও গৃহীত ঘোষণাপত্রটি (পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৫৬) এই প্রাণহীন ফর্ম্যালিজমের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক ও সম্মেলনের কার্যকরী সভাপতি অতি মৃদু একটু আপত্তি জানিয়ে, প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের জন্য যেরকম ঘোষণাপত্র বার করা হয়েছে ওরকম হলে ভালো হতো, শুধু এইটুকু বলে, খসড়াটি গ্রহণ করা চলতে পারে এই অভিমত প্রকাশ করেন।

অপরদিকে কয়েকজন ডেলিগেট ঘোষণাপত্রে এমন সব কথা ঢুকিয়ে দেবার দাবী করেন, যেমন, সমস্ত প্রগতিবাদী লেখকের পক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ সভায় যোগদান বাধ্যতামূলক করা, শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সহজিয়া সাহিত্য, তুলিকলম ত্যাগ করে বন্দুক ধরা ইত্যাদি—যা পাতিবুর্জোয়া বামপন্থী বিপ্লববাদেরই চরম নিদর্শন। সম্মেলনে পঠিত চিন্মোহনবাবুর প্রবন্ধ 'সাহিত্য ও গণ-সংগ্রাম'-এ (পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৫৬) এই দাবীর পিছনের মনোভাবই মোটামুটি প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু যে-রূপেই প্রকাশ পাক মূলত এটা সংস্কারবাদ ছাড়া, সংগ্রাম বর্জনের কায়দা ছাড়া আর কিছুই নয়—এইসব অসম্ভব ও অবাস্তব বড় বড় দাবী শ্রেণী-সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী-সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করে, আন্দোলনের বাস্তব ক্ষেত্র ও বৈশিষ্ট্য বিচার করে তোলা হয় নি। তাই, শেষপর্যন্ত আপোসে চরম দাবী ছেড়ে দিয়ে সংশোধিত ঘোষণাপত্র মেনে নিতে সবাই রাজী হয়ে যান।

এদিকে সংস্কৃতি-আন্দোলনের নেতৃত্বেরও মারাত্মক ত্রুটি ঘটেছে: যেভাবেই বলা হয়ে থাক এবং যতই বেঠিক মনে হোক, প্রকাশ রায়ের বক্তব্য সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা না করে পুরনো ধারণার ভিত্তিতে প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

কিন্তু আমি শুধু সংস্কৃতি-আন্দোলনের নেতৃত্বের কথা বলছি না। আমরা দশজন সাধারণ মার্কসবাদী ও মার্কসবাদে বিশ্বাসীরাও তো আছি—

অবিশ্বাসীরাও যে সংখ্যায় কিছু কম তাও তো নয়! আমরা এবং অবিশ্বাসী সুবিধাবাদীরাই বাস্তবতার আসল প্রতিফলক।

বাস্তবতা কি ছিল? ঐতিহ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোটামুটি একটি ব্যাপক ও দৃঢ়মূল ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে। ধারণাটি স্বতঃস্ফূর্ত নয় বা একেবারে প্রতিক্রিয়ার কাছ থেকে ধার করা নয়। কার্ল মার্কসের লেখা, কমরেড রজনী পাম দত্তের লেখা, ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে অন্যান্য আলোচনা-গ্রন্থ ইত্যাদির ভিত্তিতে ধারণাটি গড়ে উঠেছে—এবং এটা মার্কসবাদসম্মত বলেই অধিকাংশের বিশ্বাস।

এ ধারণা ভ্রান্ত। কিন্তু ছাঁকাভাবে সঠিক ধারণাকে উপস্থিত করে ভ্রান্ত ধারণাকে আক্রমণ করলে কি ভ্রান্তি দূর হয়? বরং বিভ্রান্তিই বাড়ে এবং সুবিধাবাদীরা সুযোগ পায়। কার্যক্ষেত্রে তাই দেখা গেছে।

কথাটা মোটেই এই নয় যে নেতৃত্বের অনুমোদিত আত্মসমালোচনায় প্রত্যেকটি ছোট-বড় বিষয়ে তথ্য-বিশ্লেষণ সম্বলিত বিশদ ব্যাখ্যা দিতে হবে অথবা যখন তখন যেকোনো বিষয়ে নেতৃত্বের কৈফিয়ৎ তলব করার অধিকার কর্মীদের জন্মে গেছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক, সংস্কৃতির ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রশ্ন: শুধুই বুর্জোয়া ভাববিলাসিতা ও সংগ্রাম-বিমুখতা বর্জনের বা সংস্কারবাদ উচ্ছেদের প্রশ্ন নয়। এ এমন একটি প্রশ্ন যার মীমাংসা না হলে সংস্কৃতি-আন্দোলন এক পা এগোতে পারে না।

কারণ, প্রকাশ রায় ঠিকই বলেছেন, 'হাওয়ার উপর কোনো সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না'। রামমোহন-বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথদের নিজ শিবিরে রেখে, "এদেশের প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব" (রবীন্দ্র গুপ্ত: ৫নং মার্কসবাদী, পৃঃ ১৩৩) সিপাহী-বিদ্রোহ এবং নীল-বিদ্রোহকে ইতিহাসের আনুষঙ্গিক প্রগতিশীল ঘটনা মাত্র বলে ধরে নিয়ে, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু ও নজরুলের ধারাকে মূলত একই ধারা বলে জেনে শ্রমিকশ্রেণীর যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন এতদিন চলে এসেছে, এখন হঠাৎ কাকে শিবিরে রাখা হবে কাকে রাখা হবে না এবং কোন বিচারে, এদেশের প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক ও শ্রেণীভিত্তি কি তা না জেনে, সাহিত্যের দুটি বিপরীত ধারা ও কেন পরস্পরবিরোধী তা না বুঝে সে আন্দোলন এগোতে পারে না।

৫নং 'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্র গুপ্ত যেরূপ বিশদভাবে আলোচনা করে বিষয়টি

স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন, ৪নং 'মার্কসবাদী'তে এরূপ বিশদ আলোচনাই যে অপরিহার্য ছিল তা নয়। একেবারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে তুলে অখণ্ড প্রমাণে প্রামাণ্য করে হাজির না করলে কোনো কথাটিই মানবো না এরূপ ছিদ্রান্বেষী কেউ যদি থাকেন, আমাদের সঙ্গে তিনি না থাকলেই আমরা খুশি হব।

কিন্তু সংক্ষেপে নূতন দৃষ্টির মূল কথাগুলি বলে নিয়ে তারপর পুরনো দৃষ্টিভঙ্গিকে আক্রমণ করা একান্তভাবে জরুরী ছিল। প্রকাশ রায় এটুকুও বলেন নি। ঐতিহ্য সম্পর্কে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি পরিচয়ের 'ঐতিহ্য-বিলাস'কে আক্রমণ করছেন জানিয়ে দেবার চেষ্টা মাত্র না করে সোজাসুজি আক্রমণ শুরু করেছেন—নিছক প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু তাঁকে বলতে হয়েছে সেটুকু অবলম্বন করে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন আমাদের উপর।

সংগ্রামের উদ্দীপনাবিহীন নিস্তেজ ঘোষণাপত্রটিকে এইরূপ সংগ্রামের ডাকে গরম করার দাবীতে স্থির থাকার জোর এরা কোথায় পাবেন? মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই সব মনগড়া গরম বুলি দিয়ে তো আর 'বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সত্যই লড়তে পারা যায় না।'

মার্কসবাদী নেতৃত্ব বলেছিলেন:

"খাঁটি লোকদের মনের ইচ্ছা যাই হোক না কেন, সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার যতখানি সদিচ্ছাই তাদের মনে থাক না কেন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সেই বিশেষ অবস্থার শ্রেণী-পরিস্থিতি সার্থকভাবে অনুধাবন করতে না পারলে এবং সেই বিশেষ অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্লোগান ঠিক করতে না পারলে বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে লড়তে পারা যায় না। ঠিক এই আসল কথাটি পাতিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীরা হজম করে বসে থাকেন। শ্রেণী-বাস্তবতাকে উপেক্ষা করাটা পাতিবুর্জোয়াদের একটা একেবারে সাধারণ ব্যাধি বিশেষ।"

'সাহিত্য ও গণ-সংগ্রাম' প্রবন্ধে তাঁদের মত সমর্থন করা হয়েছে যাঁরা বলেন, "মজুর-কিষাণকে সংঘবদ্ধ করতে মজুর-কিষাণ সংগঠকেরা যে কাজ করেন, শিল্পী-সাহিত্যককেও তা করতে হবে। করতে হবে তা গণসংগ্রামের খাতিরেই নয়—সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও।"

যদিও দৃষ্টিভঙ্গিতে বুর্জোয়া প্রভাবের আদর্শগত অস্বচ্ছতার ফলে চিনুবাবু

এখানে গণ-সংগ্রামের খাতির ও সাহিত্যের খাতির পৃথক করে ফেলেছেন, মার্কসবাদীর কাছে গণ-সংগ্রাম ছাড়া প্রগতি সাহিত্য কোনো কিছুকে খাতির করবে না এটাই সত্য, তবু মূল কথাটা তিনি ঠিকই বলেছেন। গণ-সংগ্রামে যোগ দিতে হলে সাহিত্যিককে গণ-সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেই হবে—সকল ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে সংগঠক হিসাবে সম্ভব না হলেও। কিন্তু এত অল্পে চিন্ময়বাবু সন্তুষ্ট নন। প্রগতিবাদী সাহিত্যিক গণ-সংগঠনে যুক্ত থেকে মজুরচাষীর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে গণ-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করবেন এবং সাহিত্যিকের ভূমিকাও বজায় রাখবেন, এ বিধান তাঁর কাছে যথেষ্ট বিপ্লবী ঠেকছে না। তিনি চান বুদ্ধিজীবী শিল্পী-সাহিত্যিক এমনভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন যাতে দু'চার বছর তুলি-কলম তাকে তুলে রাখতে হয়। দু'চার বছর তুলি-কলম চালাতে অপারগ হওয়াটাই তাঁর কাছে সংগ্রামে যথোচিত অংশ গ্রহণের মাপকাঠি। তুলি-কলম চালিয়ে সংগ্রামকে এগিয়ে নেবারও সামর্থ্য বা সময় যদি শিল্পী-সাহিত্যিকের রইল, 'দুস্তর ব্যবধান' ঘুচিয়ে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হবার সাধনায় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শিল্পী-সাহিত্যিক সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছেন, বলা যাবে কি করে!

"তা ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার অবিশ্রান্ত কাজকর্মের ফলে যদি দু'চার বছর লেখা বন্ধও থাকে, তাতেই বা কি এসে যায়। ইতিমধ্যে সেই কাজের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই—আগামী দিনের সোনালী ফসলের যা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। তাই বৈশাখের রুদ্রদাহ দেখে বিহ্বল না হয়ে ভরসা রাখতে হবে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে।"

—সাহিত্য ও গণ-সংগ্রাম, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৫৬, পৃঃ ৭১১।

দু'চার বছর লেখা বন্ধ থাকলে কি আসে যায়—চিন্ময়বাবু অনায়াসেই খেয়াল করতে পারতেন তাঁর দৃষ্টি যদি বস্তুনিষ্ঠ হতো, এদেশে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম কোন স্তরে আছে এবং সেই স্তরে শ্রেণী-সম্পর্কের বাস্তবতা কি যদি মনে রাখতেন, বৈশাখ আসার আগেই বৈশাখের রুদ্রদাহ অর্থাৎ সংগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নূতন পর্যায় কল্পনা করে বিহ্বল না হতেন। তিনি তাকিয়ে আছেন চীনের দিকে, এদেশের বাস্তবতার দিকে তাঁর নজরই নেই, তাই, চীনের বিশেষ অবস্থায় যা সম্ভব, প্রয়োজনীয় এবং ফলপ্রদ, নির্বিচারে এখানেও তিনি সেই ব্যবস্থা চালাতে চান, সেটা সম্ভব কিনা, সংগ্রামের পক্ষে মারাত্মক কিনা ভাবেন না।

"চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। চীনও আমাদেরই মত অক্ষরজ্ঞানহীন—দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতাও এক পর্যায়ের। সেখানে নবজীবনের উন্মেষে শিল্পী-সাহিত্যিকের ভূমিকা সম্পর্কে **রাষ্ট্রনায়ক** মাও সে-তুঙ অত্যন্ত আস্থাশীল। তিনি বলেছেন আমাদের ফ্রণ্ট দুটোই—**সামরিক** ও সাংস্কৃতিক এবং দুটো পরস্পর মুখাপেক্ষী। কিন্তু ঠিক ফ্রণ্টের মত করেই শিল্পীকে সাহিত্যিককে দায়িত্ব অর্জন করতে হবে—লক্ষ্য স্থির রেখে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হবে। **শুনেছি** সেখানে সংস্কৃতি-কর্মীদের দু'তিন বছরের জন্য কিসানের আত্মীয়তা অর্জন করতে যেতে হয়। তার ফলে প্রথমটা সত্যই থেমে গিয়েছিল কলম আর তুলি, কিন্তু অত্যন্ত সাময়িকভাবে। তারপর এসেছে নতুন সৃষ্টির জোয়ার।" [বড় হরফ আমার—লেখক] ঐ, পৃঃ ৭১১।

এ থেকে অত্যন্ত মূল্যবান আসল শিক্ষা আমরা যা পেতে পারি এবং সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজে লাগাতে পারি, যেমন, সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টের গুরুত্ব, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পরস্পর মুখাপেক্ষী করা, শিল্পী-সাহিত্যিকের কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব অর্জন ও লক্ষ্য স্থির রেখে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা ইত্যাদি, এসব বড় না হয়ে একমাত্র শিক্ষা আবিষ্কৃত হল তুলি ও কলম সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার প্রয়োজন! মাও সে-তুঙ-এর 'রাষ্ট্রনায়ক' এবং একটি ফ্রণ্টের 'সামরিক' এই দুটি বিশেষণ চীন ও এদেশের মধ্যে অবস্থার যে পার্থক্য নির্দেশ করে—চীনে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্র ও সামরিক ফ্রণ্ট আছে, এদেশে নেই—এই সহজ কথাটা খেয়াল করতে ও তার তাৎপর্য বুঝতে চিন্মবাবু রাজী নন। দুটি দেশের মধ্যে অক্ষরজ্ঞানহীনতা ও দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতার মিল দেখেই তিনি দুটি দেশের বাস্তবতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

চীনের বাস্তবতা কি? যে বিরাট অঞ্চলে শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য সেখানে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রতিনিয়ত বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও গোপন বিরাট অভিযান শেষ হয়ে গিয়েছে, নূতন সংস্কৃতিকে গায়ের জোরে দমন করার কেউ নেই। সাংস্কৃতিক লড়ায়ের প্রয়োজন অবশ্য এ অবস্থাতে শেষ হয়ে যায় না, বিশেষত জয়লাভের শেষ পর্যায়ে এসে পড়লেও বিপর্যস্ত জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ যখন পুরাদমে চলেছে—কিন্তু লড়ায়ের রূপ বদলে যায়। সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে যে নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ তাকে সমৃদ্ধ করা, গলদ দূর করা, বুর্জোয়া কুসংস্কারের যেসব জেরগুলি নানাভাবে নানাকৌশলে ছদ্মবেশে

টিকে থাকতে চায় সেগুলি উচ্ছেদ করা। অর্থাৎ, মূল প্রশ্ন শত্রুকে শেষ আঘাত হানা এবং অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের সংগ্রাম।

এ অবস্থায় কলম আর তুলি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকা, আর এদেশে যে-অবস্থা তাতে কলম আর তুলি বন্ধ থাকার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। অজস্র প্রচারযন্ত্র ও অসংখ্য দালালের মারফতে যেখানে অহরহ বুর্জোয়া সংস্কৃতির আফিমের ধোঁয়া ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা চলেছে জনসাধারণের মগজে, বুর্জোয়াকে বিচ্ছিন্ন করা যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের প্রধান কায়দা, সেখানে সেই অবস্থায় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ ও প্রতিআক্রমণকে কলম ও তুলির সাহায্যে জোরালো করার বদলে কলম ও তুলি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে বলা বামপন্থী বিপ্লববাদেরই নমুনা, সংগ্রামকে বানচাল করতে উপদেশ দেওয়া।

'অবশ্য' রূপ পেছনের দরজা দিয়ে কম্যুনিস্টদের ভেরস্লাভ শহরের শান্তি-সম্মেলনে ঢোকানোর জন্য প্রকাশ রায় চিন্মোহনবাবুকে খোঁচা দিয়েছেন, এর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন সংস্কারবাদের আরেক রূপ—'আত্মশক্তিতে অনাস্থা'। 'শুনেছি' রূপ অনির্দিষ্ট অপ্রতিষ্ঠিত জনরবের ভিত্তিতে চিন্মোহনবাবুই যে কম্যুনিস্টদের সাংস্কৃতিক লড়ায়ের একমাত্র অবশিষ্ট হাতিয়ার কলম ও তুলিকে বাতিল করে আত্মশক্তিতে 'অতি-আস্থা' ঘোষণা করেছেন এটা তিনি দেখতে পান নি। দেখলে তিনি অবশ্যই ধরতে পারতেন, আত্মশক্তিতে এই অনাস্থা এবং অতি-আস্থা কিভাবে পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, পরস্পরকে টিকে থাকতে সাহায্য করছে।

এই আলোচনা থেকে একটা গুরুতর প্রশ্ন বেরিয়ে আসে—কর্মীদের মজুর-চাষীর সাথে কাঁধ মেলাবার প্রশ্ন। এ যেন একটা ফরমুলা দাঁড়িয়ে গেছে, যন্ত্রের মতো আমরা কথাটা আউড়ে চলেছি। তাই সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে মজুর-সংগঠনে লেগে যাবার কথা বলতে আমাদের বাধে না—এতে যে মজুর-সংগঠন গড়ে ওঠার বদলে দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য এটা আমরা তলিয়ে দেখি না। সমাজতন্ত্রের জন্য সকল ক্ষেত্রে সব শ্রেণীর মধ্যে কাজ করা, এই ভিত্তিতেই সংগ্রাম শক্তিশালী হয়, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেণী-সম্পর্কের ভিত্তিতে ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কোনো অর্থ আছে কি? এ বিষয়ে লেনিনের অভিমত পরিষ্কার—"তখনকার দিনে (লেনিন এখানে মোটামুটি ১৮৯৪ থেকে ১৯০১ সালের কথা বলছেন—লেখক) যথার্থই আমাদের লোকবল

আশ্চর্যরকম কম ছিল এবং কেবলমাত্র শ্রমিকদের মধ্যে যাওয়া হবে স্থির করা ও এই নীতি থেকে বিচ্যুতিকে কঠোরভাবে নিন্দা করা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক ও সঙ্গত ছিল। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আমাদের স্থান সুদৃঢ় করাই ছিল তখন আমাদের সমগ্র কর্তব্য। কিন্তু বর্তমানে বিরাট শক্তিসমূহ আন্দোলনে আকর্ষিত হয়েছে ; শিক্ষিত শ্রেণীগুলির যুবসমাজের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে ; দেশের সর্বত্র বহু লোক আছেন যাঁরা বাধ্য হয়ে প্রদেশগুলিতে বাস করেন, যাঁরা অতীতে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং এখন যোগ দিতে ইচ্ছুক, এরা সোশ্যাল-ডেমোক্রেসির দিকে এগিয়ে আসছেন (১৮৯৪ সালে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের আঙুলে গোনা যেত)। আমাদের আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ত্রুটি হল এই শক্তিসমূহকে কাজে লাগাতে, এদের যথাযোগ্য কাজ দিতে আমরা অক্ষম (পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করব)। এই শক্তিসমূহের অধিকাংশেরই 'শ্রমিকদের মধ্যে যাওয়ার' সুযোগ একেবারে নেই, সুতরাং আমাদের প্রধান লক্ষ্য থেকে শক্তিসমূহ সরিয়ে নেওয়া হবে এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন।"—লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৯।

দেশে শত শত লেখক আছেন, বুদ্ধিজীবী আছেন, যাঁরা আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসুক, কিন্তু শ্রমিকের সঙ্গে কাঁধ মেলাবার, শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হবার সুযোগ যাঁদের নেই। এরা কি তবে প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করা থেকে বঞ্চিত থাকবেন, প্রগতিশীল সংস্কৃতিবিদ হওয়ার আশা ত্যাগ করবেন ? অর্থাৎ, শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে যোগ দেবার সাধ নিয়েও নিরুপায় হয়ে অগত্যাই বুর্জোয়া-শিবিরে থেকে যাবেন ? এ প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে প্রগতি সাহিত্যের সমস্যার মীমাংসা হয় না—যে মীমাংসা হয় তা একপেশে, তা মার্কসবাদ-সম্মত নয়, তা আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার বদলে পিছিয়ে দেয়।

কারণ, এ প্রশ্নের সঠিক মীমাংসার উপরেই নির্ভর করে সংস্কৃতি-আন্দোলনকে গণভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। চিন্মোহনবাবু 'সাহিত্য ও গণ-সংগ্রাম'-এ বলেছেন, এদেশের শ্রমিকশ্রেণী থেকে গোর্কির মতো লেখক উঠে আসা কঠিন। প্রকাশ রায়ও বলছেন : "ধনিকের পোষণ-শাসনে শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে বঞ্চিত" (৪নং মার্কসবাদী, পৃঃ ১১২)। এ অতি বাস্তব ও নিষ্ঠুর সত্য। কাজেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী লেখকদের দিয়ে প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করানো ছাড়া আমাদের উপায় নেই।

এদিকে শ্রমিকদের মধ্যে না গিয়েও প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়? বর্তমান অবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে যেতে অক্ষম শত শত লেখক তা হলে বাদ পড়ে যাচ্ছেন—আমাদের শক্তি বাড়ছে না।

জোশীবাদ এ-সমস্যার মীমাংসা করেছিল! মীমাংসা করেছিল শ্রমিক-শ্রেণীকে লেজুড়ে পরিণত করে, শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনকে পাতিবুর্জোয়া দৃষ্টিতে দেখে 'প্রগতি সাহিত্য' সৃষ্টির অবাধ অধিকার দিয়ে! আমাদের সে সময়কার সেরা সৃষ্টি বলে পরিগণিত 'নবান্ন' সম্পর্কে প্রকাশ রায় ঠিকই সমালোচনা করেছেন।

তবে কি জোশীবাদ ছাড়া এ-সমস্যার মীমাংসা নেই? শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হতে অক্ষম অথচ প্রগতিবাদী হতে ইচ্ছুক বিরাট এক লেখকগোষ্ঠীকে বাদ দিয়েই আমাদের প্রগতি সাহিত্যের অভিযান চালাতে হবে? নিশ্চয় নয়। আমরা সংস্কারবাদটাই দেখছি, সংস্কারবাদ উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হয়েছি এবং এই দৃষ্টি থেকে মীমাংসা খুঁজছি বলে সঠিক মীমাংসা পাচ্ছিনা, প্রকারান্তরে জোশীবাদেই জড়িয়ে পড়ছি।

কেবল শ্রমিকশ্রেণীই ষোল আনা বিপ্লবী, বিপ্লব ছাড়া এই শ্রেণীর এমন কোনো স্বার্থ ই নেই যা তার বিপ্লবী চেতনাকে স্তিমিত করে দিতে পারে। এ যুগে শ্রমিকশ্রেণীই সবচেয়ে প্রগতিশীল, এই শ্রেণীর বস্তুবাদী জীবনদর্শন ও বীরত্বপূর্ণ একনিষ্ঠ সংগ্রামের সর্বাঙ্গীণতা অবলম্বন করেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হওয়া সম্ভব: শ্রেণীসংগ্রামের চরম পর্যায়ে প্রগতি সাহিত্য মূলত সমাজবাদী চেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের সাহিত্য।

এই অত্যন্ত সত্য কথাটাকে একটু মোচড় দিয়ে, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বামপন্থী বিপ্লববাদ প্রগতি সাহিত্যের অভিযানকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে—শুধু বুর্জোয়া শিল্পরীতি, বুর্জোয়া আঙ্গিক নয়। সংস্কারবাদ বুর্জোয়াশ্রেণীর কাছে আত্মবিক্রয়ের অভ্যস্ত প্রেরণার জের, কোণঠাসা হয়ে ছদ্মবেশে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আমাদের আনুগত্যের সুযোগ নিয়ে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চায়।

সে মোচড়টা কি? শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুবাদী জীবনদর্শনের পরিবর্তে সমাজবাদী চেতনা ও সকল শ্রেণীর শ্রেণী-সম্পর্কগত বাস্তবতার পরিবর্তে, শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা ও শ্রমিকজীবনের বাস্তবতাকে প্রগতি সাহিত্যের উপজীব্য বলে দাবী তুলে!

শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামের যান্ত্রিক জয়গানের আড়ালে এই বিভ্রান্তি চাপা পড়ে আছে। শ্রেণী ও সংগ্রাম সম্পর্কিত কয়েকটি সত্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে ফাঁকিটা যে এই সত্যের আবরণ ভেদ করে নজরে পড়া কঠিন। বিশেষত বুর্জোয়া ভাববিলাসিতা ও সংগ্রাম-বিমুখতা যখন প্রকট তখন শ্রমিকশ্রেণী ও সংগ্রামকে অত্যন্ত ন্যায্য ও সঠিকভাবে তুলে ধরা'র সাথে বিভ্রান্তিটা মিশে যাওয়ায় নজরে পড়া আরও কঠিন।

'সাহিত্য ও গণ-সংগ্রাম' প্রবন্ধে আছে: "সাহিত্যিক বা শিল্পীর মন সংঘবদ্ধ মজুর-কিষাণের সংস্পর্শে এসে অলক্ষ্যে বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ হবে– যে চেতনা হল নতুন সাহিত্যের বনিয়াদ। অন্যদিকে শিল্পী-সাহিত্যিক মজুর-কিষাণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের মধ্যেও অলক্ষ্যে সংক্রামিত করবেন সেই তীব্র প্রচণ্ড অনুভূতি যা হল শিল্পী-সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য।"

পূর্বে এই প্রবন্ধ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতেও বলা হয়েছে যে ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণসভার অবিশ্রান্ত কাজের, 'মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই,' যা ভবিষ্যতে সাহিত্যের সোনালী ফসল ফলাবে।

এই দুই উদ্ধৃতির মাঝখানে চিন্মোহনবাবু লিখছেন: "তবে কি শিল্পী-সাহিত্যিক শুধু মজুর-কিষাণের বর্তমান সচেতনতা নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকবেন? নিশ্চয়ই নয়। তিনি বুদ্ধিজীবী হিসাবে সেখানে আনবেন সোশ্যালিস্ট চৈতন্য, আর তারই ভিত্তিতে তাদের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করবেন। কিন্তু সোশ্যালিস্ট চেতনা মজুর-কিষাণেরা সহজভাবেই গ্রহণ করবে শুধু তার আপনজনেরই কাছ থেকে, গুরুমশায়ের কাছ থেকে নয়।"

অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আসল কথাটা চিন্মোহনবাবুর অজানা নয়, শ্রেণীসংগ্রাম ও সমাজবাদী চেতনা যে একসঙ্গে বা একটি অপরটির থেকে উদ্ভূত হয় নি, পাশাপাশি উঠেছে, শ্রমিকশ্রেণীর স্বাভাবিক চেতনাই যে আসল কথা নয়, আসল কথা তার সমাজবাদী চেতনা এবং এ চেতনা কেবল বাইরে থেকেই তিনি পেতে পারেন—কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানটা প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি আসল কথাটা গুলিয়ে ফেলছেন। 'গোর্কীর মত নিপীড়িত শ্রেণী থেকে সাহিত্যিকের আবির্ভাব এখানে অনেক বেশী কঠিন' এবং 'লেখক ও শিল্পীরা হলেন মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে উদ্ভূত'—এই বাস্তব সমস্যার সঙ্গে মেলাবার

বদলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অতিক্রম করেই বুদ্ধিজীবীর আত্মশোধনের উপায়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন প্রগতি সাহিত্যের বনিয়াদ—মজুর-কিষাণের সংস্পর্শে আসার ফলে "অলক্ষ্যে" সঞ্চারিত বিপ্লবী চেতনা! সমাজবাদী চেতনা নয়, শ্রেণীসংগ্রাম ও শ্রেণী-সম্পর্কের বাস্তবতা নয়।

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে-সংগ্রাম তার শরিক হতে হলে বুদ্ধিজীবীকে শ্রমিক-শ্রেণীর আপন হতেই হবে—বুদ্ধিজীবী যতখানি আত্মীয় হবেন শ্রমিকশ্রেণীর, ঠিক ততখানিই শত্রু হতে পারবেন বুর্জোয়াদের। কিন্তু তাই বলে প্রগতি সাহিত্যের ভিত্তিও কি স্থির হবে বুদ্ধিজীবীর মুখ চেয়ে, তার খাঁটি বিপ্লবী হবার প্রয়োজনের নিরিখে? *প্রগতি সাহিত্যের নিরিখ একটাই, বুদ্ধিজীবী হোন শ্রমিক হোন কিষাণ হোন—সকলের জন্য প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টির বনিয়াদ একটাই। শ্রমিকশ্রেণী থেকে যে সাহিত্যিক উঠবেন তিনিও নিছক তার জীবন ও সংগ্রামের* রিপোর্ট রচনা করবেন না, সমস্ত শ্রেণীর (বুর্জোয়াশ্রেণীর পর্যন্ত) জীবন আর সমগ্র শ্রেণীসংগ্রামই তাঁর সাহিত্যেরও ভিত্তি হবে, কারণ সমাজবাদী চেতনার ভিত্তিও এটাই।

এ বিষয়ে লেনিনের নির্দেশ স্পষ্ট। প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি তো আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র, সমাজবাদী আদর্শ সৃষ্টির কাজেও শ্রমিক কিভাবে আসবেন? লেনিন স্পষ্টই বলেছেন যে, শ্রমিক জনগণের আন্দোলনের ভিতর থেকে স্বতন্ত্র কোনো আদর্শ গড়ে উঠবার প্রশ্নই উঠতে পারে না, সুতরাং হয় বুর্জোয়া নয় সমাজ-বাদী আদর্শ ছাড়া গত্যন্তর নেই: এবং এই প্রসঙ্গে ফুটনোটে লেনিন বলেছেন —"তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে এরূপ আদর্শ সৃষ্টির কাজে শ্রমিকদের কোনো অংশ থাকবে না। কিন্তু তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন শ্রমিক হিসাবে নয়, প্রুধঁ ও ওয়েটলিং-এর মত সমাজবাদী আদর্শকার হিসাবে; অন্য কথায়, বেশী বা কম ঠিক ততখানি অংশই তাঁরা গ্রহণ করবেন তাঁদের যুগের জ্ঞান যতখানি তাঁরা আয়ত্ত করতে ও সেই জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। এবং শ্রমিকেরা যাতে **আরও বেশী করে এটা করতে পারেন** সেজন্য সাধারণভাবে শ্রমিকদের চেতনার স্তর উন্নত করতে চেষ্টা অতি অবশ্য করতে হবে; বিশেষভাবে দেখতে হবে শ্রমিকেরা যেন **'শ্রমিকদের জন্য সাহিত্যের'** কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত সীমানার মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রাখেন, বরং আরও বেশী করে **সাধারণ সাহিত্য** পাঠ করেন। 'নিজেদের আবদ্ধ না রাখেন' বলার বদলে 'আবদ্ধ না

রাখা হয়' বললেই অধিকতর সত্য বলা হয়, কারণ শ্রমিকেরা নিজেরাই বুদ্ধিজীবীদের জন্য যাহা কিছু লেখা হয় সেসব পড়তে চান এবং পড়েনও এবং মাত্র কয়েকজন (খারাপ) বুদ্ধিজীবীই বিশ্বাস করেন যে কারখানার অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা হলে এবং অনেক কাল ধরে যা জানা আছে বার বার তার পুনরাবৃত্তি করা হলে 'শ্রমিকদের পক্ষে' তাই যথেষ্ট।"—নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭।

এদেশের শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষাদীক্ষায় বেশী পিছিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু আসল কথা সেটা নয়। সংস্কারবাদী যান্ত্রিকতাই শ্রমিকশ্রেণীকে প্রগতি সাহিত্য গ্রহণ করার স্তরে উন্নত করার বদলে প্রগতি সাহিত্যকে শ্রমিকশ্রেণীর স্তরে নামাবার কথা বলে, এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে দেয় বুদ্ধিজীবীর শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হবার প্রশ্ন। এও শ্রমিকশ্রেণীর দিকে কৃপা ও দরদের দৃষ্টিতে তাকাবার একটা ধরন—বেচারা মজুর মূর্খ, অজ্ঞ, তাই মজুরমার্কা সাহিত্যের ব্যবস্থা। প্রগতি সাহিত্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে এগিয়ে নেবারই সাহিত্য এবং এই জন্যই এ-সাহিত্য মজুরের জীবনপন্থী বা সংগ্রামপন্থী নয়—বুর্জোয়া সাহিত্য যেমন বুর্জোয়াদের জীবনপন্থী নয়।

তার মানে এই নয় যে মজুর-কিষাণের জীবন ও সংগ্রাম প্রগতি সাহিত্যে স্থান পাবে না, মানেটা বরং ঠিক বিপরীত। জীবনের রঙ্গমঞ্চে মজুররাই আজ মানবতার ভাগ্যনিয়ন্তা, কিষাণরা সহকারী—এদের বাদ দিয়ে প্রগতি সাহিত্য হয় না বলেই জোর দিয়ে বলা যে রঙ্গমঞ্চটা বাদ দিয়ে বা সঙ্কীর্ণ করে, এদের ভূমিকাচ্যুত করে প্রগতি সাহিত্যে আনতে গেলে এরাই বাদ পড়ে যান।

বুর্জোয়াদের দালাল সাহিত্যিকরা এদের বাদ দিয়েই এদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করে,—অর্থাৎ মিথ্যা মনগড়া মজুর-কিষাণ আনে, শ্রেণী-সম্পর্কের সমগ্র বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মজুর-কিষাণ জীবনের বাস্তবতাকে পরিণত করে হীনতা, দীনতা, অসহায়তার পশু-জীবনের বাস্তবতায়।

প্রগতিবাদী সাহিত্যিকও শ্রেণী-সম্পর্কের রঙ্গমঞ্চ থেকে 'বিপ্লবী' মজুর-কিষাণকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার অসাধ্য সাধনায় আড়ষ্ট হয়ে থাকেন।

৩নং 'মার্কসবাদী'র আত্মসমালোচনায় যে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি নির্মমভাবে সংস্কারবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে, সে দৃষ্টি এদিকে পড়েনি বলেই অনুরূপ ভুল থেকে গেছে।

"ধনিকের শোষণ-শাসনে শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার থেকে বঞ্চিত—তার অন্তরের আবেগ তাই পুরোপুরি সাহিত্যভাত হতে পারে না। যেটুকুও বা হয় তার উপরেও নেমে আসে শাসকের দণ্ড।"—৪নং মার্কসবাদী, পৃঃ ১১২।

"অন্যদিকে যেসব সংস্কৃতিবিদ শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে এসেছেন তাঁরাও পুরোপুরি শ্রেণীবিচ্যুত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন নি, তাই তাঁরাও সে আবেগকে ভাষা দিতে পারছেন না।"

শ্রমিকশ্রেণীর অন্তরের আবেগ বলতে কি বুঝাতে চান প্রকাশ রায় উল্লেখ করেছেন—সাহিত্যভাত যেটুকুর উপর শাসকের দণ্ড নেমেছে। এইসব নমুনা বিচার করে প্রগতি সাহিত্য কিসের রূপায়ণ হবে মোটামুটি আঁচ করা যেতে পারে। 'পরিচয়' ও 'লোকনাট্যে'র তুলনামূলক আলোচনাও এবিষয়ে সাহায্য করবে। কিন্তু কার্যত আমরা জানি, এভাবে মূলনীতি সম্পর্কিত বিভ্রান্তি দূর হয় না। মূল্যবান দৃষ্টান্ত কাজে লাগে না। শ্রমিকশ্রেণীর 'অন্তরের আবেগ'কে সাহিত্যভাত করতে বলা এবং 'শ্রেণীবিচ্যুত' হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হওয়াকে তার শর্ত বলে ঘোষণা করায় বিভ্রান্তি প্রশ্রয় পাবে মনে করি।

শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে পা দিয়েও মাথা বুর্জোয়া শিবিরে থেকে যাওয়া অবাঞ্ছনীয় ও অমার্জনীয় নিশ্চয়। কিন্তু পুরোপুরি শ্রেণীবিচ্যুত না হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় না বা প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না, এ সিদ্ধান্ত মারাত্মক এবং শ্রমিকশ্রেণীর আবেগ বা অনুভূতি সাহিত্যভাত করলে প্রগতিসাহিত্য হয় এই যান্ত্রিক ধারণা থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হয়। বুর্জোয়াদের বহুমুখী ব্যাপক সাংস্কৃতিক আক্রমণ চলতে থাক, শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণকে সমানে বিভ্রান্ত করে চলুক, শ্রমিক-শিবিরের সংস্কৃতিবিদরা দু'চার বছর কলম-তুলি বন্ধ রেখে কেবল মজুর-কিষাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করুন—এর পিছনেও আছে কিষাণ-মজুরের আবেগ বা অনুভূতি ভালোভাবে আত্মসাৎ করে ভবিষ্যতে একদিন 'উচ্চস্তরের' প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করার যুক্তি।

আবেগ বা অনুভূতিরও শ্রেণীরূপ আছে। কিন্তু সাহিত্য কোনো শ্রেণীগত আবেগ বা অনুভূতিরই রূপায়ণ নয়। সাহিত্য শ্রেণীস্বার্থের হাতিয়ার: বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ সম্পর্কের ভিত্তিতে যেরূপ সমাজব্যবস্থা এই বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের

অনুকূল সেই সমাজব্যবস্থাকে স্থাপন করা বা স্থায়ী করার কাজে লাগাই সাহিত্যের মূল কথা বলে সাহিত্য কখনোই একটি শ্রেণীর বিশুদ্ধ আবেগ বা অনুভূতিকে রূপ দেয় না, সমস্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আবেগ বা অনুভূতি এবং চেতনাকে (অনুভূতি ও চেতনা পৃথক কিন্তু পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়) প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটা সামগ্রিক জীবনদর্শনকেই রূপায়িত করে।

বুর্জোয়াদের দালাল সাহিত্যিকেরা শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ বিচ্ছিন্ন করে রূপ দেয়। তার কি চেহারা হয় আমরা ভালোভাবেই জানি। বুর্জোয়া শিল্পীরীতি কলাকৌশল বহুকাল ধরে শাণিত হয়েছে, তার কায়দা অনেক। বুর্জোয়া সাহিত্যিক যে মজুরকে রূপ দেয় তা কি মিথ্যা শুধু এইজন্য যে সত্যিকারের মজুরের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই? "সহরতলীতে" যে শ্রমিক ও মালিকের আবেগ—তা দুই-ই জানা-চেনা মাটির পৃথিবীর বাস্তব শ্রমিক ও মালিক থেকে নেওয়া, তবু তা মিথ্যা কেন, প্রতারণা কেন? ধনীর জয়গান নেই, তাকে আঁকা হয়েছে ভণ্ড, প্রতারক, মুনাফালোভী করেই, তবু সমগ্রভাবে বিচার করলে বইখানা শ্রমিক-স্বার্থের বিরোধী, শ্রমিকশ্রেণীর আবেগের মিথ্যা রূপায়ণ: কারণ, শ্রেণীসম্পর্কগত বুর্জোয়া সচেতনতা মজুর ও তার আবেগকে শ্রেণী-সম্পর্কের বাস্তবতা থেকে পৃথক করে ফেলেছে। নতুবা, এই বই বুর্জোয়াকে আঘাত করার, তার ভণ্ডামির মুখোশ তুলে ধরার, কিরূপ অপকৌশলে সে ধর্মঘট ভেঙ্গে দেয় তা দেখাবার, মজুরকে মহৎ করে আঁকার ইচ্ছা নিয়েই লেখা হয়।

আসল কথাটা জীবনদর্শন: বুর্জোয়া জীবনদর্শন সাহিত্যকে বুর্জোয়া-স্বার্থের অনুকূল করে, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শনই সাহিত্যকে শ্রমিক-স্বার্থের অনুকূল করতে পারে।

শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শন ও সকল শ্রেণীর শ্রেণী-সম্পর্কগত বাস্তবতা প্রগতি সাহিত্যের ভিত্তি হলে বুদ্ধিজীবীর শ্রেণীবিচ্যুত হবার মতো অসম্ভব ও অবাস্তব শর্ত প্রয়োজন হয় না।

লেনিন বলেন: "শ্রমিকদের শ্রেণী-রাজনৈতিক চেতনা এনে দেওয়া চলে কেবল বাইরে থেকে, শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্কের সীমানার বাইরে থেকে। একমাত্র যে ক্ষেত্র থেকে এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভব তা হল সমস্ত শ্রেণী ও স্তর এবং রাষ্ট্র ও সরকারের সম্পর্কের ক্ষেত্র, সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর যোগ সম্পর্কের ক্ষেত্র।"—নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৪।

সমাজবাদ ও শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে লেনিন বলেন : "কিন্তু সমাজবাদ এবং শ্রেণীসংগ্রাম উদ্ভূত হয় পাশাপাশি, একটি থেকে অপরটি নয়। প্রত্যেকটি উদ্ভূত হয় বিভিন্ন অবস্থায়। আধুনিক সমাজবাদী চেতনা কেবল গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে।" —ঐ, পৃঃ ১৭৬।

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজবাদী চেতনা নিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন, শ্রেণীবিচ্যুত হবার প্রশ্ন ওঠে না। রাজনৈতিক প্রস্তাবেও মধ্যবিত্ত সম্পর্কে শ্রেণীবিচ্যুতির নির্দেশ নেই, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার শর্ত নির্দিষ্ট আছে। বুদ্ধিজীবী যদি শ্রেণীচ্যুত না হয়েও রাজনৈতিক সংগ্রামে নামতে পারেন, সাংস্কৃতিক সংগ্রামে নামতে পারেন না কেন ?

সংস্কৃতি-ফ্রন্টে শ্রমিকশ্রেণীরই নেতৃত্ব নিঃসন্দেহ, শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অগ্রণী অংশ; কিন্তু এ ফ্রন্টের সৈনিক প্রধানত বুদ্ধিজীবী এবং শ্রেণীচ্যুত না হয়ে প্রধানত তাঁরাই গড়ে তুলবেন নতুন সংস্কৃতি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে, সংগ্রামের প্রয়োজনে। শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনে পাতিবুর্জোয়া সংখ্যাধিক্য ঘটলে কি বিপদ হয় আমরা জানি, কিন্তু সে ভয়ে এ ক্ষেত্রে বাস্তবতা অস্বীকার করার বিপদ ডেকে আনবার কারণ নেই, প্রয়োজনও নেই। বুদ্ধিজীবীর দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক থাকলে, কঠোর হস্তে প্রকাশ্য ও ছদ্মবেশী সংস্কারবাদ উচ্ছেদ করলে, শ্রমিকশ্রেণী প্রধানত বুদ্ধিজীবী সৈনিকদের দ্বারাই বুর্জোয়া সংস্কৃতির আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ ও নতুন সংস্কৃতি গড়ার কাজ চালাবেন এবং নিজেদেরও শিক্ষিত করবেন।

বুদ্ধিজীবী সম্পর্কে সাধারণভাবে যান্ত্রিক অশ্রদ্ধা জোশীবাদের প্রতিক্রিয়া। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কোনো প্রতিক্রিয়াকেই প্রশ্রয় দেয় না। লেনিন লেখকদের ধিক্কার দিয়েছিলেন, কিন্তু সে শুধু পার্টির বাইরে দাম্ভিক 'মহাপুরুষ' লেখকদের। শ্রমিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীর সম্পর্ক কিরকম হবে সে বিষয়ে লেনিনের নির্দেশ পরিষ্কার। এ-সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্বের ভিত্তিতে শিক্ষা ও জ্ঞানের আদান-প্রদানের সম্পর্ক।

লেনিন বলেন, "এই ক্ষেত্রে সর্বহারা, যাঁরা 'কারখানার' স্কুলের মধ্য দিয়ে এসেছেন, এনার্কিস্ট ব্যক্তিত্ববাদকে একটি শিক্ষা দিতে পারেন এবং তা দেওয়াই উচিত। শ্রেণী-সচেতন শ্রমিক বহুদিন আগেই সেই শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেছেন যখন তিনি বুদ্ধিজীবী বলেই তাকে পরিহার করে চলতেন। শ্রেণী-

সচেতন শ্রমিক সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে সমৃদ্ধতর জ্ঞান-ভাণ্ডার ও বিস্তৃততর রাজনৈতিক দিগন্তসীমার সন্ধান পান তা মূল্যবান গণ্য করেন।"—ঐ, পৃঃ ১৩৩।

এই প্রসঙ্গে লেনিন বুদ্ধিজীবীর মনোবৃত্তি—সর্বহারার সংগ্রামের সৈনিকের মনোবৃত্তি অথবা বুর্জোয়া মনোবৃত্তি, এবিষয়ে শ্রমিককে বিচারশীল হতে উপদেশ দিয়েছেন। সেটাই আসল কথা, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীবিচ্যুত কিনা সে-বিচার নয়।

নতুবা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর সাথে লড়াইয়ে নেমেছেন এবং নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক তাঁদের নিষেধ করে দেওয়া হয় যে সংস্কৃতিচর্চা তোমাদের কাজ নয়। এ শুধু শ্রমিকে পরিণত বুদ্ধিজীবীর কাজ।

ছাত্র-কেরাণী-শিক্ষক-অধ্যাপক প্রভৃতি যাঁরা তাঁদের 'ভবিষ্যৎ যে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনাতে' এটা বুঝে উঠতে পেরেছেন, নিজের নিজের ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামে নামছেন, কিন্তু যাঁদের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে যাওয়ার সুযোগ নেই, সংস্কৃতি সৃষ্টির চেষ্টা করার অধিকারও তাঁদের থাকছে না।

"মধ্যবিত্ত সমাজ ভেঙ্গে আজ মজুরের সঙ্গে সমতল হয়ে উঠবার উপক্রম করেছে, অতীতের স্বদেশভক্তির আদর্শ আর নূতন শ্রেণী-চেতনা তার অন্তরে ও বাহিরে ঘোরতর দ্বন্দ্ব উপস্থিত করেছে, তার ভবিষ্যৎ যে শ্রমিকের শ্রেণী-চেতনাতে তা বুঝি বুঝি করেও বুঝে উঠতে পারছে না, কংগ্রেসী আদর্শ বার বার তাকে পিছনে টানছে।"—বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা, ১নং মার্কসবাদী, পৃষ্ঠা ৯০।

সময়টা অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনের। একথা যেসময় লেখা হয় তারপর সংকট তীব্রতর হয়েছে। লড়াই ব্যাপকতর ও প্রচণ্ডতর রূপ নিয়েছে, বুঝি বুঝি করেও না বুঝে উঠতে পারার ভাব থেকে মধ্যবিত্ত অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রগতি-চর্চার জন্য বহু নূতন সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, পত্রিকা বার হচ্ছে, পুরনো অনেক প্রতিষ্ঠান ঝুঁকছে প্রগতির দিকে। শ্রমিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ না হলেও প্রাসাদবাসী বিমানচারী বুর্জোয়ার চেয়ে শ্রমিক এদের ঢের বেশী জানাচেনা মানুষ, শ্রমিকের শ্রেণী-চেতনাই এরা কম-বেশী গ্রহণ করেছেন, কংগ্রেসী আদর্শ বিষবৎ হয়ে গেছে। সমগ্র মধ্যবিত্ত সমাজের নয়, কিন্তু ঝোঁকটা এই দিকেই।

এদের প্রগতি সাহিত্য, শ্রমিকের জীবনদর্শনের রূপায়ণ কাঁচা হতে বাধ্য। কিন্তু সেজন্য যদি আমরা নাক সিঁটকাই, সাহিত্য-সৃষ্টির এ ব্যাপক প্রচেষ্টাকে বাতিল করি, সেটা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের খপ্পরে গিয়েই পড়া হবে, প্রগতি সাহিত্যের যে জোয়ার আসছে তাকে বানচাল করা হবে।

রণক্ষেত্র সর্বত্র প্রসারিত, তীব্র প্রচণ্ড সংগ্রাম, বুর্জোয়া-বিরোধী বিক্ষোভ যেখানে যেভাবে ফেটে পড়ছে সমস্তই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অঙ্গ : শ্রমিকের আদর্শে কাঁচা-পাকা-নরম সাধারণ-অসাধারণ এবং বিচিত্র ও বিভিন্নরূপে ছড়ানো আগুনের মতো সাহিত্য উঠে কংগ্রেসী আদর্শের ভিত্তি ছারখার করে দেবে—এই গণসাহিত্যই শ্রমিককেও উদ্বুদ্ধ করবে। শ্রমিকের আবেগ বিপ্লবী সাহিত্যের অবলম্বন, গোর্কিদের দিয়ে ছাড়া বিপ্লবী সাহিত্য হয় না ধরে নেওয়ার অর্থ গোর্কিদের উঠবার বাস্তব প্রক্রিয়াকেই বাতিল করে দেওয়া।

তাছাড়া গোর্কির রচনা পড়ে স্পষ্টই দেখতে পাই তা নিছক মজুর নিয়ে শ্রেণী-সংকীর্ণ রচনা নয়, মজুরের জন্য 'সহজিয়া' সৃষ্টি নয়, শ্রমিকের বিপ্লবী চেতনা গোর্কির সৃষ্টির প্রাণবস্তু, এটাই শ্রমিক-জীবনের বাস্তবতাকে এমন মর্ম দিয়েছে যা সকল মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করে।

বুদ্ধিজীবীদের জন্য রচিত সাধারণ সাহিত্যই শ্রমিকেরা বেশী বেশী করে পড়বেন, লেনিনের একথার তাৎপর্য ভুলে যাওয়ায় আমরা কার্যত প্রগতি সাহিত্যের বিকাশকে ব্যাহত করছি।

প্রথমত শ্রমিকশ্রেণীর নামে শ্রেণী-সংকীর্ণতার ভিত্তিতে কৃত্রিম প্রগতি সাহিত্য দাবী করে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের অগ্রণী সৈনিক সাহিত্যিকদের পাকা প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছি। মজুর-কিষাণের সঙ্গে একাত্ম হয়েও সাহিত্যের ভিত্তিটা কি হবে এবিষয়ে ভুল ধারণা আঁকড়ে থাকায় তাঁদের সাধনা সার্থক হচ্ছে না; আত্মশক্তিতে অনাস্থা জন্মাচ্ছে। এদের সৃষ্ট পাকা সাহিত্যের প্রভাবে ও অনুকরণে শত শত তরুণ উৎকর্ষের নানা স্তরের কমবেশী কাঁচাপাকা প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করতে লেগে গিয়ে বিপ্লবী সাহিত্যের দুর্বার জোয়ারটি সৃষ্টি করতে উদ্যত উৎসুক হয়ে আছেন, তাঁরাও পথ হাতড়াচ্ছেন।

সাহিত্যের জোয়ার এভাবেই সৃষ্টি হয়—কয়েকজন সেরা সাহিত্যিকের সৃষ্টি ছাড়া আর কিছুই লিখিত না হলে—শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির চেয়ে কম ভালো, মাঝারী, নীচু-স্তরের প্রভৃতি অজস্র সাহিত্য না জন্মালে—সাহিত্য সামাজিক শক্তি বলে গণ্যই

হতো না। বুর্জোয়া সাহিত্যের দিকপাল এবং প্রধান মুখপত্রই শুধু বিকৃত চিন্তা ছড়ায় না, নানা দরের বহুসংখ্যক লেখক ও পত্রিকাও এই বিকৃতি ঘরে ঘরে পরিবেশন করে, অপটু বাজে সৃষ্টিও বুর্জোয়া প্রচারে ফেলনা নয়।

আমরা 'বিশুদ্ধ প্রগতিসাহিত্য' 'উচ্চশ্রেণীর প্রগতি সাহিত্য' দাবী করি, অপটু সাহিত্য প্রচেষ্টা দেখে নাক সিঁটকাই, গণসংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতা নূতন সাহিত্য সৃষ্টির যে ব্যাপক উদ্দীপনা জাগিয়েছে বুদ্ধিজীবী সমাজে ব্যাপকভাবে যে অপটু প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির, তাকে উৎসাহিত ও পরিচালিত করার বদলে উদাসীন হয়ে আছি। অথচ এই বিচ্ছিন্ন ও স্বতঃস্ফূর্ত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে বুর্জোয়া আদর্শের খপ্পরে গিয়ে পড়ার বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্য, সুগঠিত ও শ্রমিকের আদর্শে সুদৃঢ় করার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ এবং সে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনেই পাকা প্রগতি সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। শুধু মজুর-কিষাণের সাথে সংস্কৃতি সৃষ্টির খণ্ডিত পরিকল্পনা সার্থকও হতে পারে এই সমন্বয়ের দ্বারাই।

এ কি জোশীবাদের সঙ্গে আপোসের পরামর্শ, অন্তত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে? মোটেই তা নয়। শ্রমিকশ্রেণীর দিকে পিছন ফিরে সংস্কৃতি-আন্দোলনে পাতি-বুর্জোয়া নেতৃত্বের কথা হলে সে ঝুঁকি থাকত, কিন্তু এক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে এরূপ ইঙ্গিতও নেই। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই রাজনৈতিক আন্দোলনের মতো সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে শ্রমিক-কৃষক মধ্যবিত্ত স্তরে প্রসারিত করা, মজুর-কিষাণের স্তরে খণ্ডিত করার ঝোঁকটা সংশোধন। সংস্কৃতির চাষে বিশেষ উপযোগিতার দরুন বুদ্ধিজীবী-সৈনিক ও সৈনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের দিয়েই প্রধানত ফসলটা ফলানোর ব্যবস্থা। লেনিনের মতে, এরূপ ফসলই শ্রমিকের উপযোগী ও প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, আঙ্গিক সহজ হবে, আঙ্গিকের বিশেষ মূল্য নেই এই ধারণাও প্রগতি সাহিত্যকে ব্যাহত করছে। আত্মসমালোচনায় ঠিকই বলা হয়েছে যে 'বুর্জোয়া শিল্পরীতি, বুর্জোয়া আঙ্গিক প্রগতি-চিন্তাকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে।' অধ্যাত্মবাদ, রহস্যবাদ, দুঃখবাদ ইত্যাদির জন্য যে আঙ্গিক, আঙ্গিক-সর্বস্বতার সাহায্যে এলেমেলো অর্থহীন চিন্তা নিয়ে উচ্চচিন্তার ভাঁওতা সৃষ্টির জন্য যে আঙ্গিক, বলিষ্ঠ সংগ্রামী বস্তুবাদের তা কোনো কাজেই লাগতে পারে না। এই আঙ্গিক-প্রীতি নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া ভাবধারার প্রতি আনুগত্য, সংস্কারবাদ।

কিন্তু সোজা সহজভাবে বিপ্লবী ভাবচিন্তাকে প্রকাশ করার আঙ্গিকই প্রগতি-সাহিত্যের আঙ্গিক হবে, একথা বলাও বুর্জোয়া-প্রতিক্রিয়া, ছদ্মবেশী সংস্কারবাদ। এই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে দু'ভাবে, বুর্জোয়া আঙ্গিক-সর্বস্বতার প্রতিক্রিয়ায় আঙ্গিককেই বাতিল করতে চাওয়ার ঝোঁক এবং অজ্ঞ অশিক্ষিত মজুর-কিষাণের সহজিয়া সাহিত্যই কেবল গ্রহণীয়—এই লেনিনবাদ-বিরোধী যান্ত্রিকতা থেকে।

৪নং 'মার্কসবাদী'র আত্মসমালোচনায় গণনাট্য সংঘের জন্য সুরপতিবাবুর উপস্থাপিত কার্যসূচীর সমালোচনা প্রসঙ্গে কার্যত এরূপ ধারণাকে সঙ্গতভাবেই বাতিল করা হয়েছে। "যাত্রাদল, কবিয়াল ইত্যাদির মধ্যেই তিনি 'নতুন সৃষ্টি ও স্রষ্টার' সম্ভাবনা খুঁজবেন—আন্দোলনের মধ্যে নয়, নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে নয়।" (পৃঃ ১৩৯) আন্দোলন বাদ দিয়ে, শ্রমিক-কৃষক বাদ দিয়ে, যাত্রাদল কবিয়ালের আঙ্গিকে নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির ধারণা কিরূপ মারাত্মক, প্রকাশ রায় সে বিষয়ে সচেতন। কিন্তু সংস্কারবাদের আংশিক রূপ ধরে এই আত্মসমালোচনা বলেই শুধু প্রসঙ্গক্রমেই এটুকু বলা হয়েছে, যাত্রাদল কবিয়ালের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের গোড়া খুঁড়ে সংস্কারবাদের চোরা-চেহারার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা হয় নি। তাই আত্মসমালাচনাতে এই বিভ্রান্তিকর ধারণা ঠাঁই পেয়ে গেছে।

"হ্যাঁ, এটাই সত্যকারের গণ-সংস্কৃতি রচনার পথ। গণ-সংস্কৃতি রচনা নিভৃত সাধনা নয়—সে সংস্কৃতি রচিত হবে লড়াইয়ের ময়দানে, বুর্জোয়াশ্রেণীর ধ্বংসস্তূপের উপর। আর এর চেতনাই দিয়েছে 'লোকনাট্য'কে ইস্পাতের তীক্ষ্ণতা। প্রবন্ধ কবিতা থেকে পত্রিকাপ্রসঙ্গ সর্বত্রই রয়েছে এই সংগ্রামশীল চেতনার ছাপ। আর তাই তো, 'লোকনাট্যে'র লোককবি সহজ কথাকে সহজ করেই বলতে পেরেছেন :

নির্বিচারে নরনারী ছাত্রছাত্রী হত্যা
এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা
তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।

বিষ্ণু দে-র মতো তথাকথিত ভদ্রকবিরা রচনা করুন তো দেখি এমন কবিতা,

তাঁদের মুরোদ বুঝি। কিন্তু বিষ্ণুবাবুদের তা সাধ্যাতীত—কোথায় পাবে বুর্জোয়াদের বশংবদ সংস্কৃতিবিদেরা এই প্রাণশক্তি?"—৪নং মার্কসবাদী, পৃঃ ১৪০।

এমন কবিতা লেখা শুধু সাধ্যাতীত নয়, বিষ্ণুবাবুদের কল্পনাতীতও বটে। তাঁদের পেশাই হল ফাঁকিবাজী, ফাঁকির শূন্যকে আঙ্গিকের ফাঁকা চটকে মুড়ে লোক ঠকানো। কিন্তু এদের উপর রাগ করে গ্রাম্য ছড়ার ধীর স্তিমিত সাদাসিদে শিল্পরীতিকেই প্রগতি সাহিত্যের বড় গুণ বলে তুলে ধরব? বুর্জোয়াদের বশংবদ সংস্কৃতিবিদরা চুলোয় যাক—প্রগতিবাদী সংস্কৃতির আঘাতে চুলোয় তারা যাবেই, তাদের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বার্ধক্যজনিত হতাশা-আতঙ্কে মার্কিনপদলেহী এবং সংকট এড়াতে অক্ষম প্রভুরাই শ্রমিকশ্রেণীর উদ্যত উদ্ধত আঘাতে চুলোয় যাচ্ছে—কিন্তু গ্রাম্য ছড়ার নরম ও সহজ আঙ্গিক ছাড়া গতি নেই, প্রগতি সাহিত্যের এ দৈন্য ঘোষণা তো এর সঙ্গে খাপ খায় না।

এ-কবিতার আঙ্গিক মূলত পুরাণ ও পাঁচালীর আঙ্গিক—অতীতের সংগ্রামহীন শান্ত ও মন্থরগতি গ্রাম্যজীবনের আবেগ-চেতনা রূপায়ণের উপযোগী। এই আঙ্গিকে কোন্দল সুন্দর রূপ পায় কিন্তু সংগ্রামের রূপায়ণ এক রকম অসম্ভব: রামায়ণ-মহাভারতে যুদ্ধের বর্ণনা তাই হাস্যকর রকমে একঘেয়ে ও ব্যর্থ; রামায়ণের যুদ্ধের একটি ঘটনা নিয়ে মাইকেলের নূতন চিন্তা 'মেঘনাদবধ কাব্যে' সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকেই সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করতে পেরেছে। অভাব ও শোক-দুঃখ-বেদনা ছড়ায় গভীরতা পায়, গ্রামের জীবনে এ-অভিজ্ঞতার অভাব নেই—কিন্তু প্রতিবাদ বা বিক্ষোভের তীব্রতা থাকে না বলেই ছড়ায় শোক-দুঃখের বর্ণনা গভীরতা পায়। আবেগ-চেতনার তীব্রতা ছড়ার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় না।

শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনসাধারণের জটিল তীব্র যুগান্তকারী সংগ্রামের কয়েকটি সাধারণ সত্য উক্ত কবিতায় সহজ ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এও বিদ্রোহের কবিতা নিঃসন্দেহ, এ কবিতাতেও আগুন আছে—কিন্তু আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের আগুন এখানে হয়েছে গ্রাম্য হুকোর টিকের আগুন।

তাই বলে কি এ কবিতা বর্জনীয়? পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার নয়। বিষ্ণু দে-র বরফের টুকরোর তুলনায় টিকের আগুনও আমাদের কাছে মূল্যবান।

কথাটা হল আঙ্গিকের। আমার মতে, প্রগতি সাহিত্যের আঙ্গিক এখনো

জন্মেনি, জন্মাচ্ছে—নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রচেষ্টার মধ্যেই জন্মাচ্ছে। বাঙলার শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির প্রাণবস্তু যেমন হবে সম্পূর্ণ নতুন, আঙ্গিকও হবে তেমনি নতুন—কারো সাধ্য নেই আজ বলে দেয় সে আঙ্গিক কি হবে। বলতে গেলেই বরং ক্ষতি হবে—বিপ্লবী আবেগ-চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রেখে যতদূর সম্ভব তীব্র তীক্ষ্ণ সুষ্ঠভাবে প্রকাশ করার বদলে আঙ্গিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার ঝোঁক আসবে।*

* পরিচয়, নব পর্যায়, প্রথম সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৬, পৃ. ৩৩-৬৪; এই প্রবন্ধটির শিরোনামের উপরে মুদ্রিত ছিল 'আলোচনার জন্য' এবং নীচে মুদ্রিত ছিল "[প্রবন্ধটির বক্তব্যের সঙ্গে সম্পাদকীয় মতের বিরোধ আছে। আলোচনার জন্য প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হ'ল—পঃ সঃ]"। মুদ্রণ-প্রমাদের সংশোধন, বানান ও যতিচিহ্নের পরিবর্তনসহ রচনাটি যথাযথ প্রকাশ করা হল।—সম্পাদক

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" / শীতাংশু মৈত্র

মানিকবাবুর প্রবন্ধটি বড় অদ্ভুত। যদি বলি তিনি প্রবন্ধে এই কথা বলেছেন অমনি তার উল্টো কথাটাও ঐ প্রবন্ধ থেকেই দেখিয়ে দেওয়া যাবে। তিনি প্রকাশ রায়ের বক্তব্য রবীন্দ্র গুপ্তের লেখা পড়ার পর মেনে নিয়েছেন, আবার রবীন্দ্র গুপ্তের নির্দেশিত সাহিত্য-বিচারের নিরিখ মেনে নিয়েও, যে ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহগুলি প্রগতিশীল সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিল তাদের ব্রিটিশ-বিরোধী রূপ সম্বন্ধেই তিনি সন্দিহান: "ইতিহাসের বাস্তবতা বলপূর্বক ব্রিটিশ-শাসন উচ্ছেদের আদর্শ নিয়ে এরূপ গণবিদ্রোহ অসম্ভব করে দেয়।" [পরিচয়, পৌষ, পৃষ্ঠা ৩৮]। আবার নীল-বিদ্রোহ সাঁওতাল-বিদ্রোহ সম্বন্ধেও মানিকবাবু বলেছেন, "কিন্তু এসব বিদ্রোহ ছিল আঞ্চলিক ও সীমাবদ্ধ এবং মূলত ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ এসব বিদ্রোহের আদর্শ ছিল না।" [ঐ]। তারপরে আবার "নীল-বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নয়, এ বিদ্রোহ ছড়ায় নি। অন্যান্য বিদ্রোহ সম্পর্কেও ঐ একই কথা।" [ঐ]

ইতিহাসের বাস্তবতা বলতে মানিকবাবু কি বুঝেছেন জানি না; তবে গণবিদ্রোহ যে বাস্তব ঘটনা এ-কথা তো তর্কাতীত এবং সে বিদ্রোহ যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই হয়েছিল এ কথাও আজ ঐতিহাসিক সত্য। তবে হ্যাঁ, সে বিদ্রোহ সার্থক হয় নি। সেই অসার্থকতার অনেক কারণের মধ্যে দেশীয় রাজন্যবর্গের দালালি, বিদ্রোহীদের অবিকশিত শ্রেণীচেতনা, সম্ভবত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে আধা-সামন্ত জমিদারদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সর্বোপরি সিপাহীদের নিজেদের মধ্যেকার অনৈক্য ও খাস ইংলণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর তখনও ক্ষমতায় আসবার অসম্ভাব্যতা। মার্কস বলেছেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত না গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিকশ্রেণী বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর স্থানে বসছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে ব্রিটিশ জোয়াল যতক্ষণ না ছুঁড়ে ফেলছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণীর ইতস্তত ছড়ানো নূতন সমাজের উপাদানগুলিকে

ভারতীয়েরা কাজে লাগাতে পারবে না।" [*India To-day*, Page 92],* তাই সিপাহী-বিদ্রোহের অসাফল্য ব্রিটিশ-বিরোধী রূপ কি করে নষ্ট করে দেয় একথা বোঝা দুষ্কর।

সিপাহী-বিদ্রোহের আগেও যে সাঁওতাল-বিদ্রোহ মূলত বিটিশ-বিরোধী, সে-কথা ব্রিটিশ বুঝেছিল বলেই অমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তারা মেতে উঠেছিল। কেননা ব্রিটিশের আওতায় জমিদার এবং মহাজনের যে বর্বর শোষণ এবং দাসপ্রথায় সাঁওতাল সমাজকে দগ্ধে মারছিল সেই বর্বরতাকে আক্রমণ করলে ব্রিটিশেরই গায়ে লাগে, কারণ ঐ জমিদার-মহাজনেরা ব্রিটিশ শোষণেরই মূল সহায় ছিল। ওরা গেলে কাদের সহায়তায় তারা শোষণ করত দেশকে? এই সাঁওতালদের আবার সাহায্য করেছিল দেশের অগণিত চাষী ও কারিগর। সাঁওতালেরা শুধু জমিই চায় নি, তারা আওয়াজ তুলেছিল যে তাদের স্বীয় দলপতিদের অধীনে সাঁওতাল রাজত্ব চাই। [মার্কসবাদী, ৬নং, পৃ. ১২৮;—*Bengal Gazettier for Santhal Parganas*]।[১] এর পরেও কি এই বিদ্রোহের শ্রেণীচরিত্র এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে?

সাঁওতাল-বিদ্রোহের আগে হয়েছিল সন্তান-বিদ্রোহ—১৭৭২ থেকে ১৭৭৪ পর্যন্ত। এই বিদ্রোহের বিকৃত, বুর্জোয়াসুলভ অপব্যাখ্যা দিয়েছেন বঙ্কিম 'আনন্দ-মঠে'। এই বিদ্রোহও ছিল মূলত ব্রিটিশ-বিরোধী এবং সে বিদ্রোহও করেছিল বুভুক্ষু কৃষক-সমাজ—মুসলমান ট্যাক্স আদায়কারী রেজা খাঁর বিরুদ্ধে নয়, ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে—যে ব্রিটিশ তখন নারকীয় লুটে ব্যস্ত। এই সন্ন্যাসীরা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কল্যাণীর প্রেমমুগ্ধ, হতাশ-প্রেমিক, আত্মহননোন্মুখ ব্রাহ্মণ সন্তানেরা নয়: "১৭৭২ সালের শীতকালে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল নিম্ন বঙ্গের ফসলভরা ক্ষেতের উপর, পঞ্চাশ থেকে হাজার লোকের এক এক দল আগুন জ্বালাতে লাগল, লুটপাট করতে লাগল। কালেক্টরেরা ফৌজ ডেকে পাঠাল—কিন্তু

* মার্কস-এর এই কথাগুলি মনে রেখে British capital-এর regenarating role এবং সেই সম্পর্কে এখানকার বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে প্রগতিবাদীদের আবার ভেবে দেখতে বলি।

১. দ্র. মার্কসবাদী, ষষ্ঠ সংকলন, ডিসেম্বর ১৯৪৯; বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়-এর 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাঁওতাল জাগরণ' নামক প্রবন্ধটির কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। - সম্পাদক

সামরিক কিছু সাফল্যের পর আমাদের সিপাইরা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হলো।"[১] [মার্কসবাদী, ৬নং; পৃ. ১৭৭]

এরা ধান দখল করছিল কার? লুটপাট করছিল কার সম্পত্তি? ব্রিটিশ শাসনের স্তম্ভ সামন্তশ্রেণীর—ফিউডাল সামন্তশ্রেণীর; তখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নূতনতর শোষণব্যবস্থা চালু হয় নি। সন্ন্যাসীদের মনে স্পষ্টত ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদের আদর্শ ছিল কি ছিল না, একথা মার্কসবাদীর পক্ষে অবাস্তব। আসলে তার শ্রেণীচরিত্র এবং বাস্তব ভিত্তি কি ছিল সেইটাই বিচার্য।

নীল-বিদ্রোহ সম্বন্ধে ঐ একই কথা আরও বেশী করে প্রয়োজ্য—১৮৫৯ সালে। ব্রিটিশ কারবারী মূলধনকে (**British merchant capital**) আঘাত করা মানেই তো ব্রিটিশ শাসনের অতি প্রকট শোষক রূপকে আঘাত করা। সেটা 'ছড়ায় নি' বলেই তার শ্রেণীচরিত্র এবং উদ্দেশ্য বদলে যাবে? আর ছড়ায় নি মানে কি? এত বড় চাষী-ধর্মঘট বাঙলাদেশে এর পরে এখনও পর্যন্ত হয়েছে কি? "এ ধর্মঘট এমনই ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে, প্রায় ৫০ লক্ষ গরীব চাষী এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছিল।"[২] [মার্কসবাদী, ৬নং; পৃ. ১৬৪] "নীলদর্পণ" এই বিদ্রোহের বিপ্লবী প্রতিরূপ নয়, শুধু জাগায় ঘৃণা ও বিক্ষোভ। অত্যাচারকে বড় করে তুলে ধরে, একথা সত্যি হলেও মূল কথাটা তো বদলায় না। দীনবন্ধু ব্রিটিশ প্রসাদপুষ্ট পেটি-বুর্জোয়া—তাঁর মন স্বভাবতই আপস করতে চায় শোষকের সঙ্গে। 'নীলদর্পণে'র এ দুর্বলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু তবু 'নীলদর্পণে' অত্যাচারের যে প্রতিবাদ আছে তা অত্যন্ত অর্থপূর্ণ এবং বাস্তবানুগ। তোরাপ যখন রোগ সাহেবকে মারছে তখন তাকে বারণ করছে ধনিক-জোতদার নবীনমাধব। তোরাপের শ্রেণীচেতনা যে সহজ প্রতিশোধের পথ নিয়েছে তাকে ব্যাহত করছে আপসকারী ধনিকের মনোবৃত্তি। কিন্তু তোরাপ তো একজন নয়; তোরাপ টাইপ। তোরাপদের জোরে নীলকর রহিত হয়েছিল, শুধু মাইকেলের 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করার ফলে নয়।

এখানে আরও যে জিনিসটা চোখে পড়ছে সে হচ্ছে বঙ্কিমের চরম সাম্প্রদায়ি-

১. নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গণেন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'উনবিংশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

২. পূর্বোক্ত 'উনবিংশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিম-সাহিত্যের ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

কতার পাশে দীনবন্ধুর একান্ত অসাম্প্রদায়িকতা : তোরাপ উদ্ধার করছে ক্ষেত্রমণিকে। এইদিক থেকেও দীনবন্ধু প্রগতিশীল বুর্জোয়া। ফিউডাল জাতিভেদ ও ধর্মভেদ প্রথাকে তিনি গভীর আঘাত দিয়েছেন এখানে—বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে।

কিন্তু এই সব গণ-অভ্যুত্থান যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছিল মানিকবাবু বলেছেন, "ঐতিহ্য হিসাবে তা প্রগতিবাদীর কাছে খুবই মূল্যবান কিন্তু সাহিত্যে এসব বিক্ষিপ্ত।" [ঐ]। সে সাহিত্য যদি বিক্ষিপ্তই হবে তবে তা ঐতিহ্য সৃষ্টি করবে কেমন করে? তবু তাকে মূল্যবান বলে মনে করছেন মানিকবাবু, সে কি শুধু রবীন্দ্র গুপ্তের কথায়? রবীন্দ্র গুপ্ত হাতের কাছের কতকগুলির সন্ধান দিয়ে গবেষকদের উপর ভার দিয়েছেন সেই ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার, খুঁজে বের করবার ভার দিয়েছেন সেই সব আমাদের এখনও অজানা গণ-সাহিত্যের এবং ব্রিটিশ-বিরোধী প্রগতিশীল সাহিত্যের নিদর্শনের। সে জিনিস যে ছিল এবং সে ঐতিহ্যই যে বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের হাতিয়ার এ বিশ্বাস মানিকবাবুর থাকলে তিনি আশান্বিত হয়ে বলতেন, হ্যাঁ, আমি যে সাহিত্যিক, আমার দায়িত্ব তাকে খুঁজে বের করা। তিনি একথা কেন বুঝলেন না যে আপসকামী বুর্জোয়ারা গণ-আন্দোলনকে শুধু ধ্বংস করে না তার সংস্কৃতিকেও ধ্বংস করে; জনমানসে সঞ্চারিত করে নিজেদের আপসী মনোবৃত্তি আর নানাপ্রকারের অদৃষ্টবাদী জীবনবেদ; মুছে ফেলবার চেষ্টা করে সমস্ত সংগ্রামী ঐতিহ্য। তখন গণ-সংস্কৃতি নিজে বাঁচবার চেষ্টায় নানাপ্রকার ছদ্মবেশ গ্রহণ করে; কখনও সেই সংস্কৃতির অংশবিশেষ বুর্জোয়া সাহিত্যিকের লেখাতেও খণ্ডিত, অপব্যাখ্যাত আকারে দেখা যায়; কখনও ধর্মীও সাহিত্যের মারফত সেই ক্ষোভ বা গণ-আন্দোলন আধ্যাত্মিক স্তরের উন্মার্গে চলে; কখনও বা শোষকশ্রেণীর দেবদেবীকে পর্যন্ত মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে এনে বুর্জোয়া অধ্যাত্মবাদকে আঘাত করে কিন্তু নিজেও আবার পড়ে যায় সেই মোহে।

বাঙলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার মারফত ইংরেজের চাকুরীর আশায় যে-মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠল সেই মধ্যবিত্ত সমাজ দেশের গণ-জীবন থেকে এত তাড়াতাড়ি নিজেকে সম্পর্কহীন করে তুললে আর ব্রিটিশ শোষণে গ্রামাঞ্চল এমনি মুমূর্ষু হতে থাকল যে, এই মধ্যবিত্তের আপসী সাহিত্যই যেন সমগ্র বাংলা সাহিত্য বলে পরিগণিত হল—মনে হল বঙ্কিম বুঝি ভুঁইফোঁড় বটগাছ। আর সেই ইংরেজি

শিক্ষিত পেটি-বুর্জোয়ার সৃষ্টির মধ্যেই এখনও আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকবার জন্য আমরা শুধু দীনবন্ধু বা আর এক-আধ জনকেই প্রগতিশীল ব্রিটিশ-বিরোধী স্রষ্টার বিক্ষিপ্ত নিদর্শন বলেই মনে করছি। খুঁজে দেখবার যে-বিপ্লবী চেতনা, যে-চেতনার মধ্যেই আছে সত্যিকারের দেশপ্রেম, তার একান্ত অভাব ঘটছে আমাদের মধ্যে।

আমাদের দেশে বুর্জোয়ারা চিরকাল ইংরেজের সঙ্গে রফা করে বেড়েই উঠেছে—এখন অবশ্য রাঘববোয়াল বুর্জোয়ারা কংগ্রেসী আমলের ব্রিটিশ-বিরোধিতার সেই পাতলা মুখোশখানাও খুলে ফেলেছে। এটা স্বাভাবিকই। স্টালিন বলেছেন, "বিপ্লবী আন্দোলন যত বাড়ে, এই সব দেশের (পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অগ্রসর) জাতীয় বুর্জোয়ারা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়—বিপ্লবীশ্রেণী (পাতি-বুর্জোয়ারা) এবং একটি আপসকামী শ্রেণী (বড় বুর্জোয়ারা)। এদের মধ্যে প্রথমটি বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে যায় আর পরেরটি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেই এক জোটে যোগ দেয়।" [*Address to the University of the Toilers of the East*—1925, Stalin]। আজকে তাই এখনও আমাদের লড়তে হবে সাম্রাজ্যবাদেরই বিরুদ্ধে প্রধানত; আমাদের দেশী **"Big Bourgeoisie" Mountbatten**-এর আশ্রয়ে সেই সাম্রাজ্যবাদেরই তল্পীবাহক।

কিন্তু একথা মনে করলে খুব ভুল হবে যে এই ভারতীয় ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ারা কোনোদিন অন্যান্য স্বাধীন দেশের বুর্জোয়াদের মতো সত্যিই প্রথম দিকে প্রগতিশীল ছিল। সে শুধু ব্রিটিশের দালালি করে কিছু সুবিধা করে নিতে চাইছিল। রজনী পাম দত্তই বলেছেন **এদের মুখপাত্র National Congress**-এর আদিযুগের সত্য প্রকৃতি সম্বন্ধে: "প্রতিষ্ঠাতাদের ছকা পথেই বিশ বছর ধরে জাতীয় কংগ্রেস বেড়ে উঠেছে। এই বিশ বছরের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের কোনো মৌলিক দাবী অর্থাৎ জাতীয় কোনো দাবীই তার প্রস্তাবাবলীর মধ্যে স্থান পায় নি; শুধু ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে আরও একটু ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের দাবীই করা হয়েছে। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত ১৯০১ সালে নিম্নলিখিত ধারায় **ভারতীয় জনগণের** দাবী উপস্থাপিত করেছিলেন: ভারতীয়েরা হঠাৎ পরিবর্তনের এবং বিপ্লবের পক্ষপাতী নয়। তারা নতুন শাসনব্যবস্থা চায় না।...তারা প্রদেশের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে ভারতীয় সভ্য দেখতে চায়।" [*India to-day*—**R. P. Dutt**;

Page 299 ; Revised Edition]। এই মৃদু চাওয়া ও পাওয়া বুর্জোয়াদের দুর্বলতারই চিহ্ন। তারা জানত "প্রথম যুগের ভারতীয় বুর্জোয়ারা ভালো করেই বুঝত যে তাদের পক্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব নয়। তারা বরং ব্রিটিশ শাসনকে মিত্র বলেই মনে করত।" [***India to-day*— Revised Edition, page 300**]

এই বুর্জোয়াদেরই মুখপাত্রদের সৃষ্ট সাহিত্য ব্রিটিশ-বিরোধী অর্থে প্রগতিশীল হতে পারে না; এবং সেইজন্যেই কোনো অর্থেই হতে পারে না। পরাধীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে জীবনে কোনো প্রগতি আনাই সম্ভব নয়, কারণ যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে জীবনের বাস্তব উন্নতি সম্ভব সেই ব্যবস্থাই তো বিদেশীদের হাতে; তারা দেশকে পঙ্গু থেকে পঙ্গুতর করতেই ব্যস্ত। জীবনে প্রগতি না থাকলে সাহিত্যে কি করে থাকবে? সাহিত্য কি আকাশকুসুম? তবু এই বুর্জোয়ারা কিছু শক্তি সঞ্চয় করে প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝে ব্রিটিশকে একটু চাপ দিয়ে ১৯১৯-এ সামান্য পার্লামেন্টারী সংস্কার আদায় করেছিল। কিন্তু "১৯১৯-১৯২২ সালের প্রথম বিরাট সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী আন্দোলন, জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে জাতীয় বিপ্লবের ধ্বংসতেই পরিণতি লাভ করল। এই বিশ্বাসঘাতকতা তারা করল প্রধানত বর্ধমান কৃষি-বিপ্লবের এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে মজুরদের ধর্মঘটের ভয়ে।" **[Revolutionary movement in the colonies and semicolonies— Thesis of the Sixth Congress of the Communist International, 1928, Page-4]** তাই এরা নিজেদেরই স্বার্থে আমাদের সংগ্রামী ব্রিটিশ-বিরোধী ঐতিহ্য থেকে বঞ্চিত করে বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের থেকে জাত এক-জাতীয় আপসী সাহিত্যকেই বিপ্লবী জাতীয় সাহিত্য বলতে শিখিয়েছে।

২

কিন্তু এহো বাহ্যঃ। মানিকবাবুর আসল কথা আগের আলোচনার মধ্যে ধরা পড়ে নি। তিনি প্রকাশ রায়কে সমালোচনা করে বলেছেন যে তিনি বামপন্থী বিপ্লববাদকে ('চোরা সংস্কারবাদ') যথেষ্ট আক্রমণ করেন নি এবং আজকের দিনে যে প্রগতিকামীদের মহলে কথা উঠেছে, প্রগতিশীল সাহিত্যিককে জনগণের সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে প্রগতি সাহিত্য

সৃষ্টি করতে হলে, সেটা এই বামপন্থী বিপ্লববাদেরই প্রকাশ। এই সম্পর্কে মানিকবাবু গত প্রগতি সাহিত্য সম্মেলনের ইস্তাহার রচনা নিয়েও কতকগুলি কথা বলেছেন, যেগুলি সেই সম্মেলনের ইস্তাহার-পুনর্লিখন কমিটির সভ্য হিসাবে তাঁর বলা ঠিক হয়েছে কিনা তাঁকে ভেবে দেখতে বলি। আগে সেই কথাটাই একটু আলোচনা করা যাক।

ইস্তাহারের প্রথম খসড়াতে বুর্জোয়া সাহিত্যের স্বর্ণযুগের প্রশস্তিমূলক মুখ-বন্ধে আমাদের কারও কারও তীব্র আপত্তি ছিল দুটি কারণে : ১) ওটাকে স্বর্ণ-যুগ বলেই আমরা স্বীকার করতে পারি নি; ২) আর গণসাহিত্য সৃষ্টির আদর্শ এবং এবং পন্থা যে খসড়ায় থাকবে তাতে ঐ রকমের প্রশস্তি এই বিভ্রান্তিই সৃষ্টি করে যে সেই স্বর্ণযুগ থেকে আমাদের পতন ঘটেছে—আমরা তারই আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চলেছি। মানিকবাবু নিজে কমিটির সভায় বলেছিলেন, 'কেন, বুর্জোয়ারা কি সমগ্র জাতির জন্যেই সৃষ্টি করে নি? তাদের আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হই নি?' আমরা তখন নিজেরা আমাদের দেশের পরাধীন যুগের সাহিত্য-বিচারের নিরিখ সম্বন্ধে কম-বেশী বিভ্রান্ত ছিলাম বলে তাকে স্পষ্ট করে বলতে পারি নি—আমাদের আপত্তিটা ঠিক কোথায়; তবু বঙ্কিম, রামমোহনকে আমাদের সংগ্রামী সংস্কৃতির পথকর্তা হিসেবে কিছুতেই দেখতে পারছিলাম না। আজ মানিকবাবু বলছেন বঙ্কিমকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বলেই জানতেন। তখন কিন্তু সে কথা আমাদের না জানিয়ে এবং খসড়াকে যথাযথ করবার কাজে নিজের দায়িত্ব পালন না করে, আজ বামপন্থী বিপ্লববাদের কাঁধে দোষ চাপানোকে আমরা তাঁর স্রষ্টামানসে অন্য এক বিচ্যুতির আভাস বলে মনে করছি। সেটি পাতি-বুর্জোয়া সংস্কারবাদ।

শ্রমিকশ্রেণীর দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবনধারা থেকে সমাজবাদী চেতনার আপনি উদ্ভব হয় না, সে চিন্তা সেখানে জাগিয়ে দিতে হয় এবং সেই চেতনার উন্মেষে, দরদী বুর্জোয়া লেখকদের মূর্খ শ্রমিকদের জন্যই লেখা জলো সাহিত্যের বদলে বুর্জোয়াদের সাধারণ সাহিত্যই বেশী প্রয়োজনীয়, কেননা তাতে বুর্জোয়ারা নিজেদের সত্য প্রতিরূপই আঁকে এবং তাঁদের পক্ষে যতখানি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার করা সম্ভব তা করে—লেনিনের এই উক্তি থেকে মানিকবাবু এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বুর্জোয়া লেখক 'শ্রেণীবিচ্যুত' না হয়েই, শ্রেণী-সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করেই, প্রগতিশীল গণসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। অথচ

তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা গণসাহিত্যিকের পক্ষে অবশ্য অর্জনীয় বলে মনে করেন। মানিকবাবু সাহিত্যিকের শ্রেণীবিচ্যুতি সম্পর্কে 'বামপন্থী বিপ্লববাদকে' সমালোচনা করে বলেছেন, "মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর সাথে লড়াইয়ে নেমেছেন এবং নূতন সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক তাঁদের নিষেধ করে দেওয়া হয় যে সংস্কৃতি-চর্চা তোমাদের কাজ নয়। এ শুধু শ্রমিকে পরিণত বুদ্ধিজীবীর কাজ।" [পরিচয়, পৌষ] শ্রেণী-বিচ্যুতি মানে তিনি কেন যে শ্রমিকে পরিণত হওয়া মনে করলেন তা বোঝা খুব দুষ্কর। মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্টালিন—কেউই শ্রমিক ছিলেন না এবং নন, গোর্কিও ঠিক শ্রমিক ছিলেন একথা বলা চলে না; আমেরিকার Theodore Dreiser শ্রমিক ছিলেন না; এখন যাঁরা আমেরিকায় প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, হাওয়ার্ড ফাস্ট প্রভৃতি, তাঁরাও কেউ শ্রমিক নন। তবে শ্রমিক হতে বলা হয়েছে এ কথা মানিকবাবু ভাবলেন কেন? শ্রেণীবিচ্যুতি মানে শ্রমিক-শ্রেণীর জীবনবেদের সঙ্গে একাত্মতা, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে যে শোষণের অবসানে বিশ্বাস এবং নিজের ব্যক্তি-মানসকে বুর্জোয়া জীবনবেদের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শোষিত জনের সংগ্রামকে সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখা। মানিকবাবুকে আশ্বাস দিচ্ছি তাঁকে শ্রমিক হতে হবে না, কেননা শ্রমিক হলেই সাহিত্য লেখা যায় না।

আসল কথা একাত্মতা। সে কথা মানিকবাবুও স্বীকার করেন। আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের যে-ঢেউ উপনিবেশে, আধা-উপনিবেশে ও ভুয়া স্বাধীন দেশগুলিতে উত্তাল হয়ে উঠেছে তার নেতৃত্ব দিচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী; ভারতবর্ষ সেই সংগ্রামে আজ শামিল; শ্রমিকশ্রেণী এখানেও নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং তার নেতৃত্ব ভিন্ন মুক্তি সম্ভব নয়, কেননা সে শুধু যে সবচেয়ে বিপ্লবীশ্রেণী তাই নয়, সেই আজ সাম্রাজ্যবাদী আর তার তল্পীবাহক দেশীয় রাঘব-বোয়ালদের দ্বারা সবচেয়ে বেশী শোষিত। আর একথাও মনে রাখা দরকার যে আজকে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করা মানেই দেশীয় শোষকদের খতম করা। বিপ্লবকে সেই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী; আর সকলেই তার নেতৃত্ব ভিন্ন নানান দ্বিধায় পেছ-পা হবে, বিশেষ করে পাতি-বুর্জোয়ারা। পাতি-বুর্জোয়ারা কি করে বিপ্লবকে বানচাল করে তার দৃষ্টান্ত আজকের দিনে Peoples' democracy-গুলিতে অপ্রতুল নয়। সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি

থেকে এই সব বিপ্লব-ভাঙাদের বের করে দেওয়া হচ্ছে।

এই রকমটা হওয়ার কারণও খুব স্পষ্ট। পাতি-বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া জীবন-দর্শনে আকণ্ঠ নিমগ্ন; নেহাৎ শোষণের চাপে তারা ক্রমান্বয়ে দরিদ্রতর হতে থাকে; এদিকে তারা দেখে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই। অবস্থা-বিপর্যয় তাদের নিয়ে আসে শ্রমিকশ্রেণীর শিবিরে। কিন্তু অনেকে মানসিক একাত্মতা বোধ করেও আসে, শুধুমাত্র অবস্থার চাপে পড়ে নয়। বিপ্লবের অগ্রগতি এইসব বুদ্ধিজীবী পাতি-বুর্জোয়াদের জীবনের শেষ বুর্জোয়া মোহটুকুও ভেঙে দেয়—কলাকৈবল্যবাদ, বুদ্ধিজীবীবের শ্রেষ্ঠতা, শ্রমিকদের প্রতি কৃপা—ইত্যাদি যেসব ভাব মনের গহনে লুকিয়ে থাকে, সেগুলিও ভেঙে যায় শ্রেণীসংগ্রামের তীব্র রূঢ়তায়; বুর্জোয়া জীবনের স্বচ্ছন্দ বিলাস, লিখবার জন্য অবসরের নামে মনন-বিলাস, শ্রমিকশ্রেণীকে শেখাবার সাধু আগ্রহ— এসবও একের পর এক পড়ে ভেঙে। মানিকবাবু যদি এ কথা ভেবে থাকেন যে সাম্যবাদী চেতনা বাইরে থেকে আসে, মানে পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা তা আগে আয়ত্ত করে শ্রমিকশ্রেণীকে শেখায়, তাহলে কিন্তু লেনিনের কথা ভুল বোঝা হবে, তার অপব্যাখ্যা করা হবে। বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে। কি রকম করে সেই শ্রমিক শ্রেণীসচেতন সংগ্রামী হয়ে ওঠে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গোর্কির 'মা' উপন্যাসের নায়ক প্যাভেল। পাতি-বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পাতি-বুর্জোয়া থেকেই শুধু বুদ্ধি দিয়ে মার্কসইজম বুঝে ফেলবেন—মানে শ্রেণীসংগ্রাম সম্বন্ধে সব তত্ত্ব এবং তথ্য আয়ত্ত করে নেবেন—এ হয় না। রোমাঁ রোলাঁকেও সংগ্রামে নামতে হয়েছিল।

মানুষ সৃষ্টিশীল জীব বলে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে বুদ্ধি দিয়ে যেটা বোঝে সেটাকে আবার কাজের মধ্যে দিয়ে তত্ত্বকে সম্পূর্ণতর করে আরও বৃহত্তর তত্ত্বের দিকে এগিয়ে চলে। কর্মই হচ্ছে তত্ত্বের পারিপূরক এবং নিরিখ। কর্মহীন মনন জীবনে কোনো কাজেই আসে না। তাই মার্কস বলেছিলেন, 'দার্শনিকেরা বহু প্রকারে জগৎকে ব্যাখ্যা করেছেন; কথা কিন্তু হল জগৎকে পরিবর্তিত করা।' অর্থাৎ যতক্ষণ কেউ কাজ না করছে ততক্ষণ তার তত্ত্বের কোনো কার্যকারিতা আছে কি না বোঝা যাবে না; কার্যকারিতা না থাকলে সে তত্ত্ব তত্ত্বই নয়। আর কর্মসম্পর্কহীন তত্ত্বই বাধায় যত অকারণ বুদ্ধির কচকচি। মানুষের আসল জ্ঞান আসে কর্মের থেকে। পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তিমানসের যে ঘাত-প্রতিঘাত কর্মের মধ্য দিয়ে হয়, তারই ফলে আসে

জ্ঞান। নিরালম্ব মনন থেকে জ্ঞান আসে না। এই হল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের গোড়ার কথা। সংস্কৃতি-সৃষ্টির মূল যেহেতু জীবন সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান যেহেতু কর্ম ভিন্ন আসে না সেখানে সাহিত্যিক যদি বলেন—শুধু মননের মধ্য দিয়েই আমার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা আসবে তাহলে তিনি মার্কসিজম-লেনিনিজমকেই অস্বীকার করেছেন এবং পেটি-বুর্জোয়াসুলভ অহমিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি জীবনযাপন করবেন পেটি-বুর্জোয়ার, সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে শ্রেণীবিচ্যুত হবেন না, অথচ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করবেন শুধু কল্পনার সাহায্যে আর সেই কল্পনার সাহায্যে করবেন এমন সাহিত্য সৃষ্টি যা সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীকেও উদ্বুদ্ধ করবে—এ একেবারে উদ্ভট কথা এবং শ্রমিকশ্রেণীকে অপমান করা। সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বাস্তব জীবনে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা না অর্জন করেও সাহিত্যে সেই সংগ্রামকে শুধু নয়, সংগ্রামের ভবিষ্যৎ পরিণতিকেও আভাসিত করা—এ সাধ্য কল্পনার নেই। বাস্তব জীবনের দ্বারাই মানুষের মন নিয়ন্ত্রিত। তাই মার্কস বলেছেন, "মানুষের চেতনা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না; বরং সামাজিক জীবনই চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে।" [**Historical Materialism—Marx & Engels, Page 1**]

শ্রেণীসংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করলে সাহিত্যিকের চেতনায় সে সংগ্রাম এবং তার পরিণতির রূপ প্রতিভাত হবে কেমন করে? শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একাত্মতা লাভ করবার একমাত্র পথই হল সংগ্রামে আসা এবং শ্রেণীবিচ্যুত হওয়া। তাই মায়াকোভস্কিকেও পোস্টার লিখতে হয়েছিল; গ্ল্যাডকভ তাই শ্রেণীসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন সিভিল-ওয়ারের আগে ও পরে; গোর্কির তো কথাই নেই; এই সেদিন হাওয়ার্ড ফাস্টও জেল খেটে এসেছেন; পাবলো নেরুদার জীবনই তো এখন শুধু যুদ্ধ। আর যে-চীনের আজকের বিজেতার রূপ দেখে মানিকবাবু সেখানকার সাহিত্যিকদের শত্রুকে 'মূল আঘাত' হানার সুযোগ দেবার জন্যে কালিকলম ছাড়াতে রাজী হয়েছেন, সেই চীনেই ১৯৩৭ সালে মাও-সে-তুঙ লেখকদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কৃষকদের মধ্যে যেতে বলেছিলেন; সেখানেও সাহিত্যিকদের চিয়াং-এর ফ্যাশিস্ট শাসন সহ্য করেই সৃষ্টি করতে হয়েছে সাহিত্য; সেই ফ্যাশিস্ট শাসনকে ফাঁকি দেবার জন্যেই সেখানে **Wood-cut**-এর আবির্ভাব। বুর্জোয়াদের প্রচার

সেখানে আজ স্তব্ধ হয়েছে আর এখানে সেটা পুরোদমে চলছে বলে সাহিত্যিক কি কল্পবিলাস করলেই বুর্জোয়াদের ঠেকাতে পারবেন? বুর্জোয়াদের প্রভাব দূর করতে হলে তাঁকে সংগ্রামী সংস্কৃতি সৃষ্টি করে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। বুর্জোয়াদের প্রভাব ধ্বংস করতে হবে বলে কলকাতায় বসে ধর্মঘটের ছবি আঁকার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করে কিছু লাভ নেই। সংগ্রামে অনেক প্রগতিকামী লেখক আসতে পারছে না বলে সংগ্রামে না এলেও চলবে—এ সুবিধা দেওয়া চলে না। মানিকবাবু বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও দেখাতে পারবেন যে, সক্রিয় প্রতিরোধে আসেন নি এমন মানুষ উঁচুদরের বিপ্লবী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন? তিনি নিজে 'চিহ্নে'র পর আর এগোতে পারছেন না কেন? কেন কাকদ্বীপ, তেলেঙ্গানা, মৈমনসিংহে এত রক্ত ঝরলেও আমাদের সাহিত্যিকদের কলম দিয়ে সেই সব বীর যোদ্ধাদের জন্যে এক কলম কালি ঝরে না? কেন আজ দেশের চারিদিকের বিপ্লবীর স্ফুলিঙ্গ আমাদের শ্রমিকের সঙ্গে 'একাত্ম' সাহিত্যিকদের আত্মায় আগুন ধরাচ্ছে না? শুধু পারি বললে তো হবে না—করে দেখিয়ে দিতে হবে। আমরা বলছি, মার্কসইজম বলছে, ঘরে বসে সংগ্রামী সাহিত্য হয় না।

এ সংগ্রামের বহু রূপ আছে। সবাইকেই কালিকলম ছেড়ে বন্দুক ধরতে হবে এমন কোনো কথা নেই। চিন্মবাবু[১] তা ঠিক বলেনও নি: তিনি বলেছেন সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা। একটা উদাহরণ দিচ্ছি: এই কলকাতা শহরে এতদিন আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের নাকের ডগা দিয়ে 'মানদণ্ড' দণ্ড ঘুরিয়ে গেল। যাঁরা শ্রমিকগত আত্মা, তাঁদের কোনো প্রতিবাদ হল এর বিরুদ্ধে? শুধু 'পরিচয়ে' একটি সমালোচনা বেরুল।[২] কেন আমাদের প্রগতিবাদীরা সভা করে, পিকেটিং করে, হ্যাণ্ডবিল দিয়ে, এমন কি সিনেমা হলের মধ্যে ঢুকে ছবি চলাকালীন প্রতিবাদ করে, সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারলেন না? এইভাবে পারতেন না তাঁরা বুর্জোয়াদের লোকের মনে এই বিষ ঢুকিয়ে দেবার প্রচেষ্টার উপযুক্ত জবাব দিতে? এতে কি বন্দুক ধরতে

১. চিন্মোহন সেহানবীশ। সম্পাদক

২. 'মানদণ্ড' বনফুলের কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী উপন্যাস। এই উপন্যাসের চলচ্চিত্র-রূপকে 'পরিচয়'-এর তৎকালীন সম্পাদক সরোজকুমার দত্ত তীব্র সমালোচনা করেন। দ্র. 'বনফুলের মানদণ্ড' পরিচয়, শবপর্বার, মাঘ ১৩৫৬, পৃ. ৪৪ ৬৮।—সম্পাদক

হয়, না কালিকলম ছাড়তে হয়? একেই বলে সক্রিয় অংশগ্রহণ। এর মধ্য দিয়েই আসে জনমানসের সঙ্গে পরিচয়, আসে সামূহিক বৈপ্লবিক চেতনা। সাহিত্যিক সোজা বুঝতে পারে কেমন করে লোকে তাকে গ্রহণ করছে এবং সেই বোঝার মধ্যে দিয়ে তার আত্মোন্নতি ঘটে সে আরও বাস্তবমুখী হয়।

৩

কিন্তু এহো বাহ্যঃ। মানিকবাবু সাহিত্যের শ্রেণীচরিত্রই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন সাহিত্য শ্রেণী-নিরপেক্ষ—সকল শ্রেণীর জীবনের নিরপেক্ষ রূপায়ণ। বামপন্থী বিপ্লববাদীরা তাঁর মতে প্রগতিসাহিত্যকে 'মুচড়ে' বিপথে চালিত করতে চাইছে: 'সে মোচড়টা কি? শ্রমিকশ্রেণীর বস্তুবাদী জীবনদর্শনের পরিবর্তে সমাজবাদী চেতনা ও সকল শ্রেণীর শ্রেণী-সম্পর্কগত বাস্তবতার পরিবর্তে শ্রমিকশ্রেণীর চেতনা ও শ্রমিকজীবনের বাস্তবতাকে প্রগতি সাহিত্যের উপজীব্য বলে দাবি তোলে।' তারপর আবার, 'আবেগ বা অনুভূতিরও শ্রেণীরূপ আছে। কিন্তু সহিত্য কোনো শ্রেণীগত আবেগ বা অনুভূতির রূপায়ণ নয়। সাহিত্য··· সমস্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আবেগ বা অনুভূতি এবং চেতনাকে (অনুভূতি ও চেতনা পৃথক কিন্তু পরস্পর-নিরপেক্ষ নয়) প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটা সামগ্রিক জীবনদর্শনকেই রূপায়িত করে।' সামগ্রিক জীবনবেদের বুর্জোয়া ধুয়া তোলার পর আবার তিনি বলছেন, 'আসল কথাটা জীবনদর্শন: বুর্জোয়া জীবনদর্শন সাহিত্যকে বুর্জোয়া স্বার্থের অনুকূল করে, শ্রমিকশ্রেণীর জীবনদর্শনই সাহিত্যকে শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল করতে পারে।' [পরিচয়, পৌষ]

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সাহিত্যও শ্রেণীসংগ্রামের রূপায়ণ: 'অতীত ও বর্তমানের সমস্ত মানব-সমাজের ইতিহাস শ্রেণী-সংঘাতের ইতিহাস ।···শ্রেণী-সম্পত্তির লোপকেই বুর্জোয়ারা যেমন উৎপাদনের লোপ বলে মনে করে তেমনি শ্রেণী-সংস্কৃতির লোপকে তারা সমস্ত সংস্কৃতির লোপ বলে মনে করে।···প্রতি যুগেই শাসকশ্রেণীর ভাবনা-ধারণাই প্রধান স্থান দখল করে।' [কমিউনিস্ট ইস্তেহার, মার্কস ও এঙ্গেলস]। বুর্জোয়া সাহিত্যিক শ্রেণীসংগ্রাম করে বুর্জোয়ার ভাবধারা সাহিত্যের মারফত প্রচার করে এবং তাকেই চিরন্তন ভাবধারা বলে জাহির করে। এই প্রচার রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদ থেকে আরম্ভ করে বনফুলের 'মানদণ্ডে' সোজাসুজি মালকোঁচা মেরে হাত গুটিয়ে বলা—ক্যাপিটালিস্টকে

যে খারাপ বলে সে খারাপ কমিউনিস্ট। এই বুর্জোয়ারাই আবার নিজেদের সাহিত্যের শ্রেণীরূপ ঢাকবার জন্মে **Art for art's sake** থেকে রসো বৈ সঃ-তেও পৌঁছেছে—অর্থাৎ কোনো রকমে শ্রেণীশোষণের রূপকে, জেনে না জেনে, চাপা দিয়ে শ্রেণীসংগ্রামকে স্তিমিত করাই এদের উদ্দেশ্যে। বুর্জোয়া সাহিত্যিকও যে আবার তার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠে জনগণের জীবনকে রূপায়িত করেন না তা নয়। তবে সেও ঐ শ্রেণীসংঘর্ষেরই রূপ—জনগণ নিজেদের অধিকার যত সুপ্রতিষ্ঠিত করছে তত তারা সাহিত্যেও তাদের আসন দখল করছে।

তাই মানিকবাবু যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে, তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে, বিপ্লবের সহায়তা করতে চলেছেন তখন শ্রমিক-শ্রেণীর যে জীবনবেদ তাকেই তো একমাত্র প্রগতিশীল বিপ্লবী জীবনবেদ বলে মানতে হবে এবং 'সকল শ্রেণীর শ্রেণী-সম্পর্কগত বাস্তবতাকে রূপায়িত' করতে হবে সেই জীবনবেদের পরিপ্রেক্ষিতে। তাই সাহিত্যিক হচ্ছেন **Partisan**; তার সৃষ্টি শ্রমিকশ্রেণীর 'শ্রেণীগত আবেগেরই' রূপায়ণ। সেই আবেগই তো আজকের দিনে একমাত্র সার্থক সামাজিক সত্য যা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ শোষণহীন সমাজের পথে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য সব শ্রেণীকে প্রগতিশীল সাহিত্যিক দেখবে এই বিপ্লবী আবেগ নিয়ে। তবেই তো অন্য সব শ্রেণীর আজকের দিনের সমাজে ঠিক ঠিক অবস্থানটি ধরা পড়বে। তাই 'সামগ্রিক জীবনদর্শন' দিয়ে সব শ্রেণীকে প্রভাবিত করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী জীবনদর্শন দিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর জীবনদর্শনকে পরাস্ত করে, সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ থেকে দেশকে উদ্ধার করতে সাহায্য করে শ্রেণীহীন সমাজের পথে মানুষকে অগ্রসর করে দেবেন। তাই তাঁর সাহিত্য যদি **Partisan** না হয় তবে সে শুধু নিরপেক্ষ, সামগ্রিক রূপায়ণের অজুহাতে বিপ্লবকে বানচাল করবে—কেননা জীবন নিরপেক্ষ নয়, সামগ্রিকও নয়। জীবন শ্রেণী-বিভক্ত এবং খণ্ডিত। এখানে সামগ্রিকতার মোহ সৃষ্টি করা, সকল শ্রেণীর মুখপাত্র হবার চেষ্টা করা এবং সমাজবাদ না এলে সমাজবাদী চেতনা আসবে না—এই যান্ত্রিকতার প্রশ্রয় দেওয়া তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের যুগে বুর্জোয়া প্রচারের কাছে পরাস্ত হওয়ারই নামান্তর।

কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর জীবনবেদের আলোকে শ্রেণীসংগ্রামকে রূপায়িত করার

অর্থ শ্রমিকজীবনের ফোটোগ্রাফি নয়। সাহিত্য যে ফোটোগ্রাফি নয় একথা আজ আর আলোচনার স্তরে নেই। রিয়ালিজম বা বাস্তবানুগতা ঘটনাপ্রবাহকে এমন করে রূপায়িত করে যাতে সমস্ত বিচিত্র ঘটনার মৌলিক সত্যটা ফুটে ওঠে এবং সেই সত্যেরই গতি সাহিত্যভাত হয় স্রষ্টার সৃষ্টিতে। সেই সত্য বোঝার মূলে আছে যথাযথ জীবনদর্শন—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ। এর আগের আগের যুগের সাহিত্যিকেরা অনেকে বস্তুবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু যান্ত্রিক বস্তুবাদকে গ্রহণ করার ফলে তাঁরা বস্তুর স্বতোগতির মধ্যে মানুষের সৃষ্টিশীলতা এবং মানুষের বস্তুকে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন না থাকায় হয় ন্যাচারালিজমের পাঁকে (ফ্লবেয়ার, জোলা) না হয় তো বর্তমান একজিস্টেন্সিয়ালিজমের হিমে পড়ে ধুঁকেছেন বা ধুঁকছেন। এঁরা মানুষকে পরিবেশের হাতে মোটামুটি পুতুল হিসেবে দেখেছেন (যথা 'পুতুল নাচের ইতিকথা')—লক্ষ্য করেছেন জীবনে শুধু হতাশা আর ক্লেদ আর মলিনতা এবং শেষপর্যন্ত মানুষকে শুধু ধ্বংসশীল জীবে পরিণত করেছেন। এ বিষয়ে জোলা আর সার্ত্র এবং মালরোর নাম করলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে। তবে ন্যাচারালিজমে জীবনের সত্যিকারের মলিনতা অনেকখানি ধরা পড়ে; অন্যটিতে মানুষকে পশুতে পরিণত করা হয়। এঁরা বুঝতে পারেন না যে, সভ্যতার ইতিহাসই হচ্ছে প্রকৃতির উপর মানুষের জয়ের এবং প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করবার ক্ষমতার ইতিহাস। সৃষ্টিশীলতার ফল হল প্রগতি এবং প্রত্যেক যুগের সাহিত্যেও জনমানসের নিকটবর্তী সাহিত্যিক তাঁর অজ্ঞাতেই এই প্রগতিকেও স্বীকৃতি জানিয়েছেন—যেমন চসার, শেক্সপিয়ার, টলস্টয়, কালিদাস এবং এ-যুগে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত। তবু দুঃখের চেতনাই যে এপর্যন্ত সাহিত্যিকের চেতনাকে ঘিরেছিল তার কারণ সোশ্যালিজম আসার আগে পর্যন্ত মানুষ যত রকম সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এসেছে সবগুলিরই ভিত্তি কোনো না কোনো রকমের শোষণ। তাই সাহিত্যেও তার প্রতিফলন; কমিউনিস্ট ইস্তাহারে সেইজন্যে সাম্যবাদকে ইতিহাসের অভূতপূর্ব উদ্‌গতি বলা হয়েছে: "যে আকারেই হোক না কেন, অতীতের সমস্ত যুগে, সমাজের এক অংশ অপরকে শোষণ করে এসেছে। এখানে তাদের ঐক্য। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই যে সমস্ত যুগের সামাজিক চেতনা (বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও) এক খাতেই প্রবাহিত হয়েছে এবং এই খাতেই চলতে থাকবে যতক্ষণ না পৃথিবীর উপর থেকে শ্রেণীবৈষম্য দূর হয়।

"আবহমান কালের সম্পত্তির অধিকারের উপর গ'ড়ে ওঠা সামাজিক সম্বন্ধগুলির সঙ্গে সাম্যবাদী বিপ্লব এক চরম সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাবে। যদি এর ফলে আমাদের আবহমান কালের ভাবলোকেও এক বিপর্যয় ঘটে তাতে কি আশ্চর্য হবার কিছু আছে?" কমিউনিস্ট ইস্তেহার]।

বর্তমানের সাহিত্যিক বুঝতে পেরেছেন এই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে যে, ইতিহাস শুধু শ্রেণীসংঘাত ও শ্রেণীসংগ্রামের দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ হয় তাই নয়, বিংশ শতাব্দীতে প্রগতির বাহক হল শ্রমিকশ্রেণী, কেননা, তার শ্রেণীসংগ্রামই শোষণহীন সমাজ তৈরী করতে চলেছে। এ শ্রমিক কেমন শ্রমিক: শোষিত শ্রেণীর মধ্যে যে-শ্রেণী ঐক্যবদ্ধ, শৃংখলানুবর্তী, যুগ যুগের শ্রমিক-সংঘাতে যার মন দৃঢ় হয়েছে, যে পুঁজিবাদী বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের যুগের সমস্ত নাগর-সভ্যতা আত্মসাৎ করেছে এবং যার এই সমস্ত ঐশ্বর্যকে রক্ষা করবার, সঞ্চয় করবার এবং আরও উন্নত করবার, সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী আর জনগণের মধ্যে এই ঐশ্বর্যকে পৌছে দেবার ক্ষমতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে; শুধু যে-শ্রেণী জানে কেমন করে সইতে হয় সমস্ত ভার, অত্যাচার, দুর্ভাগ্য; পুরনোকে ভেঙে ফেলে নূতন ভবিষ্যৎ রচনার পথ খুলে দেবার সাহস থাকার জন্য যার উপর ঐতিহাসিক নিয়মে এসে পড়ে বিশাল স্বার্থত্যাগের দায়িত্ব; শুধু যে-শ্রেণী শ্রমের ক্লেশসাধ্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে আসার ফলে জানে কেমন করে প্রত্যেক মেহনতী মানুষের মনে নিজের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাতে হয়— শুধু এই শ্রেণীই অন্যান্য শোষক-শ্রেণীকে পর্যুদস্ত করে নিজের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে [Lenin, quoted in Text book of Marxist Philosophy, Page 79]

এই শ্রেণীসংগ্রামে সাহায্য করাই হল সাহিত্যিকের কাজ। শ্রমিকজীবনের যেসব দিক ক্ষয়িষ্ণু, যেসব অভ্যাস তাকে পূর্বতন ক্লিন্ন জীবনেই আটকে রাখতে চাইছে, তার রুদ্ধ সৃষ্টিশীলতা ব্যাহত হয়ে মনের মধ্যে আবর্ত রচনা করে তাকে যে-কোনও রকমের হুল্লোড়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ঘটাচ্ছে তার দৈহিক ও নৈতিক অধঃপতন—এই সবগুলিই শুধু যাঁর চোখে পড়বে এবং যিনি শ্রমিককে হীন জীব বলে আঁকবেন তিনি আজ মিথ্যাবাদী, বুর্জোয়ার এবং সাম্রাজ্যবাদের দালাল। প্রগতিশীল সাহিত্যিক আজ এই খণ্ডিত বাস্তবকে সমগ্র বাস্তব বলে না দেখে তাঁর সাহিত্যে দেখাবেন কি করে আজকের সংগ্রামের আগুনে শ্রমিকের জীবনের এই সব ক্লেদ পুড়ে যাচ্ছে, কি করে

সংগ্রামী শ্রমিক এবং মেহনতী জনতা ক্রমান্বয়ে যুদ্ধের শিবিরে শামিল হচ্ছে আর গ্রহণ করছে শ্রমিকশ্রেণী তার অগ্রণী ভূমিকা। সমাজবাদী বাস্তবতাকে জীবনদর্শন হিসেবে গ্রহণ না করলে শ্রমিক-জীবনের এই প্রকাশ এবং এই ভবিষ্যৎ দেখাবার ক্ষমতা সাহিত্যিকের আসবে না; তিনি এখনও ক্ষয়িষ্ণু ধারাকেই (যেমন অচিন্ত্য, তারাশঙ্কর, অন্নদাশঙ্কর) বর্ধিষ্ণু বলে দেখবেন এবং হতাশায় নিজেও ডুববেন (যেমন 'হাসুলীবাঁকের উপকথা'য়), অপরকেও ডোবাবেন অথবা পুঁজিবাদের স্তবগান করবেন উপায়ান্তর না দেখে।

কিন্তু শ্রমিক-জীবনের তথা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে শামিল বহু মানুষের সত্যিকারের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে না এলে এই ক্রমবর্ধমান সংগ্রামী সৃষ্টিশীল মানুষ সাহিত্যভাত করার চেষ্টা যান্ত্রিক স্তবগানে পর্যবসিত হবে। বাস্তবের উপরেই কল্পনা গড়ে ওঠে,‐ একথা মার্কসিজমের গোড়ার কথা। সে কথা ভোলা মানে পঙ্গু সাহিত্য সৃষ্টি করে, এই সংগ্রামের মিথ্যা যান্ত্রিক চিত্র এঁকে, সংগ্রামী মানুষের সাহিত্যিকের উপর থেকে আস্থা নাশ করা এবং সাধারণ মানুষের কাছে এই যুদ্ধকে অবাস্তব করে তোলা। আজকাল এই ভাবেই বুর্জোয়ারা নিজেদের সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে, যেখানে সেখানে 'সর্বহারার' আমদানি করছে। সমাজ-বাদী বাস্তবতা শ্রমিক-জীবনের এই মৌলিক সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করে তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা চিত্রিত করেন এবং সেই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকের এবং সমস্ত মেহনতী মানুষের সমস্ত জীবনকে দেখান। তাই তিনি আদর্শবাদী, তাই তিনি রোমান্টিক। তিনি জীবনের ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন না, জীবনের গভীরে প্রবেশ করেন। তিনি শ্রমিকের প্রতি কৃপা করে 'সহজিয়া' সাহিত্যের জলো রস পরিবেশন করে দায়িত্ব এড়াতে চাইবেন না। তিনি পার্টিজান লেখক হয়ে তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনাকে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর স্তরে উন্নীত করবেন, বিস্তৃত করবেন নিজের আঙ্গিকের প্রকাশ ক্ষমতা। আজকের দিনে তাঁকে বলতেই হবে—তিনি কোন পক্ষে—'On which side are you, masters of culture'? 'শ্রেণীসংগ্রামের চরম পর্যায়ে প্রগতি সাহিত্য মূলত সমাজবাদী চেতনা ও শ্রেণীসংগ্রামের সাহিত্য' বলে নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে বসে থাকলে তিনি শ্রেণী-মিলনের ভাঁওতায় পড়বেন। এমন কি ক্রিটিকাল রিয়ালিজমের বুলিও তাঁকে বাঁচাতে পারবে না, কেননা আজকের পাঠক আর ক্লেদের সমালোচনা চায় না, চায় ক্লেদ দূরীকরণের সংগ্রামী চিত্র।*

---

* পরিচয়, নবপর্যায়' তৃতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৬ পৃ ৪৪-৫৯; এই প্রবন্ধটির শিরোনামের উপরে মুদ্রিত ছিল 'আলোচনার জন্য' এবং নীচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা ছিল "পৌষ সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের আলোচনা"। প্রবন্ধ-লেখকের নামের আগে 'শ্রী' শব্দটি আমরা বর্জন করলাম। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজনমতো সংশোধন করা হয়েছে।—সম্পাদক

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা"/নীরেন্দ্রনাথ রায়

মার্কসবাদী সাহিত্যিকগণের চেতনা হইতে সংস্কারবাদের মোহ উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে 'পরিচয়'-কে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্র গুপ্ত যে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রগতিশীল সংস্কৃতিবিদ মাত্রেই কৃতজ্ঞতাবোধ করিবেন। সাহিত্যের ও বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিচারে কিভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছিতে হইবে—এই প্রশ্ন কিছুকাল ধরিয়া মার্কসবাদী সাহিত্যিকগণকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা করিলে ইহার মীমাংসা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিবে। কিন্তু অসুবিধা হইতেছে এই যে, রবীন্দ্র গুপ্ত এই একটি প্রবন্ধে সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজবিপ্লব সম্বন্ধে এতগুলি আলোচনা-সাপেক্ষ উক্তি ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন যে, একটি প্রবন্ধে তাহাদের প্রত্যেকের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তাই আমি বাছিয়া লইব মাত্র কয়েকটি উক্তি যেখানে আমি বিশেষ বাধা পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস, সেইগুলি গ্রহণে আমার বাধা দূর হইলে অন্যগুলিতে অসুবিধা হইবে না।

ক. ভারতে ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে মার্কস্‌-এর অভিমত

রবীন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন :

"ভারতের ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তা প্রগতিশীল ধারা নয়, বরং তার উল্টো ধারা। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ-শাসন প্রগতির সূত্রপাত করেছিল—একথা যদি সত্য হয়, তবেই এদের ধারাকে প্রগতিশীল বলা যায়।...কিন্তু মার্কস কখনও একথা বলেন নি যে ভারতে ইংরেজ-শাসন একটি প্রগতিশীল শক্তি।"

এই উক্তি গ্রহণে আমার বাধা আছে। আমার ধারণা, এ উক্তিতে ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসের সিদ্ধান্তকে আংশিকভাবে

প্রতিফলিত করা হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে নয়। সেইজন্য মার্কস ১৮৫০ সালে এই বিষয়ে যে-দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—যাহা এখনও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত—তাহাদের পুনরায় সম্পূর্ণভাবে স্মরণ করা আবশ্যক।

ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কস বলিতেছেন যে, মোগল সম্রাট, মোগল সুবেদার, মারাঠা ও আফগান-শক্তির পরস্পর-বিরোধিতার ফলে শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, জন্মগত-জাতিগুলিরও (castes) পরস্পর-বিরোধিতার ফলে, তখনকার ভারতীয় সমাজ এমনই শতধা-বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে বিজিত না হইয়া তাহার অন্যরূপ ভাগ্য সম্ভব ছিল না। ["Such a country and such a society, were they not the pre-destined prey of conquest?...India then could not escape the fate of seeing conquered".] তাই মার্কস্-এর মতে, প্রশ্ন এই নয় যে, ভারতকে জয় করার ন্যায্য অধিকার ইংরেজদের ছিল কি না। প্রশ্ন এই যে, ইংরেজের বদলে যদি অন্য কোনো জাতি—যথা, তুরস্ক, পারস্য অথবা রুশিয়া—ভারত জয় করিত, তাহা আমরা পছন্দ করিতাম কি না। মার্কস বলেন, না—তাহা আমরা করিতাম না। মোগল প্রভৃতি অন্য জাতিরা পূর্বে ভারত জয় করিলেও তাহারা বিজিত ভারতীয়দের উন্নততর সভ্যতার দ্বারা নিজেরাই বিজিত হয়, কিন্তু ইংরেজ শাসকেরাই প্রথম ভারতে আনিল উন্নততর সভ্যতা, যা ভারতীয় সভ্যতার নাগালের বাহিরে ছিল। ইংরেজ আসিয়া ভারতে বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত অর্ধ-অসভ্য অর্ধ-সভ্য গ্রাম্য গোষ্ঠীজীবনকে শিথিল ও তাহার আর্থিক ভিত্তিকে চূর্ণ করিয়া দিল। ইহার ফলে যাহা ঘটিল তাহাকে মার্কস বলিতেছেন, "এশিয়ার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, এমন কি সত্য কথা বলিতে গেলে, **একমাত্র সামাজিক** বিপ্লব। (বড় হরফ মার্কস্-এর)। ["...dissolved these small semi-barbarian semi-civilised communities by blowing up their economical basis and thus produced the greatest, and to speak the truth, the *only social* revolution ever heard of in Asia."]

ইহা হইতে কি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না যে, মার্কসের মতে ইংরেজের ভারত-বিজয় কেবল একদেশ কর্তৃক অন্য দেশ বিজিত হওয়ার মতো নিছক

রাজনৈতিক ঘটনা নয়, ইহার তাৎপর্য ব্যাপকতর ও গভীরতর? তাই তিনি ইহাকে **এশিয়ার একমাত্র সামাজিক বিপ্লব** আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধনে ইংরেজ শাসকবর্গের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কত নীচ ছিল ও তাহারা কি ভীষণ পাশবিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা মার্কস্‌-এর দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু তবুও তিনি বলিতেছেন, ইহাই আসল প্রশ্ন নয়। তাঁহার মতে আসল প্রশ্ন এই যে, এশিয়ার সামাজিক জীবনে আমূল বিপ্লব না ঘটিলে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়তি সফল হওয়া সম্ভব কি-না। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে ইংলণ্ড যত পাপই করুক না কেন, সে এই বিপ্লব ঘটাইয়া নিজের অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। ["England, it is true, in causing a social revolution in Hindustan was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia ? If not, whatever may have been the crime of England, she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution."] ইহার পরে কি করিয়া বলা চলে যে, মার্কস্‌ কখনও বলেন নাই যে ভারতে ইংরেজ-শাসন একটি প্রগতিশীল শক্তি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে, মার্কসবাদের শিক্ষা যে, ইতিহাসে প্রগতির ধারা কখনও একটি রেখা বাহিয়া অগ্রসর হয় না, তাহার গতি দ্বান্দ্বিক, পুরাতন ও নূতনের অন্তর্বিরোধের ভিতর দিয়াই তাহার আত্মপ্রকাশ। ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কস্‌ তাই স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন—ভারতে ইংলণ্ডের করণীয় কাজ দ্বিবিধ। একটি ধ্বংসাত্মক, অন্যটি নবসৃজনশীল; একটি প্রাচীন এশিয়াব্যাপী সমাজ-ব্যবস্থার একান্ত উচ্ছেদ, অন্যটি এশিয়াতে পাশ্চাত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন। ["England has to fulfil a double mission in India : one destructive and the other regenerating : the annihilation of old Asiatic society and the laying of the material foundation of western society in Asia."]

ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসশীলতা সত্ত্বেও কোনগুলিকে মার্কস্ ভারতে নব-জীবনের লক্ষণ মনে করিতেন তাহাও তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন :

১) ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য—বিখ্যাত মোগলদের আমলে যে ঐক্য হইয়াছিল তাহার চেয়েও বিস্তৃততর ও দৃঢ়তর—ইহা হইতেছে ভারতের নবজীবনের প্রথম শর্ত। এই ঐক্য ভারতের উপর চাপাইয়া দিয়াছে ইংরাজের তরবারি, কিন্তু এখন ইহাকে শক্ত ও স্থায়ী করিবে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ। ২) ভারতীয় সেনাবাহিনী ইংরেজ ড্রিল-সার্জেণ্টের অধীনে শিক্ষিত ও সংগঠিত হইয়া ভারতীয় আত্মমুক্তির অপরিহার্য অঙ্গ হইবে। ৩) স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র—ভারতীয় ও ইংরেজের যৌথ-পরিচালনায় এশিয়ার সমাজে প্রথম প্রবর্তিত হইয়া ভারতের পুনর্গঠনে হইবে নূতন ও শক্তিশালী হাতিয়ার। ৪) ভারতের অধিবাসীগণের ভিতর হইতে কলিকাতায় ইংরেজের তত্ত্বাবধানে, অনিচ্ছায় ও কৃপণভাবে শিক্ষিত হইয়া উদ্ভূত হইতেছে একটি **নূতন শ্রেণী** যাহারা ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশ-শাসনের উপযুক্ত শক্তি অর্জন করিতেছে। ["From the Indian natives, reluctantly and sparingly educated at Calcutta under English superintendence, a *fresh class* is springing, endowed with the requirements of Government and imbued with European science"] (বড় হরফ আমার)

বলা বাহুল্য, এই শেষ লক্ষণটি একান্ত প্রযোজ্য কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম রামমোহন ও হিন্দুকলেজের বিস্ময়কর প্রতিভাশালী তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওর অনুবর্তীগণের পক্ষে। তাই ভারতের নবজীবন সৃজনে রামমোহন ও ডিরোজিওর প্রভাব প্রগতিশীল নয়, প্রতিক্রিয়াশীল—এই মন্তব্য মার্কস্‌বাদ-সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা পাইতে হয়।

ইংরেজ-শাসনের এই নবসৃজনশীল সুফল সত্ত্বেও ইহাতে যে, ভারতীয়গণের দুঃখদুর্দশার অবসান হইবে না, যতদিন না ভারত ইংরেজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হয়,—ইহাও মার্কসের অজানা ছিল না। তিনি জানিতেন, ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ভারতের উৎপাদন শক্তি বাড়াইয়া দিলেও তাহার ফলোপভোগে ভারতবাসীকে বঞ্চিত রাখিবে। ইহাই ধনবাদের ধর্ম। তবুও ব্রিটিশ বুর্জোয়া

ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পথ সুগম না করিয়া পারিবে না। ধনবাদের নিকট ইহার চেয়ে বেশী কিছু প্রত্যাশা করিলেই ভুল হইবে।

ভারতে বুর্জোয়া আদর্শে অনুপ্রাণিত রামমোহন-প্রমুখ চিন্তানায়কগণের বিরুদ্ধে আজ যে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহার আসল উৎস এইখানে। ইহা নিশ্চিত, ভারতে ব্রিটিশ-শাসনকে মার্কস যে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখিয়াছিলেন, রামমোহন তাহা পারেন নাই। মার্কস-এর প্রতিভা রামমোহনের ছিল না এবং রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে—মার্কসবাদের প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" প্রকাশের বছর পনের পূর্বে। একথা ঠিক যে, রামমোহন ভারতে ইংরেজ-শাসনের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, তাঁহার মনে বা তাঁহার পরিচালিত আন্দোলনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বা পরাধীনতার গ্লানি ছিল না। তাঁহার অক্ষমতা এই যে, বুর্জোয়া সভ্যতার প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহার অসম্পূর্ণতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে নাই—যেমন পারিয়াছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতারা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি মার্কস-এঙ্গেলস্‌-এর পূর্বে অন্য কাহারও নিকট আশা করা অযৌক্তিক। তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষমতা এই যে ইংরেজের দুটি রূপ—নিজের দেশে প্রগতিশীল ইংরেজ ও পরাধীন দেশে শাসকরূপে ইংরেজ—ইহাদের পার্থক্য তিনি ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার দুরাশা ছিল এই যে, ইংরেজ যেমন তাহার নিজের দেশে ক্রমশ বিস্তৃততর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে, ভারতেও তাহারা অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া ভারতকে উন্নত করিয়া তুলিবে, ইংরেজের শিক্ষায় ভারত স্বাধীন হইবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্যই ইংরেজীর মারফত গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ভারতবাসীর বহুদিন ধরিয়া পাওয়া দরকার। আজ এ দৃষ্টিভঙ্গিকে সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল বলিতে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না—১৮৫৩ সালে মার্কস-এরও এই ধারণা ছিল যে, ভারতে ইংরেজ-শাসন স্বল্পকালস্থায়ী ব্যাপার নয়, তাহার উচ্ছেদের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হইবে। কিভাবে ভারত স্বাধীন হইতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মার্কস লিখিতেছেন যে, ব্রিটিশ বুর্জোয়া ভারতীয় সমাজের নানা অংশে যে-নূতন উপকরণ আনিয়া দিল, তাহার সুফল ভারতীয়েরা ততদিন উপভোগ করিতে পাইবে না, যতদিন না ইংলণ্ডের তখনকার

বুর্জোয়া শাসকেরা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা উৎপাটিত হইবে; কিংবা যতদিন না ভারতীয়েরা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে যে তাহারা নিজের শক্তিতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিতে পারিবে। তিনি বলিতেছেন—ভারতের নব-জাগরণ ঘটিবেই, যদিও তাহার জন্য **কমবেশী দীর্ঘ সময়** লাগিবে। ["The Indians will not reap the fruits of the new elements of society scattered among them by the British Bourgeoisie, till in Great Britain itself the now ruling classes shall hav been supplanted by the industrial proletariat, or till the Hindus themselves shall have grown strong enough to throw off the English yoke altogether. At all events we may safely expect to see *at a more or less remote period* the regeneration of that great and interesting country."] (বড় হরফ আমার)।

দেখা যাইতেছে যে, মার্কস-এর অলৌকিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এখানেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ইংলণ্ডে লেবর পার্টি শাসকশ্রেণীতে উন্নীত হইলেও যে-সামাজিক বিপ্লব মার্কস-এর ধ্যানদৃষ্টির গোচর ছিল, তাহা সাধিত হয় নাই। ভারতের সমাজবিপ্লবও এখনও স্থগিত হইয়া আছে। মার্কসবাদের সূত্রানুসারে যে-শক্তি ভারতে ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটাইতে পারিবে, তাহা হইতেছে ভারতের নবজাগ্রত শ্রমিকশ্রেণী, অবশ্য কৃষক ও মধ্যবিত্তের সহযোগিতায়। সেই শ্রমিকশ্রেণী এখনও ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রেণীসচেতন ও সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই যে "স্বাধীনতা" ভারতে চালু করা হইয়াছে, তাহা মার্কসবাদী স্বাধীনতা নহে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এখনও অসমাপ্ত।

কিন্তু ইংরেজ যখন ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া অবাধ বাণিজ্য ও অবারিত লুণ্ঠনের তাগিদে ভারতের ভূমিতে রেলগাড়ীর লাইন পাতিতে বসিল তখনই, মার্কস বলিতেছেন, সে বাস্তব ব্যবস্থা করিয়া দিল ভারতে নতুন শক্তি উদ্ভবের। ইংরেজ আমলে ভারতে যে নূতন শ্রমশিল্পের প্রবর্তন হইল – যাহার গর্ভে প্রসূত হইবে ভারতীয় বুর্জোয়া ও ভারতীয় প্রলেটারিয়েট— রেলগাড়ী হইতেছে তাহার অগ্রদূত। এই বিরাট দেশে নানাদিকে রেলগাড়ী

চালাইতে গেলে শুধু রেল চালাইবার জন্য প্রয়োজন যে শ্রমশিল্প, কেবল তাহারই ব্যবস্থা করিলে চলে না, পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রমশিল্পেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্থাৎ ভারতের সনাতন সামন্তবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া ধনবাদী শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করিতে হয়। হইলও তাহাই। ভারতের শ্রমশিল্পের সবটাই ইংরেজের করায়ত্ত রহিল না, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় বুর্জোয়ারও সৃষ্টি হইল। ইহাদের নেতৃত্বে ১৯১৯-২২ সালে ভারতে যে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ পরিচালিত হয়, ১৯২৮ সালে কমিণ্টার্নের ষষ্ঠ বিশ্ব-কংগ্রেসের রিপোর্টে তাহা "প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন" ["This first great anti-imperialist movement in India (1919-1922)"] বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মানুসারে বুর্জোয়ার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীও জন্ম নিতে বাধ্য। বুর্জোয়া বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিকাশ হয়, যদিও উভয়ের গতিবেগ একই মাত্রা মানিয়া চলে না। প্রথমে বুর্জোয়ারা হয় শক্তিমান, শ্রমিকের শক্তি আসে পরে। ভারতীয় বুর্জোয়ার জন্মকাল মোটামুটি ধরা হইয়া থাকে ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে, যদিও তাহার প্রথম প্রকৃত উদয় ১৮৭৫ সালে। আর ভারতীয় শ্রমিকের শক্তির প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ বিশ শতকের প্রথম দশকে। যে সামাজিক শক্তিপুঞ্জ অবশেষে ইংরেজ-শাসনের অভিশাপ হইতে ভারতবাসীকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে সমর্থ, তাহার স্বরূপ বুঝিতে এই সুবিদিত সময়-নির্ঘণ্ট মনে রাখা দরকার।

খ. সিপাহী-বিদ্রোহের শ্রেণীচরিত্র

এই মার্কসীয় নিরিখে ইংরেজ-শাসিত ভারতে সমাজবিপ্লব ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেণী-বিশ্লেষণ ও তাহাদের পরস্পর-সম্বন্ধ বিচার করা যায়। ইংরেজ ভারতে লইয়া আসিল সুধা ও বিষ, সামাজিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক দাসত্ব— এই তাহার দ্বৈতরূপ। পরাধীনতা বাদ দিয়া যদি ভারতের সামন্তবাদের অচলায়তন ধ্বংসের জন্য তাহারই ভিতর হইতে ইংলণ্ডের প্রভাবে বুর্জোয়া ধনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, যেমন হইয়াছিল ইওরোপের নানা দেশে, তাহা হইলে ভারতে সমাজবিপ্লবের ইতিহাসের ধারা হইত অন্যরূপ। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ধর্মান্দোলন অনড় সামন্তবাদের অভ্যন্তরে যে

গতিবেগের সঞ্চার করিতেছিল, তাহার স্পন্দন ছিল অতি মৃদু, কারণ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোনো স্তরে তাহার ভিত্তি গাঁথা ছিল না। তাহা হইতে স্বতঃউৎসারিতভাবে কোনো ভবিষ্যৎ যুগে ধনবাদের উদ্ভব হইতে পারিত কি না, ইহা এখন পুঁথিগত গবেষণার বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কারণ, ইতিহাস এই শম্বুকগতি বিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে নাই। পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ইংরেজ ভারতে তথা এশিয়ায় ধনবাদের বুনিয়াদ রচনার প্রথম প্রস্তর স্থাপিত করিল, ভারতে ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত হইল, যাহাতে ভারত তাহার পূর্বতন অতীত ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ["···Seperates Hindusthan, ruled by Britain from all its ancient traditions and from the whole of her past history."]

কিন্তু পরাধীন দেশে সমাজবিপ্লব অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না —পরাধীনতার শৃংখলই তাহার মস্ত বাধা। ধনবাদের প্রকৃত ধর্ম সামন্তবাদের উচ্ছেদ। কিন্তু এমনকি স্বাধীন দেশেও ধনবাদী শাসকেরা এ-ধর্ম পূর্ণ পালন করে না। অর্ধেক পথ অগ্রসর হইয়াই সামন্তবাদের সহিত আপস করে নির্বিত্তশ্রেণীর অগ্রগমনে ভীত হইয়া। এই প্রবৃত্তি ঔপনিবেশিক দেশে আরও প্রবল হইবার কথা। ভারতের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। ধনবাদী ইংরেজ পরাধীন ভারতে সামন্তবাদকে পরাভূত করিয়াও উচ্ছেদ করিল না, পদানত করিয়া রাখিল। এবং তাহার প্রভাবে শ্রমশিল্পের উদ্ভব বিলম্বিত ও প্রসার স্থগিত করিয়া রাখিল আপন স্বার্থের সংরক্ষণে। যে-নির্জীব সামন্তবাদকে, দেশীয় নবাব-রাজা-মহারাজা-গণকে জীয়াইয়া রাখা হইল, তাহারাই হইল—মার্কসের মতে—ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রধান স্তম্ভ, যদিও ইহাদের হতমান করিয়াই ইংরেজ ভারতে রাজ্যাধিকার পাইয়াছিল। এই স্তম্ভগুলিকে উৎপাটিত করিতে না পারিলে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটানো অসম্ভব।

তাই ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামেরও দুইটি রূপ, দুইটি ধারা এবং দুটি ধারাই বিপ্লবী। একটি ধারা—প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত, সিরাজের চেষ্টা সফলে হইলে এই ধারার প্রয়োজন থাকিত না। তাই ইংরেজের বিরুদ্ধে সিরাজের সাময়িক সাফল্য মার্কস-এর চোখে মহীয়ান। এই ধারার শেষ অধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহ। নীল, সন্ন্যাসী, সাঁওতাল, ওয়াহাবি প্রভৃতি আন্দোলনের

কোনটিই বিক্ষোভের অতিরিক্ত বিদ্রোহের পর্যায়ে উঠিতে পারে না, সিপাহী-বিদ্রোহের সহিত তুলিত হইতে পারে না। সিপাহী-বিদ্রোহ ইংরেজশাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে শেষ সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহার গৌরবময় ভূমিকা কোনো মার্কসবাদী সাহিত্যিক কোনোদিন অস্বীকার করা দূরে থাকুক, কখনও অশ্রদ্ধা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তাহারা জানেন—মার্কসের মতে—এখানেও আসল প্রশ্ন এই নয় যে, বিদ্রোহের নেতৃত্ব কাহার হাতে ছিল। মূল কথা এই যে, ভারতীয় জনগণের একাংশ হিন্দু-মুসলমান সৈনিক ও কৃষক, বিদেশীর শোষণে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া লড়িয়াছিল বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য। তাহাদের বীরত্বের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। এইজন্যই মার্কস ইহাকে "বিরাট জাতীয় বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'জাতীয়' কথাটি স্টালিন-নির্দিষ্ট অর্থে প্রযোজ্য নহে, কারণ, স্টালিন দেখাইয়াছেন, আধুনিক ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পূর্বে কোনো দেশে আধুনিক 'জাতি' গড়িয়া উঠিতে পারে না। বৃহৎ জনগোষ্ঠীগুলি—'পিপল্স্'——জাতি অথবা 'নেশন'-এ পরিণত হয় ধনতন্ত্রের বিকাশের তাড়নায়। তবুও মার্কস ইহাকে 'জাতীয়' বলিয়াছেন এই জন্য নয় যে, ইহাতে ভারতের সমগ্র জনসাধারণ—এমন কি তাহার বহুলাংশও যোগ দিয়াছিল। 'জাতীয়' এই জন্য যে, ইহাতে ভারতীয় সমাজের দুইটি বিরোধী অঙ্গ—হিন্দু ও মুসলমান ও তখনকার সমাজের সবচেয়ে শোষিত অংশ—কৃষক ও সৈনিক—মিলিত হইয়া রাজ্যলোলুপ বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিল।

কিন্তু 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যে, মার্কস ইহাকে "কৃষক-বুর্জোয়া" বিপ্লব, বা "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রথম ধাপ বলিয়াছেন। বস্তুত "কৃষক-বুর্জোয়া"—এই কথাটি নূতন রচনা বলিয়া আমার বিশ্বাস অন্তত সুপ্রচলিত নহে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইহাকে অকস্মাৎ প্রয়োগের পূর্বে ইহার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। আর পূর্বে উল্লিখিত সময়-নির্ঘণ্ট মনে রাখিলে কি করিয়া সিপাহী-বিদ্রোহকে "বুর্জোয়া-গণ-তান্ত্রিক" বিপ্লব বলা যায়? "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" শব্দটি মার্কসীয় সাহিত্যে সুপরিচিত, তাহার অর্থ নেহাৎ অস্পষ্ট নয়। যে-বিদ্রোহে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় না, তাহাকে বুর্জোয়া-বিপ্লবের অন্তর্গত ভাবিতে পারা খুবই কঠিন।

১৮৫৭ সালে ভারতে বুর্জোয়া তথা প্রলেটারিয়েটের জন্ম হইয়াছিল, একথা ইতিহাসে লেখে না। স্বাধিকারচ্যুত ফিউডাল সামন্তগণের একাংশ ও দিল্লী-মিরাট-কানপুর-লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের কৃষক-সৈনিক, ইহাদের সম্মেলনে এই বিদ্রোহ। বাঙলাদেশে এই বিদ্রোহের সূচনা হইলে বাঙলার কৃষক ইহার সমর্থনে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্ষুব্ধ হয় নাই। মার্কস বিদ্রোহপরায়ণ কৃষক-সৈনিকশ্রেণীর বীরত্বের গুণগান করিয়া তাহার লেখনীর সমস্ত বিষ ঢালিয়া দিয়াছেন ফিউডাল সামন্তবর্গের বিরুদ্ধে, যাহারা জনসাধারণের বিক্ষোভের বিরোধিতা করিয়া বিদেশী শাসক ইংরেজের সহায়তা করিয়াছিল।

কিন্তু ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপর বিপ্লবী শক্তি—যে-শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ ফিউডালবাদের উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, যে-শক্তি ছিল বিপ্লবী বুর্জোয়া ভাবধারার বাহক—তাহাকে বিচার করিয়া মার্কস "প্রতিক্রিয়াশীল" আখ্যা দিয়াছিলেন, এমন কথা 'সোভিয়েট ল্যাণ্ডের' উক্ত প্রবন্ধে দেখা যায় না। বুর্জোয়াশ্রেণী পরিণামে যতোই প্রতিক্রিয়াশীল হউক না কেন, প্রথম যুগে তাহাদের ভূমিকা থাকে প্রগতিশীল—'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র প্রকাশের সময় হইতে এই তথ্য মার্কসবাদীদের সুপরিচিত। রামমোহন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ছিলেন এই বিপ্লবী ধারার সঞ্চালক। তাঁহারাই সুগম করিতেছিলেন ভারতে স্বাধীন চিন্তার পথ, সূচনা করিতেছিলেন প্রাচীন ভূমিব্যবস্থার বিলোপে শ্রমশিল্পের প্রবর্তনের অনুকূল পরিবেশ। বুর্জোয়া ব্যবস্থা এদেশে স্বাধীনভাবে না আসায় এই বিপ্লবী ধারাও শীর্ণকায় ও অপরিস্ফুট হইতে বাধ্য—ইওরোপীয় বিপ্লবের তুলনায়। তবু তাহাদের একই গোত্র। তাই, বিশ্বপ্রসারী বুর্জোয়া সভ্যতার বিচিত্র প্রকাশে রামমোহনের এত খরদৃষ্টি। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তুলনায় এই বিপ্লবী ধারায় হাতে হাতে ফল পাইবার আশা করা যায় না বটে, তবে এই খাতেই বহিয়া গিয়াছে ইতিহাসের মূল ধারা। সিপাহী-বিদ্রোহে কৃষক-সৈনিকের বীরত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে তাহার ব্যর্থ পরিণামও ছিল অবধারিত। বুর্জোয়া ও তৎপ্রসূত গণশক্তির আবির্ভাবের পূর্বে ইংরেজ অধিকারকে উৎপাটিত করার ক্ষমতা ভারতে ছিল না। সিপাহী-বিদ্রোহের সুযোগে ভারত আমেরিকা হইতে পারিল না, ইহাতে হুতোম বিক্ষুব্ধ হইয়া বাঙালী বাবুদের বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু মার্কস ঠিকই বলিয়াছিলেন, ভারত হইতেছে "এশিয়ার

আয়র্ল্যাণ্ড," আমেরিকা নহে। আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের করচ্যুত হয় (১৭৭৬ সাল) সে ইংলণ্ড ও ১৮৫৭ সালের অপ্রতিহত বলশালী ইংলণ্ড একই পদার্থ নহে। আর ভারতের মতো আয়র্ল্যাণ্ডেও বুর্জোয়া শক্তির উদ্ভব না হওয়ায় ওদেশ আজিও রাজনৈতিকভাবে বাহ্যত স্বাধীন হইলেও অর্থনৈতিকভাবে কার্যত ব্রিটিশ ধনবাদের তাঁবেদার।

সিপাহী-বিদ্রোহ যখন সংঘটিত হয়, তখন মার্কস যেগুলিকে বলিয়াছেন ভারতে ইংরেজ-শাসনের নবসৃজনশীল শক্তি, সেগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৪৯ সালে জোর করিয়া পাঞ্জাব দখলের পর বলা যাইতে পারে—আসমুদ্র-হিমাচল সমুদয় ভারতবর্ষ ইংরেজের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ। রেল ও টেলিগ্রাফের জাল দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। দেশীয় সৈন্যবাহিনী তাহাদের উপর হৃদয়হীন অত্যাচার সত্ত্বেও ব্রিটিশ শৃংখলে আবদ্ধ—যাহার ফলে সিপাহী-বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল অতি সংকীর্ণ গণ্ডিতে। ভারতে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে, যাহার মহিমায় 'হুতোম'-ও স্বীকার করেন যে তিনি মুখ খুলিয়া কথা কহিতে পারেন। আর প্রস্তুত হইয়াছে একটি নূতন শ্রেণী—ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে দীক্ষিত ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়। সিপাহী-বিদ্রোহের সমসাময়িক কালেও ভারতীয় ইংরেজ-শাসকের মধ্যে অনেকে এই শ্রেণীকে ইংরেজ-শাসনের বৃহত্তর অন্তরায় মনে করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এম্. আর. গাবিনস্ (M. R. Gubbins) প্রণীত An Account of the Mutinies in Oudh নামক গ্রন্থে। বইটির তৃতীয় সংস্করণ লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। গাবিন্স্ বলেন—"আমার বিবেচনায় ভারতে আমাদের রাজত্ব করার পথে, অযথা পিছাইয়া যাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী ভয় করার আছে ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যধিক অগ্রসর হওয়াতেই।" [I think that our rule in India has more to fear from future excessive innovation in matters of education etc. than from any improper retrogration."] ইংরেজী শিক্ষাই তাহাদের চিত্তে জাগাইয়া দিতেছিল গভীর স্বদেশপ্রীতি ; প্রমাণ—ডিরোজিও-র বিখ্যাত ইংরেজী কবিতা "ভারতমাতার প্রতি"। ইহারা ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে অধিকার স্থাপনে অতিমাত্রায় ব্যগ্র কেবল কতকগুলি বড়ো চাকুরী পাইবার মোহে নহে ; ফরাসী বিপ্লবের মূল শিক্ষার অন্যতম—যাহার প্রতিভা আছে তাহার পথ খুলিয়া

রাখিতে হইবে—তাহাদের জীবনমন্ত্র। এই মানবিক অধিকারের দাবিতে তাহারা ভারতের শাসনযন্ত্রে ভারতবাসীর অনধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিল। তাহারা ছিল তখনকার দিনের বস্তুবাদী—মিল, বেন্থ্যাম, কোঁৎ মায় অ্যাডাম স্মিথ তাহাদের আচার্য স্থানীয়। তাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে এক ধর্ম হইতে অন্য ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নয়, ভারতের পুঞ্জীভূত স্থিতিশীলতাকে সবেগে আঘাত করার জন্য। হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন তখন তাহাদের মনে জাগে নাই, কারণ তখন সে প্রশ্নই ছিল নিরর্থক ; তখন দুইটি মাত্র বিরোধী শক্তি—ভারতীয় ও ইংরেজ। দেশের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাহারা খড়্গহস্ত, দেশের দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিতে বেদনার্ত, তাই তাদের সমর্থন ধর্মাধর্ম-নির্বিশেষে শোষিত কৃষকের পক্ষে, অশুচি চণ্ডালের পক্ষে। আচারে-বিচারে, কর্মে-বিশ্বাসে, পুরাতনকে পরিত্যাগ ও নূতনকে গ্রহণ মার্কসীয় বিজ্ঞানসম্মত প্রগতির এই চিরন্তন উৎস হইতে বাঙলা দেশে তথা ভারতে বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রথম উদ্ভব। ঔপনিবেশিক পরিবেশে এই উৎস স্বভাবতই স্বল্পপ্রাণ, তথাপি ইহার ছিল গুণগত উৎকর্ষ, ভবিষ্যতে প্রসারিত হইবার অমোঘ নিয়তি। এবং ইহারই শিল্পগত প্রকাশ, বাঙলা দেশের বুর্জোয়া সাহিত্য। তাই, যতই তাহার অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তাহাকে প্রগতিশীল বলিয়া স্বীকার না করা, তাহাকে সমগ্রভাবে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলিয়া নিন্দা করা —মনে হয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসীয় বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ।

গ. সাহিত্য-বিচারে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানের মূলসূত্র

ইংরেজ-শাসনের অব্যবহিত ফল হিসাবে বাঙলাদেশে যে সাহিত্যের জন্ম, রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যাহার বিস্তার, তাহাকে বাংলা সাহিত্যের "স্বর্ণযুগ" বলা যাক বা না যাক, মার্কসীয় পদ্ধতিতে তাহার বিচার করিতে গেলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য-বিচারের মূলসূত্র : সাহিত্য হইতেছে সামাজিক বাস্তবের প্রতিফলন। সমাজের স্তরে স্তরে শ্রেণী-সংঘর্ষের প্রভাবে নিত্য যে আলোড়ন চলিতেছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে তাহাতে সাড়া দেয়। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া নির্ধারিত হয় সমাজের বিন্যাস কিভাবে পরিবর্তিত হইবে ও সমাজের গতি হইবে কোন দিকে। সাহিত্য এই শ্রেণীচেতনা হইতে সৃষ্ট হইয়া সামাজিক পরিবেশের

উপর প্রতিঘাত করে। মার্কসীয় মতে ফিউডাল হইতে বুর্জোয়া ও তাহা হইতে সমাজবাদ এই অভিমুখে পরিবর্তন ঘটাই সামাজিক প্রগতির লক্ষণ। রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ পর্বের সাহিত্য-বিচারে আমাদের সর্বদা এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে তাহা এই অভিবর্তনে সহায়তা করিতেছিল কিনা, এই সাহিত্যের প্রভাব ছিল শ্রেণীসংগ্রামের কোন পক্ষে। ইহা কি পুরাতন মনোভাব জীয়াইয়া রাখিতেছিল, না নূতনের জন্য পথ কাটিয়া দিতেছিল। এইভাবেই সাহিত্য-বিচারকে ব্যবহার করা চলে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার রূপে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এই বিচারে রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন নিরিখ স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই সাহিত্যের শ্রেণীবিচারের একমাত্র নিরিখ হইতেছে তাহা **প্রত্যক্ষভাবে** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ ও তাহার অত্যাচারকে উদ্ঘাটন করিয়াছিল কিনা (বড় হরফ আমার)। বলা বাহুল্য, এ বিচার সাহিত্যিক নহে, রাজনৈতিক। সেই সঙ্গে ইহাও জোর করিয়া বলা দরকার, এই খণ্ডিত মাপকাঠি দিয়া সাহিত্যের গুণবিচার একদেশদর্শী না হইয়া পারে না। সাহিত্য যাহার প্রতিফলন সেই সমাজমানস রাজনৈতিক চেতনার চেয়ে গূঢ়তর এবং সমাজবিপ্লব রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ব্যাপকতর। কোনো বিশেষ আন্দোলন, বিক্ষোভ বা সংগ্রাম, তাহার প্রতি কোন সাহিত্যিকের কি অভিমত, তাহা দিয়া সাহিত্য বিচার করিলে, বিশেষ করিয়া বিগত যুগের সাহিত্য সৃষ্টির বিচার করিলে—নিঃসন্দেহে বিড়ম্বিত হইতে হয়। সাহিত্য-বিচারে লেনিনবাদের স্বরূপ বিবৃত করিতে গিয়া প্রখ্যাতনামা সোভিয়েট সমালোচক মিখাইল লিফ্‌শিৎস বলেন—"অতীত সংস্কৃতির মহৎ প্রতিনিধিগণের চেতনায় বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা পরস্পরকে জড়াইয়া থাকে। ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য। বিপ্লবী আদর্শ কদাচিৎ **প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে** সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।" [The confusion of revolutionary and reactionary tendencies in the consciousness of the great representatives of the old culture is an established historical fact. Revolutionary ideals have seldom been reflected *directly and immediately* in literature."] (বড় হরফ আমার)।

অতীতের মহৎ লেখক, শিল্পী ও মানবিক চিন্তানায়কগণের রচনায় কেন

এই দ্বৈতভাব থাকে, তাহার কারণ দেখাইয়া লিফ্‌শিৎস বলেন, তখনকার দিনের সমসাময়িক গণ-আন্দোলনের অপরিপক্কতা ও ইতিহাসের ধারায় তাহাদের দ্বান্দ্বিক বিকাশ, ইহার মধ্যেই উক্ত দ্বৈতভাবের চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ["The immaturity of mass movements and their contradictory growth in the course of history explain excellently the contradictions in the works of great writers, artists and humanists of the past."]

কি করিয়া এই সাহিত্যের বিচার করিতে হইবে, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন: লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় কেমন করিয়া কোনো শিল্পসৃষ্টিতে তাহার ঐতিহাসিক মর্ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, কেমন করিয়া পৃথক করিতে হয় তাহার মধ্যে মৃত হইতে জীবন্তকে, কেমন করিয়া স্থির করিতে হয় কোন অংশ ভবিষ্যতের অভিমুখী ও কোন অংশ অতীতের দাসত্বে চিহ্নিত। এইরূপ বাস্তব বিচারেই আছে প্রকৃত শ্রেণীগত বিশ্লেষণ ["Leninism teaches us how to discriminate the historical content of works of art, how to seperate the living from the dead in them, how to determine what belongs to the future and what is the mark of a slavish past. In this concrete critique lies a real class-analysis."]

শ্রেণীসংঘর্ষ কিভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাহা বুঝাইতে গিয়া লিফ্‌শিৎস বলেন—সাহিত্যে শ্রেণীসংগ্রাম হইতেছে জনগণের প্রবৃত্তির সংগ্রাম—প্রভুত্ব ও দাসত্বের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, ধর্মগত বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে, নির্মম নৃশংসতার বিরুদ্ধে, সভ্য অপমান ও মিষ্ট ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে। ["The class struggle in literature is the struggle of the peoples' tendencies against the ideology of domination and slavery, against religious sterility, against cruelty, against polite insolence and suavity."]

ব্যক্তির মনে শ্রেণীচেতনা কিভাবে উদ্ভূত ও সঞ্চারিত হয় এই প্রশ্নের আলোচনায় মেনশেভিকদের ধারণা ছিল যে তাহা নির্ভর করে জন্মের উপর। এই ধারণাকে খণ্ডন করিয়া লেনিন প্রমাণ করিয়াছিলেন: কোনো লোকই কোনো বিশেষ শ্রেণীর ভাবাদর্শ লইয়া জন্মায় না, তাহাকে গড়িয়া উঠিতে হয়। প্রলেটারিয়ান ভাবাদর্শ অর্থাৎ মার্কসবাদ শ্রমিকের চেতনার সহজ গাঢ়করণ

মাত্র নয়, তাহার কারখানার স্বতোপ্রসূত ফলাফল নয়। প্রকৃত শ্রেণীচেতনা বিকশিত হয় কেবল মাত্র সমাজের **সকল শ্রেণীর জীবনের সকল রকম প্রকাশের—মানসিক, নৈতিক, রাজনৈতিক**—প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হইতে। ["Lenin proved that class consciousness does not originate automatically. No one is born an ideologist of a definite class ; he becomes one. Proletarian ideology i e. Marxism is not a simple deepening of the psychology of the workers, not a spontaneous consequence of factory conditions. Real class consciousness develops only from observation of the life of *all classes in all its manifestations—mental, moral and political.*"] (বড় হরফ আমার)।

রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ সম্পর্কে এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাতে কি লেনিনবাদী সাহিত্য-বিচারের এই মূল সূত্রগুলি মানা হইয়াছে? ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাঙলাদেশের সাহিত্য, এমন কি ভারতচন্দ্র ও আলাওল পর্যন্ত, ও ইংরেজী আমলের সাহিত্য, রামমোহনে যার শুরু, ইহাদের গুণগত পার্থক্য কি তাহাতে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে? বাংলা সাহিত্যের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে সাহিত্য হিসাবে ইংরেজী আমলের সাহিত্যের তুলনায় তাহার পূর্বের যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ একান্ত নিষ্প্রভ। এই নূতন সাহিত্যের যেমন বৈচিত্র্য তেমনি বিস্তার। এবং এই উৎকর্ষের মূল উৎস নূতন ধনবাদী গণতান্ত্রিক সামাজিক চেতনা। দেশের অগণিত জনসাধারণ শিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় এই নূতন চেতনার অংশভাগ হইতে পারে নাই, নূতন সাহিত্যের আস্বাদ পায় নাই, তবুও তাহাদের অন্তরের কথা অনেকাংশে এই সাহিত্যে রূপায়িত। বিশিষ্ট লেখকগণের রচনায়, বিষয়-নির্বাচনে ও লিখনভঙ্গিতে ব্যক্তিগত ঝোঁকের প্রকাশ থাকিলেও এই যুগের লেখকেরা একই 'স্কুল'-এর লেখক—যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাইরন, শেলী, কীট্‌স, কোলরীজ, স্কট। ইহাদের প্রত্যেকের রচনায় অবিসংবাদিত পার্থক্য সত্ত্বেও ইহারা সকলেই উনিশ শতকের প্রথম পাদের রোমান্টিক কবি। তাই বুর্জোয়া বাংলা সাহিত্যের বিচারে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্ন একদিকে এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে, এইরূপ মূলগত বিচ্ছেদের রেখা টানার চেষ্টা সাহিত্যিক বিচারে যুক্তিসহ নয়। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী পাঠক

'নীলদর্পণ' ও হুতোম-এর সাংস্কৃতিক মূল্য কোনোদিন অস্বীকার করে নাই, যেমন অস্বীকার করে নাই 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' 'মুচিরাম গুড়' ও 'কমলাকান্তের' সাংস্কৃতিক মূল্য। বাংলা নাটকের ইতিহাসে, রচনার শৈথিল্য সত্ত্বেও, 'নীলদর্পণের' শীর্ষস্থান ও স্থানে স্থানে সুরুচির ব্যত্যয় সত্ত্বেও ব্যঙ্গরচনায় হুতোমের শীর্ষস্থান বাঙালী পাঠকের নিকট মোটেই নূতন আবিষ্কার নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইংরেজী আমলের বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্নই কি বাঙালীর সাহিত্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন? এই অসুবিধাজনক প্রশ্ন রবীন্দ্র গুপ্তের মনে জাগিয়াছিল। তাই প্রকাশ রায়ের প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা ঢাকিবার জন্য তিনি মধুসূদনকেও এই দলে টানিয়াছেন তাঁহার "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এই প্রহসনের জোরে, যাহাতে 'মেঘনাদবধ'কেও প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের তালিকাভুক্ত হইতে না হয়। কিন্তু এখানেও প্রশ্নের অবসান হয় না। প্রশ্ন এই—তাহা হইলে কি বাঙালী পাঠককে শিখিতে হইবে যে 'বুড়ো শালিক' 'মেঘনাদবধ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি, মাইকেলের অমরত্বের জন্য কেবল 'বুড়ো শালিক' লিখিলেই চলিত, 'মেঘনাদবধ' লেখার প্রয়োজন ছিল না? এ প্রশ্নও রবীন্দ্র গুপ্তের সচেতন মন এড়াইতে পারে নাই। তাই 'মেঘনাদবধ'-এর সপক্ষে তিনি রায় দিতেছেন ইহা প্রগতিশীল বিপ্লবী সাহিত্য, কেননা মধুসূদনের "কাব্যগ্রন্থগুলি দুদিক থেকে প্রাচীন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। প্রথমত পুরাণের দেবদেবীর চরিত্র নিয়ে মানুষের মত করে আধুনিক যুগের ভাবধারায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত কাব্য রচনার প্রাচীন বাঁধাধরা অনুশাসন অগ্রাহ্য করে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেছেন।" এই মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ আমার ধারণায়, রবীন্দ্র গুপ্ত মধুসূদনের কাব্যাবলীর সম্বন্ধে সত্য বিচার করিতে গিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট হইয়াছেন।

রবীন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য হইতে আমরা কি এই কথা বুঝিব যে, মাইকেলের কবি-কৃতিত্ব কেবল ছন্দশিল্পী হিসেবে নূতন ছন্দ প্রবর্তন করায়? এ বিচার আংশিক সত্য হইলেও অত্যন্ত ভাসাভাসা। কারণ সাহিত্যে প্রকাশের, আঙ্গিকের কোনো বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে না বক্তব্যেরও বৃহৎ পরিবর্তন না ঘটিলে। নূতন 'কণ্টেণ্ট'ই কেবল পারে নূতন 'ফর্ম্' উদ্ভাবন করিতে। আর পুরাণের দেবদেবীতে মানুষীভাব আরোপ করা একান্তই মাইকেলের বিশেষত্ব নহে;

মঙ্গলকাব্যে, চণ্ডীতে, বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহার অসংখ্য উদাহরণ আছে। মাইকেলের যাহা প্রকৃত বিশেষত্ব, রবীন্দ্র গুপ্ত তাহা ঠিকই ধরিয়াছেন—তাহা হইতেছে, আধুনিক যুগের ভাবধারার উপযুক্ত প্রকাশ।

মূল প্রশ্নটি এইখানেই—"আধুনিক যুগের ভাবধারা" বলিতে আমাদের কি বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্র গুপ্তের সমগ্র প্রবন্ধের লক্ষ্য প্রমাণ করা যে, ইংরেজী আমলের বাঙলাদেশে একটিমাত্র আধুনিক ধারা আছে যাহাকে প্রগতিশীল বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য; তাহা হইতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সমর্থন। কিন্তু যে-কাব্যাবলীর মহত্বে মধুসূদন আধুনিক বাঙালী কবিদের আদিগুরু—'মেঘনাদবধ', তিলোত্তমা', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলী—ইহাদের কোনোটিতে কি তাহার সন্ধান মেলে? না, মেলে না। তাই রবীন্দ্র গুপ্তের সূত্রানুযায়ী স্ববিরোধী না হইয়া মাইকেলকে বৃহৎ বিপ্লবী কবি বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বিচারেও রবীন্দ্র গুপ্তকে অনুরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার মতে, রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যিক রচনা—"বৌঠাকুরাণীর হাট"—সাহিত্যের বিচারে হয়ত যাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু 'বলাকা'-কেও তিনি প্রগতির শিবির হইতে ছাড়িতে রাজী নন। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে 'বলাকা'র শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত। কিন্তু 'বলাকা'র কোন কবিতায় আছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সমর্থন? তখনকার সমসাময়িক জড়বিজ্ঞানে যে ব্রহ্মাণ্ড গতির, 'কস্‌মিক মোশন্‌'-এর কথা প্রচারিত হইতেছিল, 'বলাকা' সেই আধুনিক ভাবধারার কাব্যময় প্রকাশ। এখানেও স্ববিরোধী না হইয়া 'বলাকা'-কে প্রগতিশীল বলা চলে না।

অথচ প্রকৃত লেনিনবাদী সাহিত্য-বিচারে এই দোটানায় পড়িতে হয় না, দোফাঁদে পা দিতে হয় না। লেনিনবাদী সাহিত্য-বিচারে প্রথম বিচার্য, অতীতের যে-সাহিত্যিকের রচনার বিচার হইতেছে তাঁহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ, রাজনৈতিক মতামত নয়। লিফ্‌শিৎসের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচক নুসিনভ বলিয়াছিলেন: "লিফ্‌শিৎস-এর মতে মনে হয়—কাভেলিন, আকসাকভ, ফেৎ প্রভৃতি লেখকেরা শোষিত শ্রেণীর ভাবাদর্শের প্রকাশক ছিলেন না।" উত্তরে লিফ্‌শিৎস বলেন: "মোটেই তা নয়। কাভেলিনেরা নিশ্চয়ই ছিলেন শোষিত শ্রেণীর সমর্থক লেখক। কিন্তু তোমরা যদি আমার পূর্বোক্ত

মতকে খণ্ডন করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে প্রথমে প্রমাণ করিতে হইবে যে কাভেলিনেরা ছিলেন অতীতের বৃহৎ লেখক-শিল্পী-মানবিকগণের অন্যতম। তোমরা যদি কাভেলিন প্রভৃতিকে পুশকিন, গোগোল ও টলস্টয়ের শ্রেণীতে বসাইতে চাও, তাহা হইলে কেহই তোমাদের কথা শুনিবে না। ইহার জন্য আমি দুঃখিত।" ["This is not so, of course the Kavelins were ideologists of class exploitation. But if you wish to refute my foregoing passage, demonstrate first that the Kavelins were great writers, artists and humanists of the past. But when you lump together with the Kavelins such writers as Pushkin, Gogol and Tolstoy as 'ideologists of the exploited classes'—I am sorry, but no one will listen to you."]

বাংলা-সাহিত্যের বিচারে এই নীতি প্রয়োগ করিতে গেলে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত এই যে, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অতীতের মহৎ লেখক-শিল্পী মানবতাবাদী ছিলেন কিনা। মনে হয় না, এ প্রশ্নের উত্তরে পাঠক-মহলে দ্বিমত ঘটিতে পারে। এখন প্রশ্ন ওঠে এই যে, মহৎ শিল্পী হইলেই কি তাঁহাকে প্রগতিশীল বিপ্লবী শক্তির আধার হইতে হইবে? এই প্রশ্নের শেষ উত্তর দিয়া গিয়াছেন স্বয়ং লেনিন। তিনি বলেন, **কোনো শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ হন, তাহা হইলে তাঁহার রচনায় বিপ্লবের কোনো না কোনো মর্মগত অংশ প্রতিফলিত না হইয়া পারে না।** [" An artist truely great must have reflected in his work at least some essential aspects of the revolution."]

সুতরাং রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ যদি অতীতের মহৎ লেখক-শিল্পী-মানবিক হন, তাহা হইলে তাঁহাদের রচনায় ইংরেজী আমলের বাংলাদেশে যে বিরাট সমাজবিপ্লবের সূচনা হইয়াছে তাহার আংশিক প্রকাশ নিশ্চয়ই থাকিবে। তাঁহাদের রচনায় প্রতিক্রিয়াশীল অংশও নিশ্চয়ই থাকিবে এবং নিশ্চয়ই আছেও। কিন্তু রবীন্দ্র গুপ্ত কেবল এই দিকটিতে জোর দেওয়ায় তাঁহার সিদ্ধান্ত একপেশে হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের আচার্যগণের বিচার সম্বন্ধে লেনিনবাদের মূল শিক্ষাই হইল এই যে, তাঁহাদের কৃতিত্বের অভ্যন্তরে যে স্বতোবিরোধিতা আছে, তাহা হইতে নিষ্কাশিত করিয়া টানিয়া বাহিরে

আনিতে হইবে তাহার বিপ্লবী মর্ম ও তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে শ্রেণী-সংগ্রামের উপাদান হিসাবে। বুর্জোয়া লেখকগণের দুর্বল দিককে বুর্জোয়া-শাসকেরা নিশ্চয়ই তাহাদের কাজে লাগায়, কিন্তু তাঁহাদের বিপ্লবী প্রেরণা তাহাতে লুপ্ত হইয়া যায় না। বিস্‌মার্ক হেগেলের দর্শনকে পররাষ্ট্র-গ্রাসী জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দর্শন হিসাবে ব্যবহার করিতেন। তাই বলিয়া কি হেগেলের বিপ্লবী প্রেরণা অস্বীকার করিতে হইবে? গ্যেটে ছিলেন ভাইমার রাজের সভাকবি। তিনি এমন কি ফরাসী-বিপ্লবেরও বিরোধিতা করিয়াছিলেন আর করিয়াছিলেন জার্মান-বিজয়ী ফরাসী বীর নেপোলিয়নকে সাদর অভিনন্দন। অথচ দেখিতেছি সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাঁহার দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশাল উৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজিকার দিনের পৃথিবীতে যে-আন্দোলন মার্কসবাদী মহলে সবচেয়ে বিপ্লবী বলিয়া গৃহীত, সেই বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের সমর্থনে গ্যেটের নাম সোভিয়েট দেশে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করা হইতেছে। আমাদের দেশের নেহরু-সরকার রবীন্দ্রনাথের রচনাকে, হিন্দু-মহাসভাপন্থীরা বঙ্কিম-বিবেকানন্দের রচনাকে ও দর্শনকে তাহাদের কাজে লাগাইলে তাই আমাদের বিচলিত হইবার কিছু থাকে না। যে সিপাহী-বিদ্রোহকে ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসাবে রবীন্দ্র গুপ্ত সমস্ত প্রগতিশীল সংস্কৃতির একমাত্র মাপকাঠি ধরিতে চাহেন, তাহার সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা বিনায়ক সাভারকারের একটি বিখ্যাত পুস্তক আছে, যাহার নাম—১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ("The War of Indian Independence of 1857")। স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল তাঁহার 'ভারতীয় বিক্ষোভ' ("Indian Unrest") নামক গ্রন্থে সাভারকরের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিতেছেন, ইহা মিউটিনির ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। ইহাতে ঘটনার বিকৃতি সত্ত্বেও প্রচুর গবেষণা আছে, আর আছে বর্বরতম ঘৃণার সহিত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ক্ষমতার সংযোগ। ["B. Savarkar, "The war of Indian Independence of 1857" is in its way a very remarkable history of the Mutiny, combining considerable research with the grossest perversion of facts and great literary power with the most savage hatred."] তাই বলিয়া কি সাভারকরকে আজ আমাদের "বীর" বলিয়া পূজা করিতে হইবে?

আমাদের কাজ হওয়া উচিত বঙ্কিম-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অন্তরস্থ মূল বিপ্লবী প্রেরণা উদ্ঘাটিত করিয়া প্রতিক্রিয়ার শিবিরকে দুর্বল করা, তাঁহাদিগকে "মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীল" ঘোষণা করিয়া প্রতিক্রিয়ার শিবিরকেই সবল করা নয়। আমাদের ভুলিলে চলিবে কেন বুর্জোয়া সভ্যতার শেষ প্রগতিশীল পর্যায়, উদ্ধত জাতীয়তার বিরুদ্ধে উদার মানবিকতার আহ্বান টমাস মান ও রোমাঁ রোলাঁর মতো রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। আমাদের ভুলিলে চলিবে কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসসৃষ্টি ভ্রমর, শৈবলিনী, আয়েষা, শান্তি, প্রফুল্ল—এখনকার স্বাধীনতাকামী বাঙালী রমণীর মানস-জননী। আমাদের ভুলিলে চলিবে কেন, দেশের জনসাধারণের ক্লৈব্যে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতিকারার্থে বিবেকানন্দ যখন দেশের যুবসমাজকে শোনান—"তোমার জন্মভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন, তুমি বীর হও"—তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামশীল অগ্নিযুগের যোদ্ধাদের গুরুর পর্যায়ে উপনীত হন। ইহাও আমরা ভুলিব না যে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের বেদান্তভাষ্য, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের গীতাভাষ্য—ইহাদের গভীর উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ততটা নয় যতটা অন্ধবিশ্বাস ও অলৌকিকতার ক্ষেত্রে আধুনিক যুক্তিবাদ ও আদর্শ মানবিকতাবাদের প্রতিষ্ঠা। আর হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই যদি প্রগতিশীলতার চরম পরীক্ষা হয়, তাহা হইলে রামমোহনের চেয়ে প্রগতিশীল কাহাকে আধুনিক ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়?

৫ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট সংগঠন

ইহার পরেও প্রশ্ন উঠিতে পারে, অতীতে যাহাই হউক বর্তমানে মার্কসবাদীরা শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি; তাহাদের বর্তমান কর্তব্য শ্রমিকশ্রেণীর সাহিত্য, শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা। বুর্জোয়ারা শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান শত্রু সুতরাং এই শ্রেণীশত্রুর রচনা সম্বন্ধে, তাহাদের স্বতোবিরোধী ঐতিহ্য সম্বন্ধে এতো মাথা ঘামাইবার কি প্রয়োজন? আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া বর্তমান অভিজ্ঞতা হইতে নূতন করিয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিব।

এ প্রশ্ন এদেশে নূতন হইলেও ইতিহাসে নূতন নহে। নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাহিত্যিকগোষ্ঠী "প্রলেটকাল্ট" (১৯১৭-১৯২২) ঠিক এই প্রশ্নই তুলিয়াছিল এবং তাহারও উত্তর দিতে হইয়াছিল স্বয়ং লেনিনকেই। তখন

লেনিন একটি প্রবন্ধে লেখেন—"ধনবাদ আমাদিগকে যে-সংস্কৃতি দিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে সমাজবাদ। সব রকমের বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, সব রকমের সাহিত্য ও শিল্প আমরা অবশ্যই লইব।" ["All the culture which capitalism has left us must be taken and socialism built out of it. All science, engineering, all knowledge and art must be taken."]

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসের বিখ্যাত বক্তৃতায় (২রা অক্টোবর ১৯২০) লেনিন বলেন—"সমগ্র মানবজাতির বিকাশের ধারা বহিয়া যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা যদি তাহার সঠিক স্বরূপ স্পষ্ট বুঝিতে না পারি, এই সংস্কৃতিকে যদি আমরা পুনরায় প্রয়োগ করিতে না শিখি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। ইহা না বুঝিলে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করিতে পারিব না। প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি একটা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যাপার নয়। প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতিতে বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাবি করেন, এমন কয়েকজন ব্যক্তির মস্তিষ্ক-প্রসূত উদ্ভাবনও তাহা নয়। এই ধারণাগুলি একদম বাজে। আমলাতন্ত্রী সমাজ, সামন্ততন্ত্রী সমাজ, ধনতন্ত্রী সমাজ—ইহাদের শাসনের মধ্যেও মানবসমাজ যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়াছে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি হইবে তাহারই স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি।" ["Unless we clearly understand that only by an exact knowledge of the culture created by the whole development of mankind, that only by re-working this culture, is it possible to build proletarian culture, unless this is understood, we shall not be able to solve this problem. Proletarian culture is not something that has sprung nobody knows whence, it is not an invention of those who call themselves experts in proletarian culture. This is all nonsense. Proletarian culture must be the result of a natural development of the stores of knowledge which mankind has accumulated under the yoke of capitalist society, landlord society and

bureaucratic society."] সুতরাং দেখা যাইতেছে, সোভিয়েট দেশে শ্রমিক সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া লেনিন "রূপান্তরের দাবি" করিতেছেন, পূর্বতন সংস্কৃতিকে "ধ্বংস ক'রে তার স্থানে" (রবীন্দ্র গুপ্তের ভাষায়) অন্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার দাবি করিতেছেন না।

লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় কমরেড জ্‌দানভ্‌-এর ১৯৪৬ সালের বক্তৃতা হইতে প্রকাশ রায় যে-অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ শুরু করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত লক্ষ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। জ্‌দানভের সমগ্র প্রবন্ধটি সতর্কভাবে পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি এখানে সকল দেশের সকল কালের বুর্জোয়া সাহিত্যের বিচার করিতেছিলেন না। সোভিয়েট দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সমাজবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহার শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে; সেখানে নূতন উন্নততর সংস্কৃতি সোভিয়েট লেখকেরা ও শিল্পীরা গড়িয়া তুলিতেছেন, সোভিয়েট জনসাধারণের অতুলনীয় শৌর্য ও আত্মত্যাগ যাহার বাস্তব ভিত্তি। ইওরোপের প্রাচীন দেশগুলিতে ধনবাদ ক্ষয়িষ্ণু, সেখানে এই যুগে সৃষ্টি হইতেছে এক মুমূর্ষু সংস্কৃতি। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট দেশে এমন কয়েকজন লেখককে পাওয়া গেল যাঁহারা এখনও এই অস্তমিত পশ্চিমের দিকে আকুল নয়নে তাকাইয়া আছেন। ইঁহাদের সমালোচনা করিতে গিয়া জ্‌দানভ্‌ অঙ্গুলি নির্দেশ করেন **বর্তমানে** ইওরোপের গলিত বিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতির দিকে, যাহাকে অস্বীকার করা ও আক্রমণ করা সোভিয়েট লেখকদের কর্তব্য। এই মন্তব্যকে **সমগ্র** বুর্জোয়া সাহিত্য-বিচারের মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করিলে জ্‌দানভের প্রতি অবিচার করা হয়।

আমাদের দেশে বুর্জোয়া সংস্কৃতির আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ যুগের যে মূল সামাজিক সমস্যা ছিল, আমরা তাহা হইতে কিছুটা দূরে সরিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের যুগে সামাজিক বিপ্লবের অগ্রগামী পদাতিক ছিল ইংরেজী শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আমাদের যুগে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে। এবং এই নূতন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতা শ্রমিকশ্রেণী। তাই শ্রমিকশ্রেণীকে বাদ দিয়া আজ আমাদের দেশে সংস্কৃতি-আন্দোলন অসার্থক। কিন্তু লেনিন শিখাইয়া গিয়াছেন, শ্রমিক-শ্রেণী কেবল তাহার জন্মের মাহাত্ম্যেই নেতৃত্ব করিতে পারে না। তাহাকেও

মার্কসবাদে সুশিক্ষিত হইতে হইবে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত এই শিক্ষাদানের ভার ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হাতে। তাহাতে শিক্ষা দিতে গিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা। তাই এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষকগণকে নিজেদের শ্রেণীচেতনার উপরে উঠিয়া শ্রমিকশ্রেণীর চেতনায় প্রবেশ করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রার সহিত, তাহাদের সুখদুঃখের সহিত, তাহাদের শক্তি ও দুর্বলতার সহিত, তাহাদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। শ্রমিকশ্রেণী সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শ্রমিকের সহযোদ্ধা কৃষকের বেলাতে এই কথাগুলি খাটে। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয় বাদ দিয়া এখন কোনো সাহিত্যিক রচনাই সবল, সুন্দর ও সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। মধ্যবিত্ত-বুদ্ধিজীবী শ্রমিক-কৃষকের চেতনায় প্রবেশ করিতে পারে একটি মাত্র উপায়ে—মার্কসবাদের সম্যক অনুশীলন ও তাহার সঠিক প্রয়োগে। কারণ মার্কসবাদ ষোল আনা গ্রহণ করিতে পারিলে আর মধ্যবিত্তে ও শ্রমিক-কৃষকে জন্মগত প্রভেদের অর্থ থাকে না। তখন উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি হয়—কাহার আছে কি পরিমাণে মার্কসবাদে দখল ও প্রয়োগদক্ষতা। শ্রমিক-কৃষকের রচনা অথবা তাহাদের সমগ্র শ্রেণীর বোধগম্য রচনা না হইলে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি হয় না—এ ধারণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। শ্রমিক-শ্রেণীর অধিনায়ক হইয়া প্রকাশ রায় "পরিচয়"-এ প্রকাশিত যে তিনটি প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়াছেন —"সোভিয়েট বায়োলজি", "বুদ্ধিবিলাসীর ডায়লেক্‌টিক্‌স," "মার্কসবাদের নয়াভাষ্য"—ইহাদের কোনটি বর্তমানে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর বোধগম্য?

মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর আর একটি প্রধান কর্তব্য, মৃতপ্রায় লোকসংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করা। বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রকৃতিগত প্রবণতাই এই যে, তাহা পূর্বতন লোকসংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করিয়া নিজেকে বিস্তার করে। মার্কসবাদী সংস্কৃতিকর্মীর কর্তব্য, এই লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইয়া তাহার পুরাতন কাঠামোয় নূতন আবেগের সঞ্চার করিয়া তাহাকে উন্নত করিয়া তোলা। সমাজবাদী সোভিয়েট-প্রাচ্যে ধনবাদের বাধা দূর হওয়ায় লোকসংস্কৃতির অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেখানেও তাহার সহিত শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া সংস্কৃতির আন্তরিক শত্রুতা নাই। বুর্জোয়া যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা সেখানে আর স্বল্পসংখ্যক শিল্পরসিকের সম্পত্তি নন, নূতন

শিক্ষিত বিরাট জনসমাজের নিত্য আনন্দের উৎস।

আমাদের দেশে সমাজবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হইলেও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যবনিকা পতন হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় ভারতে সামন্তবাদ এখনও প্রবল। ইহার জন্য অপরিহার্য ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে "ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট" সংগঠন। ঔপনিবেশিক দেশসমূহে এই ফ্রন্ট সংগঠনের কৌশল হিসাবে কমিণ্টার্নের ষষ্ঠবিংশ কংগ্রেস যে-নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহার কার্যকারিতা এখনও বাতিল হইয়া যায় নাই। তাহাতে বলা হইয়াছে, পরাধীন দেশে মার্কসবাদীগণের অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে একটি প্রধান করণীয়:

বিভিন্ন উপজাতিগুলির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নরনারীর সমান অধিকার দাবি, রাষ্ট্র হইতে ধর্মকে পৃথক করা; জন্মগত জাতিভেদের বিলোপ; রাজনৈতিক শিক্ষার এবং গ্রামে ও নগরে জনসাধারণের শিক্ষার স্তরকে উন্নত করা; ইত্যাদি। ["Establishment of equal rights for nationalities and of sex-equality; (equal rights for women); seperation of church and state and abolition of caste-distinctions; political education and raising of the general cultural level of the masses in town and country; etc."]

আমাদের দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের এখনও চূড়ান্ত সাফল্য না হওয়ায় মার্কসবাদীগণের এই সকল কর্তব্য এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। এই কর্তব্য সম্পাদনে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রচলিত বুর্জোয়া সাহিত্যকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায়; কারণ, এই করণীয়গুলির প্রত্যেকটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহাতে আগত বিপ্লবের বিরোধিতা না করিয়া বরং সহযোগিতা করা হয়। কমিণ্টার্নের এই সঠিক নির্দেশ বিস্মৃত হইলেই হয় মার্কসবাদ খণ্ডিত ও ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট বিকলাঙ্গ।* ৪. ১১. ৪৯

* পরিচয়, নবপর্যায়, চতুর্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৬, পৃঃ ৫৩-৭৫; প্রবন্ধের শিরোনামের উপরে লেখা আছে "আলোচনার জন্য"। প্রবন্ধ-শেষে সংযোজিত "ভ্রম সংশোধন" অনুসারে আলোচ্য প্রবন্ধের 'জানা' ও 'মার্কস'-এর' স্থলে 'অজানা' এবং 'মার্কসীয়' শব্দ দুটি সংযোজন করা হল। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা হয়েছে।—সম্পাদক

"বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" / সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্র গুপ্তের "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" বের হবার পর[১], ঐ লেখার সমর্থনে, ভাষ্য হিসাবে ছ' নম্বর 'মার্কসবাদী'তে আরও দুটো প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। তারপর 'পৌষের' পরিচয়ে[২] মানিকবাবু "প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" নিয়ে আলোচনা করেন। অবশ্য, মানিকবাবুর সেই দীর্ঘ আলোচনা থেকে মার্কসবাদীদের বিশেষ কোনই শিক্ষা লাভ হয় নি। তার কারণ এই যে মানিকবাবুর সমস্ত লেখাটাই ছিল একান্ত-ভাবে রাজনীতিবর্জিত—অত্যন্ত ঢিলেঢালা, শিথিল ধরনের লেখা। রবীন্দ্র গুপ্তের থিসিসের মারাত্মক ত্রুটিগুলো সম্পর্কে মানিকবাবু উদাসীনই থাকেন এবং ঐ থিসিসের পেছনকার 'রাজনীতি'টা আদৌ মার্কসবাদসম্মত কিনা এই অতি-প্রয়োজনীয় প্রশ্নটাও এড়িয়ে যান।

'ফাল্গুনের' পরিচয়ে শ্রী শীতাংশু মৈত্র মানিকবাবুর লেখা নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র গুপ্তের সাহিত্যিক-রাজনৈতিক লাইন আর একবার স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন।

রবীন্দ্র গুপ্ত ও তাঁর ভক্তদের দৌলতে মার্কসবাদ যেরকম বিকৃত হয়েছে, মার্কসবাদের নামে তাঁরা কি মারাত্মক ট্রটস্কীবাদী চোরাকারবার করেছেন এতদিন, ঐ সম্পর্কে আজ প্রত্যেক মার্কসবাদীই সচেতন। আজ মার্কসবাদ-বিরোধীদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো স্পষ্ট করে দেখানো দরকার, যাতে করে মার্কসবাদের নামে ভবিষ্যতে আর তাঁরা ভেজাল জিনিস চালু করতে না পারেন। আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের শিক্ষার ভিত্তিতে রবীন্দ্রবাবুদের লাইন যে মার্কসসম্মত নয় এ তত্ত্ব প্রতিপন্ন করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রবাবুরা মার্কসবাদ

---

১. উক্ত রচনাটি 'মার্কসবাদী'র পঞ্চম সংকলনে প্রকাশিত হয়।

দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৮-১২৫।—সম্পাদক

২. পরিচয়, পৌষ ১৩৫৬, পৃ. ৩৩-৬৪ দ্রষ্টব্য।— সম্পাদক

সম্পূর্ণ বর্জন করে যে লাইন এতদিন চালু রেখেছেন, তাতে প্রগতি সাহিত্য-শিবিরের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি পূরণ করবার জন্যে, রবীন্দ্রবাবুদের লাইন সম্পূর্ণ বাতিল করে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে নতুন মার্কসবাদসম্মত লাইন নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুদের সাহিত্যিক বক্তব্যের রাজনৈতিক পটভূমি নিয়েই বিশেষ আলোচনা করা হবে।

আগেই বলা ভালো যে এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য প্রধানত নেতিমূলক—পূর্বপক্ষ খণ্ডন; উত্তরপক্ষ সমর্থন এর বর্তমান উদ্দেশ্য নয়। বারান্তরে অবশ্য উত্তরপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা রইল।

রবীন্দ্রবাবু ও তাঁর শিষ্যদের মূল বক্তব্য দুটি। প্রথমত, তাঁদের বক্তব্য এই যে, ১৮৫৫-৫৯-এ যেসব গণ-বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল ভারতের মাটিতে—যেমন সিপাহী-বিদ্রোহ, নীল-বিদ্রোহ প্রভৃতি, সেই গণ-বিদ্রোহগুলিই ভারতবর্ষের প্রথম "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব"। এসব বিদ্রোহের বিপ্লবীরা যে 'মতাদর্শ' নিয়ে লড়েছিল তা ছিল 'নব জাগ্রত বুর্জোয়াশ্রেণী'র "কৃষক-বুর্জোয়া"র মতাদর্শ। ভারতের ইতিহাসে এসব গণ-বিদ্রোহের অধ্যায়টাই প্রগতির অধ্যায় এবং প্রগতির উৎস খুঁজতে হলে এসব বিদ্রোহের ভেতরেই খুঁজতে হবে। এসব গণ-সংগ্রামের ঢেউ এমন একটা প্রগতিশীল অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল যে তার মর্মবাণী নিয়েই বাঙলার প্রগতিশীল সাহিত্য রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, বাঙলার নবযুগ সম্পর্কে যে সাধারণ মত প্রচলিত ছিল সেই মত রবীন্দ্রবাবুরা মার্কসবাদ-বিরোধী বলে বাতিল করে দেন। রবীন্দ্রবাবু দেখান যে "বাংলার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বাংলার নবজাগরণের নেতা", "ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়াশ্রেণীর 'মনস্বী'রা বাংলাকে সজাগ করেছে সর্বপ্রথম", এসব প্রচলিত ইতিহাস "মিথ্যা ইতিহাস"। দু'চার জন বাদে ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা বরাবরই প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়েছেন, দেশকে এবং জাতিকে তাঁরা কিছুই দেন নি। রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—সাধারণভাবে যাঁদের বলা হয় বর্তমান বাঙলার প্রগতিশীল ধারার উৎস, এঁরা যে আসলে প্রতিক্রিয়ার বাহন, এ তত্ত্ব রবীন্দ্রবাবু প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রবাবু ও তাঁর শিষ্যদের মতে অবস্থাপন্ন ইংরেজী শিক্ষিত মনস্বীরা কোনো গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ঐতিহ্য তৈরি করেন নি। জাতীয়তা প্রবর্তনের যে গর্ব তাঁরা করেন সে গৌরবের তাঁরা অধিকারী নন। বরং এই বুর্জোয়াশ্রেণীর

মনস্বীরা (যেমন, বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রভৃতি) বাঙলার গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির হত্যাকারী।[১]

তাই রবীন্দ্রবাবুদের মূল বক্তব্য ছিল এই যে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্ন এবং দু'চারজনকে বাদ দিলে সাধারণভাবে ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়া-শ্রেণীর লোকেরা ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সমস্ত অধ্যায়ে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকাই নিয়ে এসেছেন। রুশ-বুর্জোয়াদের ভূমিকা রবীন্দ্রবাবুরা রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস থেকে পড়েছিলেন নিশ্চয়ই। কাজেই ইতিহাসের সেই নজিরের কথা মনে রেখে ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়াদের সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবু নতুন তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ইংরেজ শাসনের কুক্ষিতে জন্মগ্রহণ করে, তার শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শুধু ধর্মসংস্কার ও লোকহিতকর কাজে যোগ দেয়—অথচ ইংরেজ শাসনের এই প্রসাদপুষ্ট শ্রেণীর মনস্বীদেরই প্রগতির উৎস বলে ধরা হতো রবীন্দ্রবাবুর 'বিশুদ্ধ মার্কসবাদী' তত্ত্ব প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত। ইতিহাসের উপর এই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রবাবু উদাত্ত কণ্ঠে সংগ্রামের আহ্বান জানান এবং 'মার্কসবাদী'-র লাইন সম্পর্কে শেষ রায় দিয়ে দেন।

রবীন্দ্রবাবুদের সাহিত্যিক বক্তব্য মার্কসবাদসম্মত কিনা ঠিক করতে হলে তার আগে ঠিক করতে হবে যে তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে মার্কসবাদের মিল কতটুকু। প্রত্যেক মার্কসবাদীর আজ যে প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে এই :

১) ১৮৫৫-৫৯এর ভারতীয় গণসংগ্রামগুলো "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব" কিনা এবং এসব সংগ্রামের নেতৃত্ব কাদের হাতে ছিল?

২) ১৯৫৫-৫৯এ ভারতের আর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থা যা ছিল তাতে "কৃষক-বুর্জোয়া"-র বিকাশ সম্ভব কিনা এবং আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের এ বিষয়ে বক্তব্য কি?

৩) ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের ভূমিকা কি ছিল? বাঙলার ইংরেজী শিক্ষিত বুর্জোয়াশ্রেণীর 'মনস্বী'দের সাথে রুশদেশের উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সাদৃশ্য টানা মার্কসবাদসম্মত কিনা?

১. মার্কসবাদী, পঞ্চম সংকলন, পৃ. ১৩৬।

৪) ঐতিহ্যবিচারে, প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের সমন্বয় সম্পর্কে, মার্কসবাদের শিক্ষা কি?

৫) বিপ্লব কোন্ শ্রেণী করে? এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে পেটিবুর্জোয়াদের ভূমিকা কি? পেটিবুর্জোয়ারা কি বিপ্লব-ভাঙাদের দলে, না পেটিবুর্জোয়ারা 'শ্রেণী' হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী?

* * *

১) ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামে সিপাহী-বিদ্রোহ প্রভৃতির যে বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে—এসব বিদ্রোহে যে ভারতীয় জনতার অপূর্ব বীরত্ব মূর্ত হয়ে ওঠে, বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে নিষ্পেষিত কৃষকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ ও ঘৃণা, এসব বিদ্রোহে যেরকম আদিম, ব্যাপক রূপ নেয়—তা প্রত্যেক মার্কসবাদীর পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মার্কস সিপাহী-বিদ্রোহ সম্পর্কে বলেছিলেন যে এ-বিদ্রোহে "জাতীয় চেতনার প্রথম সবল অভিব্যক্তি দেখা গেল"—(**the first powerful manifestation of national consciousness.**)[১]

ভারতীয় জাতীয় চেতনা বিকাশের, গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার যে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, তাতে সিপাহী-বিদ্রোহ ও অন্যান্য গণবিদ্রোহ এক একটা বিশিষ্ট অধ্যায়। মার্কসবাদীদের এসব বিদ্রোহের 'শ্রেণীভিত্তি', 'মতাদর্শ' প্রভৃতি নিয়ে আরও আলোচনা করা দরকার। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য শুধু তাই নয়। তাঁদের বক্তব্য হল এই যে সিপাহী-বিদ্রোহ প্রভৃতি ভারতের "বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব", এবং এদের নেতৃত্ব ফিউডাল রক্ষণশীলশ্রেণীর হাতে ছিল না। পাম দত্ত তাঁর 'আজিকার ভারত'-এ অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা বলেছেন। পাম দত্ত এসব অভ্যুত্থানের তাৎপর্য অস্বীকার করেন নি। কিন্তু এ কথা তিনি দেখিয়েছেন যে, "the rising of 1857 was in essential character and dominant leadership the revolt of the old, conservative and feudal forces and dethroned potentates for their rights and privileges, which they saw in process of destruction."

রবীন্দ্রবাবুরা পাম দত্তের এই বিশ্লেষণ বাতিল করেছেন, কারণ পাম দত্ত যে ইতিহাস লিখেছেন সেটা নাকি "মিথ্যা ইতিহাস—ইংরাজ শাসকবর্গের

১. **Marx's Notes—Nikolai Goldberg. "*Communist*", Feb. 1948, pp 394.**

শেখানো কথা।"[১] কিন্তু মার্কস স্বয়ং সিপাহী-বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ আলোচনা করতে গিয়ে এর 'রক্ষণশীল' নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। মার্কস তাঁর Notes-এ লিখেছেন যে সিপাহী-বিদ্রোহের বিপর্যয় ঘটল দুটো কারণে। প্রথমত, বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য এবং দ্বিতীয়ত, ফিউডালশ্রেণীর নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা। সোভিয়েট ঐতিহাসিক গোল্ডবার্গ, মার্কসের Notes আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, **"The notes end with the story of that rebellion and its collapse which was due to the split between the main social groups that were active in it and the betrayal of the national cause by the *aristocratic leaders*."**[২]

কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা মার্কস কিংবা পাম দত্ত, কারও মতই গ্রহণ করেন নি। অন্যদিকে তাঁরা স্বকপোলকল্পিত তত্ত্ব খাড়া করেছেন। তাঁদের মতে সিপাহী-বিদ্রোহ প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খল ভেঙ্গে বুর্জোয়াসমাজ প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রাম, ভারতের "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব"; এবং এজন্যেই এদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত বেশী।

অথচ ইতিহাসের এমন অবাস্তব, মার্কসবাদ-বিরোধী ব্যাখ্যা অন্য কোনো দেশে কোনো মার্কসবাদীরা করেছেন কিনা ভাববার বিষয়। মার্কস শিক্ষা দিয়েছিলেন যে মানুষ খুশীমত ইতিহাস রচনা করতে পারে না। সমাজের বাস্তব উপকরণ তৈরি হয় নি অথচ ইতিহাস রচিত হচ্ছে, এ হচ্ছে ইতিহাসের ভাববাদী ব্যাখ্যা।

১৮২৫-৫৯—এ-সময়ের ভারতবর্ষের আর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামো বিচার করলে দেখা যাবে যে ভারতের সমাজব্যবস্থায় তখন পর্যন্ত শিল্পপতি বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিকাশ প্রায় আরম্ভই হয় নি। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ভেঙ্গে গেলেও, তখন পর্যন্ত মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী ছাড়া, যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনকারী দেশী বুর্জোয়াশ্রেণীর আবির্ভাব সবেমাত্র আরম্ভ হয়েছে। এ সময়ে ব্রিটিশ সওদাগর ধনিকশ্রেণী, দেশী জমিদার, মহাজন, মুৎসুদ্দি-বুর্জোয়া, কারিগর, শোষিত কৃষক—এসব শ্রেণীই ছিল ভারতীয় অর্থনীতির বাস্তব বনিয়াদ।[৩]

১ মার্কসবাদী, পঞ্চম সংকলন, পৃ. ১২৬।
২. Marx's Notes—Goldberg, '*Communist*', Feb, 1948, pp 394.
৩. *India To-day* (Revised Edition)—R. Palme Dutta

অথচ রবীন্দ্রবাবুরা ১৮৫৫-৫৯-এই "বুর্জোয়া"-দের খুঁজে পেয়েছেন এবং সিপাহী-বিদ্রোহের "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন। ১৮৫৫-৫৯ সালে ভারতের সমাজব্যবস্থার বাস্তব উপকরণ যা ছিল তাতে 'বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সংগঠিত হতে পারে না। সেনভাস্কর, পাম দত্ত এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণ থেকে অন্তত তাই জানা যায়। অথচ রবীন্দ্রবাবুরা তখনকার আর্থনীতিক-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করেই "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" বিপ্লব আবিষ্কার করেছেন। "বুর্জোয়া"শ্রেণীর আবির্ভাব ও বিকশিত হবার আগেই "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব" ঘটলো কেমন করে এ-প্রশ্ন রবীন্দ্রবাবুরা এড়িয়ে গেছেন।

তাছাড়া যেটা আরও মারাত্মক কথা সেটা হচ্ছে এই যে "প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে ১৯০৫ সাল থেকেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ আরম্ভ", লেনিনের এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে রবীন্দ্রবাবুরা ১৮৫৫ সাল থেকে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব আবিষ্কার করেছেন। কমরেড লেনিন বলেছেন—"In western continental Europe the period of bourgeois-democratic revolution, embraces a fairly definite portion of time, approximately, from 1789 to 1871.

"In Eastern Europe and in Asia, the period of bourgeois-democratic revolutions only began in 1905."[১]

রবীন্দ্রবাবুরা যখন লেনিনের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করতে দ্বিধা করেন না, তখন বুঝতে হবে যে মার্কসবাদ তাঁদের হাতে নিরাপদ নয়—তাঁরা নয়া মার্কসবাদ খাড়া করতে বদ্ধপরিকর।

মজা হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রবাবুরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে তাঁদের থিসিস খাড়া করেছিলেন। অথচ মার্কস কিংবা লেনিন যেসব স্বতঃস্ফূর্ত গণসংগ্রামের "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" চরিত্র আবিষ্কার করেন নি, তাদের ঐ স্বরূপ আবিষ্কার করে রবীন্দ্রবাবুরা চরম জাতীয়তাবাদেরই অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন। মার্কসবাদী মাত্রেই স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করবেন। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহ এক কথা, আর "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব" অন্য কথা। এ দু'য়ের মধ্যে তফাৎ স্বীকার না করা

১. *Selected Works*, vol. I, Lenin, pp 512, Moscow Ed

মার্কসবাদ সম্মত নয়। মার্কসবাদের নামে আসলে রবীন্দ্রবাবুরা অতীত ইতিহাসকে রোমান্টিক জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীতেই দেখেছেন। কল্পনার পক্ষবিস্তার করে উনবিংশ শতাব্দীর গণসংগ্রামগুলিকে কাব্যময়, গীতধর্মী, জাতীয়তাবাদীর মতো ব্যাখ্যা করেছেন। তাই দেখা যায় যে রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্যের সাথে অশোক মেহতা[১] সাভারকরের[২] ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের বিশ্লেষণে এত মিল। মার্কসবাদী ডায়ালেকটিকের নিয়মে 'অতি-বাম' ও "অতি-দক্ষিণ' যে শেষপর্যন্ত একজায়গায় এসে মেশে, রবীন্দ্রবাবুদের থিসিস্ তার আর একটা প্রমাণ।

২) তাঁদের এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে রবীন্দ্রবাবুরা আবিষ্কার করে-ছিলেন যে উনবিংশ শতাব্দীর গণবিদ্রোহগুলি ছিল "কৃষক-বুর্জোয়ার বিদ্রোহ"। তার মানে এই যে ১৮৫৫ সাল থেকে ভারতের মাটিতে ধনীকৃষক-কুলাকদের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু কলোনীতে 'কুলাকশ্রেণী'-বিকাশ-এর তত্ত্বও মার্কসবাদ-বিরোধী। রবীন্দ্রবাবুরা নিশ্চয়ই এ তত্ত্ব অন্য কোনো উৎস থেকে আহরণ করে থাকবেন। কারণ ১৯২৮ সালেও কমিনটার্নের শিক্ষা হল এই যে সাম্রাজ্যবাদের শোষণে উপনিবেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের প্রকৃত বিকাশ হতে পারে না, কুলাক-শ্রেণীর জন্মও হয় না। সাম্রাজ্যবাদ যে কুলকশ্রেণী কিছুটা স্থাপন করতে চায় না এমন নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীণ সংকট এমনই যে এ প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না কখনও। বাস্তবে,অধিকাংশ কৃষক নিঃস্ব হতে থাকে—দেশী বাজার হয়ে পড়ে আরও সঙ্কুচিত; 'ধনতন্ত্র' "কুলাকশ্রেণী"র বিকাশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় আর হয়ে ওঠে না।[৩]

আন্তর্জাতিকের এই শিক্ষা অমান্য করে রবীন্দ্রবাবুরা ১৮৫৫ সালেই কি করে "কৃষক-বুর্জোয়াদের" খুঁজে পেলেন? উপনিবেশের কৃষিব্যবস্থায় ধনতন্ত্রের বিকাশ, কুলাকশ্রেণীর আবির্ভাব, এসব কাদের তত্ত্ব? এ তত্ত্ব তো মার্কসবাদের নয়। উপনিবেশের বেলায় মার্কসবাদ, সাম্রাজ্যবাদের এ ধরনের কোনো ভূমিকা তো কখনও স্বীকার করে নি। সাম্রাজ্যবাদের দৌলতে 'সামন্ততান্ত্রিক,' 'প্রাক্-ধনতান্ত্রিক' শোষণই যে কৃষিতে ক্রমশই প্রবল হয়ে ওঠে, এটাই তো মার্কসবাদের

১. *"1857—The Great Rebellion"*—**Ashok Mehta.**

২. *Indian War of Independence*—**V. D. Savarkar.**

৩. *Revolutionary Movement in Colonies*—**PPH Edition, pp 16.**

শিক্ষা। তবে 'কৃষক-বুর্জোয়া তত্ত্ব' রবীন্দ্রবাবুরা কোথা থেকে পেলেন? আশ্চর্যের কথা এই যে এ তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক ট্রটস্কীবাদের একটি অমূল্য সম্পদ! ১৯২৭ সালে ট্রটস্কীবাদীরা চীনের কৃষিতে 'ধনতন্ত্র' আবিষ্কার করেছিল, "কৃষক-বুর্জোয়া'র তত্ত্ব নিয়ে মার্কসবাদীদের সঙ্গে লড়াই তাদের কম হয় নি। ট্রটস্কী-বাদের মতে চীনের বিপ্লবের আসল শত্রু ছিল 'ধনতন্ত্র', সামন্ততন্ত্র নয়। ট্রটস্কী-বাদের বৈশিষ্ট্যই হল যে তারা ঔপনিবেশিক দেশের আর্থনীতিক অবস্থা বিশ্লেষণ না করে 'ধনতন্ত্র', 'কৃষক-বুর্জোয়া'র স্বপ্ন দেখে।[১] রবীন্দ্রবাবুরা বোধহয় এই ট্রটস্কীবাদীদের তত্ত্বের উদ্গাতা হয়েছেন ভারতবর্ষে। তা' না হলে ১৮৫৫ সালের ভারতের সমাজবিন্যাসে 'কৃষক-বুর্জোয়া' তাঁরা আবিষ্কার করলেন কেন?

৩) ভারতবর্ষের প্রগতিশিবিরে আজ যে সংকট দেখা দিয়েছে তার একটা কারণ হল এই যে মার্কসবাদের নামে এতদিন নানা রকমের মার্কসবাদ-বিরোধী তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে। দরকার মতো মার্কস, লেনিন, স্টালিনের লেখা কদর্থ করে, আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী নেতাদের কুৎসা রটনা করে, নিজেদের মনগড়া থিসিস্ "বিশুদ্ধ মার্কসবাদে"র নামে চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের বাস্তব, মার্কসবাদসম্মত ব্যাখ্যা না করে, যান্ত্রিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ঊনবিংশ শতকের গণ-বিদ্রোহগুলিই "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব"। গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল আন্দোলনের উদ্ভব ও ক্রম-পরিণতি, এ-আন্দোলনের 'মতাদর্শে'র বিকাশে শিক্ষাআন্দোলন, সমাজসংস্কার, ধর্ম-আন্দোলন, প্রভৃতির স্থান, গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের বহুমুখী প্রচেষ্টা—এসব প্রশ্নের মার্কসবাদী আলোচনা না করে সরাসরি বলা হয়েছে যে সিপাহী-বিদ্রোহ প্রভৃতির মাধ্যমেই শুধু গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার প্রচেষ্টা হয়েছিল—তারপর বাঙলার ইতিহাসে কেবল প্রতিবিপ্লবের যুগ।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের নাম করে রবীন্দ্র-বাবুরা ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের ক্রমপরিণতির ইতিহাস স্বীকার করেন নি। তাঁদের মতে ১৮৫৫-৫৯এর পর ভারতবর্ষের ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাঙলার মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনের 'গণতান্ত্রিক' তাৎপর্য রবীন্দ্রবাবুরা তাই সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাই রবীন্দ্রবাবুরা দ্বিধা-

১. *On China*—Stalin. "Marxism and the National & Colonial Question."

হীনভাবে বলতে পারেন যে ১৯০৫ সালের আন্দোলন ১৮৫৭ সালের আন্দোলনের "দুর্বলতর পুনরভিনয়"।১ কাজেই লেনিন ১৯১৩ সালে যেখানে ঘোষণা করেন যে "সারা এশিয়া জুড়ে এক বিরাট গণতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশই বিস্তৃত হচ্ছে এবং শক্তি সঞ্চয় করছে,"

"Everywhere in Asia a mighty *democratic* movement is growing, spreading and gaining strength,"২

—সেখানে রবীন্দ্রবাবুরা এসব আন্দোলনের মধ্যে কোনো প্রগতিশীল দিকই খুঁজে পান না ; প্রগতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তাঁদের ১৮৫৫-৫৯, এই যুগটাতেই শুধু পৌঁছাতে হয়। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রবাবুদের মতে ১৮৮০ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত যে আন্দোলন তাতে "মৃদু চাওয়া ও পাওয়াই শুধু দেখা গেছে—"সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান" এসময়ে ঘটে নি ; কাজেই এসব আন্দোলনে প্রগতির দিক একবারেই নেই। তাছাড়া বুর্জোয়া নেতৃত্বে সংঘটিত এসব আন্দোলনের প্রগতিশীল ভূমিকা রবীন্দ্রবাবুরা স্বীকার করবেন কি করে ! ভারতীয় বুর্জোয়ারা তো "চিরকালই" প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা নিয়ে এসেছে। কাজেই এই বুর্জোয়া নেতৃত্বে সংঘটিত আন্দোলনের কোনও 'প্রগতিশীল' দিক "বিশুদ্ধ মার্কসাবাদী" রবীন্দ্রবাবুরা তো মানতে পারেন না !

কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর "নয়া গণতন্ত্রে" চীনা বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে যে সমস্ত সংগ্রাম ঘটেছিল তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য স্বীকার করেছেন। ১৯০৮ সালের "সংস্কারপন্থী আন্দোলন"-কে তিনি "প্রতিক্রিয়াশীল" নাম দিয়ে, রবীন্দ্রবাবুদের কায়দায়, বাদ দেন নি। তাঁর মতে আফিম-যুদ্ধ (১৮১৯-২৪) থেকে আরম্ভ করে, ১৯২৫ সালের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম, জাপান-বিরোধী যুদ্ধ—ঐসবই কোনো না কোনো দিক থেকে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিমাণে, **স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার সংগ্রাম** এবং এদের প্রত্যেকটিরই ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা ভারতবর্ষের বেলায় অন্য ধরনের ভাষ্য খাড়া করেছেন। বাঙলার নবজাগরণে রামমোহনের অবদান (১৮১৪-৩৩) রবীন্দ্রবাবুরা এক কলমের খোঁচায় বাতিল করে দিয়েছেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর, কংগ্রেস স্থাপন থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত

১. মার্কসবাদী, পঞ্চম সংকলন, পৃ. ১৪২।

২. *Backward Europe and Progressive Asia—1913—Lenin.*

জাতীয় আন্দোলন যে প্রকৃতিগত দিক থেকে 'গণতান্ত্রিক' সমাজ-গড়বার সংগ্রাম, রবীন্দ্রবাবুরা ঐ ইতিহাস স্বীকার করেন নি। চীন ও ভারতবর্ষ—দুই-ই সামন্ততান্ত্রিক, ঔপনিবেশিক দেশ। তাদের মধ্যে তফাৎ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু সে তফাৎ এমন নয় যে ভারতবর্ষের "সংস্কারপন্থী আন্দোলন," "স্বদেশী আন্দোলন" সব কিছুকেই ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে হবে। রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য কিন্তু তাই। তাঁদের মতে ভারতবর্ষের প্রগতিশীল আন্দোলন শুধু একবারই হয়েছিল ১৮৫৫-৫৯'এর রক্তাক্ত গণবিদ্রোহের রাস্তায়। সম্প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে আবার বিপ্লবী লড়াই আরম্ভ হয়েছে। মাঝখানে ভারতের ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ—'প্রতিক্রিয়াশীলতা' ও 'আত্মসমর্পণ'ই সে যুগের একমাত্র পরিচয়।

ইতিহাসের এরকম বিকৃত ব্যাখ্যার নাম ডিমিট্রভ দিয়েছিলেন 'জাতীয় সন্ত্রাসবাদ'—national nihilism[১], রবীন্দ্রবাবুরা সে পথই ধরেছেন। তাই রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কোনো প্রগতিশীল ঐতিহ্যই তাঁরা খুঁজে পান না। যান্ত্রিকভাবে তাই তাঁরা দেখান যে, বিবেকানন্দ ছিলেন ইংরেজ শাসনের ভক্ত, রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থক। রবীন্দ্রবাবু তাই ঘোষণা করেন যে বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কার আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় শুধু প্রতিক্রিয়াশীল। ঘোষণা করেন যে, রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা ইংরেজ সরকারের প্রসাদপুষ্ট—প্রতিক্রিয়ার শক্তির প্রত্যক্ষ পার্টিসান; এঁদের 'মন্ত্র' প্রতিক্রিয়ার শক্তিকেই শক্তিশালী করে তুলেছে, প্রগতির শক্তিকে নয়,—এসব তথাকথিত 'মনস্বীরা' ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা সৃষ্টি করেন নি—এঁরা ছিলেন ভারতের প্রতিক্রিয়ার শিবিরের অংশীদার। সেজন্যই রবীন্দ্রবাবুদের বলতে হয়, মীরজাফর ইংরেজ-বণিকের মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল আর রামমোহন রায় সেই রাজদণ্ডকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে বিদেশী বণিকদের সাথে কোলাবরেশন করেছেন।[২] ঠিক একই কারণে বিবেকানন্দকে গোলওয়ালকারের গুরু বলে রবীন্দ্রবাবুরা গাল দেন[৩], রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে হিন্দুমহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকদের মতের কোনো পার্থক্য দেখতে পান না।[৪]

১ *Workingclass against Fascism*—Dimitrov.
২. মার্কসবাদী, পঞ্চম সংকলন, পৃ. ১৩৪।
৩. ঐ, ঐ, পৃ. ১৪০।
৪. ঐ, ঐ, পৃ. ১৪৯।

তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ এঁরা সব ভারতীয় বুর্জোয়াদের মুখপাত্র—পেটিবুর্জোয়াদের নয়, তবুও রবীন্দ্রবাবুদের থিসিস কিন্তু একেবারেই প্রমাণ হয় না। "ভারতীয় বুর্জোয়ারা সব সময় শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাই নিয়েছে", এ সূত্র যদি ঠিক হতো, তাহলে বুর্জোয়াদের সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক প্রতিনিধিদের মতাদর্শে প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কিছুই থাকত না। কিন্তু কলোনির বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবুদের মূলসূত্রই হচ্ছে একান্তভাবে মার্কসবাদ-বিরোধী। বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবুদের তত্ত্ব ষোলআনা ট্রটস্কীবাদী তত্ত্ব। এই ট্রটস্কীবাদী তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করেছেন বলেই তাঁরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে সব রকমের 'জাতীয়তা', 'স্বদেশপ্রেম' বর্জন করবার রাস্তা ধরেছেন। প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে জাতীয়-সাংস্কৃতিক জীবনের অতীত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সব অধ্যায়কে প্রতিক্রিয়াশীলতার অপবাদে বাদ দিয়েছেন। সমাজসংস্কার ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্যে যে সমস্ত সংগ্রাম হয়েছে, তাদের তাৎপর্য তাঁরা একেবারেই স্বীকার করেন নি। সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন সমাজের মতাদর্শের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক মতাদর্শ কিভাবে গড়ে উঠল—ভারতীয় পরাধীন সমাজে (oppressed nation) কিভাবে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগল—এই আকাঙ্ক্ষা কিভাবে বিকশিত হয়ে উঠল নানাভাবে, রবীন্দ্রবাবুরা এসব বিশ্লেষণের ধার ধারেন না। 'জাতীয় চেতনার' বিকাশ তাঁদের মতে বোধহয় স্বয়ম্ভূ, তার ইতিহাস নেই—ক্রমপরিণতি নেই—বিভিন্ন ধারা নেই, শুধুই ১৮৫৫-৫৯-এর রক্তাক্ত গণবিদ্রোহের রাস্তায় এর জন্ম। তার আগে বা পরে এর আর কোনো ইতিহাস স্বীকার করা চলে না।

ইতিহাসের এই উপলব্ধি রবীন্দ্রবাবুদের হয়েছে এজন্য যে তাঁদের রাজনৈতিক বক্তব্য হল "ভারতের বুর্জোয়ারা বরাবরই প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নিয়ে এসেছে।" শীতাংশুবাবু তো কমিনফর্ম বেরুবার পরও ঘোষণা করেছেন, "আমাদের দেশের বুর্জোয়ারা চিরকাল ইংরেজের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে।" "কিন্তু একথা মনে করলে খুব ভুল হবে যে এই ভারতীয় ঔপনিবেশিক বুর্জোয়ারা কোনোদিন অন্যান্য স্বাধীন দেশের বুর্জোয়াদের মত সত্যিই প্রথম দিকে প্রগতিশীল ছিল।"

অতএব, শীতাংশুবাবু রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছেন, "এই

বুর্জোয়াদেরই মুখপাত্রদের (অর্থাৎ বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ) সৃষ্ট সাহিত্য ব্রিটিশবিরোধী অর্থে প্রগতিশীল হতে পারে না ; এবং সেইজন্যেই কোনো অর্থেই হতে পারে না।" কিন্তু আসল প্রশ্ন হল তাই। রবীন্দ্রবাবুদের গোড়ার কথাটাই হল যে ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা **চিরকাল** ইংরেজের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে। কথাটা ঠিক হলে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনস্বীদের ঐতিহ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রবাবুদের সিদ্ধান্ত ভুল হতে পারে না। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের গোড়ায় গলদ। "ভারতীয় বুর্জোয়ারা **চিরকাল** ইংরেজের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে," এটা মার্কসবাদের শিক্ষা নয়, কাজেই রবীন্দ্র-শীতাংশুবাবুদের সিদ্ধান্ত ভুল এবং মার্কসবাদ-বিরোধী।

১৯০৮ সালে লেনিন ঘোষণা করেছিলেন যে সারা এশিয়া জুড়ে এক বিরাট গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠছে এবং "there the Bourgeoisie is still siding with the people against reaction"[১] ১৯২৫ সালে স্টালিন ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে নতুন বৈশিষ্ট্য যা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে "the *compromising section* of the bourgeoisie has already managed in the main to come to an agreement with Imperialism,"[২] কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা বলেছেন অন্য কথা। ১৯০৮ সালে, বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনতার শিবিরের পার্টিসান ছিল, লেনিনের একথা তাঁরা স্বীকার করেন নি। ১৯২৫-এ স্টালিনের শিক্ষা থেকে দেখা যায় যে ঐ সময়ে (১৯২১ থেকে) বড় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে একটা সমঝোতায় এসে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য তা নয়। ভারতীয় বুর্জোয়ারা সমগ্রভাবে **চিরকাল** অর্থাৎ ১৯০৫, ১৯০৮, ১৯২০, **সবসময়ে** ইংরেজের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেছে—তাদের কোনোদিন প্রগতিশীলতা ছিল না, এটাই রবীন্দ্রবাবুদের মূল তত্ত্ব। অথচ এ তত্ত্ব মার্কসবাদে কোথাও পাওয়া যাবে না।

১৯২৮ সালে কমিনটার্ন পরিষ্কার ঘোষণা করেছিল যে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের ভূমিকা হল, national reformist, অর্থাৎ "জাতীয় সংস্কারপন্থী"। "বুর্জোয়ারা শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল", এ তত্ত্ব কমিনটার্নের মতে সংকীর্ণতা-দোষে

১. *Backward Europe and Progressive Asia*—Lenin
২. Toilers of the East—Stalin.

দুষ্ট। আর "বুর্জোয়ারা জাতীয় বিপ্লবী" এ তত্ত্ব tailist—অর্থাৎ লেজুড় মনোভাবের পরিচায়ক। কমিনটার্ন এ দুটো বিচ্যুতি সম্পর্কেই মার্কসবাদীদের সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু কমিনটার্নের সাবধানবাণী না শুনে রবীন্দ্রবাবুরা প্রথম ভুলটা করে যাচ্ছেন। ভারতের বুর্জোয়াদের 'জাতীয় সংস্কারপন্থী' ভূমিকা স্বীকার না করে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের মতো তাদের "প্রতিক্রিয়াশীলতা"টাই তাঁরা আবিষ্কার করেছেন।[১]

অথচ রবীন্দ্রবাবুরা ভারতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকা বিশ্লেষণে কমিনটার্ন সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন; রুশ-বুর্জোয়াদের সাথে তাদের এক ব্রাকেটে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

শীতাংশুবাবু যে বলেছেন, ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা অন্যান্য স্বাধীন দেশের বুর্জোয়াদের মতো সত্যই কোনোদিন প্রগতিশীল ছিল না একথা সত্য। কোন মার্কসবাদী দাবি করেছেন যে ১৬৮২'র বা ফরাসী বিপ্লবের বুর্জোয়াদের ভূমিকা আর ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের ভূমিকা অভিন্ন? কিন্তু এর থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে, ভারতবর্ষের বুর্জোয়াদের ভূমিকা শুধুই প্রতিক্রিয়াশীল, রুশ বুর্জোয়াদের মতো। অথচ নানারকম কথার মারপ্যাঁচের আড়ালে রবীন্দ্রবাবুদের আসল বক্তব্যটা তাই। স্টালিন বলেছেন সাম্রাজ্যবাদী দেশের বুর্জোয়াদের সাথে কলোনির বুর্জোয়াদের এক করে দেখা ট্রটস্কীবাদেরই বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রবাবুদের কাণ্ডকারখানা দেখলে সন্দেহ থাকে না যে তাঁরা সজ্ঞানে মার্কসবাদ বর্জন করে ট্রটস্কীবাদী নীতির উপাসক হয়ে উঠেছেন।

১৯২৭ সালে স্টালিন ট্রটস্কীবাদীদের তত্ত্ব খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছিলেন, "সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিপ্লব এক জিনিস; এসব দেশের বুর্জোয়াশ্রেণী বিদেশের জনগণের উৎপীড়ক; এই বুর্জোয়ারা বিপ্লবের সব স্তরেই প্রতিবিপ্লবী। ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের বিপ্লব অন্য জিনিস; এসব দেশের জাতীয় বুর্জোয়ারা একটা বিশেষ স্তরে এবং একটা বিশেষ সময়ের জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সমর্থন করে।"...

"বিরোধী পক্ষের মূল ভ্রান্তি হল তাঁরা এ দুধরনের বিপ্লবের প্রভেদটা বোঝেন না এবং কিছুতেই স্বীকার করবেন না।"[২]

১. *Revolutionary Movement in Colonies*—PP 24-27, P.P. H. Edition

২. *Marxism and the National and Colonial Question*—Stalin, PP 196

স্টালিনের এই নীতি অনুসারে ভারতীয় ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াদের স্বভাব রবীন্দ্রবাবুরা যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা কখনও সত্য হতে পারে না। বুর্জোয়াদের "জাতীয় সংস্কারপন্থী" চরিত্র স্বীকার করে রবীন্দ্রবাবুরা যদি সাহিত্য-বিচারে নামতেন তা হলে মার্কসবাদীদের কৃতজ্ঞতা তাঁরা অর্জন করতেন। কিন্তু "ভারতীয় বুর্জোয়ারা প্রতিক্রিয়াশীল সব সময়ে"—এই ট্রটস্কীবাদী রাজনৈতিক সূত্র থেকে তাঁরা সাহিত্যবিচারে নেমেছিলেন ; কাজেই তাঁদের সাহিত্যবিচার যে ট্রটস্কীবাদের স্পর্শে কলুষিত হয়ে গেছে একথা মানতেই হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রবাবুরা আসলে রুশদেশের উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত মনস্বীদের সাদৃশ্য টানতে চেয়েছেন। সোজাসুজি তাঁরা এ কাজটা করেন নি ; কারণ মার্কসবাদীরা তাহলে সহজেই তাঁদের ট্রটস্কীবাদী তত্ত্বটা ধরে ফেলত। তাই রুশবুর্জোয়াদের নাম না করে বড় বড় কথার আড়ালে, তাঁরা এই বহুনিন্দিত ট্রটস্কীবাদী তত্ত্বটি পেশ করেন। বুর্জোয়া জীবনবেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার 'বিপ্লবী' বুলি আউড়ে ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিভূদের, প্রতিক্রিয়ার শিবিরের অংশীদার বলে ঘোষণা করেন। অথচ চীনের প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে স্টালিন ট্রটস্কীপন্থী-দের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, **"But the opposition forget that only people who do not understand and will not admit that there is a difference between revolution in oppressed countries and revolution in oppressing countries can talk like this, that only people for taking Leninism and joinning the followers of the Second International, can talk like this."**[১]

ট্রটস্কীবাদীদের বক্তব্য কি ছিল ? তাদের বক্তব্য ছিল রুশ দেশে যখন উদার-নৈতিক বুর্জোয়ারা সব অধ্যায়ে প্রতিবিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছে, তাদের যখন শত্রুতার সম্পর্ক, তখন চীনের বেলায় তা হবে না কেন ? স্টালিন বলেছিলেন, কারণ **"The liberal bourgeoisie of an *imperialist country* is bound to be counter-revolutionary,"** কিন্তু **"at a certain stage of its development the national bourgeoisie in the colonial countries may support the revolutionary movement of its country against**

১. ***On China*—Stalin, "Marxism and the National & Colonial Question"**

imperialism."[১] অর্থাৎ ট্রটস্কীবাদীরা চীনের বেলায় যে ভুল করেছিল, রবীন্দ্রবাবুরা ভারতের বেলায় গুরুর সেই ভুলই করে যাচ্ছেন ; কলোনির বুর্জোয়াদের সম্পর্কে লেনিনবাদী তত্ত্ব মানবেন না এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

রবীন্দ্রবাবুরা কলোনির বিপ্লবী আন্দোলনের তিন স্তর নিশ্চয়ই স্বীকার করেন না। স্টালিনের শিক্ষা হল যে,[২] প্রথম অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় যুক্তফ্রন্টের স্তরে, **জাতীয়-বুর্জোয়া বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করে।** কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে, বড় বুর্জোয়ারা বিপ্লবের ভয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করে, বিপ্লবকে বানচাল করে দেবার চেষ্টা করে। তৃতীয় স্তরে, কলোনিতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হবার পর, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার আগে নয়। ভারতবর্ষে ১৯২১ থেকেই বড় বুর্জোয়ারা আত্মসমর্পণ করতে আরম্ভ করেছিল, যে আত্মসমর্পণের ইতিহাসের পারসমাপ্তি হল ১৯৪৭ সালে। কিন্তু ১৯০৫ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত, ভারতীয় জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম স্তরে, বুর্জোয়ারা বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থন করেছিল। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্তও বুর্জোয়ারা প্রতিবিপ্লবী হয়ে যায় নি। স্টালিনের নীতি অনুযায়ী ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের এই হবে পরিচয়, বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা যে তত্ত্ব খাড়া করেছেন, অর্থাৎ ভারতের বুর্জোয়ারা বরাবরই প্রতিবিপ্লবী, সে তত্ত্ব মার্কসবাদী তত্ত্ব নয়, স্টালিনের শিক্ষার সাথে তার কোনো মিল নেই।

৪) আগেই বলা হয়েছে যে রবীন্দ্রবাবুরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ছুতো ধরে জাতীয় সন্ত্রাসবাদের পথ ধরেছেন। ঐতিহ্য-বিচারে স্টালিন-ডিমিট্রভের শিক্ষা বর্জন করে, মাও-এর পদ্ধতি-অনুসরণ না করে জাতীয় জীবনের অতীত ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কে, জাতীয় জীবন গড়ে তোলায় যেসব মনস্বীর অবদান সামান্য নয়, তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীলতার অপবাদে ছেঁটে বাদ দিয়েছেন। সমাজ-সংস্কার ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, প্রগতির জন্য যেসব সংগ্রাম হয়েছে তাদের তাৎপর্য একেবারেই স্বীকার করেন নি। বিশেষ বাস্তব অবস্থায় রামমোহন প্রভৃতি পশ্চিমী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভক্ত কেন হয়েছিলেন, তাঁদের আন্দোলনের মাধ্যমে যে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধারা তখনকার দিনে

১. *On China*—Stalin.

২. ঐ

রূপ পাচ্ছিল, এসব প্রশ্ন অবান্তর বলে তাঁরা বাদ দিয়েছেন। বিবেকানন্দের আপাতদৃষ্টিতে অরাজনৈতিক ধর্ম-আন্দোলনের পেছনে যে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ কাজ করছিল, যার জন্য তিনি আওয়াজ তুলেছিলেন, "জাতিকে বাঁচাতে গেলে জনতার ও নারীজাতির মুক্তি চাই", রবীন্দ্রবাবুদের চোখে এসবের কোনো দাম নেই। রবীন্দ্রনাথের মতাদর্শে যে মানবতা (humanism), মানবমহত্ত্ব, আশা ও আনন্দের সুর, ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান মূর্ত হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রবাবুরা এসব কিছুকেই বাতিল করেছেন প্রতিক্রিয়াশীলতার অপবাদে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকের কাছে ঐতিহ্য-বিচারে যে নিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক, সে নিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান রবীন্দ্রবাবুরা একেবারেই বর্জন করেছেন। সংস্কারবাদীরা ঘোষণা করে, "রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ—এরাই বাংলার নবযুগের স্রষ্টা ; এদের পথ অনুসরণ করলেই ভারতের মুক্তি।" রবীন্দ্রবাবুরা এই আংশিকতা-দোষদুষ্ট বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে ঘোষণা করলেন, "এরা জাতীয় জীবনে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার শুধু বাহক ; এদের বাদ দিয়েই প্রগতিশিবিরকে অগ্রসর হতে হবে।" কিন্তু এ দুটো বিশ্লেষণই যান্ত্রিক, অনৈতিহাসিক।

অথচ চীনের ঐতিহ্য-বিচার, মাও যেভাবে করেছেন, রবীন্দ্রবাবুদের তা হাতের কাছেই ছিল। 'গণরাষ্ট্রের একনায়কত্ব'[১] প্রবন্ধে কমরেড মাও ১৮৪০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত চীনের প্রগতিপন্থীরা কি ভাবে চিন্তা করতেন তার সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন। ঐ আমলের প্রগতিকামীদের 'বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের' ওপর যে আস্থা ছিল, তার দুর্বলতা, ত্রুটি তিনি দেখিয়েছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক হিসাবে এটাও তিনি দেখিয়েছেন যে, তখনকার বাস্তব অবস্থায় চীনা নব্যপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিক ছিল। প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে তিনি চীনের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলিকে, বুর্জোয়া ভাবধারার বাহক নব্যপন্থীদের, 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে হেয় করেন নি।

মাওয়ের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি অনুসরণ করে একথা আমরা নিশ্চয়ই বলব যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা, 'জাতীসত্তা' পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ কি হবে, ভারতীয় সমাজের প্রগতি কোন রাস্তায় হবে এসব সম্পর্কে কোনো নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে

১. গণরাষ্ট্রের একনায়কত্ব—মাও সে-তুঙ, মার্কসবাদী, পঞ্চম সংকলন।

পারেন নি। ১৮১৪ থেকে ১৯১৭ সালের আগে পর্যন্ত, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ভারতের প্রগতিশীল ধারার যাঁরা বাহক তাঁরা সকলেই পশ্চিমী বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ভক্ত ছিলেন, কোনো না কোনো দিক থেকে বিভিন্নভাবে। সমাজ-সংস্কারই হোক, শিক্ষা-আন্দোলনই হোক, ধর্ম-আন্দোলনই হোক,—এসবের মধ্যে একই সুর, "পশ্চিমী গণতন্ত্রের কাছ থেকে শেখো, সমাজকে নতুন করে গড়ে তোলো বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ছাঁচে।" রবীন্দ্রবাবুরা যাঁদের বলেছেন "ইংরেজী-শিক্ষিত মনস্বী" যারা "ইংরেজ শাসনের ভক্ত", তাঁদের সংস্কৃতি ও জীবনবেদ, সামন্ততন্ত্রী বা পুরাতনপন্থীদের সংস্কৃতির যে সম্পূর্ণ বিপরীত এটা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই স্বীকার করবেন।

এইসব ইংরেজীশিক্ষিত মনস্বীর এই ধারণা ছিল যে পশ্চিমী বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের নব্যপন্থার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মুক্তির বীজ। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে, এই "সত্য" প্রতিষ্ঠার জন্য প্রগতিশীলদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। অথচ রবীন্দ্রবাবুরা এসব সংগ্রামের কোনো তাৎপর্য স্বীকার তো করেন নি বটেই, অন্যদিকে ঘোষণা করেছেন যে এরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক দিক থেকে শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকাই নিয়েছেন। অদ্ভুত যুক্তিজাল বিস্তার করে, ইচ্ছামত অংশ উদ্ধৃত করে, রবীন্দ্রবাবুরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে রামমোহন একজন দ্বিতীয় মীরজাফর (মার্কসবাদী, পৃ. ১৩৪); রবীন্দ্রনাথ প্রধানত প্রতিক্রিয়াশীল, কোনো কোনো ব্যাপারে গান্ধীজীর চাইতেও বেশী (পৃ. ১৫০); রবীন্দ্রনাথ 'স্বদেশপ্রেমের', 'জাতীয়তা'র উদ্গাতা মোটেই নন, "বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে আজ ভারত যেভাবে আবদ্ধ আছে এই বন্ধনই রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বাধীনতা; সুতরাং নেহরুর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ" (পৃ. ১৪৭); বঙ্কিম-বিবেকানন্দ তো আমাদের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির হত্যাকারী!

প্রাক-সোভিয়েট যুগে, বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিই ছিল প্রগতিশীল। ভারতের ইংরেজী শিক্ষিত মনস্বীদের তাই সে যুগে যদি পশ্চিমী রাষ্ট্রের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার ইচ্ছা থেকে থাকে, ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে থেকে থাকে অগাধ বিশ্বাস, তবে তা যত অসম্পূর্ণই হোক না কেন, অসম্ভব নয় একেবারে। চীনের ইতিহাসের নব্যপন্থীদের

মতাদর্শ আলোচনা করতে গিয়ে কমরেড মাও সে-তুঙ'ও তাই বলেছেন। অথচ "সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শ" গ্রহণ করলেন না কেন, তাঁদের মতাদর্শে রিভাইভালিজমের চিহ্ন রইল কেন, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা এদের মতাদর্শে নেই কেন, এ সবের অজুহাতে রবীন্দ্রবাবুরা রামমোহন-বিবেকানন্দ সবাইকে প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারী বলে চিত্রিত করেছেন ; উপদেশ দিয়েছেন তাঁদের ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করতে।

এটা অবশ্য ঠিক যে ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনকে সার্থকতার পথে নিয়ে যেতে হলে, অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হলে আজ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের হাতিয়ার নিয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। মার্কসবাদী ডায়ালেকটিক্সের সাহায্যে আজ আমরা ভারতীয় সমাজের বিকাশ কোন পথে হবে, জাতীয়সত্তা পুনঃপ্রতিষ্টার পথ কি, এসব সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্ত করতে পেরেছি। আজ তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাধারার গুরুতর ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমরা সচেতন হয়েছি। মার্কসবাদী তত্ত্বে আরও ভালো করে আমরা বুঝতে শিখেছি যে রুশ-বিপ্লবের পর পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক অবস্থায় "বুর্জোয়া গণতন্ত্র" আর আমাদের আদর্শ হতে পারে না ; এখন 'পিপলস রিপাবলিক' বা 'জনসাধারণের গণতন্ত্র'টাই বাস্তব, ঐতিহাসিক আদর্শ। অন্যান্য দেশে 'বুর্জোয়া সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ঔপনিবেশিক দেশে সোভিয়েট বিপ্লবের পর, "জনগণের গণতন্ত্র"ই কায়েম করতে হবে এটাই মার্কসবাদের শিক্ষা। আমাদের পূর্বপুরুষেরা 'অন্য পথ' 'অন্য আদর্শ', নিয়েছিলেন, তাই তাঁরা সফল হন নি। বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদের, পশ্চিমী বুর্জোয়া সভ্যতার দেউলিয়াপনা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। আজ তাই প্রলেটারিয়ান জীবনাদর্শ দিয়ে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে পরাস্ত করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, এ সবই সত্য। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের বক্তব্য শুধু এটুকু নয়।

প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের নামে, মার্কসবাদের নামে, তাঁরা দিয়েছেন পুরনো ঐতিহ্য যা কিছু সব বর্জন করার পথ,—বিশেষ ধরনের বাস্তব অবস্থায়, ভারতের 'মনস্বী'রা যে 'জীবনাদর্শ' গ্রহণ করেছিলেন সেসব এমন কি সমস্ত রকমের "জাতীয়তা" ও "স্বদেশপ্রেম" বর্জন করার পথ। যে রামমোহন সর্বভারতীয় জাতীয়তার উদ্গাতা, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে "জাতীয়চেতনা"

বিকাশে যাঁর অসামান্য দান, তাঁকে রবীন্দ্রবাবুরা বিশ্বাসঘাতকের কোঠায় স্থান দিয়েছেন। যে বিবেকানন্দের দৌলতে একটা বিশেষ যুগে ভারতের অগণিত পেটিবুর্জোয়া আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল, দুর্জয় কর্মোন্মাদনা ও দেশসেবা হচ্ছে যাঁর 'বাস্তব বেদান্তে'র (Practical Vedanta) মূল কথা, তাঁকে রবীন্দ্রবাবুরা সাম্প্রদায়িক, দাস-মনোভাব-সম্পন্ন, সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার বলে চিত্রিত করেছেন। যে রবীন্দ্রনাথের জন্যে ভারতবর্ষ বহির্বিশ্বে পরিচিত, যাঁর প্রভাব এখনও পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের উপর প্রচণ্ড—কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, যিনি একটা বিশেষ যুগে, স্বদেশবাসীর প্রাণে অভয়মন্ত্র দিয়েছেন, তাঁকে রবীন্দ্রবাবুরা বড় বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, নেহরুর দীক্ষাগুরু বলে নাকচ করেছেন। ইতিহাসের এ মূল্যবোধ—অতীতের প্রতি এমন ঘৃণা, জাতীয় সন্ত্রাসবাদীদেরই সাজে, মার্কসবাদীদের নয়।

লেনিন প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে অতীতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন সে প্রশ্ন আলোচনা করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "Marxism won its world-historic significance as the ideology of the revolutionary proletariat, because it did not reject out and out the *most valuable achievements of the bourgeois epoch*, but on the contrary *made its own and worked over anew* all that was of value in the more than two thousand years of development of human thought."[১]

কিন্তু মার্কসবাদের নামে রবীন্দ্রবাবুরা ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশধারায়, বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের মতাদর্শে, কোনও গ্রহণযোগ্য, প্রগতিশীল জিনিস খুঁজে পান নি; বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামে, "the valuable achievements of the bourgeois epoch," সবটুকু বর্জন করার রাস্তা নিয়েছেন।

ডিমিট্রভ বলেছিলেন, "We, communists are irreconcilable opponents, on principle, of bourgeois nationalism of every variety. But *we are not supporters of national nihilism*, and should never act as such. The task of educating the workers

১. *Draft Resolution on proletarian culture*, **1920—Lenin.**

and all toilers in the spirit of proletarian internationalism, is one of the fundamental task of every Communist Party. But whoever thinks that this permits or even compels him to sneer at all national sentiments of the broad masses, is far from genuine Bolshevism, and has understood nothing of the teaching of Lenin and Stalin on the national question."[১]

অথচ রবীন্দ্রবাবুরা মার্কসবাদের নামে বিরাট পেটিবুর্জোয়া জনতার national sentiment-কে উপহাস করেছেন। রবীন্দ্রভক্তদের মার্কসবাদী প্রগতিশিবিরে আনবার চেষ্টা না করে তাঁদের শত্রু-শিবিরেই ঠেলে দিচ্ছেন।

আজকের দিনের গণতান্ত্রিক প্রগতিশিবিরের যোদ্ধাদের কাজ কি? আজকের দিনের কাজ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিরাট যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা, বড় বুর্জোয়াদের মুখোশ খুলে ধরা এবং নয়া গণতান্ত্রিক সমাজ গড়বার পথে পা দেওয়া।

এই বাস্তব অবস্থায় বড় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করতে হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। তাঁরা যে 'জাতির' নামে 'দেশের' নামে, 'জাতীয়তাবাদী' সেজে জনসাধারণের রক্ত চুষে নিচ্ছে, প্রতিক্রিয়াকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সাম্রাজ্য-বাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধশিবিরে গিয়ে পুরোপুরি যোগ দিয়েছে, তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ খুলে ধরতে হবে। জনসাধারণকে একথা বোঝাতে হবে যে আজকের দিনে নির্বিত্তশ্রেণীর নেতৃত্বে যে শ্রেণীসংগ্রাম চলেছে স্বাধীন ও সুখী জাতীয়জীবন গড়ে তোলবার সেটাই একমাত্র পথ· নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই যে 'জাতি' বাঁচতে পারে, জাতীয়জীবনের শ্রীবৃদ্ধি ও বিকাশ যে সেপথেই একমাত্র সম্ভব, নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জনসাধারণ ক্রমশ এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। মার্কসবাদীরা অবশ্যই জনসাধারণের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের এই শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে তুলবেন জনসাধারণের অব্যক্ত প্রচেষ্টাকে সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেবেন, প্রকাশিত করে তুলবেন। তা না হলে মার্কসবাদী স্বতঃস্ফূর্ততার কবলে গিয়ে পড়বেন, জনসাধারণের উপর বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাব তাতে বেড়েই যাবে। এ সব সত্যি এবং মার্কসবাদসম্মত, কিন্তু রবীন্দ্রবাবুদের ঐতিহ্যবিচারের মূল কথা তা

১. *The working class against Fascism*, Part II—Dimitrov, PP 46-47.

নয়। 'বুর্জোয়া সংস্কারপন্থী' ও 'হিন্দু রিভাইভালিস্ট'দের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে গিয়ে তাঁরা ভারতের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সবটুকু বাদ দিয়ে বসে আছেন। সমস্ত রকমের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, যাঁরা ভারতের নবজাগরণের নেতা, তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা স্বীকার করেন নি। শ্রেণীসংগ্রামের নামে, প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার নামে, তাঁরা গণতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় চেতনা বিকাশে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রচেষ্টার গুরুত্ব একেবারেই স্বীকার করেন নি। অথচ ডিমিট্রভ বহু আগে পরিষ্কার করে প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের সম্পর্ক কি, এ সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। ডিমিট্রভ বলেছেন যে, এ-দুয়ের মধ্যে বাস্তবিকই কোনো বিরোধ নেই, এ দুয়ের সার্থক সমন্বয়ে কোনোটিরই গৌরবহানি হয় না, বরং প্রতিষ্ঠা বাড়ে।১

শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগী শ্রেণীরা যে আজ নতুন, প্রগতিশীল সমাজ গড়বার জন্যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, যে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, নানাভাবে কোনো না কোনো পরিমাণে, আগেও হয়েছে, যদিও ঐতিহাসিক কারণে, সে সংগ্রাম সফল হতে পারে নি। আজ ভারতবর্ষের অচলায়তন, ঔপনিবেশিক সমাজের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলাই শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগীদের ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তারা নিশ্চয়ই অতীত সংগ্রামের প্রগতিশীল দিকটুকু গ্রহণ করবে, যে সমস্ত মনস্বীরা ধর্ম-মোহের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, সামাজিক কুসংস্কার রদ করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, জীবনের জয়গান যাঁদের কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছিল, ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্যে যাঁরা সংগ্রাম করেছিলেন আজীবন নিজেদের ধরনে— তাঁদের মহত্ত্ব, তাঁদের গৌরব, শ্রমিকশ্রেণী ও তার সহযোগীরা অস্বীকার করবে না। রবীন্দ্রবাবুদের মতো তাঁরা আন্তর্জাতিকতার নামে 'স্বদেশপ্রেম', নিজেদের পূর্বপুরুষদের অতীত গৌরব মুছে ফেলবেন না। বরং প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতা দিয়ে "নতুন স্বদেশপ্রেমে"রই তাঁরা আহ্বান করবেন। প্রলেটারিয়ান মতাদর্শ দিয়ে, অতীতের কদর্য কুৎসিৎ দিক সম্পূর্ণ বর্জন করে তার সুন্দর শোভন, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল দিকটুকু গ্রহণ করে, নবজীবনের পথে এগিয়ে যাবেন।

১. *The working class against Fascism*—Dimitrov.

আজকের দিনে বড় বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে লড়তে গেলে মার্কসবাদীদের, বর্তমান অধ্যায়ের সংগ্রামের সাথে নিজেদের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের—দেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল অতীতের সংযোগসাধন করতেই হবে। তা না হলে জাতির জীবনে যা কিছু মহৎ সবই বড় বুর্জোয়ারা কাজে লাগাবে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির সমর্থনে, জনতাকে বোকা বানাবার জন্যে। আদর্শগত সংগ্রামে সাফল্যলাভ করতে হলে মার্কসবাদীদের তাই দেখাতে হবে যে তারাই দেশের প্রগতিশীল, সংগ্রামী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী,—বড় বুর্জোয়ারা নয়।

জওহরলাল রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে মানবেন, গোলওয়ালকার বিবেকানন্দের ভক্ত সাজবেন, এ তো স্বাভাবিক। শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে এদের এ পথ নিতেই হবে। রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের ঐতিহ্যকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ব্যবহার করবে নিজেদের বনিয়াদ শক্ত করবার জন্যে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। জনতার উপর প্রভাব বজায় রাখবার জন্যে, পেটিবুর্জোয়াদের মোহ দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে প্রতিক্রিয়া এ কৌশল অবলম্বন করে নিজেদের প্রগতিবিরোধী মতাদর্শের জৌলুস বাড়াবে, এ তো তাদের শ্রেণী-সচেতনতারই পরিচয়। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুরা বড় বুর্জোয়াদের মুখোশ খুলে ধরবার জন্যে, তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন সম্পর্কে জনতাকে মোহমুক্ত করবার জন্যে কোন্ পথ ধরবেন? তাঁরা ধরেছেন, আসলে আত্মসমর্পণের পথ। তাঁদের আওয়াজ হল, "রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ—এঁদের সব প্রগতিশিবির থেকে দূর কর। এঁরা প্রগতি-যোদ্ধাদের অস্পৃশ্য।" এতে ফল হয়েছে এই যে দেশী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি রবীন্দ্রনাথদের দুর্বল জায়গাগুলি নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে, এবং তাঁদের স্বেচ্ছাচারী শাসনের পেছনে রবীন্দ্রনাথদের নাম করে নৈতিক সমর্থন জুটিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথদের ঐতিহ্যের তারাই উত্তরসাধক, রবীন্দ্রনাথ থাকলে যে তাদেরই সমর্থন করতেন, এরকম একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

রবীন্দ্রবাবুদের নীতির দৌলতে বাস্তবে প্রতিক্রিয়ার সামাজিক বনিয়াদ আরও শক্ত হয়েছে। কারণ রবীন্দ্রবাবুদের সন্ত্রাসবাদী নীতির ফলে রামমোহন-বিবেকানন্দের মতাদর্শের ত্রুটি সম্পর্কে জনসাধারণ সচেতন হয়ে উঠছে না, অগণিত বাঙালী পেটিবুর্জোয়া যারা সঙ্গতভাবেই রবীন্দ্রভক্ত, তাদের জয় করা যাচ্ছে না। বাস্তবে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি রামমোহন-

রবীন্দ্রনাথের নাম নিয়ে জনসাধারণকে নিজেদের শিবিরে ধরে রাখছে আর "প্রগতিপন্থীরা, 'মার্কসবাদীরা' জাতীয় ঐতিহ্যের কুৎসা-রটনাকারী" একথা বলে তাদের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। তাই আজ মার্কসবাদী-দের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পেটিবুর্জোয়াদের নিয়ে সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তোলার যে দায়িত্ব এসে পড়েছে, সে দায়িত্ব পালন করা যাচ্ছে না; রবীন্দ্র-বাবুরা বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রগতির শিবিরকে ছত্রখান করে দিচ্ছেন।

অথচ মতাদর্শগত সংগ্রামের মার্কসবাদী কায়দা সম্পর্কে ভুল হবার কথা নয়। ডিমিট্রভ "ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম" নিয়ে আলোচনা করবার সময়, এ সম্পর্কে পরিষ্কার নীতি ঘোষণা করে গেছেন বহুদিন আগে। তার উপদেশ ছিল, অতীতের সবটা বাতিল করো না, জাতির যারা বিরাট মনস্বী তাঁদের প্রতিক্রিয়ার হাতে ছেড়ে দিও না। সেটা মার্কসবাদ সম্মত নয়।[১]

আজ যখন সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশী এজেন্টরা ভারতবর্ষের "নয়া ইতিহাস", "দর্শনের ইতিহাস" লিখছে, প্রত্যেক দেশের ইতিহাস ঘেঁটে একথাই প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছে যে, তারাই দেশের গৌরবময় অতীতের উত্তরাধিকারী এবং প্রগতি-যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করছে একথা বলে যে তাঁরাই দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সব কিছুরই নিন্দাকারী, তাঁরাই বিজাতীয় মনোভাব-সম্পন্ন, তখন রবীন্দ্রবাবুরা কি করেছেন? তাঁরা একথা প্রমাণ করতে পারেন নি যে প্রগতি-যোদ্ধারাই দেশকে বাঁচাচ্ছে, দেশের নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টি করছে—গৌরবময় অতীতকে আরও অগ্রসর করে নিয়ে যাচ্ছে মহত্তর সম্ভাবনার দিকে। জনসাধারণকে একথা তাঁরা বোঝাতে পারেন নি যে প্রগতি-যোদ্ধাদের 'আন্তর্জাতিকতা'র সাথে 'স্বদেশপ্রেমে'র কোনো বিরোধ নেই; বরং প্রলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতার মাধ্যমেই এই স্বদেশপ্রেম আরও মহনীয় হয়ে উঠছে। রবীন্দ্র-বাবুরা কি দেখাতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথের যা কিছু আদর্শ সবই প্রতিক্রিয়ার হাতে পড়ে কলঙ্কিত হচ্ছে; সে সব আদর্শ প্রগতির সৈনিকদের হাতেই নিরাপদ এবং তাঁরাই সে আদর্শকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? রবীন্দ্রবাবুরা কি বলতে পেরেছেন, "আমরা রামমোহন-বিবেকানন্দের-রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতার কথা জানি। কিন্তু শাসকশ্রেণী যে তাদের নিজেদের শিবিরের পার্টিসান বলে দাবি করে সেটা মিথ্যা কথা। রামমোহন-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ যে কুসংস্কারের

১. *The Working class against Fascism*—**Dimitrov, PP 49.**

বিরুদ্ধে, নারীপুরুষ সমানাধিকারের জন্যে, জ্ঞানে, কর্মে সমাজকে নতুন করে গড়বার চেষ্টা করেছেন—আমরাই তাঁদের সেই প্রগতিশীল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। আমরাই রবীন্দ্রনাথের জীবনাদর্শকে—তাঁর মানবতা, ব্যক্তিস্বাধীনতার জয়গান, আশাবাদ, আন্তর্জাতিকতা, সব কিছুকেই নতুন অবস্থায় নতুন রূপ দিচ্ছি। আমরাই এ সব মনস্বীর গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ভাবসম্পদকে রক্ষা করছি, প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে; আমরাই তাদের ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত হতে দিচ্ছি না শাসকশ্রেণীর কলুষ-হস্তস্পর্শে।" কৈ? জার্মান কমিউনিস্টরা যেমন আওয়াজ তুলেছিল, "গ্যেটে আমাদের, গ্যেটেকে আমরা ফ্যাশিস্টদের হাতে ছেড়ে দিতে পারি না," রবীন্দ্রবাবুরা সেরকম আওয়াজ তুলতে পারেন নি, "রবীন্দ্রনাথরা আমাদের; নেহরু, গোলওয়ালকারের হাতে এঁদের আমরা ছেড়ে দিতে পারি না।" তাঁরা বরং উল্টো আওয়াজ তুলেছেন, "প্রগতিশিবির থেকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের দূর কর।"

আসল কথাটাই হল যে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদকে লড়বার মার্কসবাদী কৌশল রবীন্দ্রবাবুরা বর্জন করেছেন; তাঁরা ধরেছেন জাতীয় সন্ত্রাসবাদ—ট্রটস্কীবাদের পথ। ফল যা হবার তাই হয়েছে। মতাদর্শের সংগ্রামে প্রতিক্রিয়া জিতেছে, প্রগতিযোদ্ধারা হেরে গেছেন।

৫) রবীন্দ্রবাবুরা মার্কসবাদ বর্জন করে ট্রটস্কীবাদের পাঁকে এমন আকণ্ঠ ডুবেছেন যে পেটিবুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্পর্কেও তাঁরা ভুল করেছেন। শীতাংশুবাবু তো পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে সাবধানধ্বনিই উচ্চারণ করেছেন। প্রগতি সাহিত্য-শিবিরে থেকেও অনেকে মনে করেন যে ভারতের বর্তমান অবস্থায়, অর্থাৎ নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে, পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী বুঝি 'মিত্র-শ্রেণী'! শীতাংশুবাবুর মতে এই মার্কসবাদ-বিরোধী উপলব্ধি নিয়ে প্রগতি সাহিত্য-শিবিরকে জোরদার করা যাবে না। শীতাংশুবাবু তাই বলেছেন, "আর একথাও মনে রাখা দরকার যে আজকে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করার মানেই দেশীয় শোষকদেরও খতম করা। বিপ্লবকে সেই পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী; আর সকলেই তার নেতৃত্ব ভিন্ন নানান দ্বিধায় পেছপা হবে—বিশেষ করে পেটিবুর্জোয়ারা। পেটিবুর্জোয়ারা কিভাবে বিপ্লবকে বানচাল করে তার দৃষ্টান্ত আজকের দিনে People's Democracy-গুলিতে অপ্রতুল নয়। সেখানে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি থেকে এসব বিপ্লবভাঙ্গাদের বের করে দেওয়া হচ্ছে।"

আরও আছে। ট্রটস্কীবাদের আবর্তে পড়লে যে উদ্ধারের আশা নেই, শীতাংশুবাবুই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শীতাংশুবাবুর বক্তব্য শুনুন: যদি কোনো 'সংস্কারবাদী' সাহিত্যিক বলেন যে আজকের দিনের বাস্তব অবস্থায়, নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যসৃষ্টিই যখন ভারতবর্ষের প্রগতি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতি কর্মীদের কাজ তখন প্রগতি সাহিত্যিক 'নির্বিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীনে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংযুক্ত ফ্রন্টের' প্রবক্তা হবেন, এ ফ্রন্টের যাঁরা অংশীদার তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, তাঁদের নবজীবনের পথে অভিযান এসবকে তিনি ভাষা দেবেন, 'জনতা'কে করে তুলবেন সাহিত্যভাত; তবে শীতাংশুবাবু তাকে ধমক দেবেন, বলবেন, "সবল শ্রেণীর মুখপাত্র হবার চেষ্টা করা এবং সমাজবাদ না এলে সমাজবাদী চেতনা আসবে না এ যান্ত্রিকতার প্রশ্রয় দেওয়া তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের যুগে বুর্জোয়া প্রচারের কাছে পরাস্ত হওয়ারই নামান্তর।"

অর্থাৎ শীতাংশুবাবুর রাজনৈতিক বক্তব্য হল যে, ১) আজকে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদকে খতম করা মানেই দেশীয় শোষকদেরও খতম করা। সোজা কথায় ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃতি আজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শুধু নয়, ধনতন্ত্র-বিরোধীও বটে। ২) কাজেই পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে সাবধান! তারা বিপ্লবভাঙ্গাদের দলে! ৩) "সকল শ্রেণীর মুখপাত্র হওয়া" প্রগতি সাহিত্যিকের আদর্শ হতে পারে না, কেননা অন্য সব শ্রেণীই বিপ্লব শুধু ভাঙ্গে, বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে!"

শীতাংশুবাবু কেমন স্বচ্ছন্দে ট্রটস্কীবাদী তত্ত্ব প্রচার করেছেন তাঁর এই রাজনৈতিক বক্তব্য থেকেই জলের মতো সেটা প্রমাণ হচ্ছে। শীতাংশুবাবু ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত মেনে নেন নি। তাই তিনি আজও ঘোষণা করতে পারেন যে, "আজকে সাম্রাজ্য-বাদকে খতম করা মানেই দেশী শোষকদেরও খতম করা।" অথচ আন্তর্জাতিক শিক্ষা, কমরেড মাওয়ের শিক্ষা হচ্ছে স্বতন্ত্র। চীনের বেলায় যেমন ভারতের বেলায়ও তেমনি নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সাম্রাজ্যবাদ, জমিদার ও আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিশ্রেণী, বড় শোষকদেরই খতম করা হবে। বাকি থাকবে যে শোষক-শ্রেণী সেই "জাতীয় বুর্জোয়াদের" বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ে অন্তত খতম করা হবে না।

কমরেড মাও সে-তুঙ তাঁর "নয়া-গণতন্ত্রে" বহুদিন আগে বুঝিয়েছেন যে আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে খতম করাই মূল কাজ, সমাজতন্ত্র কায়েম করা, সাধারণভাবে সব শোষকদের খতম করা বিপ্লবী আন্দোলনের আশু লক্ষ্য নয়। সেইজন্যে কমরেড মাও তাঁর "দুই অধ্যায়ের বিপ্লব" তত্ত্ব বুঝিয়েছিলেন। শীতাংশুবাবুরা অবশ্য "এক অধ্যায়ের বিপ্লবে" আস্থাবান। কাজেই মাও-এর তত্ত্ব গ্রহণ না করে তাঁরা মার্কসবাদ-বিরোধী, যুগোশ্লাভ টিটো-গোষ্ঠীর অন্যতম নায়ক কার্দেলির "গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতন্ত্রের সঙ্গে **অবিচ্ছেদ্যভাবে** জড়িত" এই ট্রটস্কীবাদী তত্ত্ব এখনও প্রচার করছেন। কার্দেলির "Interblending" তত্ত্ব ভারতের "জনগণের গণতন্ত্রের" স্বরূপ আলোচনায় "মার্কসবাদী" গ্রহণ করেছিল।[১] কার্দেলি বুঝিয়েছিল যে যুগোশ্লাভ গভর্নমেণ্ট শুধু যে সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিকে খতম করেছিল তা নয়; সাধারণভাবে শোষকদের খতম করে, সরাসরি সমাজতন্ত্র গঠনে অগ্রসর হয়েছিল। "The Government could not restrict itself merely to liquidating the various feudal remnants and capitalist monopolies but had to adopt a clear course leading to a *general elimination* of capitalism and the construction of socialism in Yugoslavia."[২]

কার্দেলির ও শীতাংশুবাবুদের তত্ত্ব শুনতে খুবই বিপ্লবী; সত্যিই তো "দেশীয় শোষকদেরও খতম করা" অর্থাৎ সাধারণভাবে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ, কুলাক-শ্রেণীর উচ্ছেদ করে এগিয়ে যাওয়া, বিপ্লবী তত্ত্ব নয় কি? অথচ আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী ১৯৪৮ সালের জুন মাসে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে এ তত্ত্ব মার্কসবাদ-বিরোধী। আন্তর্জাতিক ঘোষণা করেছিল, "of late the leaders of the Communist Party of Yugoslavia, have, with perfect aplomb, declaiming a policy of liquidating the capitalist elements in Yugoslavia. In a letter to the Central Committee of the CPSU (B) dated April 13, Tito and Kardelj wrote that "the plenum of the Central Committee approved the

১. ভারতের নয়াগণতন্ত্র—মার্কসবাদী, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৫৪।

২. *Lessons of Yugoslav Resolution*, E. Kardelj, *"Communist."*

measure proposed by the Political Bureau of the Central Committee to liquidate the remnants of Capitalism in the country." In accordance with this line Kardelj, speaking in the Skupschina on April 25, declared, "In our country the days of the last of remnats of the exploitation of man by man are numbered."

কার্দেলির কথা শুনতে সত্যই তো চমৎকার। কিন্তু আন্তর্জাতিক মার্কসবাদী ঘোষণা করেছিল, "In the conditions prevailing in Yugoslavia this position of the leaders of the Communist Party in regard to the liquidation of the capitalist elements, and hence the Kulaks as a class, can not be qualified as other than adventurous and non-Marxist."[১]

অনুন্নত, কৃষিপ্রধান, সামন্ততান্ত্রিক দেশে সরাসরি "দেশী শোষকদের" উচ্ছেদ করা যে সম্ভব নয়, এ প্রশ্ন আলোচনা করে আন্তর্জাতিক ঘোষণা করেছিল, 'The Information Bureau considers that since these latest decrees and declarations of the Yugoslav leadership are demagogic and impracticable in the present conditions, they cannot but compromise the banner of Socialist construction in Yugoslavia.

That is why the Information Bureau considers such adventurist tactics undignified manoeuvre and an impermissible political game."[২]

অথচ শীতাংশুবাবুরা সমর্থনের অযোগ্য এই "রাজনৈতিক খেলা" (political game) এখনও খেলছেন। এখনও 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় নির্বিবাদে কার্দেলির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন।

এ রাজনৈতিক খেলারই অন্যদিকে হচ্ছে পেটিবুর্জোয়াদের বিপ্লব-ভাঙ্গাবার দলে বলে গাল দেওয়া। শীতাংশুবাবুরা পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে যে তথ্য আহরণ

১. *Cominform Resolution on Yugoslavia*—June, 1948.

২. ঐ

করেছেন যে তারা People's Democracy গুলিতে বিপ্লবকে বানচাল করে দিয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের কোনো তথ্য তিনি দেন নি। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে পেটিবুর্জোয়াদের সম্পর্কে শীতাংশুবাবুরা যে তত্ত্ব খাড়া করেছেন, মার্কসবাদের শিক্ষার সাথে তার কোনো মিলই নেই। স্টালিন শিক্ষা দিয়েছিলেন,[১] যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ঔপনিবেশিক দেশে পেটি-বুর্জোয়ারা বিপ্লবীফ্রন্টের অংশীদার। মাও-এর শিক্ষাও তাই। পেটিবুর্জোয়ারা যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে না, তাদের নেতৃত্বে যে বিপ্লব সফল হতে পারে না এ তত্ত্ব মার্কসবাদসম্মত। কিন্তু পেটিবুর্জোয়ারা 'বিপ্লব-ভাঙ্গা' এ তত্ত্ব একান্তভাবেই ট্রটস্কীবাদসম্মত। ভারতবর্ষে যে গণরাষ্ট্রিক একনায়কত্ব স্থাপন করতে হবে সেটা হবে "সমস্ত বিপ্লবীশ্রেণীর একনায়কত্ব" (মাও)[২], যার ভেতর পেটিবুর্জোয়ারাও থাকবে। "নির্বিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন সংযুক্ত ফ্রন্টে" পেটিবুর্জোয়ারা ঘনিষ্ঠ সহযোগী—মিত্রশ্রেণী, এটাই চীনের বিপ্লবের শিক্ষা। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে শীতাংশুবাবুরা চীনের অভিজ্ঞতা থেকে, আন্তর্জাতিক মার্কস-বাদের কাছ থেকে কিছু শেখবার চেষ্টা করেন নি। ট্রটস্কীবাদী মন্ত্রে তাঁরা দীক্ষা নিয়েছেন কাজেই তাঁদের উপলব্ধি তো মার্কসবাদ-বিরোধী হবেই।

ট্রট্স্কীবাদের ভূত ঘাড়ে চেপেছে বলেই শীতাংশুবাবুরা বলতে পারেন, অন্য সব শ্রেণীরাই বিপ্লব-ভাঙ্গাদের দলে—"বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে।" ট্রট্স্কীবাদের মতেই শ্রমিকশ্রেণী একাই বিপ্লব করে। অভিমন্যুর মতো শ্রমিকশ্রেণী চারদিকে শত্রুপরিবেষ্টিত। নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব, একক শ্রমিকশ্রেণী অন্যসব শ্রেণীর প্রতি-কূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে—বিপ্লব-ভাঙ্গাদের পরাস্ত করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মার্কসবাদের শিক্ষা কিন্তু স্বতন্ত্র। মার্কসবাদের মতে শ্রমিকশ্রেণী একা বিপ্লব করে না, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে অগণিত জনতা বিপ্লব করে—মার্কসবাদের এই শিক্ষা।[৩] সব ঔপনিবেশিক সামন্ততান্ত্রিক দেশের বেলায় যেমন ভারতের বেলায়ও তেমনি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণী বন্ধুদের সাহায্য নিয়েই অগ্রসর হবে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক, পেটিবুর্জোয়া, মাঝারি জাতীয় বুর্জোয়ারা মিলিত হবে লড়াইয়ের ময়দানে,

১. *Toilers of the East*—Stalin.

২. *New Democracy*—Mao Tse-Tung.

৩. *Marxism and the National and the Colonial Question*

বিপ্লবকে সফল করবার জন্যে। তা ছাড়া, ইওরোপ ও আমেরিকার গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শান্তির শিবিরের যোদ্ধারাও আমাদের বন্ধু হিসেবে রয়েছে। এসব হিসেব না করে, "বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে" বললে, গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিকে ছোট করে দেখাই যে শুধু হয় তা নয়, মার্কসবাদ বর্জন করাও হয়।

"বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে", একথা শীতাংশুবাবু লিখেছেন এ জন্যে যে তাঁর চেতনায় এখনও একথাটা রয়েছে যে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া আর সব শ্রেণীই বিপ্লব-ভাঙ্গাদের দলে। অথচ ভারতবর্ষে যে "গণরাষ্ট্রিক একনায়কত্ব" কায়েম করতে হবে তাতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকসম্প্রদায়, পেটিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী সংঘবদ্ধ হবে। এবং এসব শ্রেণী সম্মিলিতভাবে বিপ্লবকে সফল করে তুলবে। "শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হবে" এই সঠিক মার্কসবাদী সূত্র থেকে "বিপ্লব শ্রমিকশ্রেণীই করে"—এই ট্রট্‌স্কীবাদী সিদ্ধান্তে শীতাংশুবাবু হাজির হয়েছেন, এতে তাঁর তর্ককুশলতাও প্রমাণ হয় নি।

আজকের দিনে প্রত্যেক মার্কসবাদীর কর্তব্য হচ্ছে আন্তর্জাতিকের ভিত্তিতে ও চীনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রবাবুদের "রাজনীতি"কে বিচার করে দেখা এবং যদি তাঁদের বক্তব্যের ভেতর মার্কসবাদ-বিরোধী, ট্রটস্কীবাদী তত্ত্ব কিছু থাকে, তবে বিষের মতো তা বর্জন করা। কারণ ট্রটস্কীবাদকে নির্মূল করতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণীর অধিনায়কত্বে সংযুক্ত ফ্রন্ট গড়ে তোলা যাবে না,—না রাজনীতিতে, না সাহিত্যে। আজ তাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষা গ্রহণ করে, আন্তর্জাতিকের অমূল্য উপদেশ শিরোধার্য করে, আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

সেজন্যে রবীন্দ্রবাবুদের মার্কসবাদ-বিরোধী সাহিত্যিক থিসিস বর্জন করাটাই প্রথম কাজ। তারপর মার্কসবাদী তত্ত্ব আয়ত্ত করে, স্টালিন-মাও-এর শিক্ষা গ্রহণ করে প্রগতি সাহিত্যের শিবিরকে জোরদার করে তোলাটা দ্বিতীয় কাজ।

প্রগতি সাহিত্যিকদের আজ দু-ফ্রন্টে লড়াই চালাতে হবে, একদিকে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ, অন্যদিকে বামপন্থী অতি-বিপ্লববাদ—এবং বর্তমানে দ্বিতীয়টাই বেশী জরুরী। রবীন্দ্রবাবুদের হাতে পড়ে মার্কসবাদ প্রগতি সাহিত্যিকদের ও জনসাধারণের মাঝখানে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে ধরেছিল। কিন্তু মার্কসবাদী তত্ত্ব তো গুরুর মন্ত্র নয় যে শুধু ভক্তসম্প্রদায়ের জন্যে, এক বিশেষ

গোষ্ঠীর জন্যে তা থাকবে। আজ আবার মার্কসবাদকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে জনসাধারণের মধ্যে—তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে এই নতুন জীবনবেদ দিয়ে। তবেই তারা গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে সামিল হবে। রবীন্দ্রবাবুদের হাতে পড়ে মার্কসবাদের যা দশা হয়েছে তাতে আমরা পুরনো ভুল সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। শত্রুদের সাথে লড়াই আমরা করব, কিন্তু ভবিষ্যতে আর আমরা মিত্রদের, সহযোগীদের, শত্রুর কোঠায় ফেলবার ট্রটস্কীপন্থী নীতি চালু হতে দেব না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আজও অনেক লেখক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী বুর্জোয়া জীবনাদর্শের পাঁকে আটকা পড়ে রয়েছেন। এঁরা অনেকেই প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা প্রচার করেছেন। কিন্তু প্রগতি-কর্মীদের এটা মনে রাখতে হবে যে এঁদের মধ্যে অধিকাংশ সচেতনভাবে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের পার্টিসান নন। এঁদের জয় করাটা প্রগতিকর্মীদের কর্তব্য। এবং সঠিক নীতি গ্রহণ করলে এদের জয় করা অসম্ভব নয়। শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ এতই বৈজ্ঞানিক, বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতায় এতই সমৃদ্ধ যে, এ মতাদর্শ ঠিকমত জনসাধারণের মধ্যে নিয়ে যেতে পারলে, নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই, তাদের মোহভঙ্গ হবে,—তারা সন্ধান পাবে নতুন সম্ভাবনার, আনন্দোজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

ভারতবর্ষে প্রগতি সাহিত্যের প্রকৃতি কি হবে, কুও মো জো-র "চীনের সাহিত্যে ও শিল্পে সংযুক্ত ফ্রন্ট" পড়বার পর সে বিষয়ে সন্দেহ থাকবার আজ আর কথা নয়। বর্তমান স্তরে, ভারতবর্ষের বিপ্লব প্রকৃতিগতভাবে **সমাজ-তান্ত্রিক** বিপ্লব নয়। এটা এমন কি, দু'নম্বর "মার্কসবাদী" যে-তত্ত্ব খাড়া করেছিল যে ভারতের নয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে **অবিচ্ছেদ্যভাবে** জড়িত (Interweaving, inter-lacing, growing over), সে-তত্ত্বও আজ বাতিল হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিকের শিক্ষা ও চীনের অভিজ্ঞতা থেকে আজ আমরা জেনেছি যে ভারতের বিপ্লব ও "শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লব," এবং এ বিপ্লব সম্পন্ন হলে পর, তবেই সমাজতন্ত্র গঠনের প্রশ্ন উঠবে তার আগে নয়।

কাজেই একথা পরিষ্কার যে আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য নতুন প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্যে পরিণত হবে, যার মর্মবাণী হবে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী। এ নতুন সংস্কৃতি ও সাহিত্য হবে বৈজ্ঞানিক ভাবধারায়

সমৃদ্ধ। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এ রূপ দেবে, জনতার সৃজনশীল প্রতিভার প্রশংসা থাকবে তাতে, আর জনতার জীবনের বিচিত্রধারা শিল্পকর্ম-সমন্বিত রূপ পাবে এর মাধ্যমে। এ নতুন সংস্কৃতি ও সাহিত্য শুধু উপরতলার মানুষদের অবসর বিনোদনের উপায় হবে না; অন্যদিকে এ সংস্কৃতি ও সাহিত্য হবে 'জনগণের সম্পত্তি'।

কাজেই দুটো জিনিস পরিষ্কার। ভারতে প্রগতিসাহিত্য আপাতত শ্রমিকশ্রেণীর প্রলেটারিয়ান সাহিত্য হয়ে উঠছে না। আবার এ সাহিত্য পুরনো গণতন্ত্রের অচল সাহিত্যও থাকছে না। এ সাহিত্য হবে নয়া-গণতন্ত্রের নতুন প্রগতিশীল সাহিত্য।

রাজনীতিতে যেমন, তেমনি সাহিত্য ও শিল্পের যুক্তফ্রন্ট শ্রমিকশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন হবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই যুক্তফ্রন্টে শ্রমিকশ্রেণী ছাড়াও কৃষক-সমাজ, পেটিবুর্জোয়া, 'জাতীয়' বুর্জোয়াশ্রেণীও অংশগ্রহণ করবে। বিভিন্ন শ্রেণী থাকায় এই সংযুক্ত ফ্রন্টে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীও থাকবে। কুও মো জো দেখিয়েছেন যে খুব তাড়াতাড়ি এই পার্থক্য বিলোপ করা যাবে না। শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর সহযোগী যারা, তাদের অবশ্য শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কিন্তু শত্রু হিসেবে দেখলে তাদের চলবে না। সেটা হবে মার্কসবাদ বর্জন করবারই নামান্তর।

সংযুক্ত ফ্রন্টের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন শ্রেণী থাকলেও, রাজনীতির দিক থেকে—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার ভিত্তিতে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে, গণসাহিত্য সৃষ্টির সৃজনশীল প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই ফ্রন্টের একটা সাধারণ লক্ষ্য গড়ে তোলাও সম্ভব, যে সাধারণ লক্ষ্যটাই হবে বিভিন্ন শ্রেণীর ভেতরকার যোগসূত্র।*

* পরিচয়, নবপর্যায়, ৫ম সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃ. ৫৭-৮৬; এই প্রবন্ধটির শিরোনামের উপর মুদ্রিত ছিল 'আলোচনার জন্য'। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। 'ভ্রম-সংশোধন'-এর নির্দেশ মান্য করে মূল রচনার পৃষ্ঠা-সংখ্যার রদবদল ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।—সম্পাদক

মার্কসবাদ ও বাংলা সাহিত্য* / অনিমেষ রায়

এক

আজকের দিনে বাংলা সাহিত্য কোন্ পথে যাবে, বাংলা সাহিত্যের কর্তব্য কি, এ সম্বন্ধে মার্কসবাদ মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা ও নির্দেশ দিতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস। আজ বাংলা সাহিত্যের দুই ধারা। এক ধারা বাংলা সাহিত্যকে পিছন দিকে টানছে। এই সাহিত্য প্রতিফলিত করছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতিকে, এই সাহিত্য ওই সামাজিক শক্তিগুলিরই ভাবাদর্শ ও শিল্পরূপ। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি হল সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয় বড় বুর্জোয়া ও ফিউডালিজমের অবশিষ্টাংশ। এরা ভারতকে পশ্চাৎপদ রাখতে চায়, ভারতের কৃষিতে ও শিল্পে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ ও উৎপাদনশক্তির প্রসারের পথ রুদ্ধ করতে চায় এবং ভারতকে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের একটি লেজুড় ঔপনিবেশিক ইকনমিরূপে কায়েম রাখতে চায়। এই হল এদের অর্থনীতি। এদের রাজনীতিটা এদের অর্থনীতিরই কেন্দ্রীভূত সারাংশ। সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের হাতে ন্যস্ত রাখাই এদের রাজনীতি। এটাই হল ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির শাঁস। কিন্তু এর একটা দৃষ্টিবিভ্রমকারী খোলস আছে। সেটা হল 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র', জাতীয় বুর্জোয়ার 'স্বাধীন' রাষ্ট্র এবং এটাও আবার বহুরূপীর মতো আরো রং বদলে মাঝে মাঝে খবরের কাগজ ও রেডিও মারফৎ এবং কংগ্রেস, সোশ্যালিস্ট পার্টি, আই. এন. টি. ইউ. সি. ইত্যাদির নেতাদের বক্তৃতায় জনগণের শাসন, এমন কি সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক রূপেও নিজেকে জাহির করে। কিন্তু নিঃসন্দেহেই এই রাজনীতির বড়

* ৫নং 'মার্কসবাদী' সংকলনে রবীন্দ্র গুপ্তের "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" নামক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কসবাদের প্রয়োগ নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে, মাও সে-তুঙের নিউ ডিমোক্রেসি ও ১৯৪২ সালের ইয়েনান বক্তৃতা, এই দুইটি প্রামাণ্য দলিলের সাহায্যে সেই বিতর্কের মীমাংসা করতে চেষ্টা করাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য। চীন সম্বন্ধে মাও-য়ের মূল বিশ্লেষণ ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। —লেখক

কর্তারা হলেন ব্রিটিশ ও মার্কিন মনোপলি পুঁজির মালিকরা। এই রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ও রাজনীতির মনোজাগতিক রূপায়ণ, ভাবাদর্শ, শিল্পরূপ, ইত্যাদিই হল আজকের দিনের প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য যার চরিত্র সাম্রাজ্যবাদী ও ফিউডালধর্মী। কিন্তু এখানেও আমরা লক্ষ্য করি ওই একই বৈশিষ্ট্য যা আমরা দেখতে পাই ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনীতির, বিশেষ করে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্যবাদী ফিউডালধর্মী সাহিত্যই আজ নিজেকে আত্মপ্রকাশ করে 'স্বাধীন' জাতীয় বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সাহায্যে। সকল রকমের বুর্জোয়া নেতৃত্বমূলক ও বুর্জোয়া একাধিপত্যমূলক ভাবাদর্শ, জাতীয়তাবাদ, গান্ধীবাদ, ইসলামিক গণতন্ত্রবাদ, নেহরুবাদ ইত্যাদি নিজেদেরকে একটা 'স্বাধীন' জাতীয় ভাবাদর্শ বলে প্রচার করলেও আসলে তারা সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের শিকলেই ভারতকে আরও শক্ত করে বেঁধে রাখতে সাহায্য করছে এবং সেগুলি ও অন্যান্য অনুরূপ ভাবাদর্শগুলি সবই সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল ভাবাদর্শ। ভারতে আজ বুর্জোয়া সাহিত্যের কনটেন্ট নিঃসন্দেহেই সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল এবং তাই আজ বুর্জোয়া সাহিত্যের চরিত্র হল কম্প্রাডোর সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল সাহিত্য। এই সাহিত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, এই সাহিত্যের উচ্ছেদ করতে হবে, এ বিষয়ে প্রতিটি গণতান্ত্রিক সাহিত্যিকের মনে কি সন্দেহ থাকতে পারে? যেমন ভারতের তথাকথিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রটা হল সাম্রাজ্যবাদী দাসশাসনতন্ত্র, তেমনই আজ ভারতের বুর্জোয়া জাতীয়তবাদী সাহিত্য হল, সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্য, দাসসাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় ধারাটি সাহিত্যকে এগিয়ে দিতে চায়। এই সাহিত্য প্রতিফলিত করছে প্রগতিশীল বিপ্লবী শক্তিগুলির অর্থনীতি ও রাজনীতিকে। এই সাহিত্য প্রগতিশীল শক্তিগুলির ভাবাদর্শ ও শিল্পরূপ। এই প্রগতিশীল শক্তিগুলি হল শ্রমিক, কৃষক, শহুরে পেটিবুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী। এরা সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল অর্থনীতির চাপে শোষিত, নিষ্পিষ্ট ও অত্যাচারিত। এরা ভারতকে এগিয়ে দিতে চায়, ভারতে উৎপাদনশক্তির প্রসারসাধন করতে চায়, কৃষিতে ও শিল্পে পুঁজিবাদী বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে চায়। এরা চায় বিদেশী পুঁজি ও দেশের পুঁজিওয়ালাদের পুঁজি বাজেয়াপ্ত করতে, জমিদারদের জমি

বাজেয়াপ্ত করতে, ভূমিহীন চাষী, ছোট চাষী, মাঝারি চাষী ও ধনী চাষী সকলের মধ্যে সমান ভাগে জমি বিলি করতে, যাতে তারা নিজেদের জমিতে স্বাধীনভাবে চাষ করতে পারে। এরা চায় শিল্পে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে মাঝারি ও ছোট পুঁজিবাদী উৎপাদন ও উদ্যম বাড়ুক কিন্তু গণস্বার্থে ও গণরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। এই সব এদের চরম অর্থ নৈতিক লক্ষ্য এবং তাইতে পৌছতে হলে আজকের শোষণের বিরুদ্ধে দাবিদাওয়া ও লড়াইয়ের ভিত্তিতে রয়েছে বর্তমান অর্থ নৈতিক লক্ষ্য। এই দুইয়ে মিলে এদের অর্থ নীতি। এবং এই অর্থনীতির সারাংশই হল এদের রাজনীতি। এই রাজনীতির লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক, পেটিবুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী, এই সকল শ্রেণীর যুক্ত গণতান্ত্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা, যাতে করে এই গণরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ভারত পুঁজিবাদী বিকাশের স্তর সম্পন্ন করে ভবিষ্যৎ সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। এই নয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা, এটাই এদের চরম রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যেখানে যেমন সম্ভব রাজনৈতিক লড়াই, এটাই বর্তমান রাজনৈতিক লক্ষ্য। এই দুইয়ে মিলে এদের রাজনীতি, নয়া গণতান্ত্রিক রাজনীতি এই নয়া গণতান্ত্রিক অর্থনীতির ও রাজনীতির মনোজাগতিক রূপ। ভাবাদর্শ, শিল্পরূপ ইত্যাদি হল নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও সাহিত্য। এটাই নূতন সাহিত্য। এই নূতন সাহিত্যের বিকাশ সাধন করা ও শ্রীবৃদ্ধি করা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সাহিত্যিকের কর্তব্য।

অবশ্য এই নূতন সাহিত্য নয়া গণতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাজনীতি থেকে উদ্ভূত এবং তাকেই এই সাহিত্য এগিয়ে দেবে। এই নূতন সাহিত্যের কন্‌টেন্টটা হল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী কন্‌টেন্ট, এই সাহিত্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল বিরোধী নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্য। সাম্রাজ্যবাদী ও ফিউডাল ধর্মী সাহিত্যের সঙ্গে লড়াই করে একে এগুতে হবে। এতে কোনো ভুল নেই। এখন প্রশ্ন হল প্রথমটি ভাবাদর্শের, দ্বিতীয়টি সাহিত্যের ডিমোক্রাটিক ফ্রন্টের, তৃতীয়টি শিল্পরূপের ও চতুর্থ টি ঐতিহ্যের।

ভাবাদর্শের দিক থেকে নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্যের সঠিক বা শ্রেষ্ঠতম

রূপটা নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক মার্কসবাদী ভাবাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এ-বিষয়ে সন্দেহই থাকতে পারে না। এই দিক থেকে এই সাহিত্যকে শ্রমিক-সংস্কৃতি বললেও বলা যেতে পারে; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কথাটির অর্থ শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যমূলক সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতি নয়। নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গঠিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী সাহিত্য। শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য-মূলক ভাবাদর্শ ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বহুশ্রেণীর গণতান্ত্রিক একাধিপত্য-মূলক ভাবাদর্শ, এই দুটিতে তফাৎ আছে এবং এই তফাৎটা বাস্তব জগতেরই তফাৎ। শ্রমিক-সংস্কৃতি কথাটির যথেচ্ছ ব্যবহারে এই তফাৎ-টুকুর সীমারেখা তিরোহিত হয়ে অত্যন্ত অবাস্তব ও কাল্পনিক চিন্তাধারার ও বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে এবং হচ্ছে। এদিকে অবহিত হওয়া দরকার। সর্বপ্রকার বুর্জোয়া একাধিকপত্যমূলক, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে যদিও সমূলে নির্মূল করতে হবে তথাপি একথা মনে রাখতে হবে যে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বন্ধুত্বমূলক, সোভিয়েট ইউনিয়নের ও মার্কসবাদের প্রতি বন্ধুত্বমূলক বুর্জোযা ভাবধারা বিশেষ করে পেটিবুর্জোয়া ভাবধারা আছে, অন্য দেশে আছে এবং আমাদের দেশেও আছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর একাধি-পত্যমূলক নয় আবার শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক নয়, এমন মাঝারি ভাবধারা নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত না হলেও পরিধিভুক্ত। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এইসব মাঝারি ভাবধারা যে ক্রমশ সুনিশ্চিতভাবে অন্তর্হিত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিপ্লবের বর্তমান স্তরে, বিশেষ করে সংস্কৃতি-আন্দোলন যখন এখনও শহর অঞ্চলে, প্রধানত পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আবদ্ধ, তখন এইসব মাঝারি ভাবধারার অস্তিত্ব অস্বীকার করা এবং এর প্রতি বৈরভাবাপন্ন হওয়া আদৌ উচিত নয়।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্যের গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের প্রশ্নে আসা যাক। শ্রমিক ও কৃষক সাহিত্যিক, পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক এবং, যেকোনো শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত হোন, সকল প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সাহিত্যিক এই ফ্রণ্টের অন্তর্ভুক্ত। বুদ্ধিজীবীরা অধিকাংশই শোষক নন—শোষিত, তাঁদের শ্রম বেচে খেতে হয়। সাহিত্যের গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট সাহিত্যিকদের শ্রেণী-

সংস্থানের দিক থেকে অত্যন্ত ব্যাপক। এইসব শ্রেণীগুলির অভিজ্ঞতা, রাগ, দুঃখ, প্রেম, বন্ধুত্ব, সমালোচনা, ক্রোধ, বিক্ষোভ, লড়াই, সব জড়ালে তাকে বলা যেতে পারে বাস্তবতার প্রাথমিক স্তর, সাহিত্যের প্রাথমিক উপাদান বা কাঁচামাল। এইসব উপাদানের মধ্যে অনেকখানি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী কনটেন্ট থাকবেই, আবার কিছুটা খাদও থাকতে পারে, পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর অভিজ্ঞতার মধ্যে হয়তো বেশ কিছুটা, কিন্তু শ্রমিকের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার মধ্যেও খাদ আছে। বিভ্রান্তি, অপপ্রচার, সংগ্রামের অভাব বা সংগ্রাম থেকে দূরে থাকা ইত্যাদি নানা কারণে অভিজ্ঞতার মধ্যে খাদ আসতে পারে। সাধারণ সাহিত্যিক স্বীয় শ্রেণীর এই প্রাথমিক অভিজ্ঞতার অংশীদার এবং এই উপাদানকে ভাবাদর্শের ও শিল্পকার্যের সাহায্যে গড়েপিটে একটা তৈরী মাল খাড়া করার সময় তিনি আবার নূতন রকম খাদ ঢোকাতে পারেন। বড় সাহিত্যিক, সচেতন সাহিত্যিক, মার্কসবাদী সাহিত্যিক তা বড় বেশি করবেন না; কিন্তু সাধারণ সাহিত্যিক, শ্রমিক-কৃষক সাহিত্যিক, বিশেষ করে পেটিবুর্জোয়া সাহিত্যিক এইসব ভুল নিশ্চয়ই করবেন। তাঁদের এইসব ভুল সংশোধন করা যেমন দরকার তেমনই সরাসরি তাঁদের ভুলের জন্য তাঁদের সমস্ত লেখাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত হবে। অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বিতর্ক করে, concrete উদাহরণের ভিত্তিতে তাঁদের বোঝানো দরকার। বিশেষ করে একথা মনে রাখা দরকার যে মার্কসবাদী ও অমার্কসবাদী উভয়দলের গণতান্ত্রিকদের নিয়ে আজকের দিনের বাস্তব গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট।

শিল্পরূপ সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র হল সাহিত্যের কনটেন্টই আঙ্গিককে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু যেহেতু এটা সাধারণ সূত্র তাই এইটুকু বলেই যাঁরা মনে করেন সব বলা হয়ে গেল, তাঁরা সমস্যাটাকে অতি-সরল করে দেন। কনটেন্ট হল বাস্তবতা, অর্থাৎ একটা বাস্তব শ্রেণীর, বাস্তব মানুষের জীবন, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভয়, ভাবনা, চিন্তা, আবেগ ইত্যাদি। এই মানুষটি কোন্ স্তরের মানুষ, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা, চেতনা কোন্ স্তরের, কোন্ দরের, তার উপর অনেকখানি নির্ভর করবে শিল্পরূপ। এবং কার জন্য লিখব, কোন্ মানুষকে জ্ঞানে ও ভাবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, কোন্ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বা সামরিক লড়াইকে চিত্রিত ও শক্তিশালী করার জন্য, এ

প্রশ্নের সঙ্গে শিল্পরূপের প্রশ্ন অন্তরঙ্গভাবে জড়িত। কাজেই বুর্জোয়া সাহিত্য এপর্যন্ত আঙ্গিকের বা শিল্পরূপের যে বিকাশ সাধন করেছে, 'শ্রমিক-সংস্কৃতি' বা নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি একেবারে সেখান থেকে আরম্ভ করে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে এবং সেইটে সব ক্ষেত্রে হতে না পারলেই সাহিত্যের একেবারে অধঃপতন, এমন ধারা যে কথা শুনতে পাওয়া যায় তা একেবারেই abstract ও অবাস্তব। শিল্পরূপের, শিল্পোৎকর্ষের এমন কি ভাবাদর্শের দিক থেকে, নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্য নানা স্তরের হবে, হতে বাধ্য। দেশটা কোথায় আছে, কোটি কোটি জনসাধারণকে সাম্রাজ্যবাদ সর্বপ্রকার শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত করে কোথায় রেখেছে, এসব কথা ভুলে গিয়ে নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্যের শিল্পোৎকর্ষের মান নির্ধারণ করতে যাওয়া একেবারে বাতুলতা। টি. এস. এলিয়ট বা টমাস মানের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, নেরুদা বা গোর্কি বা এরেনবুর্গের শিল্পোৎকর্ষের মান আমাদের লোক-সাহিত্যে প্রযুক্ত হতে অনেক দেরি আছে। এমনকি গত সংখ্যার 'নতুন সাহিত্যে' সিদ্ধেশ্বর সেনের যে কবিতা সঙ্গতভাবেই প্রশংসা পেয়েছে ক-জন চাষীমজুর সে কবিতা বুঝবেন?[১] তাহলে কি তাঁদের জন্য সাহিত্য লেখা হবে না? কাজেই নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্যে নানা স্তর থাকবে। লোক-সাহিত্যের থাকবে তারই উপযুক্ত শিল্পরূপ ও শিল্পোৎকর্ষ ও তার মান ধাপে ধাপে উন্নত হবে। আবার শিক্ষিত বিপ্লবী বা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর জন্য রচিত হবে অন্য স্তরের সাহিত্য, তার শিল্পরূপ ও শিল্পোৎকর্ষের মান নিশ্চয়ই এখনই হবে বুর্জোয়া সাহিত্যের শেষতম মানের নীচে নয়, এমনকি সোভিয়েট সাহিত্যের শিল্পোৎকর্ষের মানের কাছাকাছি। তবে যে স্তরেরই শিল্পোৎকর্ষ হোক, ফরমালিজমকে বর্জন করতেই হবে।

এইবার বাংলা নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্যের, তথা বাংলা প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্যবিচারে নামা যাক। বাংলা প্রগতি সাহিত্য সম্বন্ধে মার্কসবাদী মহলের সাম্প্রতিক ঐতিহ্যবিচারে দুটি গুরুতর ভুল পরিলক্ষিত হয়েছে। একটি হল ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াকে মার্কিন বা ফরাসী বুর্জোয়ার সঙ্গে এক করে দেখা, তারপর বলা যে মার্কিন বা ফরাসী বা ইংরেজ বুর্জোয়ার মতো

১. কবিতাটির নাম: 'আমার মাকে'; দ্র. নতুন সাহিত্য, বৈশাখ ১৩৫৭, পৃ ৩৫-৪৬।—সম্পাদক

ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াও প্রথম যুগে একটা বিরাট বিপ্লবী সাহিত্য (স্বর্ণযুগ?) গড়ে তুলেছিল এবং সর্বশেষে এই সিদ্ধান্ত করা যে মার্কিন বা ব্রিটিশ বুর্জোয়া সাহিত্য যে-কারণে ও যে-অর্থে ক্ষয়িষ্ণু, বাংলা বুর্জোয়া সাহিত্যও ঠিক সেই কারণে ও সেই অর্থে ক্ষয়িষ্ণু এবং এখন তাই শ্রমিক-শ্রেণীকে ক্ষয়িষ্ণু বাংলা বুর্জোয়া সাহিত্যকে খতম করে নূতন শ্রমিক-সংস্কৃতি (সোশ্যালিস্ট সাহিত্য?) গড়তে হবে। এই হল এক ধরনের ভুল বা বিচ্যুতি। দ্বিতীয় ভুল বা বিচ্যুতিটি বাংলা প্রগতি সাহিত্যের বর্তমান স্তরটিকে শ্রমিক-সংস্কৃতি বা সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের সাহিত্য বলে ধরে নিলেও বুর্জোয়া বাংলা সাহিত্য ও ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি ভারতের বুর্জোয়া-শ্রেণীকে রাশিয়ান বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে এক করে দেখে, রাশিয়ান বুর্জোয়ার মতোই ভারতের জাতীয় বুর্জোয়াকে বরাবর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতিবিপ্লবী ভাবে এবং বুর্জোয়া বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে রাশিয়ান বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও সাহিত্যের মতো "বিপ্লবের পরিপন্থী" মনে করে। প্রথম বিচ্যুতিটি অনুসারে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্যবিচার হয় এই ভাবে: আমরা প্রথম যুগের বিপ্লবী বুর্জোয়া বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করব এবং শেষ যুগের ক্ষয়িষ্ণু বাংলা বুর্জোয়া সাহিত্যের ঐতিহ্যকে বর্জন করব। দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি অনুসারে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্য-বিচার হচ্ছে এইরূপে: না, ভারতের বুর্জোয়া কোনোদিন প্রগতিশীল ছিল না। চিরদিনই তারা রাশিয়ান বুর্জোয়ার মতো আপসপন্থী, সংস্কারবাদী, কোলাবোরেটর, প্রতিবিপ্লবী। অতএব সমস্ত বাংলা বুর্জোয়া সংস্কৃতিকেই 'বিপ্লবের পরিপন্থী'রূপে বর্জন করতে হবে, তার যথাযোগ্য স্থান ইতিসাসের ডাস্টবিনে।* তাহলে শ্রমিক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য কী হবে? লেনিন রাশিয়ার

* ৪নং 'মার্কসবাদী'তে প্রকাশ রায় "রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই" বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রতিনিধি এই কথা বলে তারপর লিখছেন, শ্রমিকশ্রেণী "বুর্জোয়া ঐতিহ্যের এই জঞ্জাল, বয়ে বেড়াতে রাজী নয়।" (পৃঃ ১১৯) পরে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করছেন, "এঁরা আসলে বিপ্লবের পরিপন্থী বুর্জোয়া সংস্কৃতিরই ধারক।" (পৃঃ ১২২)। এই বিপ্লবের পরিপন্থী বুর্জোয়া ধারার বিরোধী ধারাটিকে প্রকাশ রায় আখ্যা

ক্ষেত্রে বলেছিলেন যে শ্রমিক-সংস্কৃতির ঐতিহ্য হবে রাশিয়ার বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য, বাংলার ক্ষেত্রেও তাই হবে। কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বাংলা সাহিত্য? এর উত্তরে বলা হচ্ছে, খুঁজে বার করতে হবে। নিশ্চয়ই ছিল এই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বাংলা সাহিত্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ও তাদের তাঁবেদার জাতীয় বুর্জোয়ার চক্রান্তে এখন তা "লুপ্ত, অবজ্ঞাত"। ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বড় বড় 'গণবিপ্লব' ঘটেছিল আর তারই প্রতিফলনে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য রচিত হয়নি, এ কখনও হতে পারে? তাহলে লেনিনবাদ মিথ্যা হয়ে যায়!! নিশ্চয়ই অজ্ঞাত সব চারণকবিরা তার চেয়েও অজ্ঞাত সব বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য রচনা করে গিয়েছিলেন। আমরা সে-সব খবর জানতে পারছি না সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে। যদি সেটা কখনও আবিষ্কৃত হয় তবে তাকেই আমরা বলব সাচ্চা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য। তার অভাবে দুধের সাধ ঘোলে মেটানো যাক। মাইকেল, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধুর সাহিত্যকে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য বলা যাক তাঁদের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও। নিশ্চয়ই তাঁরা অজ্ঞাতনামা চারণকবিদের অজ্ঞাত রচনার দ্বারা (তাঁদের নিজেদের অজ্ঞাতে?) উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, অন্তত তাঁদের লেখায় শ্রেণীসংগ্রামের ছাপটা কিছুটা আছে। তাঁদেরই ধারাটা নজরুল, সুকান্তর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শ্রমিক-সংস্কৃতিকে উদ্বুদ্ধ করবে। এইভাবেই খাড়া হবে বাংলা সাহিত্যের 'লেনিনবাদী' থিওরি ও বিশ্লেষণ।

প্রথম বিচ্যুতিটি পরিলক্ষিত হয়েছে বীরেন পাল ১নং 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় "বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা" নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেই প্রবন্ধটিতে এবং সাধারণভাবে আরো অনেকের লেখায়। এবং দ্বিতীয় বিচ্যুতিটি দেখা গিয়েছে ১নং 'মার্কসবাদী'র উল্লিখিত প্রবন্ধটিকে "আংশিক সত্য, অতএব অসত্য"—আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্র গুপ্ত ৫নং 'মার্কসবাদী'তে "বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেই প্রবন্ধটিতে এবং ঐ একই

দিয়েছেন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারা। তারপর এই দ্বিতীয় ধারাটিকে "শ্রমিক-সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি, শ্রমিক-সংস্কৃতির প্রথম উপাদান" আখ্যা দিয়ে তিনি নরহরিবাবুদের উপদেশ দিচ্ছেন, "এই লুপ্ত, অবজ্ঞাত ঐতিহ্যের ধারাটিকে উদ্ধার করতে হবে।" (পৃঃ ১২২) রবীন্দ্র গুপ্ত এই থিসিসকেই সমর্থন ও ব্যাখ্যা করেছেন ৫নং 'মার্কসবাদী'তে।

।পরেো[illegible] লিখিত প্রকাশ রায়ের ৪নং 'মার্কসবাদী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধে। এই শেষোক্ত প্রবন্ধ দুটির বক্তব্য একই এবং মূল বক্তব্যটিকে এবং চিন্তাধারাকে আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করছি। এই প্রবন্ধ দুটির আর একটু বিশদ বিশ্লেষণ আমি আমার বর্তমান প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে করব। কিন্তু তার আগে আমি এই বিচ্যুতি দুটির কারণ কি এবং বাংলা প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্যবিচারের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নিরিখটা কি তা পরিষ্কার করতে চাই। দুটো বিচ্যুতিরই মূল কারণ হল, ভারত যে ঔপনিবেশিক দেশ এটা ভুলে যাওয়া। উৎপীড়িত ও ঔপনিবেশিক দেশের সামাজিক অবস্থা, ইতিহাসের গতি, বিপ্লব এক জিনিস; উৎপীড়ক স্বাধীন ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের সামাজিক অবস্থা, ইতিহাসের গতি, বিপ্লব, আর এক জিনিস। স্বাধীন, সাম্রাজ্যবাদী দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর ও বুর্জোয়া ভাবধারার ভূমিকা ও ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর ও বুর্জোয়া ভাবধারার ভূমিকা এক হতে পারে না।

মাও সে-তুং চীনা বুর্জোয়ার সঙ্গে রাশিয়ান বুর্জোয়ার তুলনা করে বলছেন, "রাশিয়ান বুর্জোয়ার ক্ষেত্রে কোনো বিপ্লবী element (অংশ) ছিল না, কেননা জারিস্ট রাশিয়া নিজেই ছিল একটি আধা-ফিউডাল সামরিক রাষ্ট্র যার বৈদেশিক অভিযানে বুর্জোয়াশ্রেণী অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে প্রলেটারিয়াটের কর্তব্য ছিল তার বিরুদ্ধতা করা, তার সঙ্গে মিলিত হওয়া নয়। এখানে চীনে প্রলেটারিয়াটের কর্তব্য হল বিশেষ অবস্থায় বুর্জোয়াশ্রেণীর যে একটা আপেক্ষিক বিপ্লবী ভূমিকা আছে তা বিস্মৃত না হওয়া এবং সেই জন্যই সাম্রাজ্যবাদীদের ওয়ার-লর্ডদের সরকারের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার সহিত যুক্ত ফ্রন্ট সম্ভব। [নিউ ডিমোক্রেসি, পৃঃ ১১]

তারপর মাও ইউরোপের ও আমেরিকার বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে চীনা বুর্জোয়াশ্রেণীর তুলনা করে বলছেন: "আমেরিকায় ও ইউরোপে তাদের স্বীয় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবী যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীর যে-আপেক্ষিক বিপ্লবী আপসহীনতা (thoroughness) ছিল, চীনা বুর্জোয়ার তাও নেই।" [নিউ ডিমোক্রেসি. পৃঃ ১১]

তাই মাও বলছেন, চীনা বুর্জোয়ার দুই চেহারা, একটি হল বিপ্লবী চেহারা "(the face of revolution)" এবং অন্যটি হল আপসপন্থী চেহারা (the face of compromise)"। এই হল চীনা বুর্জোয়ার দ্বৈত-প্রকৃতি (two-

fold nature)"।

তারপর মাও নূতন সংস্কৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন: "ফিউডাল ইকনমির তুলনায় পুঁজিবাদী ইকনমি প্রগতিশীল। পুঁজিবাদী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন রাজনৈতিক শক্তি (forces) বেড়ে উঠেছে এবং উঠছে—সেগুলি হল, বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়াট। এইসব শ্রেণীগুলির জাগ্রত অংশগুলির হয়ে কথা বলছে যেসব পার্টি তার মধ্যে সর্বপ্রধান দুটি হল কুওমিনটাং ও কমিউনিস্ট পার্টি। সুতরাং পুঁজিবাদী ইকনমি ছাড়া, বুর্জোয়া-শ্রেণী ছাড়া, পেটিবুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়াট ছাড়া এবং তাদের পার্টিগুলি ছাড়া নূতন চিন্তাগত রূপ (conceptual form) অর্থাৎ নূতন সংস্কৃতি হওয়া অসম্ভব।

"এই সকল নূতন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক elementগুলিই চীনের বিপ্লবী শক্তি। তারা বিরুদ্ধতা করছে পুরাতন রাজনীতি, ইকনমি ও সংস্কৃতিকে যাদের মধ্যে রয়েছে দুটি element-এর যোগ, একটি হল চীনের দেশীয় আধা-ফিউডাল রাজনীতি, ইকনমি ও সংস্কৃতি অন্যটি হল সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি, ইকনমি ও সংস্কৃতি (শেষেরটিই অধিকতর শক্তিশালী)—এই পুরাতন রূপগুলি (forms) হল প্রতিক্রিয়াশীল এবং তাদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ সাধন করতে হবে।" (নিউ ডিমোক্রেসি, পৃঃ ৩৪-৩৫) তারপর মাও বলছেন যে ৪ঠা মে আন্দোলনের পূর্বে "**সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে লড়াইটা ছিল বুর্জোয়াশ্রেণীর নূতন সংস্কৃতির সহিত ফিউডালশ্রেণীর পুরাতন সংস্কৃতির লড়াই**।" [নিউ ডিমোক্রেসি, পৃঃ ৩৪-৩৫, বড় হরফ আমার —লেখক]

ফিউডাল যুগের বিষাক্ত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে নূতন জ্ঞান, পাশ্চাত্যজ্ঞান, মূলত ছিল প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ব্যাপারে জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বুর্জোয়া-শ্রেণীর দাবী।*

"কিন্তু বুর্জোয়া চিন্তাধারা সাম্রাজ্যবাদের যুগে অত্যন্ত দুর্বল বলে প্রমাণিত হল; সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ও অতীতের দিকে মুখফেরানো চীনা ফিউডালিজমের

* পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোক চীনে আনার চেষ্টা করে চীনা বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা যে প্রগতিশীল বিপ্লবী ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন এবিষয়ে মাওয়ের লিখিত "ফর এ লাস্টিং পীস্, ফর এ পীপলস্ ডিমোক্রেসি" পত্রিকায় (১৫ই জুলাই, ১৯৪৯) প্রকাশিত প্রবন্ধটি দেখুন।

চিন্তার প্রতিক্রিয়াশীল জোটের (alliance) বিরুদ্ধে সেটা দাঁড়াতে পারল না। প্রতিক্রিয়াশীল জোটের প্রথম প্রতি-আক্রমণেই তা পরাজিত হল। পুরাতন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী ছিল ঠিক এই কারণে যে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের যুগে পুরাতন গণতন্ত্র জীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ল (deteriorated) [নিউ ডিমোক্রেসি, পৃঃ ৩৬]।

তারপর মাও দেখাচ্ছেন যে অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পর যখন চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব বুর্জোয়া বিশ্ববিপ্লবের আবর্ত ছেড়ে, বিশ্ব-সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পরিধিভুক্ত হল তখন ৪ঠা মে আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় এক নূতন সাংস্কৃতিক শক্তি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এল চীনা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা, কমিউনিস্ট বিশ্বদৃষ্টি, সামাজিক বিপ্লবের কমিউনিস্ট থিওরি। এর ফলে চীনা সংস্কৃতি আন্দোলনে যে নূতন বিকাশ আরম্ভ হল সে সম্বন্ধে মাও যা লিখেছেন তা আমি ইংরাজিতেই উদ্ধৃত করি :

"Because of the appearance on the political stage of a new force—the Chinese proletariat and the Chinese Communist Party—reinforcing China's development, the new culture which otherwise was going down became suddenly in a position to arm itself with new weapons and arms, and began to wage with help from its new Allies a new bold offensive against the combined imperialist & feudal cultures." [New Democracy, P. 36]

এই উদ্ধৃতির মধ্যে মাওয়ের অত্যন্ত গভীর ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দুটি কথার দিকে আমি সকল মার্কসবাদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—"The new culture which otherwise was going down" এবং "A new bold offensive against the combined imperialist-feudal cultures"। এর মধ্যেই রয়েছে ঔপনিবেশিক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও ভাবধারায় গঠিত নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সহিত অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের আগেকার যুগের ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির (বুর্জোয়া নেতৃত্বে গঠিত) ঐতিহ্যগত সম্পর্কের মাপকাঠি। সে যুগের বুর্জোয়াশ্রেণীও লড়াই করছিল, যত দুর্বলভাবেই হোক, সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এবং সৃষ্টি করেছিল নূতন সংস্কৃতি "(new culture)"। কিন্তু অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পর বিশ্ব-

পুঁজিবাদ তার সাধারণ সঙ্কটের যুগে প্রবেশ করার পর, বিশ্ববুর্জোয়া বিপ্লবের যুগ অবসিত হওয়ার পর, ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া নেতৃত্বের (বড় বুর্জোয়ার) প্রগতিশীল ভূমিকা লীন হয়েছে, বুর্জোয়া একাধিপত্যমূলক ভাবধারা, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারা (বড় বুর্জোয়ার ভাবধারা) সাম্রাজ্যবাদের সহকারী ; তাই যে নূতন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী—ফিউডাল-বিরোধী সংস্কৃতি বুর্জোয়া-শ্রেণী সৃষ্টি করছিল. সেই সংস্কৃতিকেই প্রলেটারিয়াটের নেতৃত্বে সকল গণতান্ত্রিক শ্রেণীগুলি নূতন অস্ত্রশস্ত্রে (মার্কসবাদী, নয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারায়, ইত্যাদি) সজ্জিত করে আরো উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাবে এবং সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাহসের সহিত নূতনভাবে লড়াই করবে। এই হল পূর্বেকার প্রগতিশীল, ঔপনিবেশিক বুর্জোয়া সংস্কৃতির সহিত নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত সম্পর্ক।

এই বিচারের মাপকাঠি, ভারতের ক্ষেত্রে, ভারতের ইতিহাসের, বুর্জোয়া-শ্রেণীর ভূমিকার, বুর্জোয়া সংস্কৃতির ও নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু রবীন্দ্র গুপ্ত করেছেন কি? ভারত যে ঔপনিবেশিক দেশ, এই মূল সত্যটিকেই তিনি ভুলে বসে আছেন। ভারতের সামনে এখনও প্রধান ঐতিহাসিক কর্তব্য যে সাম্রাজ্যবাদের ও ফিউডালিজমের কবল থেকে জাতীয় মুক্তিসাধন করা, এটি তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান শত্রু সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যে সাম্রাজ্যবাদ, ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া নয়, এটিও তিনি ভুলে গেছেন। বাংলা সংস্কৃতির আলোচনার সময়ে মাও এবং তাঁর নিউ ডিমোক্রেসির কথা তাঁর মনে পড়ে নি, এবং স্টালিনের এই সাবধান বাণীও মনে পড়েনি যে উৎপীড়িত, ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লব ও উৎপীড়ক, সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিপ্লব এক জিনিস নয়। ১নং 'মার্কসবাদী'তে বীরেন পাল কোথাও উল্লেখ করলেন না যে নূতন সংস্কৃতিটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী সংস্কৃতি এবং সেটা পুরাতন বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী সংস্কৃতিরই জের (continuation) যদিও উচ্চতর পর্যায়ের, নূতন ভাবধারায় সজ্জিত ও অধিকতর বিপ্লবী চরিত্রের। তিনি ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যেভাবে নূতন প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতির চরিত্র ও ঐতিহ্য বিচার করা হয়, অবিকল সেই বিশ্লেষণটাই বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বুর্জোয়া সংস্কৃতি ক্ষয়িষ্ণু, কেননা সেখানে

বুর্জোয়া বিকাশের যুগ শেষ হয়েছে কিন্তু ভারতে বর্তমানে বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রতিক্রিয়াশীল এইজন্য যে ভারতে যদিও বুর্জোয়া বিকাশের সম্ভাবনা আছে তথাপি জাতীয় বড় বুর্জোয়া সেই বিকাশকে বাধা দেওয়ার জন্য দেশদ্রোহীর মতো সাম্রাজ্যবাদের ও ফিউডালিজমের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।

তাপর ৫নং 'মার্কসবাদী'তে রবীন্দ্র গুপ্ত ভারতকে রাশিয়ার সহিত এক করে ফেললেন, এবং লেনিন রাশিয়ার বিশেষ ঐতিহাসিক অবস্থায় যেভাবে রাশিয়ান সংস্কৃতির দুই ধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন—একটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ধারা এবং অন্যটি আপসকামী, প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া ধারা—হুবহু সেই বিশ্লেষণ-টিকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দোহাই দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে মার্কসবাদ একও বটে এবং বহুও বটে ও একই মার্কসবাদ বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায় বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হয় এবং এক সামাজিক অবস্থায় প্রযোজ্য মার্কসবাদকে অন্য সামাজিক অবস্থায় প্রয়োগ করলে মার্কসবাদকে পরিত্যাগ করা হয়। রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশ, কিন্তু ভারত ঔপনিবেশিক দেশ, এই সহজ কথাটি তিনি মনে রাখেন নি। এবং সেই জন্য ৫নং 'মার্কসবাদী'তে ভারতের ইতিহাসকে ও বাংলা বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে তিনি সম্পূর্ণ বিকৃতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের সহিত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই।

বাংলার বুর্জোয়া সংস্কৃতিই ছিল তখনকার দিনের নূতন, প্রগতীশীল, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী সংস্কৃতি এবং তাকে লড়াই করতে হয়েছিল সে যুগের সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। সেই নূতন সংস্কৃতির cause-টিকেই আজ বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণী নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। তাই আগের দিনের বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রগতিশীল ঐতিহ্যকে সাহিত্যিকদের সামনে তুলে ধরলে আজকের দিনের নূতন সংস্কৃতির লড়াইকেই শক্তিশালী করা হয়। এই কাজে শ্রমিকশ্রেণীর যথেষ্ট মিত্র আছে। পুরাতন বুর্জোয়া সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরাই সাহিত্য লিখছেন তাঁদের ভুলভ্রান্তি অপনোদন করে নূতন সংস্কৃতির শিবিরে কায়েম করা দরকার। সমগ্র বাংলা বুর্জোয়া সাহিত্যকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা তাই শ্রমিকশ্রেণীর নয়া গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কর্তব্যের মূলে কুঠারাঘাত করা। একথা বলার এমন অর্থ নয় যে পুরাতন বুর্জোয়া সংস্কৃতির দুর্বলতাকে

দেখানোর প্রয়োজন নেই ; এমন অর্থও নয় যে তার প্রত্যেক স্তরের ভাবাদর্শকে আজো আঁকড়ে থাকতে হবে। মূল সত্যটা হল এই যে যেমন গত দেড়শত বৎসরে বাংলা সাহিত্যের যা-কিছু বিকাশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তেমনই আজও সেই একই ঐতিহাসিক নিয়মে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্য বেড়ে উঠবেই, তাকে কেউ রোধ করতে পারবে না।

দুই

৫নং 'মার্কসবাদী'তে লেনিনের রাশিয়ান বুর্জোয়াশ্রেণী ও রাশিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণটি হুবহু ভারতের ইতিহাস ও বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে রবীন্দ্র গুপ্ত তিনটি ভুল চিন্তাধারা অনুসরণ করেছেন :

১) তিনি উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাসকে বিরাট সচেতন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাস বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

২) তিনি বাংলা সাহিত্যের এক অংশকে যেসব বুর্জোয়া গণবিপ্লব তাঁর মতে ঘটেছিল তারই প্রতিফলন স্বরূপ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

৩) তিনি সমগ্রভাবে বুর্জোয়া বাংলা সংস্কৃতিকে ও সাহিত্যকে 'বিপ্লবের পরিপন্থী' বলে ব্যাখ্যা করেছেন।*

এই তিনটি ভুল চিন্তাধারাই তাঁকে নিয়ে গেছে ইতিহাসকে বিকৃত করার, ইতিহাসকে যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করার দিকে এবং এইভাবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে পরিত্যাগ করে তিনি একটা ভুল থেকে আর একটা ভুলে এগিয়ে গেছেন, সুবিধামতো বিচারের মাপকাঠিটা বদলেছেন এবং জোর করে

* দেশে বুর্জোয়া বিকাশের স্তরে সাহিত্যের দুই ধারা, একটি বুর্জোয়া আপসপন্থী প্রতিবিপ্লবী এবং অন্যটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক, এই বিশ্লেষণ লেনিন কেবল রাশিয়ার বিশেষ সামাজিক অবস্থায় বিকশিত একমাত্র রাশিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধেই করেছিলেন। ইংরেজ বা ফরাসী বা মার্কিন বা জার্মান সাহিত্য সম্বন্ধে এ বিশ্লেষণ প্রযুক্ত হয় নি এবং কোনো ঔপনিবেশিক দেশের সাহিত্যেও হয় নি। রবীন্দ্র গুপ্ত তাঁর মেথডলজিটা কি, কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং সেটা কতদূর বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সে-সব প্রশ্নের অবতারণা করেন নি।

ইতিহাস ও সাহিত্যকে একটা কাল্পনিক থিওরির কাঠামোর মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও কৃষক বিদ্রোহ

সাঁওতাল-বিদ্রোহ, সিপাহী-বিদ্রোহ ও নীল-বিদ্রোহকে রবীন্দ্র গুপ্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন। সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট। তিনি সিপাহী-বিদ্রোহকে বলেছেন নবজাগ্রত কৃষক-বুর্জোয়া মতাদর্শে পরিচালিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব।

সিপাহী-বিদ্রোহের এই ব্যাখ্যাটা তিনি কোথায় পেলেন? রজনী পাম দত্তের সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে মন্তব্যটিকে, সাম্রাজ্যবাদের শেখানো বুলি, এই কথা বলে উড়িয়ে দিয়ে তিনি কার্ল মার্কসের 'নোটস্ অন্ ইণ্ডিয়া' পুস্তিকাটির নজির উপস্থিত করেছেন। কার্ল মার্কসের এই পুস্তকটি জার্মান ভাষা থেকে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে কিন্তু এর ইংরেজি' অনুবাদ এখনও প্রকাশিত হয়নি। কাজেই যে বইটির উপর রবীন্দ্র গুপ্ত নির্ভর করেছেন সে বইটি তিনি পড়েন নি। এই বইটির একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার থেকে যে-দুটি অংশ রবীন্দ্র গুপ্ত উদ্ধৃত করেছেন তার একটি অংশে বলা হয়েছে যে মার্কস ১৮৫৩ সালে ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতীয় জনসাধারণের সামনে প্রধান ঐতিহাসিক কর্তব্য হল বিদেশীর ঔপনিবেশিক শাসন বলপূর্বক উচ্ছেদ করা ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন; এবং দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে বলা হয়েছে: "যে স্বদেশভক্তেরা বীরত্বের সঙ্গে দেশরক্ষা করেছিল তাদের মহৎ খ্যাতির পুনরুদ্ধার সাধন করে মার্কস অত্যন্ত রাগ এবং ঘৃণার সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন।"

প্রথম বক্তব্যটি পাম দত্তেরও বক্তব্য। কুখ্যাত ডিকলোনাইজেশান থিওরিকে পাম দত্ত বারংবার তাঁর 'ইণ্ডিয়া টুডে' গ্রন্থে আক্রমণ করেছেন। এই গ্রন্থে ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র হিসাবে ব্রিটিশ-শাসন যেভাবে ভারতের ঐতিহাসিক বিকাশকে এগিয়ে দিয়েছে তার তৃতীয় ধাপটি সম্বন্ধে পাম দত্ত বলেছেন:

"তৃতীয় কাজটি এখনও বাকী আছে। কার্ল মার্কসের কথায় তা হল

এই যে ভারতীয় জনগণই নূতন শক্তিগুলি আয়ত্ত করে ও নিজেদের স্বার্থে সংগঠিত করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের ভিতর দিয়ে "ইংরেজের জোয়াল থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করবে।" এটাই ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের ঐতিহাসিক কর্তব্য। জাতীয় মুক্তি, যা এই আন্দোলনের লক্ষ্য, তা হবে ভারতের সামাজিক মুক্তির প্রথম সোপান।

'সোভিয়েট ল্যাণ্ড' থেকে নেওয়া দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে কোথাও একথা বলা নেই যে সিপাহী-বিদ্রোহ কৃষক-বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শে, কৃষক-বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। ১৮৫৭ সালের আগে ভারতে যদি কৃষক-বুর্জোয়া নব জাগরণ ঘটতো এবং কৃষক-বুর্জোয়াশ্রেণীর মতাদর্শে সিপাহী-বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হতো তাহলে মার্কস নিশ্চয়ই তাঁর 'লেটারস্ অন ইণ্ডিয়া' এবং 'নোটস্ অন ইণ্ডিয়া' গ্রন্থ দুটিতে যথাক্রমে এই এত বড় দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করতেন। কাজেই পাম দত্তের বইটিকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করবার আগে নিশ্চয়ই রবীন্দ্র গুপ্তের উচিত জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা তাঁর এইসব চটকদার বিশ্লেষণের source কি, অন্য কী ইতিহাস তিনি পাঠ করেছেন বা আবিষ্কার করেছেন। এরূপ কোনো ইতিহাস আছে বলে আমাদের জানা নেই।

মার্কসের 'নোটস্ অন ইণ্ডিয়া'-র নিকোলাই গোল্ডবার্গ লিখিত আর একটু বড় আকারের একটি সংক্ষিপ্তসার বোম্বাই থেকে "Communist" পত্রিকায় ১৯৪৮ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে :

"The Notes end with the story of that rebellion (the sepoy rebellion—লেখক) and its collapse which was due to the split between the main social groups that were active in it and the betrayal of the national cause by the aristocratic leaders."

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে মার্কসের মতে সিপাহী-বিদ্রোহের শিবিরে অভিজাত শ্রেণীর এক অংশ ছিল, তাঁরাই ছিলেন এই বিদ্রোহের নেতা এবং তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই বিদ্রোহটি ভেঙে পড়ে। এইসব অভিজাত শ্রেণীর নেতা, যাঁরা ব্রিটিশ শাসকদের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত ও অধিকারচ্যুত হয়েছিলেন তাঁরা নিজেদের ক্ষমতায় ও অধিকারে ফিরে আসার জন্যই এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁদেরই মোটের উপর পিছনমুখী ফিউডাল

মতাদর্শে সিপাহী-বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল। একটা আন্দোলনের নেতৃত্বের মতাদর্শই সেই আন্দোলনের মুখ্য মতাদর্শ। সিপাহী-বিদ্রোহের নেতৃত্বের তরফ থেকে যে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে অভিজাত শ্রেণীর, জমিদার ও জায়গীরদারের স্বার্থরক্ষার উপরই প্রধান জোর দেওয়া হয়েছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের দুর্বলতাটি, তার ব্যর্থতার কারণ ঠিক এইখানটাতেই ছিল, এইজন্যই বিদ্রোহটি মাত্র বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য ভারতের কিছু এলাকায় আবদ্ধ ছিল, ব্যাপক গণসমর্থন (যেমন অস্পৃশ্য জাতিদের) লাভ করতে পারে নি এবং বিদ্রোহীদের শিবিরেও অবশেষে ভাঙন ধরায়।* সিপাহী-বিদ্রোহের নেতৃত্ব পিছনমুখী ছিল বলে ব্রিটিশ-শাসনকে উচ্ছেদ করার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করতে অক্ষম হয়েছিল, এই কথাই পাম দত্ত বলেছেন এবং এই কথার সঙ্গে মার্কসের কথার মূলত কোনোই বিরোধ নেই।

ভারতের পুরাতন সামাজিক ব্যবস্থা জোর করে ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশ-শাসন ভারতকে বিশ্ববিপ্লবের আবর্তে নিয়ে এসেছিল এটাই তার ঐতিহাসিক ভূমিকা। ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই বিশ্ববিপ্লবের আবর্ত থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা ভারতের নেই। ব্রিটিশ পুঁজির বিরোধী শক্তিগুলিই ভারতে বিপ্লব সম্পন্ন করে বিশ্ববিপ্লবকে এগিয়ে দেবে। ব্রিটিশের মহানুভবতায় বা সুশিক্ষায় বা সভ্যতার ধ্বজা বহনে যে এই বিপ্লব হবে না, তা স্বীকৃত সত্য। দুই স্তরে এই বিপ্লব সম্পন্ন হবে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সোশ্যালিস্ট বিপ্লব। ভারত এখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে। নিজের main contradiction হিসাবে ব্রিটিশ পুঁজি যে দুটি শ্রেণীর সৃষ্টি করেছে, জাতীয় বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণী, তাদেরই ঐতিহাসিক ভূমিকা হল এই বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেওয়ার। সিপাহী-বিদ্রোহ পর্যন্ত ভারতে যে বুর্জোয়া-শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল তারা ছিল কম্প্রাডোর বুর্জোয়া, তাদের কোনো বিরোধী বা বিপ্লবী ভূমিকা ছিল না। মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময় থেকে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিষ্ঠা হয় এবং জাতীয় কংগ্রেসের পত্তনের সময় এই জাতীয় বুর্জোয়ার সামান্য একটু বিরোধী ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৫ সাল থেকে জাতীয় বুর্জোয়া জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে প্রথম রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয় এবং

* Ashok Mehta-র '1857' পুস্তিকাটিতে ইস্তাহারটি মুদ্রিত হয়েছে।

সেই সময় থেকেই ভারতে সচেতন বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু হয়। অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পর ভারতের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিশ্ববুর্জোয়া বিপ্লবের আবর্ত থেকে বিশ্ব-সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পরিধিভুক্ত হয় এবং তারপর থেকে ভারতের জাতীয় মুক্তির জন্য গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেওয়ার ও সম্পন্ন করার ভার পড়েছে ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উপর। এই হল মোটামুটি ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্বন্ধে মার্কসীয় সমাচার।

সুতরাং সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে যে ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারত না এটা স্বতঃসিদ্ধ। সমাজ বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে এবং একটি বিশেষ শ্রেণীসমাবেশের ভিত্তিতেই এক বিশেষ ধরনের বিপ্লব ঘটে থাকে। জাতীয় পুঁজিবাদী বিকাশ কিছুদূর অগ্রসর না হলে এবং জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কিছুটা উন্নত না হলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে না এবং বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীকে বাদ দিয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারে না। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে একটি কৃষক বুর্জোয়াশ্রেণী এবং তার একটি স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক-রাজনৈতিক মতাদর্শ ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল, তার কোনো সাক্ষ্য ইতিহাসে মেলে না। কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে বুর্জোয়া মতাদর্শ বা প্রলেটারিয়ান মতাদর্শ প্রধানত উপর থেকে বিপ্লবী পার্টিরাই জুড়ে দেয়, সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কৃষক-আন্দোলনের ভেতর থেকেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে না। সিপাহী-বিদ্রোহের আগে কি এরূপ কোনো বিপ্লবী পার্টি ছিল?

ভারতে ব্রিটিশ-শাসন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে শুরু হয় ব্রিটিশ পুঁজি-কর্তৃক আদিম পুঁজি-সঞ্চয়ের (primitive accumulation) তাণ্ডব। পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে ব্রিটিশ-শাসন ভারতের জনসাধারণকে, artisan-দের ও বিশেষ করে কৃষকদের চরম অত্যাচারে ও দুঃখ-দুর্দশায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। সে নৃশংসতার কাহিনী ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ত অক্ষরে লিখিত আছে এবং কার্ল মার্কসই প্রথম ব্রিটিশ-শাসনের এই দিকটি উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছিলেন। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বিদ্রোহ করতে শুরু করেন। এই সকল কৃষক-বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ভারত ঘুমিয়ে নেই, ভারত নির্জীব নয়, ভারতের মধ্যেই এমন অভ্যন্তরীণ শক্তি আছে যারা ভারতে ব্রিটিশ-শাসনকে উচ্ছেদ করে একদিন জাতীয় মুক্তি সাধিত করবে। এঁরা যে সংগ্রামের ঐতিহ্য রচনা করেছিলেন তা অত্যন্ত

গৌরবময়। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থানীয় কৃষক-বিদ্রোহগুলিই রাজনৈতিক জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব, এই কথা বলে রবীন্দ্র গুপ্ত ইতিহাসকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতের ঐতিহাসিক কর্তব্য ছিল, কৃষকের ও পরের যুগে শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তিতে সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি ও দলকে একত্রিত করে জাতীয় মুক্তিসাধন করা। কৃষক-বিদ্রোহকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের রূপ দিতে পারত হয় বুর্জোয়া মতাদর্শের ভিত্তিতে বুর্জোয়া পার্টি কিংবা প্রলেটারিয়ান মতাদর্শের ভিত্তিতে প্রলেটারিয়ান পার্টি। এবং যেহেতু বুর্জোয়া পার্টি ও বুর্জোয়া মতাদর্শ এই কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারে নি, তাই আজ প্রলেটারিয়ান পার্টি ও প্রলেটারিয়ান মতাদর্শের উপর এই কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহের গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রয়োজন ঘটে না, আবার এই বিদ্রোহগুলিকে নিয়ে অবৈজ্ঞানিক উচ্ছ্বাস ও গোঁড়ামি প্রকাশ করারও দরকার হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক-বিদ্রোহগুলি ভবিষ্যৎ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করেছিল, এইমাত্র বলা চলে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একথাও বলা চলে যে উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পাদর্শগত সংস্কৃতি-আন্দোলনও ঐ একই কাজ করেছিল।

সিপাহী-বিদ্রোহকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছিল অভিজাত শ্রেণীর অধিকারচ্যুত এক অংশ তাদের বহু শতাব্দীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও কালচারের ভিত্তিতে। আউধের মিলিটারি-ফিউডাল ভূমিব্যবস্থা (land-tenure) যখন ব্রিটিশ-শাসন ধ্বংস করে দেয় তখন বহু অভিজাত জায়গীরদারগণ ক্ষমতাচ্যুত ও অধিকারচ্যুত হয় এবং তাদের সঙ্গে তাদের অসংখ্য উপজীবী (retainer) ও অধীনস্থ চাষীগণ দুর্দশাগ্রস্ত হয় এবং সরকারের ও কুসীদ-জীবীদের অত্যাচারে নিপীড়িত ও জমিহীন হয়। এই সব নিপীড়িত কৃষকদের ও আধা-কৃষকদের একটা বৃহৎ অংশ সিপাহী-বাহিনীতে কাজ করত। এদের স্বার্থের সঙ্গে বিদ্রোহী অভিজাতদের স্বার্থ সাময়িকভাবে এক হয়ে গিয়েছিল এবং এদের যুক্ত বিদ্রোহের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতিও বেশ কিছুটা ছিল। তথাপি একথা সত্য যে এই বিদ্রোহের সামাজিক ভিত্তি (social base) ও ভৌগোলিক পরিধি ছিল সঙ্কীর্ণ এবং নেতৃত্ব ও মতাদর্শ ছিল ফিউডাল। বিদ্রোহের শেষের দিকে জায়গীরদারদের ও নেতাদের অনেককেই ব্রিটিশ

শাসকরা ভাঙিয়ে নেয়। এই তার চরিত্রের প্রতিক্রিয়াশীল দিকটা। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহ ভারতের জাতীয় চেতনার প্রথম প্রকাশ এবং প্রথম জাতীয় মুক্তির গৌরবময় প্রচেষ্টা, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সিপাহী-বিদ্রোহ ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ব যুগে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রথম প্রয়াস, হোক তা ব্যর্থ, তবু তা গৌরবময়। সিপাহী-বিদ্রোহ দেশপ্রেম, বীরত্ব, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ইত্যাদি যে-ঐতিহ্য স্থাপন করেছিল, নিশ্চয়ই তা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে অমূল্য এবং এই সকল ঐতিহ্য যে পরের যুগে বুর্জোয়াশ্রেণী ও বুর্জোয়া সংস্কৃতি স্বীকার করে নিয়েছিল, এটাও ঐতিহাসিক সত্য।

সাঁওতাল-বিদ্রোহ নিঃসন্দেহেই কুসীদজীবীদের অত্যাচারে উৎসন্ন ভূমিহীন সাঁওতাল চাষীদের অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল ও সাহসিক লড়াই কিন্তু এমন রাজনৈতিক চরিত্র তার ছিল না যাতে তা ব্রিটিশ-শাসনকে উচ্ছেদ করতে পারে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের পর্যায়ভুক্ত হতে পারে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের তুলনায় নীল-বিদ্রোহ ছিল অনেক নিম্ন স্তরের। নীলকরদের পাশবিক অত্যাচারের মাত্রাটা যে-পরিমাণে উৎকট হয়েছিল তার তুলনায় প্রতিরোধটা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ক্ষেতমজুরদের বিরুদ্ধে নয়, মাঝারি চাষী ও ধনী চাষীদের বিরুদ্ধেই দাদনপ্রথার ভিতর দিয়ে প্রধানত অত্যাচার চালানো হয়েছিল। সমাজের সকল শ্রেণীর, এমন কি জমিদারশ্রেণীরও পূর্ণ সহানুভূতি ছিল নীলচাষীদের প্রতি। মোটের উপর নীলচাষীরা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারই চেয়েছিল। এবং প্রতিকার প্রার্থনা করার জন্যই হাজারে হাজারে চাষী নদীর ধারে জমায়েত হয়েছিল গ্র্যাণ্ট সাহেব যখন সফরে বেরিয়েছিলেন। নীল-বিদ্রোহে ব্রিটিশ সিংহাসন কেঁপে উঠেছিল, এটা নিঃসন্দেহেই অতিশয়োক্তি।

বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য

রাশিয়ার মতোই বাঙলাদেশে 'বিপ্লবের পরিপন্থী' বুর্জোয়া সাহিত্যের বিরোধী হিসাবে একটা বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য ছিল প্রমাণ করার জন্য রবীন্দ্র গুপ্তকে ভারতের বাস্তব রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ার বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা ফরাসী বিপ্লবের মতাদর্শ, ইউটোপিয়ান সোস্যালিস্ট মতাদর্শ, ইত্যাদির ভিত্তিতে নানা-

রূপ বিপ্লবী সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। এঁদের অনেকেই ভূমিদাসপ্রথার উচ্ছেদের জন্য জারিস্ট স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। এইসব বিপ্লবী আন্দোলনের নেতারাই এবং তাঁদের সহকর্মী ও শিষ্যবর্গই রাশিয়ায় বিপ্লবী গণতান্ত্রিক জীবনদর্শন, সংস্কৃতি ও সাহিত্য রচনা করেছিলেন এবং এঁরাই রাশিয়ায় শ্রমিক-সংস্কৃতির পূর্বাচার্য। বাঙলাদেশে এরূপ কোনো ব্যাপারই ঘটে নি।

অথচ বাঙলাদেশে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির ধারা ছিল এটা 'প্রমাণ' করার জন্য রবীন্দ্র গুপ্ত প্রথমত স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক-বিদ্রোহগুলিকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত তিনি এই সকল 'বিপ্লবের' সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত চারণকবিদের অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন।* যেহেতু এঁদের লেখা বিশেষ কোনো সাহিত্য পাওয়া যাচ্ছে না তাই তৃতীয়ত তিনি বিলাপ করেছেন যে এই খাঁটি বিপ্লবী সাহিত্য লুপ্ত, অবজ্ঞাত ইত্যাদি। চতুর্থত, তিনি বহু স্থলে এরূপ দ্ব্যর্থক মন্তব্য করেছেন যাতে এরূপ ধারণার উদয় হয় যে, কৃষকের সংগ্রামী ঐতিহ্য অর্থাৎ সংগ্রামটাকেই (তা সাহিত্যে প্রতিফলিত হোক আর নাই হোক) সাহিত্যিক ঐতিহ্য বলে তিনি ব্যাখ্যা করছেন। এবং অবশেষে, পঞ্চমত রবীন্দ্র গুপ্ত বলেছেন যে যতদিন না খাঁটি সংগ্রামী ও বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য খুঁজে পাওয়া যায় ততদিন চারণ-

* কৃষক-বিদ্রোহের সহিত যুক্ত একটিও চারণকবি ও তাঁর কাব্যের উল্লেখ রবীন্দ্র গুপ্ত করতে পারেন নি। সিপাহী-বিদ্রোহের কালে ব্রিটিশের অত্যাচারের ছবি দুটি-একটি উর্দু ফিউডাল কবির কাব্যে পাওয়া যায়। কৃষকের অবর্ণনীয় দুঃখ তদানীন্তন লোকসাহিত্যে ফুটে ওঠা সম্ভব। যেখানে যেটুকু পাওয়া যায়, তা নিশ্চয়ই আদরণীয় ঐতিহ্য। কিন্তু এই প্রায় না-থাকা আধা-ফিউডাল বাংলা লোকসাহিত্যকে চার্নিশেভস্কি, ডবরোলিউবভ ইত্যাদির যুগান্তকারী বিশ্ববিপ্লবী রাশিয়ান সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করা বা তার সমপর্যায়ভুক্ত করা মার্কসবাদের হাস্যকর বিকৃতি। ব্রিটিশ পুঁজিবাদী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চারণকবিদের ঐতিহাসিক ভূমিকার অবসান হয়েছিল। আগাগোড়া চারণ-কবিদের নিয়ে রবীন্দ্র গুপ্ত রোমান্স রচনা করেছেন এবং এই রোমান্সটাই তাঁর সাহিত্যিক 'থিওরি'র মূল স্তম্ভ, এটা লক্ষ্য করবার বিষয়। এই স্তম্ভটিকে বাদ দিলে তার 'থিওরি'টা একেবারে ভূমিসাৎ হয়। কেননা মাইকেল, দীনবন্ধুও তাঁর মতে চারণকবিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই 'বিপ্লবী গণতান্ত্রিক'।

কবিদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ (তারও কোনো প্রমাণ নেই) মাইকেল, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু প্রভৃতিকে তাঁদের "সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও" বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্যিক বলে ধরে নিতে হবে। এই হল বিপ্লবী সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্র গুপ্তের যুক্তির বনিয়াদ। বনিয়াদটা যে খুবই নড়বড়ে তা সামান্য একটু পরীক্ষা করলেই অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

মাইকেল—হোমার, ট্যাসো, মিল্টন কালিদাস গিলে খেয়েছিলেন, ডিরোজিও-র* তিনি ছিলেন উপযুক্ত শিষ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে অদ্বিতীয় অধিকারী। প্যারাডাইস লস্ট ও রঘুবংশ তন্নতন্ন করে পড়া না থাকলে তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য ব্যাখ্যা করাই অসম্ভব। তিনি বাঙলার অজ্ঞাতনামা বিপ্লবী চারণকবিদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, এটা সত্য নয়। বরং তিনি অত্যন্ত জ্ঞাতনামা কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মাইকেলের মূল্য নিরূপণের সময় রবীন্দ্র গুপ্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন, দেবদেবীকে মানুষ হিসাবে আঁকা ইত্যাদি সাহিত্যিক মাপকাঠি গ্রহণ করেছেন, এখানে তাঁর নিজের নির্দিষ্ট একমাত্র মাপকাঠিটা—অর্থাৎ ব্রিটিশ-শাসনের উচ্ছেদকামী সংগ্রামী রাজনীতি বাদ পড়ে গেল। লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্যের প্রতি মোহ, বিদেশী আক্রমণকারী রামের বিরুদ্ধে রাবণের দেশরক্ষার সংগ্রাম, রামের চেয়ে রাবণকে বড় করে দেখা, দেশদ্রোহী বিভীষণের চিত্র, মেঘনাদবধ কাব্যে এই সব সুস্পষ্ট বুর্জোয়া ভাবধারার ছাপ রবীন্দ্র গুপ্তের দ্বারা উল্লিখিত হয় নি। এবং সবার চেয়ে যেটা বড় কথা, যেটা কালীপ্রসন্ন সিংহও তখনকার দিনে বুঝতে পেরেছিলেন, অর্থাৎ মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যকে একটা স্থানীয়, ফিউডাল সাহিত্যের পর্যায় থেকে তুলে বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করল, আবার একই সঙ্গে তাকে জাতীয় সাহিত্যও করে তুললো, এই গুরুত্বপূর্ণ সত্যটিকে রবীন্দ্র গুপ্ত ধরতে পারেন নি। অথচ এটাই মাইকেলের অনুষ্ঠিত সত্যকার কাল্চারাল বিপ্লব।

কালীপ্রসন্ন সিংহ চমৎকার আলালী ভাষায় তখনকার দিনের বাবু-সমাজকে ও বাবু-কালচারকে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী কম্প্রাডোর ফিউডাল কালচারকে তীব্র সমালোচনা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের কশাঘাত করেছিলেন এবং তাঁর এই সমালোচনার

* ডিরোজিও ছিলেন একজন সত্যকার বিপ্লবী-বুদ্ধিজীবী। তাঁকে ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত এক করে দেখা ভুল।

দিকটা যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, অতএব নিশ্চয়ই প্রগতিশীল। গোপাল হালদার তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' নামক গ্রন্থে 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'-র কথা অনেক দিন আগেই উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন নিজেরই সমাজের একটা বৈঠকী সমালোচনা করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত নিজেও ছিলেন একজন অতিমাত্রায় বাবু। তাঁর না ছিল কোনো জীবনদর্শন ও না ছিল কোনো বিপ্লবী রাজনীতি। তাঁকে রাশিয়ার চার্নিশেভস্কির বা হারজেনের সঙ্গে এক করে দেখার অর্থ, রাশিয়ার ও ভারতের, উভয় দেশের ইতিহাসকে ও সাহিত্যকে বিকৃত করা।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' বাংলা সাহিত্যের একটি অমর গ্রন্থ এবং ভারতীয় মার্কসবাদীরা বহু বৎসর আগে থেকেই 'নীলদর্পণ'-কে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের একটি পূর্বগামী পথপ্রদর্শক গ্রন্থ বলে প্রচার করে এসেছেন। কিন্তু রবীন্দ্র গুপ্ত হঠাৎ দীনবন্ধুকে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের উল্টো শিবিরে স্থাপিত করে এবং তাঁকে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক অর্থাৎ সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদকামীদের দলভুক্ত বলে চিত্রিত করে একটা গোলযোগ সৃষ্টি করেছেন। প্রথমত, নীল-বিদ্রোহ মোটেই বিপ্লবাত্মক ছিল না, কাজেই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের দিক থেকে 'নীলদর্পণ' বিপ্লবের প্রতিফলন নয়। দ্বিতীয়ত, 'নীলদর্পণ' প্রধানত নীলকর সাহেবদের পাশবিক অত্যাচারের ছবি, কৃষকদের প্রতিরোধ যতটুকু বাস্তব জগতে ছিল তাও মোটের উপর ক্ষীণভাবে গ্রন্থটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। তৃতীয়ত, দীনবন্ধুর রাজনীতি ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানের রমানাথ ঠাকুর ও হরিশ মুখার্জীর রাজনীতি, অর্থাৎ নীলচাষীদের প্রতি অত্যাচারকে un-British বলে প্রচার করে 'ন্যায়পরায়ণ' ব্রিটিশের কাছ থেকেই সুবিচার প্রার্থনা করার রাজনীতি। সেকালের লিবারাল জমিদার বা লিবারাল বুর্জোয়া বুদ্ধি-জীবীর মতাদর্শ ও আপসপন্থী রাজনীতির কাঠামোর মধ্যেই দীনবন্ধু যে কৃষকদের বাস্তবজীবন, দুঃখ-দুর্দশা ও প্রতিরোধকে (যত ক্ষীণভাবেই হোক না কেন) সাহিত্যের বিষয়ীভূত করেছিলেন, সাহিত্যিক বাস্তবতার দিকে তাঁর এই বিপ্লবী পদক্ষেপের জন্যই তিনি বাঙালী সাহিত্যিকের নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'নীলদর্পণ'কে একটা অবাস্তব ও অতি-বিপ্লবী রাজনৈতিক চরিত্র দান করে দীনবন্ধুকে সাধারণ সাহিত্যিকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত নয়।

"বিপ্লবের পরিপন্থী" বুর্জোয়া বাংলা সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা, যেটিকে অনেক সময় 'রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ' এই আখ্যা দেওয়া হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধু ও নজরুল যে সেই ধারারই অন্তর্ভুক্ত এ বিষয়ে কোনো বস্তুবাদী সমালোচকের মনে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। এঁদের সকলেরই মধ্যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার যুগপৎ অস্তিত্ব, এই স্ববিরোধ (contradiction) দেখি, মাও সে-তুঙের মতে ঔপনিবেশিক দেশে যা অবশ্যম্ভাবী। এঁদের সকলেরই মধ্যে সাম্রাজবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী কন্‌টেণ্ট কিছু না কিছু ছিল, কারো কম, কারো বেশি। এই কন্‌টেণ্টটিকে ও তার স্ববিরোধকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করাই ঐতিহাসিক বস্তুবাদী সমালোচকের কর্তব্য। এই প্রধান ধারাটি বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধারা এবং মাওয়ের বিশ্লেষণ অনুসারে এটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, ফিউডাল-বিরোধী প্রগতিশীল ধারা। এই প্রধান ধারার বিরোধী একটি অপ্রধান ধারাও ছিল এবং সেটি হল সাম্রাজ্যবাদের স্তাবক, বিজাতীয়, ফিউডালিজমের উপাসক, প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ধারা। এই অপ্রধান ধারা বলতে আমি বুঝি পাদ্রী সাহিত্য (শেষের দিককার), সংস্কৃতনবীশ পণ্ডিতী সাহিত্য, বিরাট বটতলা সাহিত্য (কিছু অংশ বাদে), ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের ঐতিহ্যমার্কা সাহিত্য, অশ্লীল ও আদিরসাত্মক সাহিত্য, ধর্মধ্বজী সাহিত্য, বহু পচা নাটক-নভেল, ইংরেজীনবীশদের লেখা সাম্রাজ্যবাদের স্তাবক বিজাতীয় সাহিত্য, স্কুল-কলেজের পাঠ্য সাম্রাজ্যবাদের প্রচারে ভরা মিথ্যা ইতিহাসের আবর্জনা ইত্যাদি। এর সবটাই ইতিহাসকে পিছনের দিকে টানছিল। এই সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল ধারার সঙ্গে লড়াই করে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা, প্রগতিশীল বুর্জোয়া ধারা বিকশিত হয়েছিল।* কিন্তু রবীন্দ্র গুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের যেটি প্রধান ধারা, যেটি ষোল-আনাই সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল সংস্কৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেড়ে উঠেছিল এবং যাকে নিজেরও

* লেনিন প্রত্যেক দেশে সাহিত্যের দুই ধারা অন্বেষণ করতে শ্রমিক-শ্রেণীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, একথা খুবই সত্য। মাও সে-তুঙের বিশ্লেষণ সেই নির্দেশের উপরই স্থাপিত। মাওয়ের বিশ্লেষণ অনুসারে অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পূর্বে—বাংলা সাহিত্যের দুই ধারা এই রূপেই নির্ণীত হবে, অর্থাৎ—একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফিউডাল-বিরোধী বুর্জোয়া-সাহিত্যের ধারা এবং অন্যটি সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল ধারা।

পুরাতন ঐতিহ্যকে বর্জন করে ক্রমশ এগুতে হয়েছিল সেই প্রধান ধারার মধ্যেই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধারা দেখাতে গিয়ে ভুল বিচার করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মাপকাঠি যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং ভুল সিদ্ধান্তে এসেছেন। রামমোহন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণকে পরীক্ষা করে সংক্ষেপে এটা দেখাবার চেষ্টা করব।

রামমোহনের বেলায় রবীন্দ্র গুপ্ত যান্ত্রিকভাবে একটা মনগড়া রাজনৈতিক মাপকাঠি প্রয়োগ করেছেন—রামমোহন কি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইকে সমর্থন করেছিলেন, না ব্রিটিশের সঙ্গে কোলাবোরেশন করেছিলেন? এবং যেহেতু তিনি ব্রিটিশ-শাসনের সঙ্গে কোলাবোরেশন করেছিলেন, অতএব তাঁর প্রেস-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জাতিভেদের বিরুদ্ধে অভিযান, হিন্দু-পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সতীদাহ নিবারণের চেষ্টা, বেদান্ত-দর্শনের পুনর্ব্যাখ্যা করে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের ভিত্তিতে নূতন জাতীয়তাবাদী আইডিয়লজি গড়ার চেষ্টা, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য লড়াই, বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন, সমস্তই কোলাবোরেশনিস্ট সমাজ-সংস্কার!! যুক্তিটি স্পষ্টতই কোনো যুক্তি নয়। প্রেস-আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জাতিভেদের, হিন্দু পৌত্তলিকতার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান, নূতন জাতীয়তাবাদী আইডিয়লজি গড়ার চেষ্টা, বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন, এ সমস্ত আদৌ ব্রিটিশ শাসকদের রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না, ব্রিটিশ-বিরোধী সামাজিক শক্তিগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একথা যদি সত্য না হয়, তবে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যাঁরা সে সময়ে প্রেস-আইন, জাতিভেদ, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা, ফিউডাল ভাবাদর্শ ইত্যাদি সমর্থন করতেন এবং বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতির বিরোধিতা করতেন তাঁরা কোন শিবিরে ছিলেন?

রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য ব্রিটিশ-শাসনের সঙ্গে যে কোলাবোরেশন করেছিলেন তা সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্ববিরোধ বশতই। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেই একদল চাইতেন ভারতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তন এবং আর একদল চাইতেন পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন। সাম্রাজ্যবাদীরা পাশ্চাত্যশিক্ষার সামান্য একটু কৃপণের মতো প্রবর্তন করে নিজেদের বিরোধী শক্তি সৃষ্টি করেছে, স্বয়ং কার্ল মার্কস এই কথা বলে গেছেন। চীন সম্বন্ধে

যাও সে-তত্ত্ব পরিষ্কার করে বলেছেন যে চীনা বুর্জোয়ারা প্রথম যুগে পাশ্চাত্য-শিক্ষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক প্রবর্তন করার চেষ্টা করে প্রগতিশীল ভূমিকাই অভিনয় করেছিল। তারপর রামমোহন পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন করে যদি ব্রিটিশের গোলামি করে গেলেন, তাহলে এই গোলামির শ্রেষ্ঠ ফল মাইকেল মধুসূদন দত্ত কি করে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্যিক হলেন?

রামমোহনকে রবীন্দ্র গুপ্ত বলেছেন ইজারাদার শ্রেণীর লোক। কিন্তু রামমোহনকে বুঝতে হবে বুদ্ধিজীবী হিসাবে। বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের শ্রেণীসংস্থান ও শ্রেণীচেতনার দ্বারা প্রবুদ্ধ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ হন, একথা যেমন সত্য তেমনই এটাও মার্কসবাদের স্বীকৃত সত্য যে সত্যানুসন্ধী বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের শ্রেণীচেতনাকে কিছুটা বা সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে প্রগতিশীল বা বিপ্লবী ভূমিকা অভিনয় করতে পারেন। এই সব intellectual aristocrat-রা বিশ্ব-সোশ্যালিস্ট ভাবধারার ও আন্দোলনের অগ্রদূত। প্রগতিশীল ভাবাদর্শকে বিকশিত করা এবং কৃষক-আন্দোলন বা শ্রমিক-আন্দোলন বা জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করাই এঁদের অগ্রণী ঐতিহাসিক ভূমিকা। রামমোহনকে নিঃসন্দেহেই বিচার করা উচিত ভারতের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের (Progressive intelligentsia-র) প্রথম ও প্রধান নেতা হিসাবে। এঁদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ যেমন মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি, তাঁরাই কেউ বা জমিদার শ্রেণী, কেউ বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পেশাজীবী শ্রেণী, কেউ বা ধনী কৃষক এবং কেউ বা পেটিবুর্জোয়া ও পরের দিকে বুর্জোয়া-শ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়ে এবং প্রগতিশীল বুর্জোয়া ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশ রচনা করে গেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করলে বাংলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতির কোনোরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি বড় শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীকে স্বীয় শ্রেণীচেতনার পিঞ্জরায় সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ ভাবতেই হবে, একথা মার্কসবাদ বলে না। রামমোহন ইজারাদার শ্রেণীর চেতনার অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। উপরন্তু, তিনি সমসাময়িক ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চেতনারও অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। সমসাময়িক পারিপার্শ্বিক বিবেচনা করলে রামমোহনকে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল বলা উচিত। তাঁর সকল কাজকর্মের লক্ষ্য যে ভারতকে একদিন স্বাধীন করা, এ-বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন এবং

পাম দত্ত অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তাঁকে 'Father of Indian Nationalism' এই আখ্যা দিয়েছেন।

ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ঐতিহাসিক কর্তব্যপালন করার জন্য ইতিহাসের নির্দেশ ছিল যে কৃষক-আন্দোলন প্রথমে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের ও পরে প্রলেটারিয়ান ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জাতীয় মুক্তি সাধিত করবে। সুতরাং রামমোহনের প্রবর্তিত বুর্জোয়া ভাবাদর্শ (অবশ্যই তার অনেক দুর্বলতা ছিল) এবং কৃষক-আন্দোলন ও কৃষক-বিদ্রোহ, এই উভয়ের বিরোধিতা কল্পনা করার হেতু নেই। কৃষক-বিক্ষোভ যেমন প্রমাণ করেছিল যে দেশ ঘুমিয়ে নেই, রামমোহনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনও সেই একই জিনিস প্রমাণ করেছিল। এই দুয়ের কাল্পনিক বিরোধিতার একটা হেতু দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্র গুপ্ত বলেছেন যে রামমোহনের সময়ে দেশ দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল, "দেশে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র দেশবাসী ঘোরতর সঙ্ঘর্ষে নিযুক্ত ছিল।" 'সে সময় দেশ' বলতে আমারা কি বুঝব? দেশের ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চল, না সমগ্র ভারতবর্ষ? রামমোহনের সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী কোনো জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কল্পনা নিতান্তই অবাস্তব, এরূপ কোনো আন্দোলন বা তার ঐতিহাসিক ভিত্তি তখন ভারতে ছিল না। ইংরেজ অধিকৃত বাংলায় সমগ্র দেশবাসী রামমোহনের সময়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ঘোরতর সঙ্ঘর্ষে নিযুক্ত ছিল, এটা সত্য নয়। স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভই রাজনৈতিক গণবিপ্লব, শত্রু যখন সব চেয়ে বেশি অত্যাচার ও আক্রমণ করে তখনই সে সব চেয়ে বেশি দুর্বল এবং তখনই সে জনসাধারণের ভয়ে কাঁপছে, এইসব ভুল রোমান্টিক আইডিয়াই এরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে রামমোহনের সময়ে দেশ দুই শিবিরে বিভক্ত ছিল এবং ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রায় সমগ্র দেশবাসী ঘোরতর সঙ্ঘর্ষে নিযুক্ত ছিল। এসব কথা সত্য নয়। এ সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিক আন্দোলনের উল্লেখ রবীন্দ্র গুপ্ত করেন নি। দেশ ইংরেজ-শাসনকে কোনোদিনই মেনে নেয় নি এবং তলে তলে অসন্তোষ ও প্রতিরোধের ধারা বরাবরই বইত এবং মাঝে মাঝে ফেটে পড়ত, একথা পাম দত্তও বলেছেন। এই সত্যটিকে অতিরঞ্জিত করে একথা বলা যে সমগ্র দেশ যখন জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র লড়াইয়ে প্রবৃত্ত তখন রামমোহন কোলাবোরেশন করলেন, এটা ইতিহাসের বিকৃতি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে সমাজসংস্কার করার চেষ্টাটা প্রতিক্রিয়াশীল দেশদ্রোহিতা, নিঃসন্দেহেই এটা ফিউডাল প্রতিক্রিয়ার, ব্রাহ্মণসভার, হিন্দু মহাসভার ও আর. এস. এস-এর demagogic রাজনৈতিক লাইন। এজ্ অফ কন্‌সেণ্ট এ্যাক্ট, সারদা এ্যাক্ট, গৌড় এ্যাক্ট, ইত্যাদির সময়ে আমরা এই লাইনের সাক্ষাৎ পেয়েছি। রবীন্দ্র গুপ্ত রামমোহনের সমাজসংস্কারকে আক্রমণ করতে গিয়ে যে লাইন নিয়েছেন তার সঙ্গে ব্রাহ্মণসভার, হিন্দু মহাসভার লাইনের তফাৎ কোথায়?

বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতে তাঁদের সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক আলোচনা এখনও ভালোমতো হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। এ কাজ মার্কসবাদীদের ধৈর্যের সহিত করতে হবে। তাঁদের রচনার প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয় দিকই দেখাতে হবে। রবীন্দ্র গুপ্ত বঙ্কিমের এক-একটি উপন্যাসকে এক-একটি সংক্ষিপ্ত ফরমূলায় বেঁধে দিয়েছেন। অন্তত সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ব্যাপারে মার্কসবাদকে এই ধরনের কবিরাজি বটিকার মতো প্রস্তুত বা সেবন করা বিশেষ ফলপ্রদ নয়। বঙ্কিমের প্রত্যেকটি উপন্যাসে সে-সময়কার বাস্তব জীবন কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার বৈজ্ঞানিক ও বিস্তৃত আলোচনা যতটা প্রয়োজন করা উচিত আর নয়তো কোনো কথা বলাই উচিত নয়, এই মনোভাবকেই আমি বৈজ্ঞানিক মনোভাব মনে করি। যাই হোক, আমি সংক্ষেপে দেখাবার চেষ্টা করব কতটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী কন্‌টেণ্ট ও ভাবধারা বঙ্কিমের ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পাওয়া যায়।

ইংরেজের শেখানো বুলি নিয়ে রবীন্দ্র গুপ্ত যে উষ্মা প্রকাশ করেছেন বঙ্কিমই সেই ইংরেজ-বিরোধী ঐতিহাসিক ভাবধারার একজন প্রবর্তক। তিনিই প্রথম আমাদের দেশে ইংরেজ যেভাবে ভারতকে হীন (slander) করেছে, ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে, তার বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, দেশবাসীকে এবিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন এবং ভারতের ও বাঙলার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করবার জন্য রীতিমতো একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই আন্দোলনের পরিণতির ফলেই ক্রমে সিরাজদ্দৌলা ও মীরকাশিম দেশপ্রেমিক বলে বাঙলার বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে পূজিত হন, মীরজাফর দেশদ্রোহী বলে ঘৃণিত হন এবং সিপাহী-বিদ্রোহের গৌরবময় ঐতিহ্যও বুর্জোয়া বাংলা সংস্কৃতিতে

স্বীকৃত হয় ও প্রচারিত হয়। ভারতে অভ্যন্তরীণ শক্তি যথেষ্ট আছে যার ফলে ইংরেজের পূর্বেও ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে, বিভিন্ন ভাষা-ভাষী অঞ্চলে জাতীয়তার প্রথম বিকাশ ঘটেছে, অত্যাচারীর প্রতিরোধ করা হয়েছে এবং এইসব অভ্যন্তরীণ শক্তিই সংঘবদ্ধ হয়ে ও বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতকে একদিন স্বাধীন করবে—এই যে মূল সত্যটি মার্কসবাদ ভারতের ইতিহাসে অনুসন্ধান করে, বঙ্কিমও নানারূপ প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের সহিত আপস করা সত্ত্বেও এই মূল সত্যটি অনুসন্ধান করেছিলেন এবং এই দিক থেকে তিনি একটি প্রগতিশীল ঐতিহ্যই স্থাপন করেছিলেন।

বাঙালীর লাঠি, বাঙালীর বাহুবল, বাঙালীর জাতীয় ইতিহাস ইত্যাদির যে অনুসন্ধান বঙ্কিম করেছিলেন, তা বাঙলার নবজাগ্রত জাতীয় চেতনার (যেটার শুরু হয়েছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে) অভিব্যক্তি।*

"লুপ্ত, অবজ্ঞাত," সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ইতিহাসকে নিজের চেষ্টায় উদ্ধার করে তাকে বাঙালীর স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পলিটিক্যাল পার্টির রাজনৈতিক-সামরিক লড়াই বলে আনন্দমঠে চিত্রিত করা বঙ্কিমের অসামান্য প্রতিভারই পরিচয় দেয়। আনন্দমঠে রিয়ালিজম্ ও রোমান্টিসিজম্ দুই-ই আছে। রিয়ালিজমের দিক থেকে ব্রিটিশ পুঁজির আদিম পুঁজিসঞ্চয়ের যুগ এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে-প্রতিফলন আনন্দমঠে রয়েছে নিশ্চয়ই তা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে আদরণীয় ঐতিহ্য। রেজা খাঁ ইংরেজেরই গোলাম এবং

* সোভিয়েট লেখক ডিয়াকভ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাঙলায় ও অন্যান্য অঞ্চলে জাতীয় চেতনার নব অভ্যুদয়ের উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিম-সাহিত্যে দেখি, বাঙালীর নতুন স্তরের জাতীয় চেতনার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। সমাজের দানীন্তন পশ্চাৎপদ অবস্থায় বঙ্কিমের জাতীয় চেতনা ফিউডাল ভাবাদর্শের সঙ্গে যে বড় রকমের আপস করেছিল, সেই হিন্দু জাতীয়তাবাদ বঙ্কিম-সাহিত্যের উৎকট প্রতিক্রিয়ার দিক। হিন্দু জাতীয়তাবাদ আজ সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ও ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসন্দেহেই সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে বাহিনীর ভাবাদর্শে পরিণত হয়েছে। ঠিক যেমন ইসলামিক গণতন্ত্রবাদ ওয়াহাবী কৃষক-আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম লীগের হাতিয়ার রূপে ভারতকে খণ্ডিত করেছে এবং এই মুহূর্তে জনাব লিয়াকৎ আলি মারফৎ ট্রুম্যানের পদলেহনে লিপ্ত। বঙ্কিমকে হিন্দু জাতীয়তা-বাদী বলে সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া মুসলিম লীগের রাজনীতি।

বঙ্কিম রাজরোষ এড়াবার জন্যই হোক আর যেজন্যই হোক, যদিও বলেছিলেন যে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত, তথাপি বইয়ের ঘটনাই প্রমাণ করেছে যে বিদ্রোহটা ইংরেজের বিরুদ্ধে এবং জনসাধারণ ও শাসক-সম্প্রদায় সেইভাবেই আনন্দমঠকে গ্রহণ করেছিল। আনন্দমঠের রোমান্টিক দিকটা হল পলিটিক্যাল পার্টি গড়ে জাতীয় ভাবাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক-সামরিক লড়াইয়ের দ্বারা ভারতের মুক্তিসাধনের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন নিঃসন্দেহেই ভারতের ভবিষ্যৎ মুক্তি-আন্দোলনের একটা পূর্বাভাস, যদিও একথাও সত্য যে বঙ্কিম যে-ভাবাদর্শটি তুলে ধরেছিলেন তা ফিউডাল-প্রতিক্রিয়াশীল ও ইউটোপিয়ান। প্রগতিশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা একই সঙ্গে বঙ্কিমের মধ্যে ছিল। রবীন্দ্র গুপ্ত 'হুতোম পাঁচার নকসা'কে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সাহিত্য বলেছেন ঐ বইটির সমালোচনারূপ কন্‌টেণ্টের জন্য কিন্তু এটা কি করে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল যে লোকরহস্য, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ও কমলাকান্তের দপ্তর প্রভৃতি গ্রন্থে ও বহু প্রবন্ধে ব্রিটিশ-শাসন, ব্রিটিশ-বিচার, ব্রিটিশের তাঁবেদারদের হীন স্তাবকতা ইত্যাদিকে বঙ্কিম বহু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে গেছেন? এসকল গ্রন্থে কি ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী সমালোচনামূলক কন্‌টেণ্ট নেই? শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে রচনাগুলি উৎরেছে বলে নিশ্চয়ই তাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কন্‌টেণ্টটা বাতিল হয়ে যাবে না। একথাও সত্য যে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে কোনো ইংরেজ চরিত্রকে কখনও হেয় ছাড়া অন্যভাবে আঁকেন নি।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কন্‌টেণ্ট বঙ্কিম-সাহিত্যে আছে। এইবার দেখা যাক ফিউডাল-বিরোধী কন্‌টেণ্ট বঙ্কিম-সাহিত্যে আছে কিনা। রবীন্দ্র গুপ্ত একথাটিও সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে যেমন মাইকেলের কাব্য তেমনই বঙ্কিমের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের ফিউডাল সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়ে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-বুর্জোয়া সাহিত্যের আবর্তে নিয়ে এল এবং সেই পথ মাড়িয়েই বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আজ বিশ্ব-সোশ্যালিস্ট সাহিত্যের আবর্তের মধ্যে এসে পড়েছে। বঙ্কিম-সাহিত্য সম্বন্ধে এই সর্বপ্রধান সত্যকে ঐতিহাসিক কি করে অস্বীকার করতে পারেন? রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধারা কি বাংলা সাহিত্যের বিকাশ নয়, অগ্রগতি নয়, এটা কি তবে মায়া? গোপাল হালদার সঙ্গতভাবেই এই প্রশ্ন তুলেছেন। বাংলা সাহিত্যের এই প্রধান ধারাটি

সাহিত্যের অগ্রগতি, নরহরি কবিরাজের এই মূল দৃষ্টিভঙ্গীটা আমি সঠিক বলে মনে করি, যদিও এটাকে 'স্বর্ণযুগ' বলা, এর স্ববিরোধ ও দুর্বলতার দিকে অন্ধ হয়ে থাকা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। এবং যেহেতু এই প্রধান ধারাটি বুর্জোয়া ধারা ও মাওয়ের বিশ্লেষণ অনুসারে প্রগতিশীল ধারা, তাই এর একজন প্রথম প্রবর্তক কি করে অভিজাত শ্রেণীর ফিউডালধর্মী লেখক বলে বিবেচিত হতে পারেন এটা বিস্ময়ের বিষয়। বঙ্কিম-সাহিত্যে ফিউডাল-বিরোধী বুর্জোয়া কন্টেণ্ট, বুর্জোয়া ভাবাদর্শ আছে এবং সেটাই তাঁর প্রগতিশীল ঐতিহ্য, কেননা সেটা বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির সাক্ষ্য। সেইজন্য বঙ্কিমকে তখনকার দিনের অগ্রণী সাহিত্যিক বলে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী সাহিত্যের একজন প্রবর্তক বলে নিশ্চয়ই শ্রমিকশ্রেণী তাঁকে স্বীকৃতি দেবে। তার অর্থ এ নয় যে বঙ্কিমের মডেলে, বঙ্কিমের ভাবাদর্শে আজ কাউকে উপন্যাস লিখতে বলা হচ্ছে। তুলসীদাসের ভাবাদর্শ গান্ধীবাদ মারফৎ ভারতকে সর্বনাশের মধ্যে ডুবিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। তবু যে আজ বিশ্ব-প্রলেটারিয়াট তুলসীদাসের রামায়ণকে সেকালের প্রগতিশীল রচনা বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে তার অর্থ কি এই যে প্রলেটারিয়াটকে তুলসীদাসের মডেলে ও তুলসীদাসের ভাবাদর্শে সাহিত্য লিখতে বলা হচ্ছে ?

ফিউডালিজমের 'সহিত বঙ্কিমের আপস করাকেই যাঁরা বড় করে দেখেন এবং বঙ্কিম-কর্তৃক বাংলা সাহিত্যকে ফিউডাল সাহিত্যের পর্যায় থেকে বুর্জোয়া সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করাকে যাঁরা উড়িয়ে দেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আমি অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করি। সাহিত্য কি অবস্থায় কোন পর্যায় থেকে কোন পর্যায়ে গতিলাভ করল এটাই প্রধান বিচার। বঙ্কিমের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অন্য বাংলা সাহিত্য থেকে বঙ্কিম-সাহিত্য এক ধাপ বা অনেক ধাপ অগ্রসর। এটাই প্রধান কথা।

বঙ্কিমের মারফতই নারী প্রথম বাংলা সাহিত্যে এল ব্যক্তিরূপে। সমসাময়িক সমাজে নারীর জীবনে যে-স্ববিরোধ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, বঙ্কিম-সাহিত্যেই হল তার প্রথম প্রকাশ। নারী সম্বন্ধে হিউম্যানিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী বঙ্কিমই প্রথম প্রবর্তন করলেন বাংলা সাহিত্যে। নারী সম্বন্ধে বঙ্কিমের এই ব্যক্তিত্ববাদ ও হিউম্যানিজম অবশ্যই খুব সীমাবদ্ধ ছিল এবং সামাজিক স্ববিরোধ থেকে বাঁচবার যেপথ তিনি বাতলে দিলেন নিঃসন্দেহেই তা ইউটোপিয়ান ও প্রতিক্রিয়াশীল। কি

ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিক থেকে বঙ্কিম-সাহিত্যের স্তর ও চরিত্র নির্ণয় করতে যাঁরা প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরা কি করে এটা ভুলে যান যে বঙ্কিমের ব্যক্তিস্ববাদ ও হিউম্যানিজম তখনকার বাংলা সাহিত্যে একটা বিপ্লব ?

সূর্যমুখী, ভ্রমর ও রোহিণী চরিত্র থেকে বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিস্ববাদী, হিউম্যানিস্ট নারী-চরিত্রের সূত্রপাত। আমার যতদূর মনে পড়ছে, শরৎচন্দ্রের নিজের সাক্ষ্য আছে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' থেকেই তিনি প্রথম সাহিত্যিক প্রেরণা পান। বঙ্কিম রোহিণীর প্রতি যে-অবিচার করেছেন তার প্রতিকার করতে হবে, এই সাধনা থেকেই ক্রমে ক্রমে শরৎচন্দ্র তাঁর নিজস্ব নারী-চরিত্রে উপনীত হন।* বঙ্কিম যে রোহিণীকে হত্যা করলেন (এবং অনেক ভেবেচিন্তে ও প্রথম লেখাটিকে পাল্টে), তাতে নিশ্চয়ই প্রমাণ হল যে বঙ্কিমের হিউম্যানিজম্ ছিল সীমাবদ্ধ কিন্তু তাতে কি এ সত্য অপ্রমাণ হয় বঙ্কিমের আগে বাংলা সাহিত্যে নারী-চরিত্র বলে কোনো বস্তুই ছিল না ? দেবী চৌধুরাণীকে ও কিছুটা শ্রীকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে একটা বড়দরের সামাজিক-রাজনৈতিক ভূমিকা অভিনয় করালেন, একথা ভুলে গিয়ে কেন বঙ্কিম বহু বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করালেন না, শুধু এটিকেই বঙ্কিম-সাহিত্যের একমাত্র ও চরম সত্য বলা, এটা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য-বিচার নয়। তারপর সুরুচির জন্য, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে বঙ্কিমের সুবিদিত অভিযান কি ফিউডাল-বিরোধী নয় ? Soviet Literature পত্রিকায় এখনও অশ্লীল সাহিত্য প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার বলে নিন্দিত হয়ে থাকে। 'কৃষকের কথা', 'সাম্য' প্রভৃতি লেখা বঙ্কিমের প্রথম দিককার বিপ্লবী, ফিউডাল-বিরোধী ভাবাদর্শের সাক্ষ্য দেয়। সব শেষে এটাও আমি অস্বীকার করি যে বঙ্কিম-সাহিত্যের রস শুধু অভিজাত শ্রেণীই উপভোগ করেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, অন্তত চল্লিশ বছর আগে নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী বঙ্কিম-সাহিত্যের রসে ডুবেছিল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যদি কোনো কথা সত্য হয় তা হলে এই কথাই সত্য যে তিনিই বাংলা সাহিত্যের ফিউডাল লেজ খসিয়ে তাকে পুরোপুরি আধুনিক সাহিত্যের রূপ ও চরিত্র দান করলেন। খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না, এক

* শেষ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র কিরণময়ীকে পাগল করে দিলেন, অর্থাৎ শারীরিকভাবে হত্যা না করে মানসিকভাবে হত্যা করলেন।

আঁচড়েই এটা বোঝা যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশপত্রই হল এই স্বীকৃতি যে রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে বাংলা সাহিত্য প্রকাণ্ড এক পা ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গেল, এতদূর এগিয়ে গেল যে তাঁর সমকালীন পচা সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল সাহিত্যের ধ্বজাধারীরা, পিছনমুখীরা, যাঁরা মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধুকেও কিছুটা মেনে নিয়েছিলেন বা মেনে নেওয়ার ভান করেছিলেন এবং তাঁদেরই স্তরে বাংলা সাহিত্যকে আটকে রাখতে চাইছিলেন, সেইসব প্রতিক্রিয়াশীলের দল নানারূপ মিথ্যা স্লোগানের ও মিথ্যা জাতীয়বাদী বুলির আড়ালে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রীতিমতো একটা জেহাদ চালিয়েছিলেন —যেটাকে দিব্য একটি সাহিত্যিক ষড়যন্ত্রের ইতিহাস বললেও চলে। এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের এই ষড়যন্ত্রের ও আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্য বেড়ে উঠল এবং বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে গেল। এটা খাঁটি ঐতিহাসিক সত্য।*

এবং এইসব ফিউডাল প্রতিক্রিয়ার ধ্বজাধারীরা যখন কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, হিন্দুয়ানি, ব্রাহ্মণ্যানি, মন্ত্রতন্ত্র এবং অতীতের প্রেতপুরীর মধ্যে বিচরণকারী সর্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ফ্যান্টাসির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বিরাট শক্তিশালী আঘাতে উত্ত্যক্ত হয়ে হায়েনার মতো তাঁকে ছিঁড়ে খেত এবং মিথ্যা জাতীয়তাবাদের রব তুলত তখন তাঁদেরই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য পাকা ব্যক্তিত্ববাদীর মতো রবীন্দ্রনাথ প্রথম, আর্টের জন্যই আর্ট, এই বুলি তুলেছিলেন। এই বুলি আজ নিঃসন্দেহেই প্রতিক্রিয়ার প্রধান হাতিয়ার কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এটিকে কোন্ cause সমর্থন করার জন্য প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, ঐতিহাসিকের পক্ষে সেটিও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। যেসব প্রতিক্রিয়াশীলেরা তাঁর সাহিত্যকে

* এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য', 'নারায়ণ', 'শনিবারের চিঠি' প্রভৃতি পত্রিকার রবীন্দ্র-বিরোধী অভিযানের উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদেরই পচা ঐতিহ্যের বাহকগণ আজ একদিকে সাম্রাজ্যবাদী সাহিত্য রচনা করছেন ও নূতন প্রগতি সাহিত্যকে আক্রমণ করছেন এবং অন্যদিকে রবীন্দ্র-পূজার ভণ্ডামি চালাচ্ছেন। এই 'রবীন্দ্র-পূজক'দের দলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে (কিমাশ্চর্য মতঃ পরম্?) বুদ্ধদেব বসুকে, যিনি 'জল পড়ে, পাতা নড়ে' এটাকেই চিরদিন নিজের রচিত সাহিত্যে চরম সত্য বলে প্রচার করে এসেছেন এবং এর পিছনে বিশ্বজগৎ বলে একটা কিছুর সন্ধান করাকে যিনি মনে করেন সাহিত্যিক ইতরতা (vulgarity)।

এই কথা বলে আক্রমণ করতেন যে তাঁর সাহিত্য বাংলা দেশের 'বাস্তবের' সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না, "ইংরেজী যাহারা শেখে নাই, তাহারাই দেশের বাস্তব সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে," তাঁদের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাস্তব' প্রবন্ধে যা বলেছিলেন এই প্রসঙ্গে তা উদ্ধৃত করছি : "কিন্তু সেই বৃহৎ বাস্তব-সাহিত্যকে চোখে দেখিলে কাজে লাগিত, একটা আদর্শ পাওয়া যাইত। যতক্ষণ তাহার পরিচয় নাই ততক্ষণ যদি গায়ের জোরে তাহাকে মানিয়া লই তবে সেটা বাস্তবিক হইবে না, কাল্পনিক হইবে।

"অথচ, এদিকে ইংরেজি পোড়োরা যে সাহিত্য সৃষ্টি করিল, রাগিয়া তাহাকে গালি দিলেও সে বাড়িয়া উঠিতেছে ; নিন্দা করিলেও তাহাকে অস্বীকার করিবার জো নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। এই যে কোনো কোনো মানুষ খামকা রাগিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে তাহারও কারণ এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব।" [রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োবিংশ খণ্ড, পৃঃ ৩৬৫]

আজ নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্যের শত্রুরাও যখন বলেন যে এ সাহিত্যের সঙ্গে বাঙলার মাটির, ভারতের মাটির কোনো সম্পর্ক নেই তখন রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মাপকাঠি প্রয়োগ করে তাঁরই ভাষায় বলতে পারি, "এ স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, এ বাস্তব।" এবং তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যে দুই ধারার পৃথককরণ ও প্রগতি সাহিত্যের মাপকাঠি নির্ণয়, যা নিয়ে সম্প্রতি এত বিতর্ক উঠেছে, সে সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা সঠিক নির্দেশ আমরা এই উদ্ধৃতিটিতে পাচ্ছি। নিঃসন্দেহেই এই নির্দেশ মার্কসবাদের বিরোধী নয়।

তাঁর সাহিত্যের বাস্তব দিকটাকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন 'অন্তরের বাস্তব।' এই 'অন্তরের বাস্তব' ভাবাদর্শ এসেছিল বিশ্ববুর্জোয়া বিপ্লব থেকে এবং ভারতের ইতিহাস যে-পথে বিকাশ লাভ করার জন্য গুমরে মরছিল ওটা সেই পথেরই প্রতিফলন ও পূর্বাভাস ছিল। অন্যদিকে যে পরিণত ও পূর্ণাঙ্গ বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে তিনি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন তার সঙ্গে তাঁর নিজের দেশের পারিপার্শ্বিকের ছিল গভীর সংঘাত। এই সংঘাত থেকেই সৃষ্ট হয়েছিল রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-সংস্কৃতির অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য, যথা, তার অন্তর্মুখিতা ; কর্ম ও শিল্পের মধ্যে ভেদজ্ঞান ; উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ; আনন্দবাদ ; রাজনীতি, সমাজনীতি ও বাস্তব-জগৎ থেকে

বিচ্ছিন্ন হয়ে বিশুদ্ধ কালচারাল বিপ্লবের অনুষ্ঠান ; দেশের ও পৃথিবীর মুক্তির জন্য কয়েকজন 'মুক্তচিত্ত' ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলতা, ইত্যাদি।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করতে পারত। কিন্তু ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী কোনোরূপ বিপ্লবী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ বারংবার পালিয়ে গেছেন। এই রাজনীতি থেকে পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে যাঁরা শুধু দেখেন, গণআন্দোলন-ভীতি, রাজনীতি-ভীতি তাঁরা শুধু একটা দিকই দেখেন। নিঃসন্দেহেই এই দিকটা বর্তমান ছিল। কিন্তু সমানই নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে তিনি ভারতের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের দুর্বলতা ও প্রতিক্রিয়াকে যেভাবে সমালোচনা করে গেছেন তা বাংলা সংস্কৃতির প্রগতিশীল ঐতিহ্য এবং শ্রমিকশ্রেণী নিশ্চয়ই তার আদর করবে।

সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মধ্যে দুই দল, ভালো শাসক ও মন্দ শাসক। রবীন্দ্রনাথের এ বিশ্বাসের যেটুকু ভিত্তি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে থাক না কেন, তাঁর নিজের সময়ে কোনো ভিত্তিই ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতে তার জঘন্য ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর তীব্র সমালোচনা শুধু শেষজীবনের সাহিত্যে নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যেই আছে। এই সমালোচনার দিকটাই তাঁর সাহিত্যের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কন্‌টেন্‌ট।

বিশেষত অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পর সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর বিক্ষোভ ও আক্রমণ ক্রমশই তীব্রতর হয়েছিল। রবীন্দ্র গুপ্তও এটা অস্বীকার করতে পারেন নি। তিনি স্বীকার করেছেন যে রবীন্দ্রনাথ (১) মহৎ শিল্পীর মতো প্রগতিশীল শিবিরকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, (২) ভারতের দুঃখ-দুর্দশার জন্য ব্রিটিশ-শাসনকে একমাত্র দায়ী করেছিলেন, (৩) সোভিয়েট ইউনিয়নকে অনুন্নত জাতির বন্ধু বলে সাহসের সহিত ঘোষণা করেছিলেন, (৪) হিন্দু-মুসলিম বিরোধের জন্য ব্রিটিশ-শাসকদের ঘৃণ্য চক্রান্তকেই একমাত্র দায়ী করেছিলেন, এবং (৫) ইউরোপের বুর্জোয়া সভ্যতাকে দেউলিয়া বলে নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্র গুপ্তের যুক্তির ভিত্তিটা হল এই : এসব রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন শেষজীবনে, বুড়ো বয়সে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে। সমগ্রভাবে তাঁর সাহিত্যকে বিচার করলে শুধু দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদের ও ফিউডলিজমের প্রতি প্রীতি, সামগ্রিক প্রতিক্রিয়াশীলতা। অতএব তাঁর সাহিত্য

ও সংস্কৃতিকে ঘৃণা ও বর্জন করতে হবে, কেননা বুর্জোয়াশ্রেণীর তা হাতিয়ার ও জনসাধারণকে তা মোহাচ্ছন্ন করছে।

রবীন্দ্র গুপ্তের এই যুক্তির ধারাটি সম্পূর্ণরূপেই ভুল। অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লব যখন হয় তখনই রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় ষাট। এবং প্রায় সত্তর বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট ইউনিয়নের শিক্ষানীতি, গণউন্নয়ন নীতি, সমস্ত জাতির সমানাধিকার নীতির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। যুবা বয়সে সোভিয়েট ইউনিয়নের সুখ্যাতি, স্প্যানিশ রিপাবলিককে সমর্থন জ্ঞাপন, জাপানী ফ্যাশিস্ত বর্বরতার নিন্দা তিনি কি করে করতে পারতেন? এসব তিনি যথা-সময়েই করেছিলেন। বিশ্বপুঁজিবাদ যখন সাধারণ সঙ্কটের যুগে প্রবেশ করে তখনই রবীন্দ্রনাথের বয়সটা কিছু অধিক হয়ে পড়েছিল।

তারপর রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ও মধ্য জীবনের সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী কন্‌টেন্ট আছে কিনা, সে বিচার রবীন্দ্র গুপ্ত আদৌ করেন নি। তাঁর সমগ্র সাহিত্য জুড়েই রয়েছে অত্যুগ্র ফিউডাল-বিরোধী সমালোচনা ও ভাবাদর্শ যার জন্য সারা জীবন তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কন্‌টেন্টও তাঁর সমগ্র সাহিত্যেই আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রধান প্রধান উপন্যাস, নাটক ও কাব্যগ্রন্থকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা না করে শুধু কয়েকটি বাছাই করা প্রবন্ধের ভিত্তিতে একটা যান্ত্রিক রাজনৈতিক মাপকাঠি প্রয়োগ করে তাঁর সাহিত্যকে ও সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থানকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে মার্কসবাদী বিজ্ঞানের ও শ্রমিকস্বার্থের বিরোধী। রবীন্দ্র-সাহিত্যই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী বাংলা প্রগতি সাহিত্যের চরম বিকাশ, যত অসম্পূর্ণতা ও স্ববিরোধই তার থাক না কেন, মার্কসবাদী বিজ্ঞান এই কথাই বলবে। শরৎচন্দ্র রাবীন্দ্রিক হিউম্যানিজমকেই আর একটু ব্যাপকতর সামাজিক ভিত্তিতে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাকে আরও তীব্রতর ও তিক্ততার সহিত সমালোচনা করেছিলেন এই মাত্র। অন্যদিকে শরৎ-সাহিত্যে পাই শোভিনিজম ও ফিউডাল-প্রতিক্রিয়ার প্রতি নূতন রকমের মোহসৃষ্টি। এইজন্যই শোভিনিস্ট মহল শরৎচন্দ্রকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে খাড়া করতে চেয়েছিল, শরৎচন্দ্রের হিউম্যানিজমটুকু বাদ দিয়ে। শরৎচন্দ্র শ্রমিকশ্রেণীর ধারে কাছে তো আসেনই নি, উপরন্তু 'পথের দাবী' উপন্যাসে

শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে তিনি বুর্জোয়া সুবিধাবাদীদের মতো বিদ্রূপ ও নিন্দা করেছেন। সুতরাং কোন মার্কসীয় বিচারে শরৎ-সাহিত্যকে রবীন্দ্র-সাহিত্যের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে?*

রবীন্দ্রনাথের মতো একজন বুর্জোয়া হিউম্যানিস্টকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান না করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বলা আদৌ মার্কসবাদসম্মত নয়। কেননা মার্কসবাদের মতে বুর্জোয়া হিউম্যানিজমের লক্ষণই হল এই যে তা ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন ও বড় করে দেখে এবং অন্তভের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। তাসত্ত্বেও সোশ্যালিস্ট হিউম্যানিজম নিজেকে বুর্জোয়া হিউম্যানিজমের উত্তরাধিকারী বলে মনে করে। রবীন্দ্রনাথ যে হিউম্যানিস্ট ছিলেন, হিউম্যানিস্ট হিসাবেই তিনি সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, ফ্যাশিবাদ, ফিউডাল জীবনযাত্রার ও ভাবাদর্শের সঙ্কীর্ণতা, শোভিনিস্ট বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদ ইত্যাদির তীব্র নিন্দা করে গেছেন, অসংখ্য কবিতায়, গল্পে ও উপন্যাসে মানুষের মুক্তি-পিপাসাকে ও সৌন্দর্য-পিপাসাকে রূপ দিয়ে গেছেন, মানুষের ব্যক্তিত্বকে মূল্য দিয়ে গেছেন, সর্বপ্রকার ধর্ষণের প্রতি তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করে গেছেন, বিশ্বশান্তির বাণী প্রচার করে গেছেন, ভারতের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে বিশ্ব-মানবের ঐক্যকে প্রচার করে গেছেন, এইসব জিনিস রবীন্দ্র গুপ্তের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। তাঁর সারা জীবনের হিউম্যানিস্ট আদর্শকে পুঁজিবাদী সভ্যতা ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এই বলিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ সমালোচনাকে রবীন্দ্র গুপ্ত রবীন্দ্র-নাথেরই বিরুদ্ধে চালিত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ শেষ-জীবনে নিজেই নিজেকে repudiate (বাতিল) করে গেছেন! এইকি মার্কসবাদী সমালোচনা? এ হল মার্কসবাদকে পরিণত করা ঠিক তার বিপরীত জিনিসে।

* শরৎচন্দ্র নারী-পুরুষের সমানাধিকারে বিশ্বাস করতেন। রবীন্দ্র গুপ্তের এই মত ষোল-আনা ভুল। শরৎচন্দ্র পুরুষের হাতে নারীর লাঞ্ছনা ও অপমানকে মহৎ শিল্পীর মতো ফুটিয়েছিলেন একথা সত্য, কিন্তু শিবানী ও কিছুটা পরিমাণে অভয়া চরিত্র ছাড়া তিনি বিদ্রোহী নারী-চরিত্র আঁকেন নি। তিনি নারীর আত্মসমর্পণ, সেবাপরায়ণতা, আত্মনিগ্রহ ও আত্মহত্যার ছবিই এঁকেছেন। এদিক থেকে শরৎচন্দ্র ছিলেন রীতিমতো প্রতিক্রিয়াশীল।

রবীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেছেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বিরোধিতা করেছেন, রবীন্দ্র গুপ্ত এই কথা বলে রবীন্দ্রনাথকে slander করেছেন। বড় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মহৎ স্বপ্ন ও ভাবাদর্শকে পদদলিত করে ভারতকে চরম সাম্প্রদায়িক বর্বরতার ও নৃশংসতার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে এই কথা বলে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের নগ্নরূপকে উদ্ঘাটিত না করে রবীন্দ্র গুপ্ত রবীন্দ্রনাথকেই দায়ী করেছেন ভারতের বর্তমান বীভৎসতার জন্য। ভারতের বড় বুর্জোয়া নেতৃত্ব যে সমস্ত প্রগতিশীল বুর্জোয়া ভাবাদর্শকেই পরিত্যাগ করছে, এটি রবীন্দ্র গুপ্তের চোখে পড়ল না।

তারপর সাহিত্যবিচার করতে গিয়ে রবীন্দ্র গুপ্তের এটাও নজরে পড়ল না যে অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পরে, বাংলা সাহিত্যে ইউরোপ-আমেরিকার ডিকাডেন্ট বুর্জোয়া সাহিত্যের ফর্ম্যালিজম্, নৈরাজ্যবাদ ও অন্যান্য চরম প্রতিক্রিয়াশীল trend-এর আবির্ভাবের বিরুদ্ধে অত্যন্ত জোরের সহিত রবীন্দ্রনাথ লড়াই করেছিলেন। সেই লড়াইটা প্রগতি সাহিত্যের বিকাশকে সহায়তা করেছিল।

মার্কসীয় বিচারে এই কথাই বলা যেতে পারে যে অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক ভাবধারাতেই বিপ্লবী সাহিত্য রচিত হতে পারত এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ফিউডাল-বিরোধী সাহিত্য উচ্চতর স্তরে উঠতে পারত। নজরুল শ্রমিকশ্রেণীর সামান্য একটু কাছে এসেছিলেন, এবং অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের ঢেউ (যার অঙ্গীভূত ছিল তুর্কীর কেমালিস্ট বিপ্লব ও ভারতের অসহযোগ ও কৃষক-আন্দোলন) তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, এই তাঁর গৌরব। যাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে সাহিত্যে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজন সুকান্তকে দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতির পর্যায়ভুক্ত করা পুরোপুরি অমার্কসীয় ও অবৈজ্ঞানিক। ১৯২৮-২৯ সাল থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৩৩-৩৪ সাল থেকে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কি ভারতের ইতিহাসে শুরু হয় নি? এও কি তবে মায়া? এ যদি মায়া না হয় তবে বলতেই হবে, অক্টোবর সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের পরবর্তী যুগে নূতন স্তরের সাহিত্য, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বমূলক অগ্রণী সাহিত্য রচনা করেছেন—সুভাষ-সুকান্ত-মঙ্গলাচরণ-নন্দী ভৌমিক-সুশীল জানা-সলিল চৌধুরী প্রভৃতি। এ কোনো রসের বা কোনো

ব্যক্তিগত সাহিত্যিকের প্রতিভার বা শিল্পদক্ষতার প্রশ্ন নয়, এটা সাহিত্যের স্তর বিচারের প্রশ্ন। তাই সুকান্তকে দীনবন্ধুর সঙ্গে এক ধারায় ফেলার অর্থ ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে বর্জন করা।

এবং এই যে নূতন স্তরের নূতন সাহিত্য, নয়াগণতান্ত্রিক সাহিত্য, সেটা বিশ্ব-সোশ্যালিস্ট সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। তার ঐতিহ্য শুধু বাঙলাদেশে আবদ্ধ নয়। বিদেশের বুর্জোয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যকেও সে গ্রহণ করবে। তার সর্ব-প্রধান ঐতিহ্য ও সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হবে গোর্কি, ফাদেয়িভ, এরেনবুর্গ প্রভৃতি সোভিয়েট লেখকদের রচনা, নেরুদার কাব্য, লু-সুন, তিং-লিং প্রভৃতির লেখা, ইত্যাদি। কিন্তু একথাও ঠিক যে আজ যে নয়া গণতান্ত্রিক বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সোশ্যালিস্ট সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফিউডাল-বিরোধী সাহিত্যকে উচ্চতর পর্যায়ে তুলতে পারছে তার পিছনে রয়েছে এই সত্য যে বাংলা সাহিত্যেরও একটা বিকাশ ঘটেছে, কন্‌টেণ্ট্, আঙ্গিক, ভাবাদর্শ, সকল দিক থেকে। এবং বুর্জোয়া ভাবধারায়, বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বে, একটা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফিউডাল-বিরোধী বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেই সাহিত্যের cause-টিকেই পূর্ণতর বিকাশের জন্য বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণী নিজের হাতে তুলে নেবে। তাই একদিকে যেমন এই সাহিত্যের পূর্বতন প্রগতিশীল মনীষীদের ও শিল্পীদের শ্রমিকশ্রেণী ঐতিহাসিক স্বীকৃতি ও সম্মান দেবে, অন্যদিকে বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদী ভাবধারায় আজো যাঁরা সাহিত্য লিখছেন তাঁদেরকে শ্রমিকশ্রেণী নির্মমভাবে আঘাত করবে, কেননা তাঁদের সাহিত্য এখন সাম্রাজ্যবাদী-ফিউডাল তাঁবেদার সাহিত্য। বাংলা বুর্জোয়া সাহিত্যের পূর্বতন প্রগতিশীল ঐতিহ্যকে সাধারণ সাহিত্যিকের কাছে তুলে ধরার অর্থই হল আজকের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সেটা হবে একটা হাতিয়ার। মোহ সৃষ্টি নয়, মোহমুক্তির জন্যই এটা একান্ত আবশ্যক।*

* নতুন সাহিত্য, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭, পৃ. ১-২৫; অনিমেষ রায় প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র ছদ্মনাম।—সম্পাদক

প্রগতি সাহিত্যের বিচার-পদ্ধতি ও বাঙলার প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্য-সন্ধান / সনৎকুমার বসু

'মার্কসবাদী'তে বাংলার প্রগতি সাহিত্য ও প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্যের ওপর যে-কটি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে, তাকে কেন্দ্র করে বাঙলার মার্কসবাদী লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা চলেছে। আলোচনার বিষয়টি মোটেই সহজ বা সরল নয়, অতএব এক কথায় বা একটি মাত্র প্রবন্ধে সব কিছু পরিষ্কার হতে পারে না। ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। উপরন্তু, বাংলা সাহিত্যে বা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আগে হয় নি। সেইদিক থেকেও এর প্রয়োজন থেকে গেছে। মনে রাখা দরকার যে এইরকম আলোচনা ও সমালোচনার মধ্যে দিয়েই সাহিত্য বা সমাজের সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের আলোচনাগুলি সব সময় সার্থক আলোচনা হয়ে দাঁড়ায় না। আলোচনার বিষয়বস্তু মাঝে মাঝে গৌণ হয়ে যায় আর যেটা মৌল হয় সেটা হল সমালোচকের নিছক ব্যক্তিগত মত ও রুচিকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা। বলাই বাহুল্য, এরকম ক্ষেত্রে আলোচনার কোনো মূল্যই থাকে না।

আমরা আশা করব যে সমালোচক তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করবার সময় যেন অধৈর্য হয়ে না যান। প্রতিপক্ষের বক্তব্যের জবাব নিশ্চয়ই দিতে হবে কিন্তু তা কোনো মতেই ব্যক্তিগত কুৎসা বা গালিগালাজের দ্বারা নয়। যত্নসহকারে ও যুক্তি দিয়ে প্রতিপক্ষের ভুল দেখানোই সার্থক সমালোচকের কাজ বলে মনে করি।

এখন মূল প্রশ্নে আসা যাক। সমস্যাটা হল এই ধরনের: প্রগতি সাহিত্য বিচারের পদ্ধতিটা কি? এবং বাঙলার প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্য-সন্ধান।

স্পষ্টতই প্রথম প্রশ্নটির সঠিক উত্তর না পাওয়া গেলে দ্বিতীয় প্রশ্নটির কোনো সমাধান সম্ভব নয়। অথচ আজ পর্যন্ত যে কটি প্রবন্ধ এ-বিষয়ে লেখা হয়েছে,

তার আলোচনাতেই এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। ফলে আমাদের আলোচনা ঠিক পথে এগোচ্ছে না।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে আমরা প্রথম প্রশ্নটির ওপর গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করি। এমনকি এটা যে একটা সমস্যা, (যার কোনো আশু সমাধান সম্ভব নয়) আমাদের সমালোচকরা তা মনেই করেন না। অথবা তাঁরা ধরেই নেন যে এর উত্তর তাঁদের পকেটে সবসময়েই থাকে। তাই এ-বিষয়টি তাঁদের দৃষ্টিতে পড়ে না।

আমাদের দেশে সাহিত্য-আলোচনার মূল গলদটি এইখানে। মুশকিলটা আরো বেশী এইজন্য যে মার্কস বা এঙ্গেলস্ নিছক aesthetics-এর ওপর বিশেষ করে কোনো বই লিখে যাবার সময় পান নি। এ-বিষয়ে তাঁদের যে-কয়েকটি লেখা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, সেগুলি সাধারণভাবে চিঠিপত্র অথবা 'বই সমালোচনা'-প্রসঙ্গেই লেখা হয়েছিল। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি আলোচনার মূল সূত্রটিকে ধরাবার অথবা পরিষ্কার করার জন্য লেখা। তাই এই লেখাগুলিকেই এ-বিষয়ের চূড়ান্ত ও শেষ সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখাটা অবৈজ্ঞানিক। উপরন্তু, মার্কস-এর মূল উপপাদ্যের ওপর ভিত্তি করে এগুলিও লেখা হয়েছিল। এবং মূল উপপাদ্যের উপযুক্ত ধারণা না থাকলে সাহিত্য-শিল্পের ওপর মার্কস-এর সঠিক উপলব্ধি অথবা তার প্রয়োগ হওয়া সম্ভব নয়। ফলে, মার্কসবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগ হতে বাধ্য।

প্রগতি সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি কি তা আলোচনা করবার আগে দেখা দরকার সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে সম্পর্কটা কি।

মার্কস বলেছেন, "In the social production which men carry on they enter into definite relations that are indispensable and independent of their will; these relations of production correspond to a definite stage of development of their material powers of production. The sum total of these relations of production constitutes the economic structure of society—the real foundation, on which rise the legal and political super-structures and to which correspond definite forms of social consciousness.......In considering such transformation, the

distinction should always be made between the material transformation of the economic conditions of production which can be determined with the precision of natural science, and the legal, political, religious, aesthetic or philosophic, in short, ideological forms in which men become conscious of their conflict and fight it out."

এই বক্তব্য থেকে শুরু করব আমাদের আলোচনা। কিন্তু আরো এগোনোর আগেই বলে রাখা দরকার যে আমাদের আলোচনার বিষয়গুলি অত্যন্ত জটিল। একটি প্রবন্ধে সমস্যার বিভিন্ন দিক সমানভাবে দেখানো সম্ভব নয়। তাই এই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য প্রগতি সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে যেসব প্রশ্ন সাধারণভাবে মনে জাগে, সেই প্রশ্নগুলিকে তুলে ধরা এবং কোন্ দিকে এর সমাধান, তার আলোচনা করা।

মার্কস-এর উদ্ধৃত লেখাটি তার সম্পূর্ণ পরিপ্রেক্ষিতে পড়লে দেখা যায় যে মার্কস সমাজের কাঠামোর দুটি স্তর ভাগ করেছেন। একটি হল সমাজের মূল কাঠামো, অপরটি তার ওপরের কাঠামো বা Superstructure এবং শিল্প-সাহিত্য বা aesthetics-কে তিনি ঐ ওপরের কাঠামোতে ফেলে তার বিচারে নেমেছেন।

মার্কস্ ও এঙ্গেলস্ বারবার সাবধান করে দিয়েছেন যে সমাজের মূল কাঠামোর অদল-বদলে অর্থনৈতিক factor যেভাবে সরাসরি কাজ করে সমাজের ওপরের কাঠামোয় সেভাবে সরাসরি কাজ করে না। এবং দুটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশ্লেষণে একথা মনে রাখতে হবে। যদি আমরা এইভাবে না চিন্তা করি তবে সার্থক সমালোচনা কখনই হতে পারে না। আলোচনার বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে Marxism is a guide to action and not a dogma.

মার্কসবাদের এই মূল সূত্রটি আমরা যতই ভুলে যাই ততই ঝোঁক পড়ে যায় এর যান্ত্রিক প্রয়োগে। ফলে, সাহিত্য-বিচারে ত্রুটি থেকেই যায়। হয় আমরা সাহিত্য-বিচারে সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধকে প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার না করলেও কার্যত তা করি, নয় সমাজের মূল কাঠামো যে-নীতি অনুযায়ী ভাঙে-গড়ে তাকেই হুবহু লাগিয়ে সাহিত্যের মূল্যবিচার করার চেষ্টা

করি। তখনি শুরু হয় একদিকে সাহিত্যে বাস্তবের কোনো প্রতিফলনের খোঁজ না করার, অন্যদিকে সাহিত্যিকের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতামতের ওপরেই তার সাহিত্যের মূল্য নির্ধারণ করার। বলাই বাহুল্য, সাহিত্যের স্বাধীন মূল্যকে উভয় ক্ষেত্রেই অস্বীকার করা হয়।

সাহিত্য ও সমাজের সম্পর্কটিকে আমরা ঠিকমতো ধরতে পারি না। তাই এত গলদ দেখা যায় আমাদের চিন্তায় ও বিশ্লেষণে।

আসলে, সাহিত্য সমাজ বাদ দিয়ে নয়, অথচ সমাজের মূল কাঠামোর ভেতরেও এর স্বাধীন সত্তা অগ্রাহ্য নয়।

তাহলে সমস্যা ওঠে যে সাহিত্য ও সমাজের মধ্যে যোগসূত্রটা কি? কিসের মারফৎ এ-দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রের যোগাযোগ?

একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে যোগসূত্রটা খুঁজতে হয় সংগঠিত মানুষের সঙ্গত চেতনার প্রকাশে। এই প্রকাশের রূপটা কি? রূপটা হল মানুষের সৌন্দর্যবোধ। তাই সাহিত্যের বিচার হওয়া দরকার সাহিত্যের সৌন্দর্যে। আর সে-বিচার সৌন্দর্যবোধ দিয়েই করতে হয়।

বক্তব্যটি অত্যন্ত জটিল এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। অনেক সমালোচক হয়তো কথাটা শুনেই চমকে যাবেন এবং উপযুক্ত চিন্তা না করেই বলে বসবেন যে এটা "বুর্জোয়া বুলি"।

ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয় এবং একটু পরেই তা প্রমাণ করার চেষ্টা করব। মার্কসীয় সংজ্ঞায় সৌন্দর্যবোধটা Taboo নয়। বরং সৌন্দর্যবোধের অভাবটাই Taboo। তাই মার্কসপন্থীরাই সাহস রাখেন ঘোষণা করবার "insurrection is an art"—অন্য কোনো অমার্কসীয় বিপ্লবীর পক্ষে একথা বলা অসম্ভব।

সৌন্দর্যবোধের শুরু মানুষের চেতনার সক্রিয় বিকাশে। আর এই বিকাশেরও ইতিহাস আছে। কারণ তা স্থিতিশীল নয়।

এই চেতনাবোধের সঙ্গে সামাজিক বিবর্তনের সম্বন্ধ কি? মার্কস বলেছেন, "the mode of production in material life determines the general character of the social, political, and spiritual processes of life. It is *not* the consciousness of men that determines their existence, *but* on the contrary, their social existence determines their consciousness."

অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধেই খুঁজতে হয় চেতনার উৎস। কাজেই মানুষের চেতনা কখনই সমাজ বাদ দিয়ে নয়। শুধু তাই নয়, যে-চেতনার মূলে কোনো সামাজিক তাগিদ নেই সে-চেতনাকে চেতনাই বলা যায় না। যেমন পাগলের প্রলাপ বা তার চিন্তাধারা ; স্বভাবতই তা সুন্দর হতে পারে না।

কিন্তু একথা বলার মানে এই নয় যে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ তার চেতনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুত, এদের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব (**contradiction**) সব সময়েই থেকে যায়, যার ফলে যোগাযোগটাকে দ্বন্দ্বমূলক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা ছাড়া অন্য কোনো সরল পথ থাকে না। এই **contradiction**-কে স্বীকার করতেই হয়। তাকে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া যদি ধরে নেওয়া যায় যে **freedom is the recognition of necessity**, তাহলে এই দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করার প্রশ্ন আসে কোত্থেকে? একে স্বীকার করতে পারলে সাহিত্যের মান তো কমেই না বরং তার পুরো রসাস্বাদ গ্রহণ সম্ভব হয়।

বলাই বাহুল্য, কথাটি শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সমাজের ওপরের কাঠামোর বেলায়ও সমগ্রভাবে খাটে।

কোন সাহিত্যকে প্রগতিশীল বলব, তার উত্তরে অনেক মার্কসবাদীরা (?) একটি চটকদারি জবাব দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, যে-সাহিত্য আমাদের শ্রেণীসংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যে-সাহিত্য পাঠ করে সাধারণ কৃষক-মজুর তাঁর নিজের আন্দোলন সম্পর্কে আরো সচেতন হন এবং কাজের প্রেরণা পান, সেই সাহিত্যই প্রগতিশীল, বাকি সব কিছু পড়ে প্রতিক্রিয়াশীল অংশে এবং তা আমাদের বর্জনীয়।

কথাটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোনো গলদ নেই। খুব ঠিক কথাই ; কিন্তু সমালোচনার পক্ষে এ উত্তর কোনোভাবেই সাহায্য করে না। কারণ, এতে আমাদের সমস্যার কোনো সমাধান নেই বরং সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তোলে।

একথা বলা সত্ত্বেও আমাদের মূল প্রশ্ন থেকেই যায়, কেবল প্রশ্নের **form** পাল্টে যায়। যদি প্রশ্ন তোলা যায় কোন্ সাহিত্য আমাদের বিপ্লবের কাজ এগিয়ে দেয়, তাহলে বাধ্য হয়েই বলতে হবে নাকি আবার সেই পুরোনো

কথা—যে সাহিত্য প্রগতিশীল ?

কাজেই এ-ধরনের জবাবের কোনো দাম নেই। অন্তত সমালোচনার দিক থেকে—উপরন্তু কাজে বাধা সৃষ্টি করে। গত দু'বছর যাবৎ এই পথে সাহিত্য-সমালোচনা চালানোর ফল কি হয়েছে, আজ তা প্রত্যেকটি সৎ সাহিত্যিকের চিন্তা করা দরকার।

তাছাড়াও শ্রেণীসংগ্রাম কথাটার মানে অনেক ব্যাপক। সংগ্রাম তো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়—মানুষের প্রত্যেকটি কর্মক্ষেত্রেও তা ছড়িয়ে। যার ফলে বর্তমান শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সমস্ত মানুষের aesthetic চেতনা সমান স্তরে নয়। শুধু aesthetic কেন, কোনো চেতনাই সমান স্তরে থাকতে পারে না। কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সমস্ত শ্রেণীর পরিপূর্ণ বিকাশ একযোগে হওয়া সম্ভব নয়।

কাজেই যখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর চেতনা বিভিন্ন স্তরে, তখন এই সমাজেই সর্বজনগ্রাহ্য কোনো সাহিত্য বা শিল্প তৈরী হওয়া কি করে সম্ভব? উৎপীড়ক শ্রেণীর কথা বাদ দিলেও উৎপীড়িত শ্রেণীর মধ্যেও চেতনার বা understanding-এর তারতম্য—কখনও বা গুণগত প্রভেদ থেকে যায়। সেখানে একটিমাত্র মাপকাঠি বানিয়ে সাহিত্যের গুণাগুণ বিচার করতে যাওয়া মানে একটিমাত্র শ্রেণীর চেতনাকে স্বীকার করা, যা অসম্ভব। উপরন্তু, একটি শ্রেণীর মধ্যেও ঐ তারতম্য থাকতে বাধ্য। কাজেই এভাবে বিচার করা যায় না।

প্রশ্নটি আরো জটিল হয়ে দাঁড়ায় কবিতার ক্ষেত্রে, যেখানে কবির বক্তব্যকে গ্রহণ করতে হয় কবিতার মাধ্যমেই, অন্য কোনোভাবে নয়। কবিদের ভাব প্রকাশের একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে, যা আজকের সমাজে কখনই সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না। কাজেই, কবিতা-বিচারের সময় সমালোচকদের একথা মনে রাখা দরকার। অথচ তা প্রায়ই হয় না। আমাদের কবিতা-বিচারে, যার ফলে কোনো একটি কবিতাকে "বোঝা গেল না" বলে আমরা প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে থাকি, আবার কোনো একটি কবিতায় সরাসরি শ্রেণীসংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছে বলেই তার সাহিত্যিক গুণাগুণ বিচার না করে শ্রেষ্ঠ কবিতার আসনে বসাই। প্রথমোক্ত কবিতা-বিচারে আমরা একবারও চিন্তা করি না যে "বোঝা গেল না" বলতে কাদের কথা হচ্ছে। সব কবিতা

সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় এবং তা না হলেও যে সেটি সার্থক কবিতা হতে পারে, এটি অনেক সমালোচক বুঝতে পারেন না। কবিতার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পরে হবে।

অতএব এই দিক থেকে সাহিত্য-বিচার করা যায় না। এখন ফিরে আসা যাক্ আমাদের মূল কথায়।

সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক বিশ্লেষণে আমরা সৌন্দর্যবোধের কথা তুলেছি এবং বলেছি যে সাহিত্য-বিচারের একমাত্র কষ্টিপাথর হল সাহিত্যের সৌন্দর্য যা সার্থক সাহিত্যের সৃষ্টি করে। এবং এই সার্থক সাহিত্যই প্রগতিশীল সাহিত্য। সার্থকতাই সাহিত্যের প্রগতিশীলতার মাপকাঠি। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যাক।

সৌন্দর্যবোধ বলতে কি বোঝা যায়? তার criterion কি? সমাজের মূল কাঠামোর বা সমাজব্যবস্থার সঙ্গে তার সংযোগটা কোথায়? এই প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।

সমাজব্যবস্থার রূপান্তরে মানুষের চেতনারও রূপান্তর ঘটে। উন্নত সমাজ-ব্যবস্থার একটি পরিচয় মানুষের চেতনার উন্নততর বিকাশে। আদিম যুগে মানুষের চেতনার যখন কোনো প্রকাশ হয় নি, তখনো তাকে সংঘবদ্ধ হতে হয়েছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই সংঘবদ্ধ সংগ্রামই তার চেতনার বিকাশের প্রথম উৎস ছিল। তাই চেতনার কথা বলা মানেই মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব স্বীকার করা। সমাজ বাদ দিয়ে চেতনার কোনো প্রশ্নই উঠে না। Marx বলেছেন, by acting on nature and changing it, man changes his own nature; দ্বিতীয় nature কথাটির যদি কোনো ঐতিহাসিক অর্থ থাকে, তবে তা মানুষের চেতনার স্বীকৃতি যা প্রতি মুহূর্তে তাকে প্রকৃতির নতুন রূপ আবিষ্কার করতে সাহায্য করছে। মানুষের চেতনার সঙ্গে প্রকৃতির ক্রমাগত ঘাতপ্রতিঘাতই মানুষকে ক্রমশ উচ্চস্তরে এগিয়ে দিচ্ছে। এবং এই অগ্রসরের পথে তার চেতনারও রূপান্তর ঘটছে।

For not only the five senses but also the so called intellectual and practical senses (will, love etc.) in a word human senses and the humanity of senses, come into being as a result

of the existence of man's object, as a result of humanised nature..., The formation of the five senses is the work of the entire history of the world up to now. Senses limited by crudely practical needs have only a narrow meaning. [Lit & Art, P 16]

চেতনার বিশ্লেষণে মানুষ কখনই শুধু মাত্র subject হিসাবে দেখা দেয় না। আর প্রকৃতিও (nature) শুধুমাত্র object হয়ে থাকে না। চেতনার স্বীকৃতি মানেই প্রকৃতিকে subjective object বলে স্বীকার করা। কারণ, এখানে subject এবং object পরস্পর polar opposite থাকে না। উপরন্তু, এই দুই-এর মধ্যে খানিকটা পরিমাণে interpenetration হয়।

সুতরাং চেতনার উপাদানটা objective হলেও তার উপলব্ধিটা হল subjective. আবার যেহেতু objective উপাদান থেকে subjective উপলব্ধিতে পৌছুতে হলে একটি process-এর ভেতর দিয়েই পৌছানো সম্ভব, objective উপাদানের পরিবর্তনে, সেই process-এর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাঁচার তাগিদেই মানুষ সমাজ গড়েছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। সংগ্রামের রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন হয়। তার ফলে সমাজ ও ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধটা ক্রমশ জটিল হয়ে দাঁড়ায়। আর এই জটিল সম্বন্ধটিও মানুষের চেতনার বিকাশে সক্রিয় ভাবে কাজ করে। সুতরাং সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চেতনারও পরিবর্তন হতে বাধ্য। বিশেষ বিশেষ সামাজিক সংঘাতে, সামাজিক তাগিদে বিশেষ বিশেষ চেতনার উদয়। চেতনার ব্যাপ্তি, চেতনার সমৃদ্ধি তাই সামাজিক ব্যাপ্তি, সামাজিক সমৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত।

সামাজিক পরিবর্তনের মূলে সব সময়েই আছে অর্থ নৈতিক factor এবং যেহেতু সামাজিক পরিবর্তনে চেতনারও পরিবর্তন হয়, তাই চেতানার ইতিহাসেও অর্থ নৈতিক factor থেকে যেতে বাধ্য। কিন্তু এই যে কার্যকারণ সম্বন্ধ, এটা সব সময় প্রত্যক্ষ থাকে না। আদিম যুগের চেয়ে আজ এই সম্বন্ধ অনেক বেশী পরোক্ষ। শুধু তাই নয়, সমাজের মূল কাঠামোর মধ্যে এই সম্বন্ধটি এক-তরফা নয়। যদি তা হতো তবে মানুষ নিছক সামাজিক ইতিহাসের পুতুল হয়ে থাকত। ইতিহাসকে পরিবর্তন করার কাজে তার কোনো দায়িত্বের প্রশ্নই উঠত না।

অতএব চেতনার যে-স্বাধীন ইতিহাস, তার সৃষ্টি বা শুরু সামাজিক ব্যবস্থার একটি অবশ্যম্ভাবী তাগিদে। আবার যখন সেই স্বাধীন ইতিহাসের পরিণতি হয় ওই তাগিদ পূরণেই, তখনই তা সার্থক চেতনার পরিচয় হয়ে উঠে; তখনই ব্যক্তির মানসপটের স্বাধীনতা রূপান্তরিত হয়ে সামাজিক চৈতন্যে পরিণত হয়—সেইখানেই তার সামাজিক দায়িত্বের সার্থক পূরণ, সেইখানেই একজন individual social individual হয়ে ওঠেন আর চেতনার সমন্বয় হয় সমাজের সঙ্গে—যাকে বলা যায় dialectical unity through conflict.

Superstructre বা ভাবজগতেরই একটি বিশিষ্ট বিকাশ শিল্পে, সাহিত্যে বা কাব্যে। তাই সমাজের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন শিল্প-সাহিত্যে পড়তে বাধ্য। এই প্রতিফলনের যথার্থ বিশ্লেষণ কাম্য। আমাদের আলোচনার কাজে এর চেয়ে গুরুতর বিষয় আর কিছুই নেই।

আগেই বলা হয়েছে যে Superstructure-এর সৃষ্টি social structure-এর তাগিদে। আদিম যুগে এই দুই জগতের মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের মধ্যে division of labour যতই স্পষ্ট হয়ে দেখা দিতে থাকে, এই দুই জগতের মধ্যে ব্যবধানও ততই বাড়তে থাকে। এদের কার্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে থাকে। এমনকি আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে এদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধই নেই। তাই আমরা দেখি যে বুর্জোয়া সমালোচক সাহিত্য-সমালোচনা করতে নামেন সমাজকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই, তাঁদের কাছে ভাবজগতের আলোচনায় বা ব্যাখ্যায় সামাজিক কাঠামোর কোনো দামই নেই। আবার অনেক materialist সমালোচক superstructure-এর ব্যাখ্যায় তার কোনো স্বাধীন রূপই খুঁজে পান না। তাঁদের চোখের সামনে সব সময়েই ভাসতে থাকে সামাজিক কাঠামোর অর্থনৈতিক factor। এই দুই ধরনের চিন্তার মধ্যেই বিচ্যুতি থেকে যায়, তা বলাই বাহুল্য।

ভাবজগতের বিভিন্ন রূপগুলির বিকাশের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। একথা স্বীকার করলেও মানতে অসুবিধা হয় না যে এই স্বাধীন ইতিহাস সবসময়েই ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে সমাজের ইতিহাসের ওপর।

তাহলে ভাবজগতে শ্রেণীসংগ্রাম খুঁজতে হবে কোন পথে? খুঁজতে হবে ভাবজগতের সৃষ্টির ভেতরেই। শ্রেণীসংগ্রামের রূপ এক নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার রূপ বিভিন্ন। সামাজিক বিশ্লেষণে অর্থ নৈতিক factor কাজ করে

একরকম ভাবে—আর ভাবজগতে আর একরকম ভাবে। এখানে "দুই-এ দুই-এ চার" নীতি প্রযোজ্য নয়—আমাদের একথা মনে রাখা দরকার।

মানুষের চেতনা ও তার সমাজের সঙ্গে সম্পর্কটা মোটামুটি আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এখন প্রশ্ন হল এই যে চেতনার ইতিহাসের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের সংযোগটা কোথায়।

সৌন্দর্যবোধটাও মানুষের সামজিক বিকাশের একটি অঙ্গ। কারণ চেতনার বিকাশ, তার বিস্তারে বা প্রসারেই সৌন্দর্যবোধের বিকাশ, বিস্তার বা প্রসার। মানুষ কল্পনায় যে-জগৎ সৃষ্টি করে, তার উদ্দেশ্য এই কল্পনার জগতে তার বাস্তব জীবনের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেবার ইচ্ছা। এবং যেহেতু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব সময়েই এক থাকে না—বিশেষ সামাজিক পরিবেশে, বিশেষ ধরনের আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, তাই ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে আশা-আকাঙ্ক্ষার গুণগত পার্থক্য থাকে। মানুষের সমাজ যতই উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়, ততই সেই সমাজের কাঠামো complex হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই সমাজের complexity-র পরিণতি হিসাবে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাও complex হতে বাধ্য। শুধু তাই নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাও বিভিন্ন এবং স্বভাবতই তাকে রূপ দেবার ইচ্ছাটাও বিভিন্ন।

তাই বিভিন্ন ধরনের চেতনার সমাবেশ লক্ষ্যণীয় শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ভাব-জগতের ইতিহাসে। তাই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের শিল্প-সাহিত্য।

এই যে রূপদানের ইচ্ছা, এইটাই হল সৌন্দর্যবোধের উপাদান। এবং সার্থক রূপদান ও তার উপলব্ধিই হল সৌন্দর্যবোধের পরিচয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হয় যে রূপদানের উপাদান সামাজিক হলেও তার প্রকাশ শিল্পীর ব্যক্তিগত পারদর্শিতায়। সুতরাং সার্থক শিল্পে শিল্পীর পারদর্শিতাই প্রধান factor, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

একই কারণে শিল্পের বা সাহিত্যের রস উপলব্ধিতে সবচেয়ে বড় কথা হল পাঠকের subjective conciousness. শিল্প objective হলেও তার উপলব্ধি subjective, সুতরাং সাহিত্যের রসাস্বাদনে পাঠকেরও দায়িত্ব থাকে। তবে যেমন শিল্পী objective উপাদানকে গ্রহণ করেন unconscious হয়েই, তেমনি, পাঠকের কাছেও তার রসাস্বাদন হয় unconscious ভাবে।

সুতরাং এই subjective consciousness-এর উপযুক্ত গুরুত্ব না দিলে aesthetics-এর আলোচনা বা তার রসাস্বাদ গ্রহণে অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাহিত্য-আলোচনায় আমরা সব সময়েই সাহিত্যিকের কর্তব্য বা তাঁর দায়িত্বের কথা স্মরণ করাতে ব্যগ্র থাকি। অথচ সাহিত্যপাঠে পাঠকের দায়িত্বের কথা আমাদের মনে থাকে না। আমরা ধরে নিই যে, যে-ব্যক্তি সাহিত্য পাঠ করেন, তাকেই পাঠক বলা চলতে পারে। সাহিত্যিক এবং পাঠক দুজনেরই কর্তব্য আছে। শিল্পের একদিকে যেমন শিল্পী, অন্যদিকে তেমনি পাঠক; এবং এই দুইজনের মনের সার্থক আদান-প্রদানেই শিল্পের সার্থকতা।

সাহিত্যের আলোচনায় প্রথমেই লক্ষ্যণীয় যে সাহিত্যের বিভিন্ন form আছে, যেমন নাটক, নভেল, কবিতা, ছোটগল্প ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি form-এরই বৈশিষ্ট্য আছে। একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উদ্দেশ্য এক: সার্থক সাহিত্যই হল সেই সাহিত্য—তার form যাই হোক না কেন—যা আমাদের চেতনাকে বিস্তৃত করে সমাজের বিভিন্ন সমস্যাকে আরো স্পষ্ট করে তোলে অথবা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করে, যার ফলে আমাদের সচেতন মন প্রকৃতির সৌন্দর্যকে আরো বেশী appreciate করতে পারে। [মার্কস এই process-কেই humanised nature বলেছেন] সার্থক সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক জীবনের বা প্রকৃতির যোগাযোগ মোটামুটি এই ধরনের। এবং সৌন্দর্যবোধ বলতেও সাধারণভাবে এই কথাই বোঝা যায়।

সৌন্দর্যবোধের বিশ্লেষণে "সার্থক রূপদানের" কথা বলা হয়েছে। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে এই কথাটির যথেষ্ট তাৎপর্য আছে। কারণ, এখানে সামাজিক চেতনা বলে কোনো এক বিশিষ্ট চেতনা নেই। চেতনা মাত্রেই কোনো একটি শ্রেণীর চেতনা হতে বাধ্য। [তবে কখনো সেটা প্রত্যক্ষ-ভাবে প্রকাশ পায়, আবার কখনো বা পরোক্ষভাবে]। এবং যেহেতু এ-সমাজের মূল কাঠামোয় শ্রেণীসংঘাত অবশ্যম্ভাবী, তাই চেতনার জগতেও সংঘাত অনিবার্য। আবার ঠিক একই কারণে বিভিন্ন চেতনার রূপদানের ধারাও বিভিন্ন।

স্পষ্টতই সব রূপদানই সার্থক হয় না। কারণ যে-রূপদান সমাজের অগ্রগতিকে থামিয়ে দেবার জন্তে স্বষ্টি হয়, তা আমাদের প্রগতির দিক থেকে কাম্য নয়। তাই সেই রূপদানকে সার্থক রূপদান বলতে পারি না। আর সেইজন্তই সব সাহিত্যই সার্থক সাহিত্য হয় না। এবং আগেই বলা হয়েছে সার্থক সাহিত্যই প্রগতিশীল সাহিত্য।

স্বতরাং প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য-বিচারে আমাদের পদ্ধতি ঠিক করতে হলে উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখতে হয়। প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের মূল লক্ষণগুলি তা 'হলে কি? সংক্ষেপে বলতে গেলে, যে-সাহিত্য সমাজ-ব্যবস্থার মূল গলদগুলি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে না বা গলদগুলি কাটাবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করে না, যে-সাহিত্য দেশের উৎপীড়িত জনগণের মনের কথা বা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পারে না, এককথায় যে-সাহিত্য উৎপীড়িত শ্রেণীর চেতনাকে সর্বাঙ্গভাবে বিস্তার করে না, সেই সাহিত্যই প্রতিক্রিয়াশীল।

কিন্তু বলা বাহুল্য, এই প্রতিক্রিয়া বা প্রগতির মাপকাঠিতে সবচেয়ে বড় factor হল দেশ, কাল ও কায়েমী সমাজব্যবস্থার বিশেষ ধারা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার না করলে, কোনো মতেই সাহিত্যের গুণাগুণের উপযুক্ত বিচার সম্ভব নয়।

মার্কস প্রশ্ন তুলেছিলেন, সার্থক সাহিত্য যুগধর্ম-নির্বিশেষে আমাদের আনন্দ দেয় কেন?—প্রাচীন গ্রীক্ সমাজের দাসপ্রথা আজ নিন্দনীয় হলেও ঐ সময়েরই রচিত গ্রীক্ নাটক আজো কেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আসনে? এ-প্রশ্নের সঠিক উত্তর তিনিই দিতে পেরেছিলেন—মানুষের চেতনার ও সৌন্দর্য-বোধের Continuous development-এই এর উত্তর। সার্থক সাহিত্যের স্বষ্টির মূলে স্থান কাল ও সামাজিক ব্যবস্থার যথেষ্ট অবদান থাকলেও তা এদের নিছক করুণার পাত্র নয়। তাই এই উপাদানগুলির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয় না। বরং আরো বেশী দৃঢ়ভাবে মানুষের মনে গেঁথে থাকে। এবং যুগে যুগে এরাই সার্থক সাহিত্যের ঐতিহ্য বহন করে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হয় যে, যেহেতু আজকের সমাজের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক্-সমাজের কোনো মিল নেই, তাই আজকের সমাজে ওই সময়ের সাহিত্যের objective উপাদানগুলি পাওয়া সম্ভব নয় এবং তাই আজ আর

ঐ গ্রীক্ নাটক সৃষ্টি হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন মনে আসে। সাহিত্য সৃষ্টি যেমন স্থান, কাল ও সমাজব্যবস্থা বাদ দিয়ে হতে পারে না, তেমনি সাহিত্যের রসাস্বাদনে এই উপাদানগুলির কোনো influence আছে কিনা।

আমার ধারণা যে এদের influence যথেষ্ট আছে। কারণ, গ্রীক্ নাটক রচনাকালে, প্রাচীন গ্রীক্‌গণের চেতনা বা সৌন্দর্যবোধ একটি বিশেষ পর্যায়ে ছিল। আজ সেই পর্যায়ে নিশ্চয় নেই। সুতরাং ঐ সময়ের নাটক সমসাময়িক গ্রীক্‌দের কাছে যেভাবে গৃহীত হতো আজ সেভাবে হতে পারে না। অবশ্যই এতে গ্রীক নাটকের মূল্য কমে নি বরং আজ তা অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাহিত্যের বিভিন্ন formগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি form-এর পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমে আসা যাক উপন্যাসের প্রসঙ্গে। দুঃখের বিষয় এখানেও বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। আগের মতোই মূল আলোচনার কাঠামো দাঁড় করানো ছাড়া আর বেশী এগোনো যাবে না।

সার্থক উপন্যাস বলতে কি বোঝায়? সার্থক উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান মাপকাঠি হল উপন্যাসের realism-এ এবং realism বলতে মোটামুটি যা বুঝি তা হল: ১) উপন্যাসের চরিত্রগুলির সমাবেশ হওয়া দরকার বাস্তব সামাজিক দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ২) এই বাস্তব দ্বন্দ্ব বিচার করতে হবে স্থান, কাল ও ঘটনার সংযোগে। ৩) চরিত্রগুলি সাধারণভাবে সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র হওয়া প্রয়োজন। কারণ তা নাহলে পাঠকের মনকে নাড়া দিতে সক্ষম হয় না। শিল্পী যদি নিজের ইচ্ছামতো চরিত্র আঁকেন, তা হলে সে-চরিত্রগুলি আমাদের সহানুভূতি জাগায় না। তাই এক্ষেত্রে শিল্পীর দায়িত্ব পালন হয় না। ৪) সবশেষে চরিত্রগুলিকে এমন করে আঁকতে হবে যেন বাস্তবের সঙ্গে তার মিল থাকে। শেষ বক্তব্যকে একটু পরিষ্কার করা দরকার।

মনে করা যাক, একটি কারখানার ধর্মঘটের ভিত্তিতে একটি গল্প লেখা হল। আজকের দিনে এই ধর্মঘটের রাজনৈতিক তাৎপর্য কারখানার সমস্ত শ্রমিকের কাছে সমান নয়। এইটাই হল বাস্তব ঘটনা। সুতরাং সেখানে একজন কম্যুনিস্ট শ্রমিকের চরিত্র যেভাবে আঁকা হবে, তাঁর বক্তব্য যে-পরিমাণে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন থাকবে, নিশ্চয় একজন সাধারণ শ্রমিকের বক্তব্যে

তা থাকবে না। সাধরাণ শ্রমিক ধর্মঘটে যোগদান করেন নিছক তাঁর দাবীদাওয়া আদায় করার জন্য, তিনি তাঁর সবকিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই ধর্মঘটে যোগ দেন। এইরকম বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, তাঁর পাশের অপেক্ষাকৃত সচেতন বন্ধুর দৈনন্দিন সাহচর্যেই তিনি নিজেও ক্রমশ রাজনৈতিকচেতনা অর্জন করেন।

সুতরাং যখন এ-ধরনের plot নিয়ে শিল্পী গল্প লিখবেন, তখন এই সমস্ত কথা মনে রেখেই তাঁকে অগ্রসর হতে হবে। তাহলেই হতে পারে সার্থক realism। এ-সাহিত্য কখনই বাতাসে সৃষ্টি হতে পারে না। তারজন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের প্রতি শিল্পীর সহানুভূতি, বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠ নাড়ীর যোগাযোগ। এ-যোগাযোগ কেমন করে সম্ভব তা উপদেশ দিয়ে বলা যায় না। এখানে শিল্পীকে তাঁর নিজের চেষ্টাতেই পথ করে নিতে হয়। এবং সে-পথ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী না হয়েও বার করা সম্ভব।

উপন্যাসের realism নিয়ে প্রফেসর লুকাস Masses & the main stream-এর ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সংখ্যায় একটি সুন্দর আলোচনা করেছেন। সেখানে Flaubert, Zola ও Tolstoy-কে পাশাপাশি রেখে তিনি তাঁর আলোচনা চালিয়েছেন। পাঠককে ঐ প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি।

অনেকে Tendentious উপন্যাসের কথা তোলেন। আমার ধারণা উপন্যাসের realism-এর যে-কাঠামোর কথা ওপরে বলা হল tendentious লেখাগুলিও সেই কাঠামোতেই পড়ে। তারজন্য বিশেষ উল্লেখ অপ্রয়োজনীয়; Positive Hero র যে-প্রসঙ্গ অনেক সমালোচক তুলেছেন, তাও ঐ tendentious লেখার একটি দিক এবং সেখানেও নতুন কিছু বলার দরকার হয় না। Realism-এর সঠিক ধারণা থাকলে এ সমস্যাগুলির সমাধান সহজ।

একই কারণে Socialist Realism ও Critical Realism-এর মধ্যে তর্কের বিশেষ অবকাশ নেই বলে মনে করি। ধনতান্ত্রিক সমাজে যা Critical Realism, সোভিয়েট সমাজে তাই Socialist Realism হয়ে দাঁড়ায়। এখানে মূল প্রভেদটা realism-এ নয়—সমাজ-ব্যবস্থায়। তাই দুটি ক্ষেত্রে realism-এর প্রকাশের ভঙ্গিটা পৃথক। তাই অযথা এদের মধ্যে ব্যবধান টানা অবৈজ্ঞানিক।

উপন্যাসের সার্থকতা আর কবিতার সার্থকতা এক মাপকাঠি দিয়ে বিচার

করা যায় না। কারণ উপন্যাসের ধর্ম আর কবিতার ধর্ম এক নয়। তাই মানুষের প্রথম সাহিত্যিক বিকাশ হয় কবিতার মাধ্যমেই। উপন্যাসের সৃষ্টি অনেক পরের যুগে।

কবিতার সৃষ্টির আদিযুগের কথা কডওয়েল অত্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর "Illusion & Reality"-তে।

কবিতা আলোচনায় অনেক সমালোচক কবিতার বক্তব্যকে নিছক paraphrase করেই তার গুণাগুণের বিচারে নামেন। এ-ধরনের আলোচনা অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। তার সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই। কারণ কবিতার সার্থকতা নিছক paraphrasing নয়। paraphrasing-এর প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু তা গোড়ায় নয়, শেষে।

আসল প্রশ্নে আসা যাক, সার্থক কবিতা কেন আমাদের মনকে দোলা দেয়, কেন আমরা তা পাঠ করে আনন্দ পাই? অথবা সব কবিতাই কেন আমাদের উদ্দীপ্ত করে না? কবিতার প্রয়োজনীয়তা কি এবং কেন মানুষের প্রথম কাব্যিক বিকাশ কবিতায়?

আমরা চেতনার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছি যে চেতনার উদয় মানুষের নিছক বাঁচার তাগিদ থেকে।

কবিতার সৃষ্টি এই চেতনারই একটি বিশিষ্ট প্রকাশে। আদিম যুগে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজে সচেতন করাই ছিল কবিতার আদি উদ্দেশ্য। মানুষের সাধারণ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামগ্রিকভাবে রূপ দেবার প্রয়োজনীয়তা মানুষ যখন অনুভব করে, তখনই সে সৃষ্টি করে ভাষার, আবার সেই ভাষারই সার্থক প্রয়োগ হয় কবিতায়। কারণ কবিতার ছন্দ, বিভিন্ন শব্দের বিশেষ সংযোগ মানুষের মনে বিশেষ ভাবের সঞ্চার করে। সাময়িকভাবে হলেও কবিতা-পাঠের সময় মানুষ তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবকে ভুলে যায়। কল্পনায় আর এক নতুন জগতের সৃষ্টি হয়, সে-জগৎ তার মনের অতৃপ্তিকে পূরণ করে। তাই সে কবিতাপাঠে এত আনন্দ পায়। শুধু তাই নয়, তার ভাবজগতের বা মননের এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে, যে-পরিবর্তন তার সামগ্রিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করে, বিস্তৃত করে। এইখানেই কবিতার সার্থকতা। কেন কবিতা এ-কাজ করতে সক্ষম হয়, তার কারণ, কবির রূপদানের কৃতিত্ব। কবিতার ভাষায় বাস্তবকে

রূপান্তরিত করা হয় abstraction-এ। অথবা Aristotle-এর কথায় বলা যায় fact-কে রূপান্তরিত করা হয় vision-এ। কবিতার সার্থকতা এই vision-এ। তাই কবিতার ধর্মই হল abstraction; কারণ vision তো এছাড়া আর কিছু নয়।

Fact যখন vision-এ পরিণত হয়, মনকে উদ্দীপ্ত করার দিক থেকে তখন তার মূল্য অনেক বেশী, কারণ তখন fact এর "particular" সত্তা পরিণত হয় তার universal সত্তায়; যার ফলে সময়ের বা সমাজের পরিবর্তন হলেও কবিতার মৃত্যু হয় না; তা মানুষের বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যেও universal সত্তার সঙ্গে খাপ খায়। এইজন্যই কডওয়েল কবিতাকে non-symbo বলেছেন। বলা বাহুল্য, বিভিন্ন অবস্থায়, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ধরনের কবিতা সৃষ্ট হওয়া অবশ্যম্ভাবী কিন্তু কবিতার function সব সময়েই মোটামুটি এক এবং তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

তাহলে কবিতার সঙ্গে উপন্যাসের তফাৎটা কোথায়? তাদের সাদৃশ্য খোঁজা অপেক্ষাকৃত সহজ। [আলোচনার প্রথম অংশে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে।]

তফাৎটা প্রধানত Time factor-এ। কবিতায় এই factor প্রায় non-existent। আর উপন্যাসে এইটাই হল প্রধান কথা।

উপন্যাসে একটি সম্পূর্ণ নতুন জগতের সৃষ্টি হয় যা বাস্তব জগতের এক বিশেষ ছোট সংস্করণ। হয় সেখানে পাঠক নিছক দ্রষ্টা হয়ে ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত অনুসরণ করে চলেন অথবা কোনো একটি বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে ঐ চরিত্রের সঙ্গে নিজেও অচেতনভাবে ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে আনন্দ পান। তাই উপন্যাসের সার্থকতা বাস্তবের সঙ্গে তার যথার্থ সংযোগে।

অথচ কবিতায় পাঠক সাময়িকভাবে কবির জায়গা দখল করে বসেন। কবির প্রতিটি অনুভূতি, স্পন্দন তিনি নিজেও উপলব্ধি করেন। এবং এই উপলব্ধির ক্ষেত্র তার চেতনায় বা তার abstraction-এ। সুতরাং সেখানে সময়ের কোনো প্রশ্নই থাকে না। তাই উপন্যাস সৃষ্টি হয়েছে সমাজের বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে আর কবিতা তার অনেক আগে, ভাষা সৃষ্টির প্রথম যুগেই।

মানুষের সত্তায় দুটি দিক আছে। একটি তার সামাজিক সত্তা, অন্যটি তার

নিজস্ব স্বাধীন সত্তা। এ দুটি দিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হলেও তাদের মধ্যে antagonism সব সময়েই অবশ্যম্ভাবী নয়। [এখানে স্মরণ করানো দরকার যে দ্বন্দ্ব বা contradiction মানেই antagonism নয়।]

কিন্তু সে যাই হোক শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এই দ্বন্দ্বে antagonism থাকা অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং কবির ভাষার মধ্যে এই antagonism থাকতে পারে। অর্থাৎ সব কবির ভাষাই পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হবে এমন কোনো কথা নেই। শুধু সেই ভাষাই গ্রাহ্য, যা কেবলমাত্র কবির নিজের চেতনারই প্রকাশ নয়—তার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চেতনাকেও রূপ দেয়। এইখানেই কবির সামাজিক দায়িত্ব। সুতরাং যে-প্রতীকের মারফৎ কবিতা সৃষ্টি হয় সে-প্রতীক যদি পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হয়, তবেই সার্থক কবিতা সৃষ্টি হতে পারে। অন্যথায় কবি নিজেই আনন্দ পেতে পারেন তাঁর কবিতা পড়ে, পাঠকের কাছে তার কোনো মূল্য থাকে না। স্বভাবতই এরকম কবিতাকে সার্থক কবিতা বলা যায় না।

কিন্তু পাঠক কথাটি বড় জটিল। আগেই বলেছি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সব শ্রেণীর চেতনা বা understanding সমপর্যায়ে নয়। সুতরাং একটি কবিতা সকলকে আনন্দ দিতে পারে না। কবিতার প্রতীক বিভিন্ন শ্রেণীর কাছে বিভিন্ন অর্থ বহন করে। সুতরাং সার্থক কবিতা হলেই যে সর্বজনগ্রাহ্য কবিতা হবে এমন নয়। আবার সর্বজনগ্রাহ্য না হলেই যে সার্থক কবিতা হয় না, তা বলা যায় না।

তাই কবিতার গুণাগুণ বিচার করতে হলে মুখ্যত লক্ষ্য করতে হয় কবিতার সৌন্দর্যের। সেখানেই কবিতার সার্থকতা।

কবিতার আলোচনায় mythology-র উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ, মানুষের প্রথম aesthetic সৃষ্টি mythology, যা প্রকাশ পেয়েছিল কবিতার মাধ্যমে। তাই aesthetic চেতনা বিকাশে বা তার সামাজিক অবদানে mythology-র প্রচণ্ড দাম। তাছাড়া, mythology-র সৌন্দর্য আজও আমাদের মুগ্ধ করে। আর তাই আজও তার রূপক আমাদের কবিতায় আসে।

Mythology সৃষ্টির মূলে মানব-সভ্যতার শৈশবের প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা, যা কখনো তার মনে ভয়ের সঞ্চার করত আবার কখনো বা সেই

ভয় থেকেই জাগত বিরাট শ্রদ্ধা। প্রকৃতির সৃজন বা নাশন-শক্তি তার মনে এনে দিত বিরাট বিস্ময়। তাই এই শক্তির বিভিন্ন রূপগুলিকে তার কল্পনায় প্রাণবন্ত করে সৃষ্টি করত অসাধারণ চরিত্রের, সৃষ্টি করত mythology। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের যে-সংগ্রাম, সে-সংগ্রামের দুই পক্ষকেও কাল্পনিক জগতে রূপান্তরিত করা হতো অসাধারণ অথচ প্রাণবন্ত চরিত্রে। এবং এই কাল্পনিক সৃষ্টি বা মায়া (illusion) তার দৈনন্দিন বাস্তব সংগ্রামকে চালিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা দিত। Mythology-কে তাই ধর্মের প্রথম ধাপ বলে ধরা যেতে পারে।

সুতরাং সামাজিক অথবা ভাবজগতের প্রগতির দিক থেকে mythology-র একটি বিশিষ্ট দাম আছে, তা স্বীকার করতেই হয়।

সাহিত্য-বিচারের পদ্ধতি আলোচনা করবার সময় বলা হয়েছে যে সাহিত্য-বিচারে আমাদের নজর রাখতে হয় স্থান, কাল ও সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ কাঠামোর ওপর। প্রত্যেক সাহিত্যিকের একটি বিশিষ্ট সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। উপরন্তু, সকলের লেখার তাগিদও এক নয়। তাই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের। আর তাই সব সাহিত্য সার্থক বা প্রগতিশীল সাহিত্য হয় না। অবশ্য আমরা লেখকের ব্যক্তিগত পারদর্শিতা ধরে নিয়েই একথা বলছি।

সুতরাং কোনো বিশেষ যুগের সাহিত্য-বিচারে সেই যুগের সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা বাদ দেওয়া যায় না। তাই বাংলা সাহিত্যে "রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ" বলে যে-যুগটিকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, সে-যুগের বাংলা সাহিত্য আলোচনা করার আগে বাংলা সমাজের তৎকালীন ইতিহাস আলোচনা করা দরকার। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য সাহিত্য-বিচার—সমাজ-বিশ্লেষণ নয়, তা আগেই বলে রাখা ভালো। সমাজ বা ইতিহাসের বিশ্লেষণ করা সাহিত্যিকের কাজ নয়, তা মুখ্যত ঐতিহাসিকের কর্তব্য। কাজেই সমাজ-বিশ্লেষণের ওপর জোর আমরা ঠিক ততটুকু দেব, সাহিত্য-বিচারে যতটুকু প্রয়োজন।

ভারতে ইংরাজ বণিকের পদার্পণ হয় বিলাতে Industrial Revolution হবার অনেক আগে এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল বাঙলাদেশ। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতার জোয়ার প্রথমেই ধাক্কা দিল তদানীন্তন বাঙালী সমাজকে।

যদিও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরাজ বণিকের তাণ্ডব প্রকৃতভাবে শুরু হয় পলাশীর যুদ্ধের পর।

ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি বরাবর এক ছিল না। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন সময় তার নীতিরও পরিবর্তন হয়। এই পরির্তনের মূলে যে অধিকতর মুনাফা লাভ, তা বলা বাহুল্য। এদিক থেকে দেখলে ইংরাজ আমলে বাঙলার ইতিহাসকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়।

প্রথমপর্বে (মোটামুটি ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের শুরু থেকে ১৮১৫ খ্রীঃঅঃ পর্যন্ত) অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের ভারত অধিকারের গোড়ার দিকে তার অত্যাচারের প্রধান কায়দা ছিল সরাসরি দেশে লুঠতরাজ, ডাকাতি আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের তৈয়ারী মালপত্র ইউরোপে চড়াদামে বিক্রয় করা। সরাসরি লুঠ-তরাজের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠেছিল ইংরাজ বণিকের ভারতসাম্রাজ্য।

আঠারো শতকের শেষভাগে বা আলোচ্য যুগের প্রথমাংশে বিলাতে Industrial Capitalism শুরু হয়ে গেলেও তার প্রাধান্য হয় নি। তখনো সেখানে Merchant Capitalism-এর যুগ—আর মুনাফার প্রধান পথ বাণিজ্য। তাই ভারতের ইংরাজ বণিকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল Merchant Capitalism-এর দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ, ভারত থেকে যে-মাল বিদেশে রপ্তানী হতো, তার ওপর সম্পূর্ণ দখল রেখে ঐ মাল বেশী দামে বিক্রয় করাই তাদের প্রধান লক্ষ্য। ভারত জয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরাজ বণিক এদেশে আসে নি। সে এসেছিল প্রধানত বাণিজ্য করতে, ইউরোপের অন্যান্য বণিকের মতো। ভারত জয়ের পর্ব শুরু হল এই বাণিজ্য চালু রাখার তাগিদ থেকেই।

তৎকালীন বাঙালী সমাজ অথবা ভারতীয় সমাজের মূল সমস্যা জানতে হলে ঐ সমাজের একটা মোটামুটি ছবি পাওয়া দরকার। নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে এ ছবি বেশ পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে :

"...Both in the zemindary territories and in the Haveli territories there existed from time immemorial the village community system, *a simple form of self government* which protected cultivators of every village from the oppressions of the zemindars [আধুনিক সংজ্ঞার জমিদার নয়—লেখক] and the government. This ancient instituion—ancient in the days

of Manu—*had survived* the wrecks of dynasties and the downfall of empires, had secured peace and order in villages in time of war, and struck the servants of the East India Company in the eighteenth century as a unique and excellent institution.

A village, geographicaly considered, is a tract of country comprising some hundreds or thousands of acres of arable and waste land ; politically viewed, it resembles a corporation or township. ... Under this simple form of municipal government the inhabitants of the country have lived from time immemorial......... *The inhabitants give themselves no trouble about the breaking up and divisions of kingdoms* ; while the village remains entire, they cared not to what power it is transferred or to what sovereign it devolves ; *its internal economy remains unchanged* ; the Potail is stil the head inhabitant, and still acts as the petty judge and magistrate and collector or rentor of the village."

[বাঁকা লেখা লেখকের : quoted by Romesh Dutt in Economic History of India, Vol. 1, P 117-119.]

তৎকালীন ভারতীয় সমাজের সঙ্গে বিলাতের সমাজ-ব্যবস্থার তুলনা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না, ভারত জয় করার শক্তি ইংরাজ বণিক কোথেকে পেল। এ শক্তি ইংরাজ পেয়েছিল তাঁর উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই। এবং বিজেতার কাছে ভারতবাসীর পরাজয়ের মুখ্য কারণ বিজেতার উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা। (গৌণ কারণ আরো অনেক কিছু ছিল অবশ্যই) এইখানেই ইংরাজের সঙ্গে আগের যুগের অন্যান্য বিদেশী আক্রমণকারীর পার্থক্য, যার ফলে আগের যুগে বিদেশী আক্রমণ বা দেশ অধিকার সত্বেও ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি কিন্তু এখন তা অনিবার্য হয়ে উঠল।

কিন্তু উল্লেখযোগ্য, ইংরাজ আগমনের প্রথম যুগে আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃত পরিবর্তন হয় নি। তা হয়েছিল অনেক পরে—যখন জমিদারী প্রথা

চালু হয় তখনই শুরু হল সমাজে ভাঙন।

ইংরাজের লুঠতরাজের আমলে তাদের প্রধান সহায় ছিল তদানীন্তন ভারতীয় রাজন্যবর্গের অন্তর্বিরোধ যা অনেক সময় যুদ্ধে পরিণত হতো। এবং এই গৃহযুদ্ধই ইংরাজের ভারত-জয়ের পথ পরিষ্কার করে। যেহেতু ইংরাজের ভারত জয় করার প্রকৃত তাৎপর্য দেশীয় রাজাদের বা সমাজের নেতাদের কাছে তখনো ধরা পড়ে নি, তাই বিদেশী আক্রমণের সামনেও ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তির ঐক্যবদ্ধ সমাবেশ সম্ভব হয় নি। তাই বিদেশীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসী উপলব্ধি করে নি। তখনো রাজশক্তিগুলি নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যেতেই ব্যস্ত। তাই ইংরাজের ভারত-জয়ের পথ অপেক্ষাকৃত সোজা। **"Those who came to trade, founded an empire."**! আমাদের দুর্ভাগ্য এইখানেই।

ইতিমধ্যে ১৭৭০ খ্রীঃ অঃ আন্দাজ বিলাতে **Industrial Revolution** হয়, যার ফলে **merchant capitalism** রূপান্তরিত হয়ে দেখা দিল **Industrial capitalism.** সুতরাং ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর ঔপনিবেশিক নীতিও পাল্টে গেল। ভারতীয় মাল ইউরোপে বা নিজের দেশে বিক্রয় করার পথ ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী ত্যাগ করল। কারণ এ-ব্যবসা তার পক্ষে আর লাভজনক নয় বরং ক্ষতিকর। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর সমস্যা, কি করে নিজের কারখানায় তৈয়ারী মাল বিক্রয় করার জন্য বাজার পাওয়া যায়। সব চেয়ে বড় বাজার যে তার অধিকৃত ভারতবর্ষ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাই ভারতবর্ষকে তার মাল বিক্রয় করার প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত করাই হল সাম্রাজ্যবাদীর দ্বিতীয় যুগের প্রধান নীতি। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কারখানায় যে-কাঁচা মালের প্রয়োজন, সেই কাঁচা মাল সরবরাহ করার দিক থেকেও ভারতবর্ষই হল তার প্রধান সহায়।

এই কাজ করার জন্য তাকে নতুন পথ অবলম্বন করতে হল। সে-পথই ভাঙন এনে দিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার (মার্কস যাকে বলেছেন, **Asiatic Feudalism.**)

একদিকে জমিকে প্রথম পণ্য করা হল জমিদারী-প্রথা চালু করে—অন্যদিকে ভারতে যেসব দেশজ শিল্প ছিল তাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে ভারতের ব্যবসায়ী বা কারিগর শ্রেণীর মৃত্যু ঘটানো হল। ফলে প্রাচীন সময় থেকে ভারতের গ্রাম্য-

গোষ্ঠীর (village community) যে পরিপূর্ণতা ছিল, তা ধ্বংস হল। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সব চেয়ে বড় বিপ্লব ঘটল ইংরাজের এই সর্বনাশা উৎপীড়নের ফলে। প্রাচীন সমাজ-পদ্ধতির ভাঙ্গনের ফলে সমাজের নেতৃত্বে যে-অভিজাত সম্প্রদায় ছিল, তাদেরও উৎখাত করা হল। একদিকে দেশের লোকের জমি ছাড়া জীবন ধারণের অন্য কোনো উপায় রইল না, অন্যদিকে ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারী ও জমিদারশ্রেণীর অত্যাচারেও দুর্দশার সীমা চরমে উঠল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতীয় সমাজের ওপর যে-আঘাত হেনেছিল তা নিছক তার মুনাফার অংশকে বাড়ানর জন্যই। সুতরাং এ-সমাজ ভেঙ্গে তার জায়গায় নতুন সমাজব্যবস্থা কায়েম করা তাদের পক্ষে ছিল স্বতঃসিদ্ধ। আর এই নতুন ব্যবস্থা তাদের নেতৃত্বেই কার্যকরী হল। তাই গড়ে উঠল সমাজের বুকে নতুন অভিজাত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের সৃষ্টি বললেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ সরকারি ও বাণিজ্যের কাজে সাম্রাজ্য-বাদীদের দরকার ছিল একটি দেশীয় সম্প্রদায়, যে-সম্প্রদায়কে সাম্রাজ্যবাদীরাই শিখিয়ে পড়িয়ে নিজের কার্যোপযোগী করে তুললো।

এটাই হল আমাদের তৎকালীন শিক্ষিত বা আধুনিক সমাজ। এই সমাজের লক্ষ্য হল ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইংরাজি ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে ইংরাজ সমাজের অনুকরণে ভারতীয় সমাজকে পুনর্গঠন করা। রামমোহন রায় বা ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই।

মার্কস বলেছেন, "England has to fulfil a double destiny. One the destruction of the old Indian society and the other, laying material foundations for a new one."

এই পরিপেক্ষিতে বিচার করতে হবে তৎকালীন ইংরাজ সৃষ্ট আধুনিক সমাজ বা ব্রাহ্মসমাজ, যার নেতা বলা যেতে পারে রামমোহনকে এবং তাহলেই রামমোহনের প্রকৃত সামাজিক বিশ্লেষণ সম্ভব।

রামমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রাচীন ভারতীয় সমাজের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে মার্কসের কথায় ইংরাজের উপরিউক্ত প্রথম কাজটি চালু করার দিক থেকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেদিক থেকে তাঁদের কার্যাবলী নিশ্চয় প্রগতিশীল। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিলোপ

সাধনে সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে সহযোগ কোনো মতেই প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে না।

কিন্তু রামমোহনকে পুরোপুরি প্রগতিশীল বলাটাও বাহুল্য। কারণ, ইংরাজের যে-দুটি দায়িত্বের কথা মার্কস বলেছেন, তার প্রথমটি যথেষ্ট জোরের সঙ্গে পালন করলেও, দ্বিতীয় দায়িত্বের যথার্থ পালনে সাম্রাজ্যবাদ যথেষ্ট গররাজি ছিল এবং যে-গররাজির কারণ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। অথচ এই যে গররাজি, এটা তৎকালীন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখে প্রথমে ধরা পড়ে নি। ফলে, তারা এক্ষেত্রেও ইংরাজের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, অথচ তখন দরকার ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই সমাজ পুনর্গঠনের কাজে এগোনো।

সুতরাং এদিক থেকে রামমোহন প্রমুখ মনীষীদের কার্যকলাপ প্রতিক্রিয়াশীল, অথবা প্রগতিশীল না বলে, বলা ভালো যে তাঁরা পুরোপুরি বিপ্লবী ছিলেন না। এবং তা হওয়াটাও অসম্ভব ছিল। কারণ, তারা যে-শ্রেণীর প্রতিনিধি, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্মই হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে, তার প্রয়োজনে। উপরন্তু, দুটি সমাজব্যবস্থার তুলনা করলেই দেখা যায় যে ঐ সময়ে ইংরাজ নেতৃত্বকে সরাসরি বর্জন করে স্বাধীনভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শ গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। এর কারণ কি? এর কারণ সংক্ষেপে, আমাদের সমাজের বিশেষ ধারা। সমাজ-ভাঙ্গনের যে-তাগিদ তা নিছক সমাজের স্বাধীন তাগিদ ছিল না,—তা এসেছিল সাম্রাজ্যবাদের নিজের সুবিধার জন্যই। সুতরাং ভারতীয় সমাজ বা বাঙালী সমাজে যে পুনর্গঠন শুরু হল তাও দেশের স্বাধীন তাগিদ থেকে নয়, সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশেই। তাই সে পুনর্গঠনে নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে এগোতে অক্ষম হলেন।

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে আমরা নতুন সমাজের যে-নেতৃবৃন্দের কথা উল্লেখ করেছি, (যার নেতা রামমোহন) সে-নেতৃত্ব ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখপাত্র ছিলেন না। কারণ, তখনো বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম ভারতে হয় নি। বড় জোর বলা যেতে পারে তাঁরা পাশ্চাত্য দেশের বুর্জোয়া ভাবাদর্শে দীক্ষিত হয়ে ঐ ভাবধারাকে এদেশে আমদানী করার চেষ্টা করেছিলেন। এর বেশী বুর্জোয়া-চরিত্র তাঁদের মধ্যে খুঁজতে যাওয়া অনৈতিহাসিক। এ-দেশে বুর্জোয়া-শ্রেণীর জন্ম অনেক পরে।

ইংরাজ আমলে ভারতের ইতিহাসের দ্বিতীয় যুগের যে-কথা আগে বলা

হয়েছে তার সমাপ্তি হল উনিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। অর্থাৎ, সিপাহী-বিদ্রোহের কিছু আগে। [অবশ্য সময়ের নির্ঘণ্ট খুব মোটা কাঠামোয় উল্লেখ করা হয়েছে—তাই তারিখের ওপর বেশী জোর দেওয়া উচিত হবে না।]

তৃতীয় পর্ব তাই শুরু করতে হয় এর পর থেকে। এ-পর্বের শুরুতে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা রেলপথ নির্মাণ। দ্বিতীয় পর্বে সাম্রাজ্যবাদের যে-নীতি অনুসৃত হয় তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রেল-নির্মাণ, যা সমাজে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এবং এই নতুন পরিস্থিতির দরুণ সাম্রাজ্যবাদের নীতিও আবার পাল্টে যায়। শোষণ চলতে থাকে পুরোমাত্রায়, তবে তার কায়দা হল ভিন্ন।

রেলপথ বা 'ডাক,' 'তার' চালু করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশ-শোষণকে দৃঢ়ভাবে কায়েম করা, যাতে বিদেশী মাল এদেশে বিক্রয় করা সহজ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশ থেকে কাঁচা মাল কম খরচে বিলাতে পাঠানো যায়। তার সঙ্গে আর একটি বড় উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র দেশকে অন্য বিদেশী শক্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে সম্পূর্ণ নিজের দখলে রাখা। তাই দরকার ছিল সামরিক বাহিনীকে প্রয়োজন মতো দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সহজে চালনা করা।

ভারতীয় সমাজের অর্থ নৈতিক ইতিহাসে জমিদারী-প্রথা চালু করার পর সব চেয়ে বড় বিপ্লব হল রেলপথ নির্মাণ। কারণ, সমগ্র বিশ্বের আধুনিক সমাজে যে-প্রধান সমস্যা তা ভারতীয় সমাজে প্রথম দেখা দিল এই রেলপথ মারফৎ। এদিক থেকে এর গুরুত্ব বোধহয় জমিদারী-প্রথার চেয়ে বেশী। সাম্রাজ্যবাদীর দিক থেকেও রেলপথ হয় উঠল **Frankenstein**।

কারণ, রেলপথ চালু হবার পর থেকে ভারতের বুকে গড়ে উঠতে লাগল ছোট ছোট শিল্প—ওটা ছিল অবশ্যম্ভাবী, রেলপথ চালু রাখার দিক থকে।

আর এই সব ছোট ছোট শিল্পই জন্ম দিল একদিকে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণী অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীর।

এখানে আবার লক্ষ্যণীয়, এই শিল্প গড়ে উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদের তাগিদেই। তাই, যে-দেশী বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম হল তাও সাম্রাজ্যবাদীর করুণায়, তার পৃষ্ঠপোষকতায়। সুতরাং, এই বুর্জোয়া-বিকাশ স্বাধীন বিকাশ নয় এবং একই কারণে আংশিক বিকাশ। তাই তার সামাজিক দায়িত্ব পালন হল আংশিক ভাবে। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মতো এদেশে বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবী হয়ে

জন্মগ্রহণ করে নি। অতএব আমাদের সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণী সমগ্র উৎপীড়িত জনগণের মুখপাত্র হয়ে সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় সামন্তবাদের বিরুদ্ধে চরম জেহাদ ঘোষণা করতে অসমর্থ হল।

কিন্তু ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় সিপাহী-বিদ্রোহের পর—অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষের দিকে (আনুমানিক ১৮৭০ খ্রীঃ অঃ)। সুতরাং বুর্জোয়াশ্রেণীর কথা বলার আগে সিপাহী-বিদ্রোহের আলোচনা করা দরকার।

স্পষ্টতই, সিপাহী-বিদ্রোহ ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর বিদ্রোহ নয়, কারণ আগেই বলা হয়েছে যে বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম সিপাহী-বিদ্রোহের পর। এবং বুর্জোয়া-বিপ্লব না হলে কৃষক-বুর্জোয়ার সৃষ্টি অসম্ভব; তাই সিপাহী-বিদ্রোহকে কৃষক-বুর্জোয়া বিপ্লব বলাটাও অনৈতিহাসিক।

তাহলে সিপাহী-বিদ্রোহের শ্রেণী-বিশ্লেষণ কিভাবে করা যায়? আগেই বলা হয়েছে যে ইংরাজ বণিকের ভারত আগমনের বা ভারত-বিজয়ের প্রকৃত তাৎপর্য তৎকালীন ভারতবাসী বা দেশীয় রাজন্যবর্গ বুঝতে পারে নি। যার ফলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়াতে অসমর্থ হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তিগুলি। এবং দেশীয় রাজশক্তিগুলিকে উপেক্ষা করেই সমগ্র ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নিয়ে যাবার মতো সচেতন কোনো শ্রেণী তখনো ভারতীয় সমাজে গড়ে ওঠে নি।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর চরম অত্যাচারে, এবং তাদের সক্রিয় চেষ্টায় দেশীয় সমাজে ভাঙন দেখা দেবার ফলে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার চেতনা ক্রমশ ভারতবাসীর মধ্যে জেগে উঠতে শুরু করে। একমাত্র ইংরাজপুষ্ট নব্যভারতীয় শ্রেণী বাদে, সমাজের অন্য সমস্ত শ্রেণীর এই সংগ্রামে সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় সম্মতিই সিপাহী-বিদ্রোহের পথ সূচনা করে। কিন্তু কার্যক্রমে এ-বিদ্রোহ প্রধানত দেশের গদিচ্যুত রাজন্যবর্গের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় সিপাহীর সাহচর্যে চালিত হয়। সুতরাং এর শ্রেণী-চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হলে বলা যায় যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর এইটিই ছিল শেষ সশস্ত্র সংগ্রাম—এ-সংগ্রামের নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল হলেও সমগ্রভাবে এ-বিদ্রোহকে প্রগতিশীল বলতেই হয়।

সমগ্র দেশবাসী কেন এ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে নি তার কারণ আগে

বলা হয়েছে। দেশে বুর্জোয়াশ্রেণী তখনো দেখা দেয় নি—এবং এ-কাজ করা সম্ভব ছিল একমাত্র ঐ শ্রেণীর পক্ষেই। উপরন্তু, ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালানো কোনো দিনই সম্ভব ছিল না, কারণ তার জন্মই সাম্রাজ্যবাদের ঔরসে এবং বিকাশও আংশিকভাবে। তাই এ প্রশ্নই ওঠে না।

সুতরাং সিপাহী-বিদ্রোহে যে-ব্যর্থতা, তার কারণ এই নয় যে ঐ বিদ্রোহ ছিল প্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার বিদ্রোহ। ব্যর্থতার কারণ প্রধানত প্রগতিশীল শক্তির অভাব যা তৎকালীন সময়ে অনিবার্য ছিল।

সিপাহী-বিদ্রোহের পরাজয়ের পর ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর ক্রমবিকাশ শুরু। এবং এই সময় থেকে সাম্রাজ্যবাদের নীতি আবার অন্য পথ অনুসরণ করে চলতে লাগল। প্রথমে নিছক নিজের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যবাদ দেশীয় শিল্পবিকাশে বিরোধিতা করে নি। এবং দেশীয় শিল্প তার প্রাথমিক অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের মুনাফার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। কিন্তু ক্রমশ দেশীয় শিল্প যখন অগ্রসরের পথে, তখনি শুরু হল তার ওপর সাম্রাজ্যবাদের হামলা। ধনতন্ত্রবাদের অন্তর্বিরোধের শুরু হল ভারতের বুকে এই ভাবেই। সুতরাং দেশীয় বুর্জোয়াশ্রেণীও তার স্বার্থ অটুট রাখার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর বিরোধের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, অনিবার্য ঐতিহাসিক কারণের জন্যে সে-বিরোধ অত্যন্ত আংশিক বিরোধ—বৈপ্লবিকপন্থায় সংগ্রামে সে অসমর্থ। তাছাড়া, তার দাবীও বৈপ্লবিক দাবী নয়, অত্যন্ত আংশিক দাবী। তার এক উদাহরণ পাওয়া যায় রমেশ দত্তের একটি উক্তিতে :

"In India, the people honestly desire a longer connection with Great Britain.... They still believe that they have much to gain by being in close touch with the West, through the rule of a Western Power. They have cast in their lot with Great Britain ; they have identified themselves with British rule ; they honestly desire that rule to last. But they do not desire the administration to last in its present absolute and exclusive form... They demand a fair share in the higher services of their own country ; they desire to have a voice in

the highest Councils of the Empire." [R. C. D., Preface to Economic History of India, Vol. I, p. xvii-xviii]

ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্র পশ্চিমের অন্যান্য স্বাধীন দেশের বুর্জোয়া চরিত্রের মতো নয়। আর তাই সমাজে তার ভূমিকাও স্বতন্ত্র। একদিকে সে কিছুটা পরিমাণে প্রগতিশীল, আবার তারি সঙ্গে জড়িয়ে তার প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আংশিকভাবে হলেও, যে-বিরোধী ভূমিকা ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর চরিত্রে দেখা গিয়েছিল তা চলেছিল মোটামুটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পরও কিছুকাল পর্যন্ত। তার শেষ প্রতিবাদের আন্দোলন ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন।

এরপর থেকেই ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে ভাগ হয়। Big Bourgeois অংশ সরাসরি সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণের পথে এগিয়ে যায়।

গত দু'শ বছরের ভারতের ইতিহাস অত্যন্ত কাঠামোয় আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি আমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে। স্বভাবত বাঙলাদেশের ক্ষেত্রেও এই বিশ্লেষণ প্রযোজ্য।

প্রবন্ধের তৃতীয় বা শেষ অংশে আলোচনা কর হবে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যের সমস্যা।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য নিয়ে যে কটি লেখা হালে বাঙলার বিভিন্ন মার্কসবাদীরা লিখেছেন, তার মধ্যে প্রায় সকলেই ধরে নিয়েছেন যে আমাদের ঐতিহ্য খুঁজতে হবে "রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ" বলে যে-যুগটি পরিচিত, সেই যুগের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে।

অর্থাৎ, ঐতিহ্য-সন্ধানে তাঁরা একটি দাড়ি টানার চেষ্টা করছেন। সেই দাড়ির পেছনে তাকাবার কোনো দরকার নেই বলে তাঁরা মনে করেন। তা নাহলে কেন তাঁদের লেখায় ঐ যুগের পেছনের কোনো নির্দেশ নেই? আমার মনে হয় এরকম দাড়ি টানা ভুল। ঐতিহ্য আকস্মিক নয়—তার ইতিহাস সমাজের ইতিহাসের মতো প্রবহমান।

সুতরাং উনিশ শতকের পেছনেও যাওয়া দরকার এবং তাহলেই ঐতিহ্যের সার্থক সন্ধান হতে পারে।

কিন্তু এই প্রবন্ধে বিশেষ করে আলোচনা করা হবে "রামমোহন থেকে

রবীন্দ্রনাথ"—এই যুগের সাহিত্য।

সাহিত্য-আলোচনার পদ্ধতি কি, তা প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলার চেষ্টা করেছি। এবং যে-যুগের সাহিত্য আলোচনা করতে চলেছি সেই যুগের সামাজিক ইতিহাসেরও একটি মোটা কাঠামো দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে। এই দুই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজ আমলে বাঙলার সাহিত্য-আলোচনা করার চেষ্টা করব।

আগেই বলা হয়েছে যে প্রগতি কথাটি আপেক্ষিক; তাই তার নির্দিষ্ট একটি মাপকাঠি তৈয়ারী করতে হলে স্থান-কাল ও সমাজের কাঠামো আমাদের জানা দরকার। কোনো এক বিশেষ যুগের সাহিত্য কতদূর প্রগতিশীল হতে পারে তা নির্ভর করে সেই সময়ে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর সমাবেশ কি রকম ছিল বা সমাজের নেতৃত্ব ছিল কোন শ্রেণীর হাতে, তার ওপর। Scot-এর যুগে যেমন Balzac-কে আশা করা যায় না, তেমনি আধুনিক রুশ-লেখককে Tolstoy-এর সময় খুঁজে পাবার চেষ্টা করা যুক্তিহীন।

বাঙালীর মনের সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয়ে যে-নতুন চেতনার সৃষ্টি হল, সে চেতনার বিকাশ আংশিক বিকাশ। সমাজের সমস্ত স্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার বা সংস্কৃতির ধাক্কা এসে লাগে নি। শুধু তাই নয়, সমাজের সমস্ত শ্রেণীর কাছেই ঐ সংস্কৃতি আদরণীয় ছিল না।

তাই, বাঙলার নব্য সভ্যতাকে Renaissance বলা বা ইউরোপীয় Renaissance-এর সঙ্গে তুলনা করা বাহুল্য। সেখানে যে-নবচেতনার জোয়ার এসেছিল, সেটা সমাজের নিজের ধর্মে, নিজের স্বাধীন তাগিদে। আর এদেশে তার হল আমদানি, এবং তাও এদেশীয় সমাজের স্বাধীন তাগিদে নয়। তাই এর প্রভাব দেখা গেল শুধু কলকাতায় এবং তাও আবার কলকাতারই একটি বিশিষ্ট সামাজিক অংশে, যার নেতা রামমোহন।

সুতরাং রামমোহন বা ব্রাহ্মসমাজকে দেখে অথবা তার বিশ্লেষণ করলেই তৎকালীন বাঙালী সমাজের বিশ্লেষণ হয় না। রামমোহনের বা ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও যে বাঙালী সমাজ ছিল তা ভুলে গেলে চলবে না।

অথচ আমাদের মার্কসবাদীরা ঠিক এই ভুলই করছেন। তাঁদের আলোচনার কেন্দ্র হল কলকাতা, যার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা তাঁদের কাছে 'রামমোহন প্রগতিশীল, না কালীপ্রসন্ন প্রগতিশীল।' অর্থাৎ, সমস্ত কিছু প্রগতির জন্য দৃষ্টি

থাকছে কলকাতার ওপর। আমাদের যেমন কলকাতার দিকে নজর দিতে হবে তেমনি ভুলে গেলে চলবে না কলকাতার বাইরের বাঙালীকে।

সেইখানেই সন্ধান পাওয়া যাবে আমাদের লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য, যে-লোকসাহিত্য এখনো বাঙলার গ্রামে, বাঙলার রূপকথায় বেঁচে আছে, বেঁচে আছে গ্রাম্য বাঙালীর মনের-কোঠায়। বাঙলার পদাবলী, বিশেষ করে চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কন চণ্ডী, মঙ্গলকাব্য, গাজন, কবিগান প্রভৃতির সামাজিক অবদান, কে অস্বীকার করবেন?

দু'শো বছরের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারেও এইসব সংস্কৃতির মৃত্যু হয় নি। আর তা সম্ভব নয়। যতদিন বাঙালী বেঁচে থাকবে, ততদিন বাঁচবে বাঙালীর একান্ত নিজস্ব সংস্কৃতি—আর সে-সংস্কৃতির জন্মভূমি নিশ্চয় কলকাতা নয়, বা তার জন্মদাতা কলকাতার মুষ্টিমেয় এক গোষ্ঠীও নয়।

শুধু তাই নয়, অনিমেষবাবু[১] তাঁর প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে নব্য বাংলা সাহিত্য (বা বুর্জোয়া সাহিত্য) সৃষ্টি হয়েছিল পুরনো বাঙলার বা ফিউডাল বাঙলার সাহিত্যকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে। কারণ, দ্বিতীয়টি তাঁর মতে প্রতিক্রিয়াশীল। এ-যুক্তিটি ঠিক বুঝলাম না। অনিমেষবাবু কি বলতে চান যে, পুরনো বাঙলায় বা তাঁর মতে ফিউডাল বাঙলায় কোনোদিন কোনো প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি, বা তা হওয়া সম্ভব ছিল না? প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-ব্যবস্থা হলেই কি সেখানে প্রগতিশীল সাহিত্য হতে পারে না? তাহলে Gorky তাঁর 'Mother' লিখলেন কি করে? অথবা প্রাচীন গ্রীক-সমাজে দাস-প্রথার আমলে গ্রীক নাটক সৃষ্টি হল কি করে? তখনকার রুশ বা গ্রীক সমাজ-ব্যবস্থা নিশ্চয় প্রগতিশীল ছিল না!

আমার মনে হয় সাহিত্য-বিচারে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন না করে নিছক সামাজিক ইতিহাসের দিকেই ঝোঁক বেশী থাকার ফলে এই রকম অসাবধানতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়।

দ্বিতীয়ত, পুরনো বাঙলার ফিউডাল সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল এরকম কোনো মন্তব্য সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে না বিচার করে বলা অনৈতিহাসিক।

১. অনিমেষ রায়, প্রখ্যাত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র-র ছদ্মনাম। দ্র. মার্কসবাদ ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ১২৬-১৬৪।—সম্পাদক

বাঙলার নব্য সাহিত্যের বাহিরেও প্রগতিশীল সাহিত্য ছিল এবং নব্য সাহিত্যের যে-সংগ্রামের কথা অনিমেষবাবু উল্লেখ করেছেন খুব সঙ্গতভাবেই, সে-সংগ্রাম পুরনো বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমগ্রভাবে নয়, হয়েছিল তার এক অংশের বিরুদ্ধে, যেটা প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশে বিশেষ লক্ষ্যণীয় বটতলার সাহিত্য প্রভৃতি।

এবং তার যে-অংশ প্রগতিশীল, তার রূপ ছিল বাঙলার গ্রামের লোক-সাহিত্যে, যার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। অবশ্য গ্রামের সমস্ত সংস্কৃতিই যে প্রগতিশীল ছিল তা নয়। বস্তুত, সংস্কৃতি কোনো দিনই এক ধারায় পুষ্ট হতে পারে না। প্রবন্ধের প্রথম অংশে তার বিশদ আলোচনা আছে। বাঙলার লোকসাহিত্য আলোচনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সমালোচকের এদিকে দৃষ্টি আহ্বান করি।

"রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ" বলে যে-ভাবধারার কথা বলা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন-র মূলত কোনো সামাজিক প্রভেদ নেই। উভয় ভাবধারাই নব্য বাঙলার ভাবধারা, উভয় ভাবধারাই ইংরাজ-পুষ্ট নব্য বাঙালী সমাজের ভাবধারা। তবে তাদের মধ্যে যে-প্রভেদ, সেটা তাঁদের নিছক সাহিত্যিক পারদর্শিতার প্রভেদ। উভয়েরই সামাজিক আদর্শ compradore bourgeois আদর্শ—পাশ্চাত্য বুর্জোয়া আদর্শের অনুকরণ। তাই ঠিক যে-পরিমাণে ভারতের নতুন বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবাদর্শ বিপ্লবী, এঁদের ভাবাদর্শও সেই পরিমাণে বিপ্লবী বা প্রগতিবাদী। তার বেশী বিপ্লবী যেমন এঁরা কেউ ছিলেন না, তেমনি প্রতিক্রিয়াশীল বলে বাদ দেবার প্রশ্নও ওঠে না।

তবে যেহেতু এঁরা প্রধানত বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক, তাই সামাজিক ভাবাদর্শ এঁদের সকলের ভেতর সমানভাবে প্রতিফলিত হয় নি।

সমাজের মূল কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার নিদর্শনই এই পার্থক্যের মূলে।

রামমোহন সাহিত্যিক ছিলেন না। তাই তাঁর কথা এখানে ওঠে না। তাঁর সামাজিক বিশ্লেষণ আগেই করা হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শের দার্শনিক ভিত্তি নিঃসন্দেহেই হিন্দু-revivalist। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। তবুও ঐ প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টি তাঁর সাহিত্যিক বিকাশকে যথেষ্ট পরিমাণে বিকৃত করেছিল।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমের সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টায় তিনিই প্রথম সার্থক হন।

শুধু তাই নয়, আধুনিক বাংলা ভাষা সৃষ্টির দিক থেকেও তাঁর দান প্রভূত, বোধহয় বিদ্যাসাগরের পরেই তাঁর স্থান।

সমাজ-বিকাশের একটি বিশিষ্ট স্তরেই উপন্যাস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এবং বঙ্কিমের আগে বাঙালী সমাজ সে-স্তরে ওঠে নি। তাই আরও আগে উপন্যাস সৃষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাই বলে তো বঙ্কিমের প্রচেষ্টাকে হেয় করা যায় না।

অনেকের মতে বঙ্কিমের বাংলা সাহিত্যে প্রধান অবদান, "বঙ্কিমের মারফতেই নারী প্রথম বাংলা সাহিত্যে এলো ব্যক্তি রূপে।" নারী-চরিত্রের স্বাধীন সত্তার বিকাশ উপন্যাসেই সম্ভব এবং যেহেতু বঙ্কিমের আগে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ছিল না, তাই স্বাধীন নারী-চরিত্রও তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে অসম্ভব ছিল। সুতরাং একথা বলার কোনো বিশেষ সার্থকতা নেই। বরং জোরটা দিতে হয় তাঁর উপন্যাস লেখার প্রচেষ্টার উপরই।

কিন্তু বঙ্কিমের চেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও খুব সার্থক হয় নি উপন্যাস সৃষ্টির দিক থেকে। তাঁর উপন্যাসগুলি ফিউডাল-বিরোধী ছিল কি না, সেটা প্রধান প্রশ্ন নয়। প্রধান প্রশ্ন সাহিত্যের দিক থেকে উপন্যাসগুলি উৎরেছিল কিনা। তাই অনিমেষবাবু "আনন্দমঠ" সম্বন্ধে যেকথা বলেছেন, তার কোনো সার্থকতা খুঁজে পাই না। বঙ্কিমের সরাসরি প্রগতিশীল রাজনৈতিক মত অবলম্বন করা উচিত ছিল কি না এ-কথার ওপর জোর দিয়ে তাঁর উপন্যাসের গুণাগুণ বিচার করা কোনো মতেই সমীচীন নয়।

উপরন্তু, অনিমেষবাবু "আনন্দমঠের" রাজনৈতিক বিশ্লেষণ যেভাবে করেছেন তার কোনো ভিত্তি নেই। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ শেষপর্যন্ত ইংরাজের বিরুদ্ধেই চলেছিল এমন উক্তি করার যুক্তি তিনি আনন্দমঠের কোনখানে পেলেন? সুতরাং এভাবে আনন্দমঠ বিচার্য নয়। সাহিত্যিক দিক থেকে আনন্দমঠ খুব উঁচুদরের সৃষ্টি নয়। কারণ, উপন্যাসের যে-মাপকাঠির কথা প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলা হয়েছে, সেই দিক দিয়ে বঙ্কিমের কোনো উপন্যাসই খুব প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস হয়ে দাঁড়ায় নি।

অবশ্য সে-সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুব উঁচুদরের উপন্যাস সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও

কম ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বঙ্কিমের সাহিত্যিক প্রতিভাও যে, কিছুটা পরিমাণে দায়ী তা স্বীকার করতেই হয়।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তৎকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে মাইকেল শ্রেষ্ঠ। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার কোনো তুলনাই মেলে না তাঁর সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সব চেয়ে সার্থক সাহিত্যিক বিদ্রোহ তিনিই এনেছিলেন। তার উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর সৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দে—যে নতুন ছন্দে তিনি বিপ্লব এনে দিলেন আমাদের সাহিত্যে। এবং এই বিপ্লবী ছন্দেই তিনি গাঁথলেন রামায়ণের কাহিনী—কিন্তু সে-কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্রের সম্পূর্ণ রূপান্তর করা হল। এ-রূপান্তরের উদ্দেশ্যই ছিল পুরনো সমাজকে অগ্রাহ্য করা। এখানেই তাঁর সাহিত্যের মূল্য—তাঁর প্রগতির মাপকাঠি। তাঁর প্রতিটি কাব্যে যে-বিদ্রোহ ফুটে উঠল সে-বিদ্রোহের একটি বড় দিক ছিল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ঘোষণা। নায়ক-চরিত্রের দৃঢ়তা তিনি দেখালেন তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য ইত্যাদিতে। এ-বিদ্রোহের প্রেরণা দেশীয় সমাজ বা নব্য শিক্ষিত সমাজের আদর্শ নয়, বরং তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, পাশ্চাত্য বুর্জোয়া ভাবাদর্শের অনুপ্রেরণায়, তাই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনের নেতা হিসাবে তাঁকে দেখা উচিত নয়। তবুও তাঁর সাহিত্য নিঃসন্দেহেই প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরাট স্তম্ভ।

কিন্তু অনেক সমালোচক মনে করেন যে মাইকেলের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান তাঁর "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ," বা "একেই কি বলে সভ্যতা?" ; মাইকেলের সাহিত্য-বিচার এভাবে করা সম্পূর্ণ ভুল। তৎকালীন শিক্ষিত সমাজকে ব্যঙ্গ করে লেখা হয়েছিল বলেই যে এগুলি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের নিদর্শন এমন যুক্তি কোনো মতেই দেওয়া যায় না।

তৎকালীন বাংলা সাহিত্য আলোচনায় বিষ্ণুবাবু বিদ্যাসাগরের উল্লেখ করেছেন খুব সঙ্গতভাবেই।[১] বাংলা ভাষা কোনোদিন বিদ্যাসাগরের ঋণ ভুলতে পারবে না। তাছাড়া তাঁর মানবতাবোধ, স্বদেশপ্রীতি, উৎপীড়িত জনতার প্রতি সহানুভূতি সত্যই প্রশংসনীয়। এবং এই মানবতাবোধ থেকেই তিনি সমাজের অনেক প্রতিক্রিয়াশীল অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১. দ্র. সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, প্রথম সিগনেট সংস্করণ; পৃ. ১৩।—সম্পাদক

দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, টেকচাঁদ ঠাকুর, প্রভৃতি সাহিত্যিকদের সবচেয়ে বড় দান বাংলা সাহিত্যে realism আনার চেষ্টা। সামাজিক চরিত্রের দিক থেকে এই লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের ধারার গুণগত কোনো প্রভেদ নেই। প্রভেদ যেটা দেখা যায়, সেটা নিছক তাঁদের সাহিত্যিক পারদর্শিতার প্রভেদ। রামমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যেমন বিপ্লবী ছিলেন না, তেমনি কালীপ্রসন্ন বা দীনবন্ধুও বিপ্লবী ছিলেন না। এটাও ঠিক নয় যে তাঁরা তৎকালীন উৎপীড়িত কৃষকশ্রেণীর মুখপাত্র।

তাছাড়া দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' উপযুক্ত দাম দিলেও মানতেই হয় 'নীলদর্পণ' দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখা। মধুসূদনের কাব্যিক প্রতিভার সঙ্গে এর কোনো তুলনা করা যায় না। উপরন্তু, 'নীলদর্পণ' দীনবন্ধুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়; বিষ্ণুবাবু ঠিকই বলেছেন "সধবার একাদশী" অপেক্ষাকৃত ভালো নাটক।[১] কারণ এর পটভূমি অনেক বড় এবং এর ঘটনাও অনেক বেশী মর্মান্তিক, সমগ্র সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে। তবে "সধবার একাদশী"-কে বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাটক বলাটা অত্যুক্তি। কাজেই বঙ্কিমকে বাদ দিয়ে দীনবন্ধুকে প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্যে দিকপাল বলে গণ্য করাটা অজ্ঞতার পরিচয়।

এই যে প্রগতিশীল ভাবধারার আলোচনা করা হল, তা কোনো মতেই সম্পূর্ণ বিপ্লবী না হলেও সামগ্রিকভাবে প্রগতিশীল। কিন্তু বিবেকানন্দ এই ধারায় আসেন না। বস্তুত, তিনি ছিলেন পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল। রবীন্দ্র গুপ্ত বিবেকানন্দের ওপর যে-আলোচনা করেছেন, তা ঠিক বলেই মনে করি; তাই সে-বিষয় পুনরুল্লেখ অযথা। সাম্রাজ্যবাদ তার শোষণকে কায়েম রাখার জন্য যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করেছিল, তার একটি প্রধান ছিল ধর্ম। আর বিবেকানন্দ ঠিক এই দিক থেকেই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সহায় হলেন। এইখানে রামমোহন আর বিবেকানন্দের মধ্যে পার্থক্য। তাই ইউরোপের Reformism-এর সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রচারের তুলনা ঠিক নয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনার প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথ রামমোহন অথবা বিদ্যাসাগরের মতো সমাজ-সংস্কারক বা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতো রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। মূলত তিনি কবি। রবীন্দ্রনাথের বিচার করতে হয় প্রাথমিকভাবে তাঁর কাব্যবিচারেই।

---

১. দ্র. সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, প্রথম সিগনেট সংস্করণ, পৃ. ১৩।—সম্পাদক

রবীন্দ্র গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের কাব্য বাদ দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতামতের বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এলেন যে রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ প্রতিক্রিয়াশীল। তারপর এখান থেকেই রবীন্দ্র গুপ্ত প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবে বলে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিক্রিয়াশীল। অকাট্য যুক্তি! অত্যন্ত সোজা একটি ছকে ফেলে তিনি দিলেন রবীন্দ্রনাথকে কাবু করে—প্রায় "হাঁটু ভেঙ্গে দিলেন"! এক আঘাতেই রবীন্দ্র-সাহিত্যকে চিরনির্বাসনে ঠেলে দেওয়া হল, পাঠানো হল সুদূর দিল্লীর মসনদে—জহরলাল, সাভারকরের গুরু করে। সার্থক সমালোচনা!

আরো মজার ব্যাপার, যে-বইটিকে ভিত্তি করে [আত্মশক্তি] রবীন্দ্র গুপ্ত তাঁর সিদ্ধান্তে এলেন, সে-বই যদি পাঠক মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেন, তবে বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবে না যে রবীন্দ্রনাথকে তিনি সম্পূর্ণ বিকৃত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতামত যাই হোক অন্তত ঐ বই থেকে রবীন্দ্র গুপ্ত যে-প্রমাণ খাড়া করার চেষ্টা করেছেন তা ঠিক নয়।

কিন্তু এ-বিষয়ে বাদানুবাদের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আলোচনা করাটাই বাঞ্ছনীয়।

বাংলা কাব্য-জগতে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহেই বিপ্লব আনলেন। তবে এ-বিপ্লব মাইকেলী ধারা থেকে স্বতন্ত্র। মাইকেলী ধারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, রবীন্দ্র-কাব্যও তাই, কিন্তু তফাৎটা হল মাইকেল তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন পৌরাণিক আখ্যানের মাধ্যমে। তাই তিনি আধুনিক কবির পর্যায়ে পড়েন না। এদিকে, রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আধুনিক নন—তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ আশ্রয় নিল তাই lyric-এ। তিনি হয়ে উঠলেন প্রধানত romantic কবি। classic থেকে আধুনিক—এই দুই ধারার মাঝখানে romantic বা lyric অবশ্যম্ভাবী এবং তাই রবীন্দ্রনাথের lyric একেবারে আকস্মিক নয়। কিন্তু lyric মারফৎ রবীন্দ্রনাথ যে অদ্ভুত চেতনাজগতের সৃষ্টি করলেন, সে-জগতের যেমন ব্যাপ্তি, তেমনি বিস্তার। তাই তাঁর কবিতা নব্য বাঙালীর মনকে প্রচণ্ড নাড়া দিতে সক্ষম হল। দেশের নতুন অর্থনৈতিক বিকাশ এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব নব্য বাঙালী মনে যে-চঞ্চলতা সৃষ্টি করল, সেই চঞ্চলতার রূপ প্রথম দেখা গেল রবীন্দ্র-কবিতায়। এখানেই তাঁর কবিতার সার্থকতা বা প্রগতি।

বুর্জোয়া আদর্শের প্রধান সামাজিক দান ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার স্বীকৃতি। তাই এ-স্বীকৃতির প্রয়োজনীয়তা তৎকালীন নব্য বাঙালী সমাজেও দেখা গেল রবীন্দ্র-কাব্যের যুগে। স্বভাবতই এ-স্বাধীনতার তাগিদ আংশিক তাগিদ, কারণ দেশের নতুন অর্থনৈতিক বিকাশটাই ছিল আংশিক বিকাশ। এমন সামাজিক কাঠামোতে "Faust" অথবা "Prometheus" জন্ম নিতে পারে না। তাই রবীন্দ্র-কাব্যে ব্যক্তিত্ববোধের স্বীকৃতিও আংশিক স্বীকৃতি আর তাই তিনি "Faust" সৃষ্টি করতে অসমর্থ হলেন।

কিন্তু যে-আংশিক চেতনা তিনি সৃষ্টি করলেন, সে-চেতনাকে যতদূর ঐ পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব তা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ পেরেছিলেন। তাছাড়া আর একটি নতুন দিক তিনি খুলে দিলেন। তা হল "human values"-এর আশ্চর্য স্বীকৃতি—যা স্থান পেয়েছে তাঁর কবিতায়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের একটি বিশেষ দিক হল নারী-পুরুষের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের এক অপূর্ব রূপ দিল তাঁর কবিতা। বাঙলার পদাবলী-কাব্যের উপযুক্ত মূল্য দিলেও স্বীকার করতেই হয়, রবীন্দ্রকাব্য প্রেমের যে নতুন ধারণা দিল তা পদাবলী-কাব্যের চেয়ে অনেক বেশী সমৃদ্ধশালী।

রবীন্দ্রনাথের **সোনারতরী, মানসসুন্দরী** কবিতা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কবিতার সার্থকতা—কবিতায় human values-এর স্বীকৃতি ও তার বিস্তারে —যা মানুষের চেতনাকে সমগ্রভাবে ছড়িয়ে দেয় বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন পথে। মানুষের মনের ও চেতনার স্বাভাবিক বিকাশের তাগিদেই মানুষ তার সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। সমাজ-পরিবর্তনে মানুষের চেতনার দায়িত্ব এইখানেই।

কুদ্দুস সাহেব ও সরোজ দত্ত 'উর্বশী' কবিতার ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ভাবে : যেহেতু রবীন্দ্রনাথের উর্বশী মাতাও নয়, কন্যাও নয়, আবার বধূও নয়, সুতরাং এ-মেয়ে নিশ্চয় "বেজন্মা" মেয়ে।[১] এরকম মেয়ের সমাজে কোথায় স্থান, তাও তাঁরা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এবং এই ব্যাখ্যা থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে শুধু প্রতিক্রিয়াশীল বলা হলে তাঁকে প্রশংসাই করা হয়। তাঁর স্থান কাব্য-জগতেই নয়।

১. এই রচনাটির লেখক গোলাম কুদ্দুস, সরোজ দত্ত নন। দ্র. পরিচয়, মাঘ ১৩৫৬; পৃ. ৩৮।—সম্পাদক

এই মন্তব্যের প্রতিবাদে কিছু বলা অনাবশ্যক। বড়জোর বলা যেতে পারে যে এঁরা কবিতার কিছুই বোঝেন না। কবিতা তাঁরা জীবনেও পড়েন না। নচেৎ এ-ধরনের কথা বলার সাহস তাঁদের এলো কোত্থেকে?

"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।

উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা॥" [উর্বশী]

এ-কবিতার সৌন্দর্য অস্বীকার করা হলে আর কিছুই বলার থাকে না, কেবল Marx-এর সেই কথাই মনে হয়, "as thc finest music has no meaning for an unmusical ear."

কবিতার কান কি করে তৈরী করা যায়, তার উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য নয় এবং সে ক্ষমতাও নেই, তবু জিজ্ঞাসা করি এ-কবিতা কোন পাঠকের মনে দোলা না দেয়?

অথবা ধরা যাক্ "মদনভস্মের পর" কবিতাটি:

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতিবিলাপসংগীতে,
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
ফাগুন মাসে নিমেষ-মাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি মূরছি পড়ে অবনী॥"

রবীন্দ্র-কবিতায় প্রকৃতি একটি প্রধান স্থান পেয়েছে। কিন্তু সে-প্রকৃতির রূপ অভিনব। Wordsworth প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্র-কবিতায় যে-প্রকৃতি তার রূপ একটু স্বতন্ত্র।

কবির প্রতিভায় ও তাঁর আশ্চর্য দৃষ্টিতে প্রকৃতি মানুষের মনের মধ্যে এক সম্পূর্ণ নতুন চেতনা জাগাল। প্রকৃতি হয়ে উঠল প্রাণবন্ত, যাকে মার্কস বলেছেন—"humanised nature". এ সে-প্রকৃতি নয়, যার সঙ্গে আমাদের গতানুগতিক যোগাযোগ। এ-প্রকৃতির রূপ যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি সুন্দর। তাই বাঙলার ঋতু আশ্চর্য সমৃদ্ধশালী হয়ে দেখা দিল তাঁর কবিতায়। এমনটি আগে হয় নি।

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা—
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥" [দুঃসময়]

কিংবা,

"ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে,
শিখীদম্পতি কেকাকল্লোলে বিহরে।
দিগ্‌বধূচিত্ত-হরষা।
ঘনগৌরবে আসে উন্মাদ বরষা॥" [বর্ষামঙ্গল]

রবীন্দ্রনাথের আর একটি সার্থক কবিতা 'মত্ত সাগর দিল পাড়ি' (বলাকা)

উল্লেখ করা যেতে পারে।

"এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে,
সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আসছে তরী বেয়ে।
কোন ঘাটে সে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি।
পথ হারা কোন পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
কোন অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েছে পথ চেয়ে।
অগৌরবের বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে॥"

এ-কবিতার প্রতীক সহজবোধ্য ও সার্থক। এদিক থেকে বিচার করলে নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে এত সুন্দর দেশপ্রেমের কবিতা আমাদের দেশে খুব কম।

কিন্তু তৎকালীন "শিক্ষিত সম্প্রদায়ের" যে-গলদ ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সে-গলদ অনেকাংশে থেকে গেছে। তিনিও বাঙালী সমাজের দৈন্য, অসম্পূর্ণতা বা একপেশেমি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এ-গলদ কাটাবার জন্য যে-বিপ্লবী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল, সে-দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন অর্জন করতে সক্ষম হন নি। এইখানেই তিনি ছিলেন তাঁর নিজস্ব সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের victim। সামাজিক পরিবেশের কাছে ব্যক্তির পরাজয় স্বীকার এই প্রথম নয়। পাশ্চাত্য সমাজেও এমন ঘটনা বার বার দেখা গেছে। Goethe হয়তো তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তাই রবীন্দ্রনাথের এই অক্ষমতা আকস্মিক বা হৃদয়বিদারক নয়।

রবীন্দ্র-সংস্কৃতি পুরোমাত্রায় বাঙালী-সংস্কৃতি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালী-সংস্কৃতি নিছক রবীন্দ্র-সংস্কৃতি নয়; তার বিভিন্ন রূপের একটি নিদর্শন রবীন্দ্র-কাব্যে। তাই বাঙালী-সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-কাব্যের অনেক গলদই চোখে পড়তে বাধ্য।

ইংরাজ-শাসনে বাঙালী সমাজে যে-ভাঙন দেখা দিল, সে-ভাঙনের জোয়ার বাঙালী-সংস্কৃতিকেও আঘাত করল। কিন্তু এ-ভাঙনের সম্পূর্ণ তাৎপর্য

রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারলেন না—যেমন পারলেন না তৎকালীন শিক্ষিত-সম্প্রদায়। রবীন্দ্রনাথের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এলো তাঙ্গনের একটি তাগিদ থেকে। সে তাগিদ বিশিষ্ট হলেও সংকীর্ণ, তাই তিনি বিপ্লবী জীবনদর্শনের প্রয়োজন বোধ করলেন না। তাঁর আংশিক তাগিদ পর্যাপ্ত বিকাশের সম্ভাবনা পেল সনাতনী উপনিষদের জীবনদর্শনে।

উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ এবং নিজস্ব সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ—এই দুই ভাবধারার মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগত। তাই সে-জগত শুরু থেকে শেষপর্যন্ত আবদ্ধ হয়ে গেলে lyric-এ। আর তাই অপূর্ব এবং আশ্চর্য হলেও, lyric ছাড়িয়ে যেতে অসমর্থ হল তাঁর কবিতা। এ-যুগপৎ অপূর্বতা ও অসম্পূর্ণতা স্বীকার না করে উপায় কি?

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে সত্তার পূর্ণ বিকাশের স্বীকৃতি থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং রবীন্দ্র-কাব্যে মানবিকতাবোধ বা সৌন্দর্যবোধ যে-বিস্তার বা স্বীকৃতি পেল তাও আংশিক স্বীকৃতি। তাই জীবনের বিভিন্ন সমস্যার তিনি স্থান দিলেন আংশিকভাবেই—সম্ভব হল না চেতনার সর্বাঙ্গীন বিস্তার।

নর, নারী, পুরুষ, প্রকৃতি এমন কি জীবন-মৃত্যুর সমস্যাও ব্যাপক অর্থে এলো না তাঁর কাব্যে। জীবনের সমস্ত ঝড়-ঝঞ্ঝাও সমর্থ হল না তাঁর কাব্য-লোকে প্রলয়-আন্দোলন সৃষ্টি করতে। পার্থিব জীবনকে দেখলেন তিনি হালকা ভাবেই। এমতো কাব্যে Tragedy-র স্থান কোথায়? যাঁর কাছে সমস্ত সমস্যাই শেষপর্যন্ত উপনিষদের 'শান্তির' আবেষ্টনীতে বাঁধা রয়ে গেল, তাঁর সৃষ্টিতে কেমন করে সম্ভব হবে Tragedy? তাঁর যে সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজা, সে পূজার কোথায় Tragedy স্বীকৃতি পাবে? Macbeth-এর সব আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল কিন্তু তবু তিনি সুখী হলেন না, শান্তি এলো না তাঁর জীবনে; কোথায় যেন কি এক ক্ষত থেকে গেল। Faust-এর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা টেনে নিয়ে গেল তাঁকে শয়তানের কবলে। Aragon তাঁর প্রিয়ার বিরহে অন্ধকার দেখলেন সমস্ত ফরাসী দেশটাকে। আর রবীন্দ্রনাথ প্রিয়াকে না পেলেও প্রিয়ার ফেলে দেওয়া বকুল মালাতেই পেলেন সান্ত্বনা। মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও গান করলেন—"সম্মুখে শান্তিপারাবার।"

এখানেই রবীন্দ্র-কাব্যের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। একদিক থেকে তাই বলা যায় যে, আধুনিক সমাজে বাস করেও রবীন্দ্রনাথ যে-কাব্য সৃষ্টি করলেন, সে-

কাব্য বাঙলার কুলীন সংস্কৃতিরই জের। হয়তো বাঙালী সমাজের বিকাশ স্বাভাবিক বিকাশ হলে এ-সঙ্কীর্ণতা তাঁর কেটে যেত, কিন্তু সে যাইহোক এটা তাঁর অক্ষমতা তা স্বীকার করতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি ছিলেন না। উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন অনেক। এবং এখানেও দেখা যায় তাঁর অসামান্য সাহিত্য-প্রতিভা।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিঃসন্দেহেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চেয়ে উঁচুদরের, যদিও তাঁর সব উপন্যাসগুলি তুল্যমূল্য নয়। গোরা, চোখের বালি, যোগাযোগ, উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। বাঙলা দেশের সমাজে উৎকৃষ্ট উপন্যাস সৃষ্টি হওয়া দুরূহ, কারণ এ-সমাজের কাঠামো বড় ছোট এবং কঠিন। ব্যক্তির সত্তা এখানে অত্যন্ত অস্পষ্ট তাই representative চরিত্র বিরল। তবুও এই সামাজিক কাঠামো বা গণ্ডীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

বীরেন পাল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করতে গিয়ে ১নং 'মার্কসবাদী'তে "শেষের কবিতা" বইটিকে সামনে তুলে ধরেছেন এবং "শেষের কবিতা"র অমিত ও লাবণ্যের মিলনের অন্তরায় খুঁজবার চেষ্টা করেছেন তাদের দু'জনার সামাজিক ব্যবধানে! এ-ধরনের আলোচনা অজ্ঞতার পরিচয়। প্রথমত, "শেষের কবিতা"-কে রবীন্দ্রনাথের representative উপন্যাস হিসাবে দেখাটা ভুল। কারণ, মূলত এটি উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না। উপন্যাস হিসাবে এর মূল্য প্রায় নেই বলা চলে। তাই গোরা, ইত্যাদি বাদ দিয়ে এ-বইটির ওপর গুরুত্ব দেবার কোনো মানেই হয় না। দ্বিতীয়ত, ব্যারিস্টারের ছেলে অমিত ও অধ্যাপকের মেয়ে লাবণ্য—এদের দু'জনার মধ্যে সামাজিক তফাৎ খুঁজতে গিয়ে বুর্জোয়া ও ফিউডাল সমাজের দ্বন্দ্বকে টেনে আনাটা কি নিছক অবাস্তব কাল্পনিক সমালোচনার পরিচয় দেয় না? বিশ্লেষণ যদি করতেই হয় তবে এইটুকুই বলা যায় যে, অমিত এবং লাবণ্যের রুচির প্রভেদই তাদের মধ্যে ব্যবধান এনে দিয়েছিল। এর বেশী কিছু বলা অসম্ভব।

গোরা, যোগাযোগ বা চোখের বালি ইত্যাদি পড়লেই দেখা যায় যে, যথেষ্ট সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ যে এ-ধরনের উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন, তার প্রধান কারণ ছিল তাঁর উদার মানবতাবোধ। রবীন্দ্রনাথের মহত্ব এই মানবতাবোধেই। তাই স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক মিলনের জন্যে সামাজিক বাধাকে অস্বীকার করতেও ভয় পেলেন না

"গোরা"-রচয়িতা। যে-সমাজ এই স্বাভাবিক মিলনের অন্তরায় হল সেই সমাজের প্রতি পাঠকের ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হলেন ঔপন্যাসিক। যোগাযোগে 'কুমুর' চরিত্র কোন পাঠকের মনকে নাড়া দেবে না? যে-সামাজিক ব্যবস্থার ফলে একটি মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে হয়, সেই সামাজিক ব্যবস্থার অপরূপ ছবি কি যোগাযোগে ফুটে ওঠে নি? "বাতি কি আর জলবে না বউ?"—এ লাইন কোন সহানুভূতিশীল পাঠকের চক্ষে জল না এনে দেবে?

"চোখের বালি"তে বিনোদিনী বিধবা। সুতরাং আমাদের সামাজিক দৃষ্টিতে তার সমস্ত কার্যকলাপ অমার্জনীয়। কিন্তু তবুও পাঠকের টান থেকে যায় ওই সমাজের নিন্দনীয় মেয়েটির প্রতি। এই টান আসে হয়তো পাঠকের অজ্ঞাতসারে কিন্তু তবুও পাঠক কি সাময়িকভাবে হলেও বিদ্রোহ জানান না এই সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে? জানান না কি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন নারী-পুরুষের স্বাভাবিক মিলনের ইচ্ছাকে? প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বাভাবিকভাবে ফুটেছে আর তাই সার্থক হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাসগুলি।

কোনো কোনো সমালোচক রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেছেন তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বলে। আবার অনেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রগতিশীল, কারণ তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ প্রগতিশীল না হলেও প্রতিক্রিয়াশীল ছিল না। অনিমেষবাবু দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়েন। রবীন্দ্র গুপ্তকে খণ্ডন করবার জন্য তিনি যে-প্রবন্ধ লিখেছেন, সে-প্রবন্ধে দর্শন থেকে রাজনীতি—সব কথাই আছে—কেবল নেই সাহিত্যের কোনো কথা। প্রবন্ধটির গুণাগুণ যাই হোক্,—তাকে যে ঠিক কোন বিষয়ের প্রবন্ধ বলে ধরব তা বোঝা মুস্কিল।

মনে হয় তিনি বোধহয় একটি নতুন রাজনৈতিক প্রস্তাব আনার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের উপর অথবা অন্য সাহিত্যিকের ওপর যে-আলোচনা তিনি করেছেন, তার সার্থকতা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, কোনো সমালোচকই রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের কোনো উল্লেখ করেন নি। অথচ তাঁর গল্পগুচ্ছের ছোট গল্পগুলি আশ্চর্য প্রতিভার নিদর্শন দিয়েছে। বাঙালী সমাজ ছোট গল্প লেখার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী এবং বাংলা সাহিত্য ছোট গল্পে যথেষ্ট সমৃদ্ধ; বোধহয় পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে

সমমর্যাদা আমরা পেতে পারি একমাত্র ছোট গল্পে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে কবিতা বা উপন্যাস বাদ দিয়েও অনেক কিছুই লিখেছেন। সব লেখাগুলি তুল্যমূল্য নয়। তাঁর সামাজিক মতবাদ স্পষ্টতই প্রতিক্রিয়াশীল। তবুও অনেক সময় তাঁর সামাজিক মতবাদ যে কিছুটা পরিমাণে সময়োপযোগী হতে পেরেছিল তার একমাত্র কারণ তাঁর উদার মানবতাবোধ। তাই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টি নিয়েও তৎকালীন সমাজের অনেক গলদই তাঁর চোখে পড়েছিল। এবং রবীন্দ্র গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের চরম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মত দেখাতে গিয়ে যে বইটিকে (আত্মশক্তি) বিশ্লেষণ করেছেন, মজার ব্যাপার যে ঠিক সেই বইটিতেই তাঁর উদার মানবতাবোধের সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেয়েছে। সমালোচক হিসাবে রবীন্দ্র গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত, তাই এ-দিকটি তাঁর নজরে পড়ে নি।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিক্রিয়াশীল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মানবতাবোধই শেষবয়সে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বের প্রগতিশীল দুনিয়ার অনেক কাছে এনেছিল। শুধু তাই নয়, নিজের মতবাদের অনেক গলদই শেষজীবনে তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল, যার জন্য ফ্যাশিবাদের তীব্র সমালোচনা তিনি করতে পেরেছিলেন, আর পেরেছিলেন সোভিয়েট রুশিয়াকে সমর্থন জানাতে।

যুদ্ধোত্তর বাঙলায় রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে, আজ বিশ্বের কোন ক্যাম্পকে সমর্থন করতেন তা বলা দুরূহ হলেও একথা মানতেই হয় যে, বাঙলার প্রগতি সাহিত্যের ঐতিহ্যে তাঁর সাহিত্য বিরাট স্তম্ভ।*

* ডাক, তৃতীয় বর্ষ, শারদীয় সংকলন ১৩৫৭, পৃ. ১-৪৪ ; সনৎ বসু পঞ্চাশের দশকে তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরূপে খ্যাতিমান ছিলেন। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো সংশোধন করা হয়েছে। —সম্পাদক

সংগ্রামী সাহিত্য / শান্তি বসু

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের এই শেষপাদে সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা নিয়ে আবার বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। যা ছিল আলোচনার বিষয়, আমাদের অদ্ভুত দেশ বলেই হয়তো, আলোচনার স্তর পেরিয়ে তর্কের আশ্রয় নিয়েছে ; প্রায়শই যা কুতর্ক, সহজ আলোচনার স্বাভাবিক পরিবেশের অভাবে, ব্যক্তি-বিদ্বেষ, অবিনয়ী ও উদ্ধত মতবাদে গণ্ডীবদ্ধ। যতটা বাধিত বোধের সমন্বয়ে সার্থক সাহিত্যালোচনা সম্ভব এবং যা প্রধানতই সাহিত্যিক মূল্য-নিরূপণ, আমাদের ভাবের রাজ্যে তার প্রবেশাধিকার নেই। মতবাদে আমরা যতটা তৎপর চিন্তায় ততটাই পশ্চাৎগামী ও অন্যনির্ভর। ফলে, চিরকালই যা হয়েছে, অন্যের তরণী-আশ্রয়ে সমুদ্রপাড়ির একান্ত কামনা কোনো মুহূর্তেও সাফল্যলাভ করে নি।

আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির দেশে আত্যন্তিক কারণেই জনসাধারণের মুক্তি-আন্দোলন বিরাট আকার নেবে, ঔপনিবেশিক শোষণের লৌহ-শৃঙ্খল ভেঙে ভবিষ্যৎ সুখী-জীবনের ভিত্তি স্থাপন করবে। গণ-আন্দোলনের এই প্রবাহে, ইতিহাসের প্রয়োজনেই, মার্কসবাদ হবে পুরোধা। মার্কসবাদের আলোকে তখন জীবন ও ইতিহাসের সমস্ত জট ছাড়াবার চেষ্টা চলবে, নতুন-ভাবে দেশের ঐতিহ্যকে ব্যাখ্যা করে বর্তমান জীবনের সঙ্গে সেতুসংবদ্ধ করা হবে। অতীত ও বর্তমানের সেতুসঙ্গম, একমাত্র মার্কসবাদেই যার সম্ভাবনা ও পরিণতি, সার্থক সাধিত হয়েছে, আমাদের চিন্তাবীররা প্রায়শই এ-দাবী করে থাকেন। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন তাঁদের নেতৃত্বে, ক্রমান্বয়ে উচ্চতর পর্যায়ে উঠছে, ঐতিহ্য-বিচার এবং এমন কি সাহিত্যের পরিণত দিকনির্দেশ সঠিকভাবে তাঁরাই করেছেন, যা মার্কসবাদী হিসেবে অনেক আগেই করা উচিত ছিল। কর্তব্য সম্পর্কে যথাবিহিত অবহিতি থেকেই যে সম্যক দৃষ্টিভঙ্গি আসে না একথা রাজনীতি-সমাজনীতি থেকে সাহিত্য-শিল্প সব কিছুতেই প্রতিফলিত, বিশেষ করে, মার্কসবাদী হিসেবে সচেতন থাকা যুক্তিবিচারের প্রকৃষ্ট পথ। আবার যে যুক্তিবিচার-পদ্ধতি

মার্কসবাদের আলোকে আলোকিত এ-মন্তব্য করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, যদি-না সব বিষয়ে সমান জ্ঞান ও বোধের বিনয়হীন অভাব থেকে, ইতিহাস-সন্ধানে ইতিহাসকেই বিকৃত করবার সম্ভাবনা দেখা না দিত। অতি প্রাচীনকাল থেকে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহমূলক আন্দোলন সব কিছুকেই অতি সহজে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিনা দ্বিধায় মার্কসবাদের তাৎপর্যটুকুসই ভুলতে বসা হয়েছে, প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনায় ('ভারতবর্ষ আদিম সাম্যতন্ত্র থেকে দাসত্ব') ওপরে রাজনীতি ও সাহিত্যের অপূর্ব এক সমীকরণের কথা বলেছি। মার্কসবাদী মহলে এই সমীকরণের চাহিদা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে এবং আরো বাড়বে, যতই রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্ব ও সম্ভাব্য ব্যাপকতার আশা সার্থক হতে থাকবে। তার কারণ যতো ভালো রাজনীতি ততো ভালো সাহিত্য—এই সহজ-সরল সূত্রটি তো দিনে দিনেই তখন ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠবে।

বেশ কিছুদিন থেকেই আমি সন্দেহ করেছিলুম যে মার্কসবাদী মহলে সাহিত্যবোধের অভাব থেকে বাংলা কবিতায় মারাত্মক কুফল ফলবে। আমার সে-সন্দেহ যে অমূলক নয় গত কয়েক মাসের বিভিন্ন পত্রিকার কবিতা-গল্প তার প্রমাণ। 'সংগ্রামী' বা 'জঙ্গী' এই নামে বর্তমানে সাহিত্যের নতুন শ্রেণী-বিভাগ হয়েছে এবং তা হয়েছে স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ রাজনীতির প্রয়োজনে। সাহিত্যে এ-ধরনের কোনো শ্রেণীবিভাগ যে হতে পারে না তার প্রমাণ সাহিত্যের ইতিহাসই শুধু নয়, বিদেশের প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য সমালোচকের লেখা থেকে প্রমাণ করা চলবে। অবশ্য মার্কসবাদী চিন্তাবীররা 'সংগ্রামী কবিতা' বা 'সংগ্রামী সাহিত্যে'র সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, লেনিন-মার্কস আউড়েই দেবার চেষ্টা করেছেন। নানা ধরনের যুক্তিবিন্যাস তাঁরা করেন, করেন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসেই এবং প্রয়োজন হলে অবাধে পটভূমিচ্যুত অবান্তর উদ্ধৃতিতেও পেছপা হন না।

সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার প্রথম সূত্র তাঁদের, সাহিত্য শ্রেণীচেতনার অনুভূতিময় প্রতিফলন অথবা সাহিত্য শব্দ-চিত্রে বিশেষ শ্রেণীচেতনার প্রকাশ। প্রত্যেক মানুষ কোনো-না-কোনো শ্রেণীর অংশভূত, স্বভাবতই তাই, তাঁরা তাঁদের বাক্যে ও চিন্তায়, সেই শ্রেণীর সত্যকেই প্রকাশ করেন। কবি ও শিল্পী হিসেবে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের শ্রেণীরই প্রকৃষ্ট মুখপাত্র, অর্থাৎ বিশিষ্ট শ্রেণীর কথা

সবচেয়ে ভালো করে সাহিত্যভাত করতে পারলেই পুরুষার্থ লাভের পথ খোলা। ফলে, শেক্‌সপীয়র বুর্জোয়াদের জীবনকে চিত্রিত করেই শ্রেষ্ঠ, এবং রবীন্দ্রনাথ জমিদার ও উচ্চশ্রেণীর কবি। অবশ্য শেক্‌সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ মহৎ-শিল্পী— কারণ তাঁরা দুজনেই তাঁদের শ্রেণীর কথা কবিজনোচিত উপায়ে প্রকাশ করতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে এই বিচারেও ত্রুটি থাকে, রবীন্দ্রনাথ তখন সাভারকরের গুরু ও জহরলালের মন্ত্রদাতা, কবিতায় ভাববাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদের পোষক; শুধু তাঁর মহত্ত্ব 'সভ্যতার সংকট'-এ, ইত্যাদি। এই সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার আসরে মার্কসকে নিশ্চয়ই টেনে আনা হয়, সুবিধেমতো তাঁর সিদ্ধান্ত— 'অস্তিত্বই চৈতন্যের নির্ধারক'—বিশ্লেষিত-ও হয়। বিশ্লেষণের ধারা একান্তভাবেই মনস্তাত্ত্বিক, বস্তুগত নয়, শ্রেণীর মানসিক অনুভূতি প্রকাশ করাই যখন সাহিত্য! ইতিহাসে এ-পর্যন্ত শিল্পী-সাহিত্যিকরা যেহেতু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণী থেকে এসেছেন, এ-কথা তো বলতেই হবে, তাঁরা তাঁদের শ্রেণীর কথাই এতদিন ধরে লিখছেন। তাই গোগোল নীপার-কসাকদের জীবন নিয়ে লিখেও কসাকদের জীবনের কথা প্রকাশ করেন না, য়ুক্রেনবাসীর পোশাক ও গরম ওভারকোটে আপাদমস্তক ঢেকে, তাঁরা নিজের জীবনের কথাই বলেন, যে মধ্যবিত্ত জীবনেই তাঁর আত্মার সদ্‌গতি! মার্কসবাদী সমালোচকের কাজ এই সব লেখার স্তূপ থেকে লুকনো শ্রেণীচরিত্রটি খুলে ধরা, তাকে সাধারণ মানুষের গোচরে আনা। এক সমালোচক অত্যন্ত সুন্দর করে এই অবস্থাটির বর্ণনা দিয়েছেন:

"He is the rightful psychlogical product of his own life, the life of his class, of his group, of his own stratum, his own dunghill. The more closely we link the artist to this dunghill, the *more exact* and the *more scientific* will be our analysis"..... ..

বিবর্তনের ধারাকেই সরাসরি, মার্কসের সতর্কবাণী অস্বীকার করেই, ভারতবর্ষের মান হিসেবে ধরা হয়েছে। উনিশ শতকের সাঁওতাল-বিদ্রোহ ও সিপাহী-বিদ্রোহ তাই ইউরোপের 'কৃষক-বুর্জোয়া' অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হচ্ছে, ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি, আমলাতান্ত্রিক মূলধন ও শ্রেণীবিন্যাসের কথা সম্পূর্ণই ভুলে গিয়ে। উনিশ শতকেই 'কৃষক-বুর্জোয়া' অভ্যুত্থান, পরেই তো দেখা গেছে, কেমন করে 'কৃষিতে ধনতন্ত্রই প্রধান' রূপ নেয়—শেষ পর্যন্ত

সর্বেতেই ভূতের আত্মপ্রকাশ, 'বি-উপনিবেশীকরণ' মতবাদে।

সাহিত্য-বিচারে এই ভ্রমাত্মক চিন্তার চেহারা অত্যন্ত মারাত্মক। ইতিহাসের বিকৃতিই নয়, শিল্পসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, জ্ঞান এবং বোধের অভাব থেকে অতীতের ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করবার ঝোঁক পেয়ে বসে; রবীন্দ্রনাথের মহৎ কীর্তিকে যেমন কলংকিত করবার চেষ্টা হয়েছে। এ-কথাই শেষ নয়, সাহিত্যিক মূল্য-নিরূপণকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিকেই মুখ্য স্থান দেবার প্রচেষ্টা থেকে, রাজনীতি ও কবিতার অপূর্ব এক নির্যাস তৈরী হয়েছে। অবশ্য প্রাসঙ্গিকভাবে একথাও অত্যন্ত সত্য যে সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমির বিচার না করে সাহিত্যিক মূল্য-নিরূপণ অসম্পূর্ণ। কারণ, যে-পটে জীবন বিধৃত, ব্যাপকভাবে আবার যা জীবনের নব মূল্যায়ণেই রূপান্তরিত, তার ইতিহাস, ব্যাপ্তি ও জীবন-সংযোগ সাহিত্যের সার্থকতার জন্যেই প্রয়োজন। কিন্তু রাজনীতির প্রাধান্য থেকে, আমাদের মার্কসবাদী মহলে, সাহিত্য ও রাজনীতিকে বীজগণিতের সমীকরণে পর্যবসিত করা হয়েছে। রাজনীতির অর্থে, রাজনীতির মানে, যা তৎকালীন আন্দোলনের ধারাকে প্রকাশ করে তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য; অবশিষ্ট যা তা হয় 'বুর্জোয়া' 'সংস্কারবাদী' নয়তো 'প্রতিক্রিয়াশীল'। কিন্তু সমগ্র কবিসত্তাই যে কবিবিচারের মূল, সাহিত্যিক-রাজনৈতিক মূল্যায়ণে সমকালীনতা যে রাজনীতির স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অর্থে নয়—জীবনের গতি ও ছন্দের অর্থেই, একথা মার্কসবাদীরা নিঃসংশয়ে ভুলে বসে আছেন। অবশ্য লেনিনের উক্তি উদ্ধার করে দেখানো যাবে ভুলের মধ্য দিয়েই মার্কসবাদীর ইতিহাস পরিক্রমা; তবু ভুলটাই তো প্রথম ও শেষ নয়, একটা ঘটনা মাত্র। আসলে ত্রুটি স্বীকারের সৎসাহস ও বিনয়ী মনোভাব নিয়ে ইতিহাসের পাঠগ্রহণ আমাদের কর্তব্য।

"Each literary work is those converted into a coded telegram, and the entire history of art into the collection of rebuses and symbolic figures hiding certain class meanings. We have to decipher these hieroglyphics in order to determine their sociological equivalent."... ...

"Dogmatic Marxism understands by class analysis the establishment of primary social-psychological types and styles

of thought, truthful from the point of view of their own classes, and false from the point of view of the opposing classes. The sociologist merely *explains* these types. He reasons like Voltaire's Doctor Pangloss : 'Every thing is as it is, and cannot be otherwise." [ইটালিকস্ লেখকের]

এই সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার সঙ্গে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কোনো সম্বন্ধ নেই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে 'মনস্তাত্ত্বিক প্রতিফলন' সার সত্য নয়, এমন কি কোনো সত্যই নয়; বাস্তব জীবনকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য-বিচার। শেকস্পীয়র, রবীন্দ্রনাথ ও টলস্টয় বুর্জোয়া উচ্চবিত্ত ও জমিদারশ্রেণীর জীবন সাহিত্যভাত করেই মহৎ শিল্পীর সার্থকতা লাভ করেন নি; তাঁরা লেনিনের ভাষায় বিপ্লবের কোনো-না-কোনো বিশিষ্টরূপ প্রকাশেই মহৎ। লেনিন বলেছেন, "An artist truely great must have reflected in his work at least some essential aspect of the revolution". এজন্যেই মার্কস-এঙ্গেলস বহুবার শেক্সপীয়র, গ্যয়টে, বালজাক, লেনিন টলস্টয় ও পুশকিনের মহত্ব, দুর্বিনীত ও মূর্খদের হাত থেকে, অকলংকিত রাখবার জন্যে কলম ধরেছিলেন। এই সমস্ত মূর্খ ও দুর্বিনীত সমালোচকদের কাছেই রোলাঁ ছিলেন 'পাতিবুর্জোয়া মানবতাবাদী', আনাতোল ফ্রাঁস 'মধ্যবুর্জোয়া'। একথা বোধহয় তাই খুব আশ্চর্য শোনাবে না যে, একদা প্লেখানভই লেনিনকে, 'হোআট্ ইজ্ টু বি ডান্' পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে চৈতন্যের শ্রেণীস্বরূপ অবহিত থাকবার জন্যে উপদেশ দিয়েছিলেন। নিকৃষ্ট মার্কসবাদীদের জন্যে নিম্নোক্ত উক্তিটি তাই অত্যন্ত মূল্যবান :

' Leninism demands something entirely different. The class nature of spiritual phenomena is determined not by their subjective colouring, but by their depth of comprehension of reality. From this objective world comes the subjective colouring of class ideology. It is a *conclusion* and not a *premise*. A man who is capable of rising to hatred of oppression and falsehood in all this manifestations and forms in the social life of his epoch, becomes an ideologist of the revolutionary class.

A man who is completely immersed in his individual existence, in his basic isolation, remains for ever under the influence of reactionary ideology. In contrast to the dogmatist marxism of the Mensheviks and the Economists, Lenin proved that class consciousness does not originate automatically. No one is born an ideologist of a definite class ; he *becomes* one."

কবিতার ক্ষেত্রে এই 'সমাজতত্ত্বের' চেহারাটা হলো এই: সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের হাতিয়ার ; প্রায় যুদ্ধে রাইফেলের পর্যায়েই পড়ে। শত্রুকে পর্যুদস্ত করা হাতিয়ারের কাজ ; শ্রেণীসংগ্রামে ইস্তাহার থেকে কবিতা সব কিছুই শ্রেণীশত্রুকে বিব্রত, ব্যতিব্যস্ত ও ধ্বংস করার কাজে প্রয়োজন। কবিতা যখন "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" হাতিয়ার, স্বভাবতই, যুদ্ধ-হাতিয়ারের আঘাত করবার ক্ষমতা কবিতা-হাতিয়ারের ওপরেই বর্তায় ; ফলে, কবিতা যতো বেশি সোচ্চার, ততো বেশি তার ক্ষমতা, যতো বেশি অশ্লীল কটু-কাটব্য গালিগালাজ, ততো বেশি তার অগ্নিসঞ্চারী প্রাণবন্তুতা এবং শেষপর্যন্ত "ইনকিলাবী" ঢঙে বিশ্ব-বিপ্লব কিংবা শ্রমিকশ্রেণীর জয়ধ্বনি ; কারণ, মার্কস-ই বলেছেন, শ্রমিকশ্রেণীর জয় অনিবার্য। রাজনীতির একটা সিদ্ধান্ত: 'যতো সংগ্রাম ততো সংগঠন এবং সংগ্রামেই একমাত্র সংগঠন সরাসরি কবিতায় আমদানি করা হয়েছে. যতো জঙ্গীত্ব ততো উচ্চশ্রেণীর কবিতা। গত দু'বছরের কবিতার স্তূপ থেকে দুজন 'বিখ্যাত' কবির উদাহরণ দিচ্ছি :

"যুদ্ধ বাধাবে ?
যুদ্ধে পাঠাবে ?
বারুদের মুখে ছুঁড়বে আমাকে ?
ভেবেছ কী ?
যুদ্ধে যাবনা—ভেবেছ কী ?
তোমার যুদ্ধে যাবনা যাবনা
যুদ্ধ আমার তোমার সাথে—
ধান দেবনা পাই দেবনা জান দেবনা
যুদ্ধ চাইনা শান্তি চাই
তোমাকে মেরেই শান্তি চাই।"

এখানেই শেষ নয়, এই বিপ্লবী-কবি এতেই ক্ষান্ত হতে পারেন না, কবিতার হাতিয়ারে জমিদখল ইত্যাদি করা তখনো শেষ হয়নি। তাই—

"দেখছো কী হে?
দেখছো কী হে?
নভেম্বরে
আসছে সনের নভেম্বরে
বাংলা বানাবো তেলেঙ্গানা
বাংলা বানাবো চীনেরও বাড়া
বাংলা বানাবো লেনিনগ্রাদ :
ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ!
ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ!!

['ভেবেছো কী', অনিল কাঞ্জিলাল]

'পরিচয়'-সম্পাদক গোলাম কুদ্দ্‌স সাহেব লিখছেন :

"কানে যাদের তুলো গোঁজা, মন যাদের পাষাণ,
যাদের গরীবের বুক চিরে প্রতিদিন চলে রক্তপান
ভারতের উপবাসী ক্ষুধার্ত জনতা
তাদেরও শুনাতে চায় চরম বারতা,
তাহাদের হাতে রেখে হাত
পদতলে ক'রে প্রণিপাত
পণ্ডিত নেহরু তুমি করে নাও শেষ আলাপন
ক্ষুব্ধ ভারতে আজ দুরন্ত ক্ষুধার উদ্দাম গর্জন,
গরীব মানুষ আজ তোলে উচ্চশির—
দিকে দিকে শান্তি চাই, কাজ চাই, চাই শান্তিনীড়।"

[নেহরুর আমেরিকা যাত্রা]

খুব বেশি উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই; গত দু-বছরে অজস্র 'কবিতা' লেখা হয়েছে, যদি তাকে কবিতা বলা চলে। জীবন, সংগ্রাম ও কবিতা সম্পর্কে বোধের অভাব থেকে ক্রমশই কবি-সাহিত্যিকরা বিপথে চালিত হচ্ছেন, এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় যে পৌঁছুবেন তার প্রামাণ্য নজীর হিসাবে কাঞ্জিলাল-

কুন্দনদের কবিতা অনায়াসেই উল্লেখ করা যায়। এঁদের সম্পর্কেই বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক বেলিন্‌স্কি বলেছেন :

"Every poetical work is the fruit of a powerful idea that has taken possession of the poet. If we assumed that this idea is merely the result of his mind's activity, we would thereby kill not only art but even the very possibility of art. Indeed, *why should we not become poet when want drives us, profit tempts or the fancy takes us,* if all that is necessary, is to think out some idea and press it into a thought-out form ? No, not thus do poets by nature and calling work. *He who is not a poet by nature may think out some deep, true, even sacred idea, but what he write will nevertheless come out petty, false, insincere, ugly, dead--and it will not convince any one, but rather disappoint everyone in the idea he expresses, despite all its truth. Nevertheless, that is precisely how the mob understands art, and that is what it demands of poets* !"

বেলিন্‌স্কি বলেছেন বলেই, এদেশে, আমাদের মতো ক্ষুদ্রবুদ্ধি সাহিত্য-আলোচকদের অনেক বিষয় সহজবোধ্য হয়ে যায়। বর্তমানে রাজনীতি ও কবিতার সমীকরণটি যাঁরা করেছেন এবং ফলাও করে প্রচার করেছেন, আয়ত্তে থাকলে নির্দেশও দিচ্ছেন, তাঁদের মস্ত বড় একটা যুক্তিই হলো—এই মুহূর্তে জনসাধারণ (বেলিন্‌স্কির 'mob' ?) তোমাদের কাছে 'সহজ-সরল উদ্দীপনাময় কলাকৌশলে'র কবিতা চায় এবং তাই লিখতে হবে। জনসাধারণের বর্তমান রুচির বিচারে কবিতার কলাকৌশল 'সহজ-সরল' না হলে—সেই কবি হয় 'তৃতীয় শক্তির দালাল' নয়তো 'বুর্জোয়া ভাববাদী', তাঁর, বেলিন্‌স্কি-কথিত 'poetical idea' থাকলেও। অথচ বেলিন্‌স্কিই বলেছেন—'art does not tolerate abstract philosophical or, all the more, rationalising ideas : it tolerates only poetical ideas. And the *poetical idea is not a syllogism, not a dogma, not a rule ; it is pulsing passion, it is pathos.* [ইটালিকস্‌ লেখকের]

এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদীর সাহিত্যালোচনার কথা স্মরণ করলে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে বেলিন্‌স্কির সাহিত্যিক সিদ্ধান্ত মার্কসবাদী মানেন না এবং মানেন না

বলেই সিমোনক ও বিষ্ণু দে-র, সুকান্ত ও লোককবির কবিতা নিয়ে অপরিসীম গোলযোগে পড়ে যান।

অবশ্য নিকৃষ্ট মার্কসবাদীদের আরও একটা যুক্তি আছে। লেনিন বলেছেন, তাঁরা ঘোষণা করেন—"down with non-party writers". দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে না গিয়েও দেখানো যায় নিকৃষ্ট মার্কসবাদীরা কী অসাধু উপায়ে লেনিনের লেখা থেকে উদ্ধৃতি তোলেন। লেনিনের 'পার্টি-লেখক ও পার্টি-সংগঠন' বক্তৃতাতেই আছে:

"It goes without saying that literary activity is least of all subject to mechanical equalization or levelling, to the domination of majority over a minority. *It gives without saying that in this sphere it is absolutely necessary to ensure large scope for personal initiative and individual inclinations, full play for thought and imagination, form and contet. All this goes without saying. But all this only proves that the literary part of the party cause of the proletariat cannot be mechanically identified with other parts of the party cause of the proletariat.*" [ইটালিকস্ আমার]

সবকিছু মিলিয়ে, শেষপর্যন্ত, একথা বলতেই হবে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির আলোচনায় মার্কসবাদী মহল মোটেই বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতার পরিচয় দেন নি, বরং মার্কসবাদসম্মত আলোচনার নামে মনোমত সমস্যাকেই আরো জটিল করে তুলেছেন। তবু একথা অনস্বীকার্য যে নিকৃষ্ট মার্কসবাদীদের বোধহীন শিক্ষামন্যতার প্রতিটি ক্রটিই মার্কসবাদীর আলোচনায় সুস্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছিল। মার্কসবাদী আমাদের সে-বিষয়ে অবহিত করেছেন। তবু চিন্তার দৈন্য থেকে যে-ক্রটি তা, আমার একান্ত বিশ্বাস, নিরলস বস্তুগ্রাহ্যতা ও যুক্তি-বিচারের আলোকে উদ্ভাসিত হবে; আমরা নতুন প্রতীতিতে স্বচ্ছন্দ হতে পারব। এ কারণেই, এবং লেনিনের উক্তিকে প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেই, সংগ্রামী সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব আমরা বিচার করলাম। শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী শিল্পীর কাজ, সমালোচকরা যা পারে না, অবশ্যই হবে সার্থক শিল্পসৃষ্টি—সমাজতত্ত্ব অর্থনীতি রাজনীতির অনাবশ্যক প্রতর্ক নয়; বস্তুত, বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর*।

---

* ইস্পাত, বৈশাখ ১৩৫৭; পৃ. ১-৩ ও ৫১-৫৬। শান্তি বসু এই সময় ছিলেন ছাত্রনেতা ও তরুণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী।—সম্পাদক

সংগ্রামী সাহিত্য / ঊর্মিলা গুহ

শান্তি বসু, এই নামে প্রকাশিত "সংগ্রামী সাহিত্য" শীর্ষক রচনাটি সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। তাঁর বক্তব্য আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, "সাহিত্য-সমালোচনা প্রধানত সাহিত্যিক মূল্য-নিরূপণ", "নিকৃষ্ট মার্কসবাদী"দের ভাবের রাজ্যে এই সুগভীর তত্ত্বটির প্রবেশাধিকার নেই। তাই শান্তি বসু অনেকদিন ধরে সন্দেহ করছিলেন যে, মার্কসবাদী-মহলে এই সাহিত্যবোধের অভাবের মারাত্মক ফল ফলবে, হয়েছেও তাই! (অদ্ভুত শান্তি বসুর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি!) আর বাংলা কবিতার এই চরম অধঃপতনের জন্য দায়ী,—"সহজ-সরল কলাকৌশলে সাহিত্য রচনা করতে হবে," মার্কসবাদীদের এই দাবী। শান্তি বসু কাঁচা কারবার করেন না—অনিল কাঞ্জিলাল এবং কুন্দ্‌সের মাত্র দুটি কবিতার তিনটি উদ্ধৃতি দিয়েই তিনি বাংলা কবিতার এই শোচনীয় অধঃপতনের মর্মস্পর্শী দৃশ্যটিকে একেবারে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি "নিকৃষ্ট মার্কসবাদীদের" (পাঠকদের অবগতির জন্য জানিয়ে রাখছি এই শব্দটি বিষ্ণু দে-র অস্ত্রাগার থেকে আমদানী—সাহিত্যপত্র, মাঘ, ১৩৫৬ দ্রষ্টব্য) জানিয়ে দিয়েছেন রাজনীতি আর সাহিত্য এক নয়, সুতরাং তাদের সমীকরণ চলে না। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি শান্তি বসুর জন্যই যেন এতকাল ধরে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু দয়া করে তিনি কোন 'নিকৃষ্ট মার্কসবাদী' এমন ধরনের সমীকরণ করেছেন, দেখিয়ে দেবেন কি?

২

শান্তি বসু নিকৃষ্ট কবিতার মাত্র তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আলোচনা শুরু করার আগে আমি আরও দুটি নিকৃষ্ট কবিতার নমুনা দিচ্ছি:

> **I feel,**
> **I am a Soviet factory.**
> **manufacturing happiness**
> **I don't want to be**
> **a wayside flower**

plucked after work
    in an idle hour.
I want gesplan
    to sweat in debate
assigning my out-put
    as part of the state...
I want the pen
    to equal the sun
To be listed
        with iron,
  in industry
And the Polit Bureau's agenda,
            Item 1
to be Stalin's report on
    "The out-put of Poetry" :

কিংবা,

"That aristocratic black guard, son of a bitch D' Anthes !
We would have questioned him
'Your social descent ?'
And "before 17 were you one of the Antis ?"

পাঠকদের কি অভিমত? এই কবিতাগুলি কি নিকৃষ্ট কবিতার নমুনা নয়? "সোচ্চার" "অশ্লীল কটু-কাটব্য গালিগালাজ" "ইনকিলাবী ঢঙে বিশ্ব-বিপ্লব এবং শ্রমিকশ্রেণীর জয়ধ্বনি"—নিকৃষ্ট কবিতার এই সবকটি লক্ষণই কি এই কবিতাংশগুলির মধ্যে অতিমাত্রায় প্রকট নয়? "ট্রট্স্কিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত" শান্তি বসুর মতে এই কবিতাগুলি নিশ্চয়ই সোভিয়েট সাহিত্যের চরম অধঃপতনের সাক্ষ্য। কিন্তু শান্তি বসুর দুর্ভাগ্য যে, এই কবিতার রচয়িতা মায়াকোভ্স্কিকে স্টালিন বলেছেন, সোভিয়েট যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। শান্তি বসুর সংজ্ঞা অনুযায়ী বোধহয় স্টালিনও ট্রট্স্কিবাদী!

৩

শান্তি বসু লিখেছেন, "বর্তমানে রাজনীতি ও কবিতার সমীকরণটি যারা কলাও করে প্রচার করেছেন, আয়ত্তে থাকলে নির্দেশও দিচ্ছেন, তাদের মস্ত বড় একটা যুক্তি হল এই মুহূর্তে জনসাধারণ (বেলিন্‌স্কির mob ?) তোমাদের কাছে 'সহজ-সরল উদ্দীপনাময় কবিতা চায়' এবং তাই লিখতে হবে। জনসাধারণের **বর্তমান** রুচির বিচারে কবিতার কলাকৌশল 'সহজ-সরল' না হলে—সেই কবি হয় 'তৃতীয় শক্তির দালাল' নয়তো 'বুর্জোয়া ভাববাদী', তাঁর, বেলিন্‌স্কি-কথিত "poetical idea" থাকলেও।" [বড় হরফ আমি ব্যবহার করেছি]

শান্তি বসু যখন লিখেছেন তখন অবশ্যই এটা উৎকৃষ্ট মার্কসবাদ! শান্তি বসু যখন লিখেছেন তখন সন্দেহ কি "সহজ-সরল কলাকৌশলে" সাহিত্য-রচনার দাবী ট্রটস্কিবাদ! কিন্তু দুঃখের বিষয় শান্তি বসুর এই যুক্তি অনুযায়ী মাও-সে-তুঙ্‌ও ট্রটস্কিবাদী। কারণ মাও লিখেছেন :

"Cultural workers or cultural thought that are isolated from the masses and the people (বেলিন্‌স্কির "mob"—শান্তি বসু কি বলেন ?) are merely troopless commanders or 'Commandments of Castle in the air' and there fires can never reach the enemies. [New Democracy—3rd. PPH Edition.].

শান্তি বসু সঙ্গতভাবেই অভিযোগ করেছেন যে ভারতের মার্কসবাদী-নেতৃত্ব ভারতবর্ষের আধা-সামন্ততান্ত্রিক চরিত্র ভুলে বসেছিলেন। তাঁরা বাস্তব অবস্থা ভুলে গিয়ে সমাজবাদী বিপ্লবের শ্লোগান তুলেছিলেন। এই বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালাতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, শান্তি বসুও এই বাস্তব অবস্থাটিকে ভুলে বসে আছেন। *কি লেখা হবে? কার জন্য লেখা হবে?*—সাহিত্যের কলাকৌশল তারি ওপর নির্ভর করে। আমাদের নয়া গণতান্ত্রিক সাহিত্য, ব্যাপকতম জনতার সাহিত্য, এই ব্যাপকতম জনতা কারা ?

"The broad basis of the masses, constituting more then 90% of our population is made up of workers, peasants, soldiers & petti-bourgeoisie. Therefore, our literature serves first the workers—the class which guides the revolution ; second—the

peasants—a strong & resolute ally of revolution; third, the armed workers & peasants—the 8th route and new 4th Armies & other popular units, comprising the main forces of our revolution, who can co-operate with us in the long range terms. These four types of people constitute the majority of Chinese. They are the broad masses of the people." [Mao-Tse-Tung, Yenan speech—cyclo edition.]

ভারতবর্ষেও এই চতুর্বর্গ ই ব্যাপকতম জনতা। সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-শাসনে এঁদের অধিকাংশ আজ শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার বঞ্চিত। উন্নত সংস্কৃতি রচনার তাগিদেই তাদের বর্তমান চেতনার পক্ষে গ্রহণযোগ্য সাহিত্য-রচনা প্রয়োজন। রাজনীতিক্ষেত্রে ট্রটস্কিপন্থী বিচ্যুতি—উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা—সমাজবাদ কায়েম করার নামে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে ও সাহিত্যের মান উঁচু করার নাম করে জনতার বর্তমান রুচিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর প্রচেষ্টা—আসলে ট্রটস্কিবাদই। এবং শান্তি বসু, যতই না কেন ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে হাওয়ায় তলোয়ার চালান—তার এই ট্রটস্কিবাদী স্বরূপ ঢাকা পড়ে নি। শান্তি বসুর অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ইয়েনান বক্তৃতায় এই ঝোঁককেই মাও sectarianism বলেছেন। এই সব তথাকথিত উন্নত সাহিত্যের ধ্বজাধারীদের জনসাধারণ কিভাবে অভ্যর্থনা করবে সে-সম্পর্কে উক্ত ইয়েনান বক্তৃতায় মাও বলেছেন :

"The more you demonstrate your qualification as an accomplished writer, the more you parade as a hero, the more you sell your ideas to the people, the more emphatically will they reject your work."

মাও-এর এই উক্তি যে কতদূর সত্য, যে-বিষ্ণু দে-র পক্ষ নিয়ে শান্তি বসু কলম ধরেছেন, সেই বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্পর্কে জনসাধারণের মনোভাব থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। জনসাধারণ বিষ্ণু দে-র কবিতাকে বাতিল করে দিয়েছে।

"প্রকাশ রায় লোককবির কবিতাকে কাব্যসাহিত্যের উৎকর্ষের শেষ কথা বলেছেন," এ [illegible] মধ্যে যাঁর যতটাই থাকনা কেন, সত্য বিন্দুমাত্র

নেই। প্রকাশ রায়ের প্রবন্ধে এইটুকুই বলা হয়েছে যে, বিষ্ণু দে-র দুর্বোধ্য এবং নেতিবাচক কবিতার তুলনায় লোককবির কবিতা শতগুণে শ্রেয়ঃ। আমি মনে করি এ-বিবৃতির মধ্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই।

প্রকাশ রায়ের প্রবন্ধে নিঃসন্দেহে ভুল আছে। প্রকাশ রায় সমাজবাদী সংস্কৃতি গঠনের শ্লোগান তুলেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে যে-ট্রটস্কিবাদী বিচ্যুতি দেখা গিয়েছে—এই শ্লোগান সাহিত্যক্ষেত্রে তারি অভিব্যক্তি। রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধেও ভুল আছে। কিন্তু তাঁদের ভুল এ নয় যে, তাঁরা সহজ-সরল উদ্দীপনাময় কলাকৌশল ও সাহিত্য রচনার দাবী করেছেন। 'বিশ্বাসে অর্জিত কৃষ্ণকে' আঁকড়ে ধরে না থেকে নিজের বুদ্ধিবৃত্তিকে একটু ব্যবহার করলেই শান্তি বসুও একথা বুঝতে পারবেন।

৪

শান্তি বসু poetical idea নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন। রাজনীতিক শ্লোগান যে কবিতা নয়, একথা স্বীকৃত সত্য—যুগান্তকারীভাবে তা না বললেও চলত। এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই, poetical idea আর রাজনৈতিক বক্তব্য—একটি আর একটির বিপরীত নয়। কুদ্দুস বা অনিল কাঞ্জিলালের কবিতা ভালো কি মন্দ সে আলোচনায় আমি ব্যাপৃত হতে চাই না। তবে এটুকু জোরের সঙ্গে ঘোষণা করা দরকার যে, সোজাসুজি রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে কবিতা রচনা করে তাঁরা বিন্দুমাত্র দোষ করেন নি। বরং আজকের দিনে এমন ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে আরও, আরও বেশী কবিতা, (হ্যাঁ, কবিতাই শুধু, প্রবন্ধ নয়) লেখা দরকার। অভিযোগ আসবে, এসব কবিতা নয়, সাংবাদিকতা। মায়াকোভস্কিই এই সব বাঁকা-মুখ-করা নিন্দুকদের জবাব দিয়ে গেছেন:

"At this
Poets will wink in horror,
And critics
Will neither learn nor listen.
"But where's the soul?

"Why it's sheer rhetoric !"
"And where's the poetry ?
Mere Journalism !"
"Capitalism's
A word so inelegant,
How much more refined is "Nightingale"
But I will come back to it,
Again and again,
On slogan tipped pen
All less impale !"

এখানে আর একটি কথা বলা দরকার। বেলিন্‌স্কি-কথিত poetical idea-র সাথে আমাদের কোনো কালেই বিরোধ ছিল না। আমাদের বিরোধ ছিল, poetical idea আর রাজনৈতিক বক্তব্যকে পরস্পর-বিরোধীভাবে উপস্থিত করা সম্পর্কে। ফর্মকে তুচ্ছ করার কথা কখনও বলা হয় নি—ফর্মকে কন্‌টেণ্টের ওপরে স্থান দেবার নীতিরই বিরোধিতা করা হয়েছে। ১নং 'মার্কসবাদী'তে আমার যে-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আমি পরিষ্কারই লিখেছিলাম : "মার্কসবাদীরা ফর্মকে তুচ্ছ করে না। ·গণতান্ত্রিক বক্তব্যকে জনসাধারণের কাছে যাতে আরও কার্যকরীভাবে উপস্থিত করা যায়, তদুপযোগী ফর্ম আয়ত্ত করার জন্য মার্কসবাদী সাহিত্যিক নিশ্চয়ই সাধনা করবেন, আপ্রাণ নিষ্ঠার সাধনা করবেন।"

রাজনীতি আর সাহিত্যের সমীকরণ করা হয়েছে এই তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য শান্তি বসু যে "সহজ-সরল উদ্দীপনাময় কলাকৌশলের" দাবীর উল্লেখ করেছেন একটু নজর করে পড়লেই শান্তি বসু দেখতে পাবেন যে, কলাকৌশল বর্জন করার উপদেশ ওটি নয়। এখানে মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচনার নীতিটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচনার দুটি দিক আছে—একটি হল রাজনৈতিক বিচার এবং এইটিই মুখ্য। অপরটি শিল্পনৈতিক বিচার। রাজনৈতিক বিচার মুখ্য এই কারণে যে রাজনীতি যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয় তাহলে তার পক্ষে শিল্পরূপের ক্ষতি করবার শক্তিই বাড়ে।

শান্তিবাবুর আর একটি অভিযোগ, "জনসাধারণের বর্তমান রুচির বিচারে কবিতার কলাকৌশল" "সহজ-সরল" না হলে—সেই কবি হয় "তৃতীয় শক্তির দালাল" "নয়তো বুর্জোয়া ভাববাদী", তাঁর বেলিন্‌স্কি-কথিত "poetical idea" থাকলেও। এই "poetical idea" ওয়ালা কবিটি বোধ-হয় বিষ্ণু দে। শান্তিবাবুর অবগতির জন্য জানিয়ে রাখি—কন্‌টেন্টের উপর ফর্মের স্থান, মার্কসবাদে যে কোনো 'ঈস্‌থেটিক' নেই ইত্যাদি তত্ত্ব প্রচারের জন্যই ঐ সব বিশেষণে বিষ্ণুবাবুকে ভূষিত করা হয়েছিল—poetical idea-র জন্য নয়।

৫

১নং 'মার্কসবাদী'তে আমি যে-প্রবন্ধ লিখেছিলাম তাতেই "down with non-party writers" শীর্ষক উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছিলাম। শান্তি বসু অভিযোগ করেছেন, উদ্ধৃতিটি নাকি অসাধু উপায়ে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ পরবর্তী অংশ উদ্ধৃত করা হয় নি, এ-অভিযোগ তো বরং শান্তি বসু সম্পর্কেও করা চলে। কারণ, তিনিও যেসব উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন তাও সমগ্র রচনার অংশ বিশেষ মাত্র, তারও পূর্বাপর আছে। এ-অভিযোগ মুক্ত হতে হলে লেনিনের সম্পূর্ণ রচনাবলীই লেখার শেষে পরিশিষ্ট হিসাবে জুড়ে দিতে হয়। এখানে আসল বিচার হওয়া উচিত লেনিনের উদ্ধৃতিকে পটচ্যুত বা বিকৃত করা হয়েছে কি না। বিশেষ ধরনের চশমাটি, যা দিয়ে 'প্রতিপক্ষের' রচনার অংশবিশেষ পড়া যায় না, সেটি খুলে ফেললেই শান্তি বসু দেখতে পাবেন, আমি লিখেছিলাম :

"সৃষ্টির স্বাধীনতা নিশ্চয়ই থাকবে, কোনো বিশেষ দলের রাজনৈতিক থীসিসকে কাব্যের মধ্যে প্রমাণ করার জন্য কেউ ফরমাশ দিচ্ছে না, গড়ের কোনো বিশেষ ফর্মুলা তৈরীরও প্রশ্ন আসে না।" [পৃঃ ১৫২]

সুতরাং লেনিনের রচনার পরবর্তী অংশ উদ্ধৃত করা না হলেও লেনিনের বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়নি।

পরিশেষে 'শান্তি বসু'-দের সমীপে আমার একটা আবেদন আছে। আমাদের সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায় গুরুতর বিচ্যুতি ছিল। তার জন্য সংস্কৃতি-আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ সবই সত্য। "পাণ্ডিত্য-

এর সম্পাদকবর্গের সাথে আমিও একমত যে এই সব ট্রট্স্কিবাদী বিচ্যুতির মূল খুঁজে বের করে তা উৎপাটন করা দরকার। আর তা না করে 'ট্রট্স্কিবাদ' 'ট্রট্স্কিবাদ' বলে হাওয়ায় তলোয়ার চালালে,—আসল কাজ এতটুকুও এগুবে না। আঘাত করতে হবে ঠিক জায়গায়, আঘাত করতে হবে মার্কসবাদের প্রহরণ দিয়ে—তবেই ট্রট্স্কিবাদ পরাভূত হবে,—অন্যথায় নয়।

মাও-এর ভাষায় সংস্কৃতি হল, "Any given culture (as a form of ideas) is the reflection of a given political and economic system of society, though the former in term exerts immense influence upon the latter and politics is the concentrated expression of economy." [New Democracy, 3rd PPH Ed. pp. 2.].

আমাদের বর্তমান লক্ষ্য যে-সমাজ, তা নয়া গণতান্ত্রিক সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নয়। আমাদের সংস্কৃতিও তাই হবে নয়া গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতি নয়। আমরা প্রথমে কিন্তু সোশ্যালিস্ট সংস্কৃতির কথা বলেছিলাম, এটা নিঃসন্দেহেই ট্রট্স্কিবাদী বিচ্যুতি। এই বিচ্যুতি ঐতিহ্য-বিচার এবং সংযুক্ত ফ্রণ্ট সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিকৃত করেছিল। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার দরকার আছে—আর সে-সংগ্রামে আমি অন্তত শান্তিবাবুদের প্রতিপক্ষ নই, তাঁদেরই সহযোদ্ধা! কিন্তু এই মূল সমস্যাটিকে গুলিয়ে ফেললে এই সংগ্রামই বিপথে চালিত হবে। শান্তিবাবুদের এই কথাটা স্মরণ রাখতে বলি।*

* ইস্পাত, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ. ২৯-৩০ ; ঊর্মিলা গুহ বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক প্রভোৎ গুহ-র ছদ্মনাম।—সম্পাদক

পরিশিষ্ট১

গণনাট্য সংগঠন-১ / মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী

গণনাট্য সঙ্ঘের আদর্শ এক কথায় লেখা হয়েছে—Peoples' Theatre Stars the People. স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে গণনাট্য সঙ্ঘ সে-আদর্শ পালন করছে কিনা—পাঁচ বছরের আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করে কিনা গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্যদের নিষ্ঠা আছে তাঁদের নিজেদের সৃষ্ট নীতির প্রতি। সত্যিসত্যিই সঙ্ঘের সাংগঠনিক রূপ সে-নীতিকে কাজের ক্ষেত্রে চালু রেখেছে কিনা।

যদি সেই দিক থেকে বিচার করা যায়—তাহলে অত্যন্ত কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে, দ্বিধাহীনভাবে আত্মসমালোচনা করতে হবে।

গণনাট্য সঙ্ঘ জন্মেছিল ফ্যাশিবিরোধী আন্দোলনের মধ্য থেকে—দানা বেঁধেছিল দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে তুলে। এ-দুটি আন্দোলনই ছিল আবার দেশজোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিরাট গণবিক্ষোভের অংশ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সংগ্রামকে ভাঙিয়ে, খবরের কাগজে নাম ছাপিয়ে, উড়োজাহাজে চড়ে অনেকে মন্ত্রীগিরির আসন পেয়েছেন—চোরাবাজার করে অনেকে অঢেল পয়সাও রোজগার করেছেন—কিন্তু সত্যি-সত্যি সাম্রাজ্যবাদের গুলির ঘায়ে যারা বুকের তাজা খুন ঢেলেছিল—যারা স্ত্রী-পুত্র-সংসার সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল—তারা কারখানার মজুর—মাঠের চাষী—ছাত্র। সেদিনের সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে পাশে স্বভাবজাতভাবেই দানা বাঁধছিল সাংস্কৃতিক আন্দোলনও। ফাঁসির কাঠে জীবন দিতে গেলে যে-গান গাইতে হয়—রাস্তায় রাস্তায় ব্রিটিশ সৈন্যের বিরুদ্ধে ব্যারিকেড গড়তে যে-জলন্ত নাটকের সৃষ্টি—মা-বোনের বেইজ্জতের প্রতিশোধ নিতে যে-কবিতা প্রতি-হিংসার আগুন জ্বালায়—এককথায় সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার যে-লড়াই তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার জন্যে যে-

সাংস্কৃতিক আন্দোলন তারই মধ্যে গণনাট্য সঙ্ঘ জন্মেছে, দানা বেঁধেছে আর আজও টিঁকে রয়েছে। সেদিনের সঙ্ঘের সেই প্রথম সূচনার দিনে এর শিল্পী ছিল শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র; নেতা ছিল শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলনের জঙ্গী-কর্মী, যারা শুধু শ্লোগান দিতেন না, লড়াই করতেন না, গান করতে পারতেন, নাটক লিখতে পারতেন, কবিতাও লিখতে পারতেন। সেদিন মাঠে মাঠে, কারখানার বস্তিতে এবং সভা-সমিতিতে আন্দোলনের ভিত্তি করেই শিল্প-সাহিত্য রচিত হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চের তোয়াক্কা তাঁরা করতেন না—কেননা চাষী-মজুর তার নিজের ঘরেই রঙ্গমঞ্চ তৈরী করত। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করে গান গাইবার বা অভিনয় করবার পয়সাও ছিল না—মনোবৃত্তিও ছিল না। স্বভাবতই আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল কৃষক-মজুর-ছাত্রদের আড্ডায়-জমায়েতে, জীবিকানির্বাহের স্থানে, মাথাগুঁজবার ঠাঁই বস্তিতে, কুঁড়ে ঘরে। কে না জানে, সেদিনে নাটক-গান হতো কৃষক-মজুর-ছাত্র আন্দোলনের জমায়েতে, আলাদা করে সংস্কৃতি-আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল না। সভা-সমিতিতে যেখানে কৃষক-মজুর-ছাত্রের দাবী নিয়ে বক্তৃতা হতো—সেইখানেই আবার গানও হতো—নাটকও হতো। কৃষক-মজুর, তাঁরা বক্তৃতাও করতেন আবার গানও গাইতেন তাঁদের জীবনের দুঃসহ জ্বালা নিয়ে আর সেই মরে বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে লড়াইকে আশ্রয় করে। মাটির সঙ্গে জীবন্ত সংযোগেই নির্ভুলভাবে সঙ্ঘের নীতি নির্ধারিত হয়েছিল—জনগণই গণনাট্যের নায়ক।

প্রতি জেলায় গণনাট্য সঙ্ঘ দানা বাঁধল। নতুন নতুন শিল্পী-সাহিত্যিক জীবন্ত মানুষের কাহিনী রচনা করলেন। তাঁদের শিল্প-প্রতিভা মৃতপ্রায় শহুরে সংস্কৃতির সামনে আনল নবজীবনের ইঙ্গিত। সাধারণ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা এবং সাধারণ সংগ্রামী মানুষ গর্বে-গৌরবে চেয়ে দেখলেন, বাঙলার সাহিত্য-শিল্প জগতে নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা। গণনাট্য সঙ্ঘ শুধু জনপ্রিয় হল না—শত শত শিল্পী-সাহিত্যিকের ভিড় লেগে গেল এই গণনাট্য আন্দোলনের সংগঠনে।

স্বভাবতই পেশাদারী শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা শহরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত তাঁরাও এলেন তাঁদের প্রতিভা নিয়ে—তাঁদের বহু আয়াসসাধ্য শিল্প-আঙ্গিকের ক্ষমতা নিয়ে। আর সেই সঙ্গে নিয়ে এলেন শিল্প সম্বন্ধে তাঁদের বদ্ধমূল বিকৃতধারণা যে, সার্থক শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে পৃথিবীর সাধারণ মানুষের জীবনের

দুঃখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো সম্বন্ধ নেই এক অতীন্দ্রিয় রসলোকই হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যের উপজীব্য—সাধারণ মানুষের বাঁচবার সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরালায় নির্জন কক্ষে বসে অধ্যবসায় করলেই সার্থক শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। গণনাট্য সঙ্ঘের নেতাদের উচিত ছিল এই সব পেশাদারী শিল্পীদের সরাসরি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের মধ্যে ঠেলে দিয়ে, তাঁদের শিল্প-প্রতিভাকে চাষীর জমির লড়াই—মানুষের মজুরীর লড়াই, এককথায় দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াইয়ে কাজে লাগানো। কৃষক-শ্রমিকের মধ্য থেকে শিল্পী-সাহিত্যিক খুঁজে তাদের শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিভাকে উন্নত করে—তাদের জীবন ও লড়াইকে রূপ দেবার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে নতুন রেনেশাঁর সম্ভাবনাকে শক্ত করা।

কিন্তু তা হল না। যদিও আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল শ্রমিক-কৃষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন—তথাপি সমগ্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। বুর্জোয়া সংস্কৃতির মেকী জাঁকজমক নেতাদের আন্দোলনের আদর্শকে করল পরাজিত। শোষিত মানুষের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়ে রাখবার জন্যে এই যে জাঁকজমক আর আঙ্গিকের বুলি—তাকেই সার্থক শিল্প বলে মেনে নিলেন আমাদের নেতারা। এইসব তথাকথিত সার্থক শিল্পী-সাহিত্যিককে সংগ্রামী মানুষের লড়াইতে ঠেলে দিয়ে, এইসব শিল্পী-সাহিত্যিককে শ্রমিক-কৃষকের শিল্পসৃষ্টির কাজে না লাগিয়ে গণনাট্য আন্দোলনের নেতারা এঁদের কাছে করলেন নিজেদের বিক্রি। পেশাদারী শহুরে সংস্কৃতিবানরা পিঠ চাপড়ে বললেন—হ্যাঁ, তোমরা নতুন শিল্পসৃষ্টির সূচনা করেছ বটে—তবে এখনও শিল্পসৃষ্টির সার্থক পর্যায়ে পৌছাও নি। দেখ, প্রচার আর শিল্প এক নয়। তোমরা যদি সারাদিন চাষী-মজুরদের আন্দোলনের মধ্যেই ডুবে থাকো—শ্লোগান দিয়ে বেড়াও—কেমন করে শিখবে সার্থক শিল্পসৃষ্টির কাজ? অতএব, এসো, আমাদের সার্থক শিল্পশিক্ষা তোমাদের দান করছি—তোমরা ঘর ঠিক করো—টাকা জোগাড় করো—এক-একটা দল বেছে নাও। আর দেখ, তোমাদের আন্দোলনের কাঠামোটা নিচ্ছি বটে, তবে লড়াইয়ের কথাটা বাদ দিতে হবে। কারণ, সংগ্রামের কথা সোজাসুজি বলতে গেলেই শিল্প প্রচার হয়ে যাবে।

এই ফাঁদে পা দেবার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র আন্দোলন

থেকে অঙ্গীকর্মীরা সরে এসে ছোট ছোট এক-একটা দল গড়ে দু-মাস চার-মাস ধরে মহড়া দিতে লাগলেন। তার নামকরণ হল স্কোয়াড। সেখানে এই মরা শহরে শিল্পীরা হলেন মাস্টার আর নবনাট্য আন্দোলনের স্রষ্টারা হলেন ছাত্র।

প্রয়োজিত হল নবান্ন, নবজীবনের গান, ভারতের মর্মবাণী, অমর ভারত আরও কত কত কী! পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করা হল, অনুষ্ঠান হল পেশাদারী কায়দায়। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র আন্দোলনের সেই বিরাট বৈপ্লবিক শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে গণনাট্য সঙ্ঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বসল। রিহার্সাল-হল্-শো, শো-হল্-রিহার্সাল—এই ঘূর্ণিপাক থেকে আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষেত্রে যাবার সময় কোথায়?

বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তরা অবশ্য বাহাবা দিলেন—বললেন, অপূর্ব। অপূর্ব তোমাদের অনুষ্ঠান—অপূর্ব তোমাদের প্রাণশক্তি। আমরা অনেকেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। সারা ভারতে আন্দোলনের প্রসার রইল; কিন্তু অচিরে স্বাভাবিকভাবেই আদর্শের সংঘাত শুরু হল সংগঠনে।

প্রথমত দেখা গেল, যে-শিল্পকে শ্রমিক-কৃষকের শিল্প বলে চালু করা হল, সেই শিল্পানুষ্ঠান নিয়ে যখনই কৃষক-শ্রমিকের মাঝে গেলাম, তাঁরা বুঝলেন না। সভ্যরা দেখলেন এইসব আঙ্গিক না শিখেও আগে যেসব অনুষ্ঠান করেছেন তাতে শ্রমিক-কৃষক অনেক বেশী সাড়া দিতেন। সভ্যদের মাঝে কঠিন প্রশ্ন জাগল।

দ্বিতীয়ত, এই সব শিল্পী-নেতারা ক্রমশই বলতে শুরু করলেন, তোমরা সাধারণ সভ্যরা শিল্পের মধ্যে যদি রাজনীতি আনবার চেষ্টা করো, আমরা বরদাস্ত করবনা। তোমরা, যারা শিল্পের আঙ্গিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ—তারা কোনো কথা বলতে পারবে না আমরাই স্রষ্টা। আমরা যা সৃষ্টি করব—তোমাদের ঘাড় পেতে তা শিখতে হবে। আর যেহেতু আমরাই করছি সৃষ্টি, অতএব অনুষ্ঠান দেখিয়ে যে-পয়সা আসবে তা আমাদেরই সুখ-সুবিধের জন্যে করতে হবে ব্যয়। সভ্যরা বিক্ষুব্ধ।

তৃতীয়ত, প্রতিক্রিয়াশীল শিল্প-মালিকেরা যখন দেখলেন যে এই নবনাট্য আন্দোলনের মোড় ভুল পথে ঘোরানো গেছে, তাঁদেরই সহোদর ভাই সংবাদপত্র মালিকরা কাগজে কাগজে এই সব শিল্পী-নেতাদের নাম ছড়িয়ে

দিলেন বড় বড় হরফে। সভ্যরা বুঝতে পারলেন না যে, কি করে এটা সম্ভব? যে সংবাদপত্র-মালিকেরা কৃষক-শ্রমিকের [illegible] কথা চেপে দেয়—বিকৃত করে—তারা কি করে কৃষক-শ্রমিকের শিল্পস্রষ্টাদের ঢাক বাজাবে? বিক্ষোভের সাথে এসে মিশল গভীর সন্দেহ।

দেখা গেল, শ্রমিক-কৃষক ক্রমশ সংগঠন থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। শ্রমিক-কৃষক, সংগ্রামী মধ্যবিত্তের জীবন ও লড়াইকে বাতিল করে সূক্ষ্ম-স্বপ্নময় শিল্প-সৃষ্টির দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকছেন সার্থক শিল্পী-দাদারা। বিচার করতে শুরু করলেন গণনাট্য সঙ্ঘের সারা ভারতব্যাপী সাধারণ সভ্যের দল।

চোখের সামনে দেখতে পেলেন সভ্যরা, কোনো নতুন সৃষ্টি নেই। দেখতে পেলেন, শিল্পী-দাদারা কিভাবে নিজেদের নাম আর দাম বাড়ানোর কাজ হাসিল করছেন গণনাট্য সঙ্ঘের নাম ভাঙ্গিয়ে। দেখলেন, কেমনভাবে সাধারণ কৃষক-শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনকে কেন্দ্র করে সাধারণ সভ্যরা যখনই নতুন নতুন গান-নাটক সৃষ্টি করছেন তখনই বিষাক্ত ও তিক্ত সমালোচনা করছেন সে-সৃষ্টিকে প্রচারমূলক বলে, বিশ্রী বলে।

আর সাথে সাথে দেখলেন, কেমনভাবে অন্ধ্রপ্রদেশে গণনাট্য সঙ্ঘ শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে শত শত শাখা গঠন করে—নতুন নতুন গান-নাটক রচনা করছেন—কত ভালো ভালো শিল্পী-সাহিত্যিক বেরিয়ে আসছেন, যাঁদের অবজ্ঞা করা এই উন্নাসিক দাদাদের পক্ষেও সম্ভব হচ্ছে না। দেখলেন, ঐ গণ্ডীবদ্ধ ঘরে আশ্রয় না করে—শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের মধ্যে থেকে, আন্নাশাঠে, গভহর, অমরশেখ অভূতপূর্ব শক্তিশালী অনুষ্ঠান সৃষ্টি করছেন।

আর দেখলেন, সারা দুনিয়ায় শিল্পী-সাহিত্যিকরা প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে শুধু কলম ধরছেন না—গলা ছেড়ে গান ধরছেন না—গড়ছেন গেরিলা বাহিনী, প্রতিরোধের শানানো কৃপাণ তুলে ধরছেন হাতে।

আর সারা দুনিয়ার মতো এদেশেও যখনই কোনো শিল্পী বা সাহিত্যিক জনসাধারণের লড়াইয়ের মধ্যে থেকে, জনসাধারণের জীবন ও লড়াইকে নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করছেন তা একদিকে যেমন অসাধারণ জনপ্রিয় হচ্ছে—তেমনি শিল্পের দিক থেকেও এইসব তথাকথিত আঙ্গিকসর্বস্ব শিল্পের চেয়ে অনেক বলিষ্ঠ—অনেক দৃপ্ত।

সামনে এসে হাজির হল কারখানায় কারখানায় শ্রমিকের কলজে-ছেঁড়া

লড়াইয়ের ময়দানে রচিত নতুন গান—কাকদ্বীপ, ডোঙ্গাজোড়া আর বড়া-কমলাপুরে জমাটবাঁধা রক্তের স্বাক্ষরে লেখা জ্বলন্ত নাটক।

গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্যরা মরিয়া হয়ে উঠলেন! দ্বিধাহীন সংগ্রাম চালাতে শুরু করলেন এই ধনিক শিল্পমহলের শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পী-দুলালদের বিরুদ্ধে। যে-সমস্ত শিল্পীদের মাথায় করে নেচেছিলেন এতকাল—তাঁদের সঙ্গে চললো আদর্শগত ও কার্যপদ্ধতির নীতি নিয়ে লড়াই। সব সময়েই এই সব সার্থক শিল্পীরা চেষ্টা করেছেন গণনাট্য সঙ্ঘকে পেশাদারী শিল্পমালিকদের কাছে নতি স্বীকার করাতে—চেয়েছেন গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্যদের গলায় জোর করে গণ-আন্দোলনের বিকৃত সুর বেঁধে দিতে। কিন্তু সাধারণ সভ্যরা এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে গত আমেদাবাদ সম্মেলন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পাঁচবছর অবিশ্রান্ত লড়াই চালিয়েছেন যাতে গণনাট্য সঙ্ঘ ভেঙে না পড়ে—মাটি থেকে সঙ্ঘের মূল যাতে কিছুতেই এই মুখোশপরা ধনিক শিল্পীগোষ্ঠীরা উৎপাটিত করতে না পারে।

কিন্তু সংগঠনের মধ্যেকার এই লড়াই সত্ত্বেও একথা ধ্রুব সত্য যে, সংগঠন জোরদার হয়ে ওঠে নি—শক্ত গাঁথুনির ভিত্তি ছিল না সংগঠনের। তাই বারে বারে সংগঠনকে ভেঙ্গে যেতে দেখা গেল। দেখা গেল, যখনই কোনো আঘাত আসে সংগঠন ভেঙ্গে যায়। আমেদাবাদ-সম্মেলনের সময় জেলায় জেলায় নতুন কমিটি তৈরী হল, মনে হল গণনাট্য সঙ্ঘের শাখা-প্রশাখা পুনরায় বিস্তারিত হচ্ছে জনসাধারণের মধ্যে। 'শহীদের ডাক' ছায়াভিনয় সারা বাঙলা ও আসামে এক নতুন উদ্দীপনা আনল। ভাবলাম, গণনাট্য সঙ্ঘের অনুষ্ঠান আবার নতুন প্রাণে জীবন্ত হয়ে উঠল।

ঠিক এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব-সম্মেলনে আগত দেশ-বিদেশের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে সুশীল-ভাবমাধব যখন গুণ্ডার গুলিতে নিহত হলেন—বিস্ময়ে, আতঙ্কে সকলে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি আতঙ্কে পদত্যাগ করলেন। সমস্ত জেলা কমিটির এই ধরনের নেতা, যাঁরা সার্থক শিল্পের চটকে সংগঠনকে ভূষিত করতে এসেছিলেন—তাঁরা সরে পড়লেন একে একে। মনে হল বাঙলা দেশের সংগঠন বুঝি বাঁচবে না।

এর কিছু পরেই প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপর সরকারী

আঘাত এসে পড়ল। সারা ভারত জুড়ে গণনাট্য সঙ্ঘের বহু শাখা কার্যত বে-আইনী হল, গণনাট্য সঙ্ঘের অনুষ্ঠান বানচাল করা হল, দর্শকদের উপর গুলি চললো, প্রতি প্রদেশের নেতৃস্থানীয় বহু কর্মী কারাগারের বদ্ধ প্রাচীরে গ্রেপ্তার হয়ে রইলেন। সভ্যরা বুঝলেন—কোনো আপস নেই—কোনো মাঝপথ নেই। সংঠনের সঠিক নীতি নির্ধারণ করে সোজাসুজি আদর্শকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে, সভ্যদের সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে। সারা পশ্চিম বাঙলার প্রতিনিধিরা এসে মিললেন কলকাতায়। সেখানে একদিকে যেমন কঠিন আত্মসমালোচনার ভিত্তিতে আদর্শ ও নীতিকে সোজাসুজি ব্যাখ্যা করা হল—তেমনি সঙ্ঘের জীবন্ত শাখাগুলির কার্যপদ্ধতির ভিত্তিতে সংগঠনকে নতুনভাবে গড়া হল। এই সভা গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্যে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল, দুর্দমনীয় গতিতে সাংগঠনিক বিস্তৃতির রাস্তা খুলে দিল।

এই সভার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিবরণ হল, পুরনো স্কোয়াডগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে—তথাকথিত সার্থক শিল্পীরা সকলেই ভেগে গেছেন বা যেতে শুরু করেছেন। অন্যদিকে সংগঠন বিস্তার লাভ করেছে, গৌরীপুর, নৈহাটি, বেলঘরিয়া, কাঁকিনাড়া, মেটিয়াবুরুজ, ফতেপুর, বদরতলার রঙকল, চটকল, কাপড়ের কল, ধাঙ্গড় শ্রমিকদের মধ্যে। আর ছড়িয়ে পড়েছে সংগঠন ট্রামশ্রমিক ও রেলশ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে। সংগঠন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিস্তৃত হবে সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর শিল্প আন্দোলনের সূচনা করছে। কাকদ্বীপ, ডোঙ্গাজোড়া, বড়াকমলাপুর, কানাইপুর, আন্দুল প্রভৃতি সংগ্রামী কিষাণ এলাকায় ক্ষেতমজুর, চাষী, সঙ্ঘের মধ্য দিয়ে এক নতুন প্রাণবন্ত সাহিত্য-শিল্পের জন্ম দিচ্ছেন—যা গণনাট্য সঙ্ঘের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। সাথে সাথে সংগ্রামী মধ্যবিত্ত যাঁরা অফিসে-ব্যাঙ্কে লড়ছেন—তাঁরাও স্কোয়াড গড়ছেন—গণনাট্য সঙ্ঘ মজবুত করছেন। আরও উল্লেখযোগ্য, এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শিল্পীরা শুধু নিজেদের জীবন ও লড়াইকেই রূপ দিচ্ছেন না, এঁরা প্রত্যেকেই শ্রমিক-কৃষকের লড়াইয়ের পাশে থাকতে চান। যেতে চান তাঁদের মধ্যে, রূপায়িত করে তুলতে চান শ্রমিক-কৃষকের জীবন ও লড়াই। তাই প্রথম ডাক এ-সম্মেলনের, আন্দোলনকে ভিত্তি করেই গণনাট্য সঙ্ঘকে প্রতিটি সংগ্রামশীল মানুষের সংগ্রামের পাশে পাশে থাকতে হবে। গণনাট্য সঙ্ঘের

সেই স্কোয়াডই সর্বাপেক্ষা সম্মান পাবে যার সভ্যরা শ্রমিক এবং কৃষকের লড়াইকে বেশী করে চিনতে পেরেছে—ভালোবাসতে পেরেছে—রূপায়িত করতে পেরেছে। গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্যরা শ্রমিক-কৃষক, সংগ্রামী সর্বহারা মধ্যবিত্তের মিলিত ফ্রন্ট গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

দ্বিতীয় আহ্বান তাই—সংগঠনের নেতৃত্ব মধ্যবিত্তের হাত থেকে শ্রমিক-কৃষকের হাতে নিয়ে আসতে হবে। গণনাট্য সঙ্ঘের সমস্ত সচেতন কর্মীকে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থেকে, শ্রমিক-কৃষকের স্কোয়াড গঠন করে, তাদেরই শিল্পী-সাহিত্যিক দ্বারা শ্রমিক-কৃষকের জীবন ও লড়াইকে রূপদান করলেই সত্যিকারের গণশিল্প হবে।

তৃতীয় আহ্বান তাই—কৃষক-শ্রমিকের বোঝার উপযোগী করে অনুষ্ঠান তৈরী করতে হবে। আমাদের কাছে বিষয়বস্তু প্রথম, আঙ্গিক পরে। আমরা সমস্ত সংগ্রামী মানুষের জীবন ও লড়াইয়ের কথা প্রচার করব—রূপায়িত করব।

চতুর্থ আহ্বান—প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, শাসনযন্ত্রের সাহায্যে প্রগতিশীল আন্দোলনের টুঁটি চেপে ধরছে। পেশাদারী শিল্পমহল বিকৃত যৌনসম্পন্ন শিল্পের দ্বারা দেশবাসীর সুস্থ চেতনাকে বিষাক্ত করে তুলছে। গণনাট্য সঙ্ঘের সভ্যরা পেশাদারী শিল্পমহলের শিল্পীদের অর্থ নৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিতে ও সমস্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীকে সুস্থ চেতনার আন্দোলনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং প্রতিক্রিয়ার কণ্ঠরোধ করবে।

তাই সম্মেলনের শেষ এবং প্রধান সিদ্ধান্ত—সংগঠনকে সমস্ত সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্তের মধ্যে ছড়িয়ে দাও—প্রতিটি শোষিত মানুষের জীবন ও লড়াইকে মূর্ত করে প্রতিক্রিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। সভ্যরা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের জীবন ও লড়াইকে রূপায়িত করলে—জনসাধারণই সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখবে। সংগঠনের রাস্তা ১, ২, ৩ করে বলা যায় নি—কেননা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সঠিক সংগঠন গড়ে ওঠে। তবে এই দিকদর্শন করা গেছে যে, বোম্বাইয়ের কেন্দ্রীয় দল বা কলকাতার নবান্ন, শহীদের ডাকের দল নয়—ট্রাম, রেল, চটকল, ডোঙ্গাজোড়া-কমলাপুরের সংগঠনের রাস্তাই আমাদের রাস্তা।

এ-সভারও প্রধান ত্রুটি ছিল আমরা সংগঠনের রাস্তা বাতলাতে পারি নি।

আমরা নতুন নীতি নির্ধারণ করেছিলাম—সংগঠনের দিকদর্শন করেছিলাম—কিন্তু সভ্যদের এই নেতৃত্ব দেওয়া যায় নি যে, যদি সংগঠনকে মজবুত রাখতে হয়—আরও সংগঠিত করতে হয়, তাহলে সংগঠনকে শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, শ্রমিক-কৃষকের নেতারা যদি সংগঠনের নেতৃত্বে না আসতে পারে—তাহলে সংগঠন আবার ভেঙ্গে পড়বে।

বিভিন্ন ইউনিট ও জেলা সম্মেলনের অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে, সংগঠন এই পথে পা বাড়িয়েছে সত্যিকথা—কিন্তু এখনও আমাদের অতীতের পিছু-টান ঝেড়ে ফেলতে পারি নি। তাই এখনও শ্রমিক-কৃষকের অনুষ্ঠান আমাদের অনুষ্ঠানের প্রধান অংশ হয়ে ওঠে নি—এখনও সভ্যদের মধ্যে মধ্যবিত্তসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেছে। সংগঠন ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে—সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করছে—কাজ করছে—কিন্তু এখনও সংগ্রামী মানুষের মধ্যে সংগঠন একাকার হয়ে যায় নি। এই পথেরই ঠিকানা দিতে হবে আগামী এলাহাবাদে সর্বভারতীয় সম্মেলনের। আমাদের প্রত্যেকটি সভ্যের দায়িত্ব :

ক) সমস্ত শিথিলতা ও পিছুটান সরিয়ে ফেলে সংগ্রামী শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের লড়াইয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং সেই লড়াইয়ের জীবন্ত অভিজ্ঞতায় শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি করা।

খ) প্রতিটি সভ্যকে শ্রমিক-কৃষকের মধ্য থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংগঠনে নিয়ে আসা, সচেতন করা ও সংগঠনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা।

গ) শ্রমিক-কৃষক ও সংগ্রামী মধ্যবিত্তের মধ্যে যে শত শত গান, নাটক, কবিতা রচনা হচ্ছে—তা সমস্ত প্রগতিশীল সংস্কৃতি-জগতের সামনে তুলে ধরা এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এই জীবন্ত সংস্কৃতির দ্বারা আরও প্রাণবন্ত করা।

ঘ) তাই প্রতিটি সংগঠকের দায়িত্ব, প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে—জানতে হবে—চিনতে হবে এবং প্রতিটি লড়াইয়ের ব্যারিকেডে রক্তের স্বাক্ষরে যে-সংস্কৃতি রচিত হচ্ছে তাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হবে এবং সেই সমস্ত সংগ্রামের শিল্পী-কর্মীদের নেতৃত্বের পদে আনতে হবে।

ঙ) সাথে সাথে দেশ-বিদেশের প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্য পড়তে হবে—জানতে হবে। চিনতে হবে আমাদের নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য

ও লোকসংস্কৃতিকে। তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবে আগামী দিনের মহত্তর লড়াইয়ের বিষয়বস্তু। একদিকে পড়তে হবে, জানতে হবে, শিখতে হবে, সাথে সাথেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষের বাঁচবার লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হবে।

তবেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি মানুষের সুস্থ চেতনাকে বিকৃত করে তাদের শোষণযন্ত্রের শামিল করবার যে-ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে তাকে প্রতিরোধ করতে পারব এবং শোষিত শ্রমিক-কৃষক ও সর্বহারা সংগ্রামী মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার যে-লড়াই তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে পারব আমাদের গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের মাধ্যমে। প্রতিক্রিয়া ও তার মুখোশপরা দালাল সাহিত্যিক-শিল্পীদের সাথে লড়াই আমাদের নীতিকে আরও করবে জোরদার, শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ও কায়দা আমাদের সংগঠনকে করবে মজবুত। প্রতিটি সভ্য সাংগঠনিক লড়াই সম্পর্কে কাজের ভিত্তিতে—অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিন্তা করুন—আলোচনা করুন—পথনির্দেশ করুন। নিজের উপর আস্থা রেখে নির্ভয়ে কাজ করুন—দেখবেন অচিরেই আমাদের সংগঠন হয়েছে ইস্পাতের মতো শক্ত আর ধারালো।*

* লোকনাট্য, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৫, পৃ. ১৫-২০ ; মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী গণনাট্য সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার তৎকালীন সম্পাদক সজল রায়চৌধুরীর ছদ্মনাম। এই রচনাটি সম্বন্ধে 'মার্কসবাদী' পত্রিকার চতুর্থ সংকলনে প্রকাশ রায় ছদ্মনামে প্রদ্যোৎ গুহ 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' নামক প্রবন্ধে আলোচনা করেন। দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭০-৭৭। বানান ও যতিচিহ্ন প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করা হয়েছে। —সম্পাদক

গণনাট্য সংগঠন-২ / সুরপতি নন্দী

গত সংখ্যা 'লোকনাট্যে' প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় অধিকারীর সাংগঠনিক সমালোচনাটি নানা কারণে প্রণিধানযোগ্য।

অতীত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

গণনাট্য সঙ্ঘের পাঁচ বছরের ইতিহাসকে সমালোচনা করতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়-বাবু যে কয়েকটি দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন ও তার কারণ হিসেবে যা যা দেখিয়েছেন উভয়ই অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক। তিনি বলতে চান যে, কয়েকজন পেশাদারী শিল্পী গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দেওয়ার পর থেকেই গণনাট্য সঙ্ঘ ভুল পথে চালিত হয়েছে। "কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র আন্দোলনের সেই বিরাট বৈপ্লবিক শিল্প-সৃষ্টির ক্ষেত্র থেকে গণনাট্য সঙ্ঘ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বসল!" কি করে মুষ্টি-মেয় কয়েকজন শিল্পী এসে এত বড একটা আন্দোলনকে ভুল পথে চালিত করে দিল তা ধারণাতীত। এমনি করে আমাদের অতীতের দুর্বলতার দায়িত্ব সামান্য কয়েকজনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে, "আমরা অনেকেই আত্মহারা হয়ে গেলাম" বলা অতীতকে বিকৃত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর "গণনাট্য সঙ্ঘের নেতাদের উচিত ছিল এইসব পেশাদারী শিল্পীদের সরাসরি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের মধ্যে ঠেলে দিয়ে…কাজে লাগানো" ও "সাধারণ সভ্যরা এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে গত আমেদাবাদ সম্মেলন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পাঁচ বছর অবিশ্রান্ত লড়াই চালিয়েছেন"—"কিন্তু সংগঠনের মধ্যেকার এই লড়াই সত্ত্বেও একথা ধ্রুব সত্য যে সংগঠন জোরদার হয়ে ওঠে নি"—প্রভৃতি উক্তির মধ্য দিয়ে তিনি যা বলতে চাইছেন তা অত্যন্ত অসম্মানজনক। গণনাট্য সঙ্ঘের পাঁচ বছরের আন্দোলনের মধ্যে তিনি শুধু কয়েকজন নেতা ও কয়েকজন পেশাদারী শিল্পীর ভূমিকাই দেখতে পেয়েছেন, যেখানে সাধারণ সভ্যরা পাঁচ বছর ধরে সংগ্রাম করেও কিছুই করতে পারেন নি?

সঙ্গে সঙ্গে গণনাট্য সঙ্ঘের অতীতের বিভিন্ন শিল্প-সৃষ্টিকে গণনাট্য সঙ্ঘের দুর্বলতা ও ভুল পথে চলার দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরাও অত্যন্ত মারাত্মক রকমের

ভুল। গণনাট্য সঙ্ঘের "নবান্ন", "নবজীবনের গান", "শহীদের ডাক" প্রভৃতি গণনাট্য আন্দোলনের গৌরবেরই বস্তু। একথা অস্বীকার করার অর্থ—অন্দোলন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার এবং ধারাবাহিক অভিজ্ঞতার অভাব।

গণনাট্য সঙ্ঘের গৌরব ও দুর্বলতা

আসল কথা হচ্ছে এই যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হবার সমসাময়িক কাল থেকে, প্রচলিত শিল্প-সাহিত্য এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে প্রগতির পথে আর এক পা এগোতে পারছিল না। কোথাও কোথাও আবার শিল্পের মধ্যে এক বিশ্রী পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল। শিল্প তার গণজীবনকে রূপায়িত করতে পারছিল না। সেই সময়ে গণনাট্য সঙ্ঘ সর্বপ্রথম শিল্পকে সমাজমুখী করার পথ দেখায় এবং সেকাজ তারা অবিচলিতভাবে অদ্যাবধি করে এসেছে। গণনাট্য সঙ্ঘের গৌরবের কথা যে, তারা ভারতের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে, শিল্পের সঙ্গে গণজীবনের এক নিবিড় সংযোগ স্থাপনের কাজে অগ্রণী হয়েছিল।

কিন্তু গণনাট্য সঙ্ঘের দুর্বলতা এই যে, যদিও তারা দুর্ভিক্ষপীড়িত সংগ্রামী কৃষক-মজুরের জীবন থেকে মাল মশলা সংগ্রহ করল তথাপি সেই সমস্ত নিরক্ষর শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে নিজেদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করল না—করল শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যে। অর্থাৎ, গণজীবনকে শহরের সামনে তুলে ধরা হল, লোকশিল্পকে শহরের লোকের সামনে পরিবেশন করা হল; কিন্তু শহরের মজুর ও গ্রামের কৃষকের কাছে নিয়ে যাওয়া হল না। এই শিল্পসৃষ্টির দৃষ্টিকোণ অনেক সময়ে ওপর থেকে নীচের দিকে তাকানোর মতন রয়ে গেল। যতটা পরিমাণে বাস্তব শিল্পসৃষ্টি করলে অনেক সুবিধাবাদী শিল্পী গণনাট্য সঙ্ঘ পরিত্যাগ করত, তা সব সময়ে হয় নি। এবং সর্বোপরি আন্দোলন রয়ে গেল এক বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে গণজীবন রূপায়ণে আমাদের দোষ-ত্রুটিগুলো উপযুক্ত ক্ষেত্রে পরিবেশনার অভাবে দূরীভূত হল না। যাদের জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে গণনাট্য সঙ্ঘের মহান দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল সেই মেহনতী মানুষের মাঝখানে না যাওয়ায় তা যথাযথ ভাবে পালিত হল না। সংগঠনিক-ভাবে গণনাট্য সঙ্ঘ হয়ে গেল কুক্ষিগত। যেহেতু গণনাট্য সঙ্ঘের অনুষ্ঠান-

গুলি কেবলমাত্র মধ্যবিত্তের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ রয়ে গেল ও বেশী করে শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে পৌঁছাল না—অর্থাৎ গণনাট্য সঙ্ঘের স্থান মধ্যবিত্তদের মধ্যেই প্রধানত আবদ্ধ ছিল তাই ১) আদর্শগতভাবে গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অনেক গলদ ছিল ও ২) সংগঠনগতভাবে গণনাট্য সঙ্ঘ কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবুও গণনাট্য সঙ্ঘের গত ছ'বছরের আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই রচিত হয়েছে আগামী দিনের বৈপ্লবিক শিল্পসৃষ্টির বনিয়াদ, গণনাট্য সঙ্ঘ কোনোদিনই নিজেদেরকে "পেশাদারী শিল্পী-দাদাদের কাছে বিক্রি" করে নি। আজ যখন গণনাট্য সঙ্ঘ তার অতীতের দুর্বলতা কাটিয়ে গণজীবন থেকে রসদ সংগ্রহ করে সত্যিকার জনসাধারণের কাছে যাবার চেষ্টা করছে তখন হয়ত গণনাট্য সঙ্ঘের অনেক পুরনো সভ্য দূরে সরে যাচ্ছেন। কিন্তু তাতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অস্পষ্ট নির্দেশ

গণনাট্য সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার নির্দেশ দিতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবু যে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন তাও সমান অস্পষ্ট। ভবিষ্যতের কার্যক্রম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, "শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে যেতে হবে"—"গণনাট্য সঙ্ঘে শ্রমিক-কৃষক নেতৃত্ব গড়তে হবে"—"রক্তের স্বাক্ষরে যে-সংস্কৃতি রচিত হচ্ছে তাকেই সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে হবে"—"প্রতিটি শোষিত মানুষের জীবন ও লড়াইকে মূর্ত করে প্রতিক্রিয়ার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও"—"প্রতিটি রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে হবে" ইত্যাদি। কথাগুলি বড়ই অনির্দিষ্ট ও এ-ধরনের কথা আমরা পূর্বেও বহুবার শুনেছি। কথাগুলো অনেকটা 'গ্রামে ফিরে যাও' বা 'গো ব্যাক টু দি পিপল্'-এর মতন। আমার মনে হয় অতীত দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিম্নলিখিত কর্মপন্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কয়েকটি কার্যকরী প্রস্তাব

(১) গণনাট্য সঙ্ঘের কার্যক্ষেত্র—অতীতে গণনাট্য সঙ্ঘ মধ্যবিত্তদের মধ্যেই অধিকাংশ অনুষ্ঠান করেছে। ভবিষ্যতে অধিকাংশ অনুষ্ঠান শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে করতে হবে। কিন্তু এটুকু করলেই শেষ হবে না। লেখক, ছাত্র,

মধ্যবিত্ত, ক্লাব, সমিতি এমন কি পেশাদারী শিল্পীদের মধ্যেও যেখানেই প্রগতিশীল ভাবধারা নিয়ে কাজের ভিত্তিতে এগোনো যেতে পারে সেখানেই সে-কাজ সুপরিকল্পিতভাবে করতে হবে। দেশের শাসকবর্গের কর্তৃত্বাধীনে যে বিভিন্ন শিল্পের প্রচার হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সকল প্রগতিশীল গণশিল্প তখনই সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(২) বিভিন্ন গণ-প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সংগঠনকে বিস্তার করা—পূর্বে গণনাট্য সঙ্ঘ যেসব জায়গায় অনুষ্ঠান করেছে সেসব জায়গায় গণনাট্য আন্দোলন বিস্তারের ভিত্তিতে কোনো গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রহণ করে নি—ক্ষেত্র হিসাবে কোথায় কতটুকু সম্ভাবনা আছে, অথবা কোনো একক শিল্প-প্রতিভাকে গণনাট্য সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা, এরকম সংগঠনগতভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। উপরন্তু, যেসব জায়গায় সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠন গড়ে উঠেছে, সেখানেও যোগাযোগের অভাবে দানা বাঁধতে পারে নি। ভবিষ্যতে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে করতে হবে। বিভিন্ন শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র প্রতিষ্ঠান, যথা—ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কিষাণসভা ও ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে একসঙ্গে বসে পরিকল্পনা নেওয়া সবচেয়ে ভালো। সব সময়ে নজর দিতে হবে কোথায় নতুন সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্ভাবনা। আমাদের দেশে বিভিন্ন যাত্রা, কবিগান বা হিন্দুস্থানীদের মধ্যে কজরী, গানা প্রভৃতির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি রেখে—এইসব বিভিন্ন জায়গায় সংগঠক প্রেরণ করে সংগঠনকে প্রসারিত করতে হবে।

(৩) জনসাধারণের মধ্যে থেকে শিক্ষালাভ করা—গণনাট্য সঙ্ঘের অনুষ্ঠানগুলিকে উত্তরোত্তর আবেদনশীল ও সমৃদ্ধ করতে হলে নিরলসভাবে জনসাধারণের জীবন থেকে শিক্ষালাভ করতে হবে। একথা পুরনো হলেও গণনাট্য সঙ্ঘের পক্ষে আজও প্রযোজ্য। কিন্তু একথার অর্থ নয় যে, সমস্ত দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া বরং এ ব্যাপারে শক্তি অর্জনের জন্যেই শিক্ষার প্রয়োজন।*

* লোকনাট্য, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৫৫, পৃঃ ৫৮-৬০; প্রয়াত সুরপতি নন্দী গণনাট্য সংঘের প্রথম যুগের অন্যতম সংগঠক ও খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী। তিনি সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সলিল চৌধুরী-রচিত কয়েকটি বিখ্যাত গণসঙ্গীতের স্বরলিপি-রচয়িতা।—সম্পাদক

নবনাট্য আন্দোলনের সংকট / দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়

গণনাট্য সংঘের ভ্রান্তনীতি

একথা সুবিদিত যে, সাম্প্রতিক প্রগতিশীল নাট্য-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ; কিন্তু গত দু'বছরে অতি-উগ্র নীতি অবলম্বনের ফলে এই সংঘ অনেকগুলি বড় ভুল করেছে। তার ফলে কয়েক বছরের চেষ্টায় সমগ্র ভারতে যে একটা নাট্যআন্দোলন প্রসার লাভ করছিল, তার পরিধি আবার সংকুচিত হয়ে এসেছে। ১৯৪৮ সালে আমেদাবাদে যে সর্বভারতীয় গণনাট্য সম্মেলন হয়, তা থেকে বিভিন্ন প্রদেশের গণনাট্য কর্মীরা অনেকখানি উৎসাহ পেয়েছিলেন। দিনের পর দিন পনের-বিশ হাজার দর্শকের সামনে প্রাদেশিক গণনাট্য সংঘগুলি তাদের নাটক, নৃত্য ও সংগীত উপস্থিত করে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল; কিন্তু এই সম্মেলনের পরে এক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তার মাথায় অতি-বামপন্থা প্রবেশ করে এবং প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও তা সংক্রামিত হয়। তার ফলে অতি-বামপন্থায় অবিশ্বাসী বহু সৎ ও নিষ্ঠবান কর্মী ও নেতাকে সংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয় বা কলে-কৌশলে তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এর ফলে গণনাট্য সংঘের গণতান্ত্রিক রূপটি বদলে গিয়ে উগ্র দলীয় সংস্থায় তা পরিণত হয়। এই উগ্রতা চরম পরিণতি লাভ করে ১৯৪৯ সালে এলাহাবাদ সম্মেলনে। উগ্র বামপন্থী নেতা ও কর্মীরা সেখান থেকে জেহাদ ঘোষণা করে স্ব স্ব প্রদেশে ফেরেন এবং সংস্কারবাদকে ঝেঁটিয়ে তাড়াবার অছিলায় তাঁরা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মিত্রদেরই শত্রুজ্ঞানে দূরে সরিয়ে রাখেন। তাঁরা যে কল্পিত বিপ্লবের ছবি মনে মনে এঁকে নিয়েছিলেন তদনুসারে তাঁরা একটা ইস্তাহার রচনা করে ফেললেন এবং সেই ইস্তাহারের ভিত্তিতে সংগঠন ও অনুষ্ঠানের সব উদ্ভট পরিকল্পনা তাঁরা দাঁড় করালেন। গণনাট্য সংঘের বহু পুরাতন কর্মী নিন্দিত হলেন; পূর্বের সকল ঐতিহ্য অস্বীকৃত হল, আত্ম-সমালোচনার নামে আত্মনিন্দা দেখা দিল এবং তা থেকে আত্মকলহেরও সৃষ্টি

হল। নবজাত বাংলা সাময়িকী 'লোকনাট্যে' মৃত্যুঞ্জয় রায়[১]—এই ছদ্মনামে একজন উগ্র বামপন্থী 'সব ঝুটা হায়, সব ঝুটা হায়' বলে গণনাট্য সংঘের অতীত ক্রিয়াকলাপকে ধুয়ে মুছে ফেলে নতুন পন্থাই একমাত্র সত্য বলে আস্ফালন করলেন। পেশাদার মঞ্চের যে দু-চারজন প্রবীণ অভিনেতা আদর্শের প্রেরণায় গণনাট্য সংঘে এসে যোগ দিয়েছিলেন, নামোচ্চারণ না করলেও মৃত্যুঞ্জয় রায় তাঁদের ভাগ্যান্বেষী বলে অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি করলেন। বাঙলা দেশে তৎকালীন উগ্র বামপন্থী রাজনীতিকদের মুখপত্র 'মার্কস্‌বাদী'তে এই প্রবন্ধের সমর্থন করে 'মড়ার ওপর খাড়ার ঘা' দেওয়া হল। গণনাট্য সংঘকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখার আশা সমূলে উৎপাটিত হল; উগ্র বামপন্থায় অবিশ্বাসী কর্মী ও নেতারা প্রতিকারোপায় না দেখে সসম্মানে সরে দাঁড়ালেন। বোঝা গেল, রোগের মূল কারণ অন্যত্র।

মজার ব্যাপার হল এই যে, রাতারাতি বিপ্লব সমাধার স্বপ্ন যাঁরা দেখছিলেন তাঁদের মাথায় এটা কিছুতেই ঢোকানো যাচ্ছিল না যে, গ্রামে যেভাবে গণনাট্য আন্দোলন চালানো সম্ভব, মধ্যবিত্তপ্রধান শহর অঞ্চলে বিশেষ করে কলকাতার মতো মহানগরীতে সেভাবে গণনাট্য আন্দোলন চালানো সম্ভব নয়। গ্রাম্য পরিবেশ এবং শহরের পরিবেশে পার্থক্য আছে এবং গ্রাম্য লোকের রুচি ও শহরের লোকের রুচিতে প্রভেদ বিদ্যমান। সুতরাং এই পরিবেশ ও রুচির পার্থক্য স্বীকার করে নিয়েই পল্লী অঞ্চলে এবং শহর অঞ্চলে পৃথক ভিত্তিতে গণনাট্য আন্দোলন চালানো দরকার। এই বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে উগ্র বামপন্থীরা যে ধরনে গণনাট্য আন্দোলন চালাতে উৎসাহী হলেন সেটা একমাত্র চীন-ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশের মুক্ত এলাকাতেই সম্ভব হয়েছিল। উগ্র বামপন্থীদের একগুঁয়েমির ফলে সংগঠন অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ল এবং পুলিশ-কর্তৃপক্ষ আন্দোলনের এই দুর্বলতা বুঝতে পেরে জোর দমননীতির আশ্রয় নিলেন এবং তার ফলে গণনাট্য সংঘ ক্রমশ জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগল। উগ্র বামপন্থা রোগের চরম মুহূর্ত কেটে গেলেও গণনাট্য সংঘ আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠতে পারে নি।

১. নামটির উল্লেখে লেখক ভুল করেছেন, প্রকৃত ছদ্মনাম—মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী।—সম্পাদক

নাট্য-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ

সুখের বিষয়, দেরিতে হলেও গণনাট্য সংঘের একদল একনিষ্ঠ কর্মী তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং তা বুঝতে পেরে সংশোধনের চেষ্টাও করছেন। কিন্তু উগ্র বামপন্থী রোগে সে এতই জীর্ণ ও রক্তহীন হয়ে পড়েছে যে তাতে আজ নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হওয়া প্রয়োজন। শক্তি আহরণ করতে হবে বাইরের থেকে। তার নিজস্ব ভাণ্ডারে এ-প্রাণশক্তির সঞ্চয় তেমন নেই। সুতারাং গণনাট্য সংঘের বাইরে আজ যেসব প্রগতিশীল নাট্য-সম্প্রদায় গড়ে উঠছে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ স্থাপন করেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তার হৃতবল পুনরুদ্ধার করতে পারে। প্রগতিশীল হলেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মত ও পথ নিয়ে কিছুটা বিরোধ হয়তো থাকবে; কিন্তু লক্ষ্য যদি এক হয় তবে সহযাত্রী হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানের একযোগে কাজ করা মোটেই অসম্ভব নয়। সকলে হয়তো সমানভাবে এগিয়েও আসতে পারবে না, কিন্তু আগে হোক পরে হোক সবাইকে যদি একই মিছিলে দাঁড করানো যায় তবে আজকের দিনে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় কাজ। কথা হল মিছিলটি যাবে কোন দিকে—তার লক্ষ্যটি স্থির করে দিতে হবে। এ-লক্ষ্য হল কৃষিপ্রধান ভারতের গণ-সংস্কৃতি আজও অনেকখানি পিছিয়ে আছে; তাকে এগিয়ে দিতে হবে। অর্থনৈতিক জীবন থেকে সাংস্কৃতিক জীবনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলবে না। ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো আজও প্রধানত সামন্তযুগীয়। এই সামন্তযুগীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে তাকে নতুন গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যেই রয়েছে ভারতের কোটি কোটি মানুষের দুঃসহ দারিদ্র্য থেকে যথার্থ মুক্তি। এই মুক্তির পথে যারা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে তারাই আজ জনগণের শত্রু। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে কায়েম রাখবার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ কৌশলে দু-পা পেছনে দিয়ে ছলনার জাল বুনছে; আসলে সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারত আজও মুক্তি পায় নি।

এদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের একদল দোসর জুটেছে। নানা ছলাকলা করে এবং যেখানে অসমর্থ হচ্ছে সেখানে জুলুম চালিয়ে তারা সামন্তযুগীয় অর্থনৈতিক কাঠামোকেই টিঁকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে। সুতারাং সাম্রাজ্যবাদীর এবং

তাদের দোসরদের কবল থেকে অব্যাহতি না পেলে এদেশের জনসাধারণের যথার্থ মুক্তি নেই। এই অর্থ নৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠবে নতুন গণ-সংস্কৃতি। সুতরাং প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পীদের পক্ষে আজ পথ বেছে নেওয়া এবং লক্ষ্য স্থির করা কিছু কঠিন নয়।*

নতুন সাহিত্য, প্রথম বর্ষ, শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৭, পৃ ১১৯-১২৪; উপর্যুক্ত রচনাটি 'নবনাট্য আন্দোলনের সংকট' নামক প্রবন্ধের অংশ-বিশেষ। এই অংশটুকুতেই দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় ও তৎকালীন গণনাট্য সংঘের নীতিকে সমালোচনা করেছেন। বাকী, অংশ এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক বিধায় বর্জন করা হল।—সম্পাদক

কলকাতার খবর/গুরুদাস পাল

ওরে সাথীরে—
শুনেছো কি কলকাতার খবর ?
(সেথা) পুলিশেতে গুলি করে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর।
(ওরে) বুদ্ধদেবের শিষ্য যারা
(হয়ে) অহিংসাতে আত্মহারা
ধরলো পেশা মানুষ মারা বন্ধ করে ঘরের দোর।
(ও ভাই) আমাদের ভাই-ভগ্নী মরে
পথে ঘাটে রক্ত ঝরে
ছাত্র শুধু ছাত্র নয় রে প্রত্যেকের বুকের পাঁজর।
(ভাইরে) মরীচিকার পানে ছুটে
গেছে কি আজ ভ্রান্তি টুটে ?
কাকদ্বীপেতে পড়ছে লুটে অহল্যার ওই আঁখিলোর।
আজও যদি ইতস্তত
করি তবে পশুর মতো
মরতে হবে অবিরত দিন পর দিন মাস বছর।
কাকদ্বীপের পরে কলিকাতা
এমনি করে যথা তথা
মরবে ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা, স্বদেশবাসীর বংশধর।

(তাল বদল)

এবার দিকে দিকে জেগে ওঠো
রক্তনদীর পরপারে ওই মুক্তিপথে ছোটো।
দিকে দিকে অত্যাচারী কংসরাজার হানা
অন্তরের এই ঘুমন্ত নৃসিংহকে জাগা না।
লক্ষ লক্ষ হাসান-হোসেন কারাবালাতে মরে
হত্যাকারী এজিদ সেনা ফিরছে দম্ভ ভরে।
রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে দে না ইতিহাসের পাতা
নতুন করে লেখ না এবার উনপঞ্চাশের খাতা।

কুরুক্ষেত্রে ঘুরছে আজও দুর্যোধনের সেনা
লক্ষ লক্ষ পাঞ্চালীর আজ চুকিয়ে দে না দেনা।
গাই না আমি গানের ছন্দ বিদ্রোহের সুরে
মনের জড়তা সব যাক্ না ভেঙে চুরে।
মজুর-কিষাণ মধ্যবিত্তের সকল ব্যবধান
জাগরণের জোয়ারে সব হোক্ না রে খান খান।
বুকেতে হাত দিয়ে সবাই সত্য করে বলুক
দশ বছরের শিশুর ওপর ডাণ্ডাবাজী চলুক।
নির্বিচারে নর-নারী ছাত্র-ছাত্রী হত্যা
এই যদি হয় শিশুরাষ্ট্রের আইন নিরাপত্তা,
তবে আমি সভার মাঝে উচ্চকণ্ঠে কহি
পাঁচশো হাজার অসংখ্যবার আমি রাজদ্রোহী।
তাতে যদি যেতে হয় ওই আলিপুরের জেলে
গর্ব করে বলবো আমি বাঙলা মায়ের ছেলে।
কিম্বা যদি বন্দুকে হয় জীবন অবসান
মরার আগে গেয়ে যাবো এই রক্ত ঝরার গান।
আমার পরে থাকবে যারা, দেশ-বিদেশে ঘুরে
আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দেবে মর্মভেদী সুরে।
এই পর্যন্ত ক্ষান্ত আমি নমস্কার করি
দশের তরে বাঁচি যেন আর দেশের তরেই মরি।

[এই কবিগানটির রচয়িতা বিখ্যাত কবিয়াল শ্রীগুরুদাস পাল সরকারী রোষে পতিত হয়ে বর্তমানে স্বগৃহে অন্তরীণ আছেন। তাঁর অপরাধ এই যে, দেশের অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামই তাঁর গানের বিষয়বস্তু। জনসংস্কৃতির উপর এই জাতীয় সরকারী কণ্ঠরোধের প্রতিবাদ হিসেবে এই গানটি এখানে প্রকাশিত হল। গানটি ২১শে জানুয়ারী ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে রচিত।—সঃ লোঃ] *

* লোকনাট্য, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৫৫, পৃ. ৩৫ ; গানটির শিরোনামের ঠিক নীচে 'লোকনাট্য'-সম্পাদকের উপর্যুক্ত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়। এই গানটির বিতর্কিত উল্লেখ মার্কসবাদী প্রবন্ধকারদের নানা রচনায় লক্ষ্যগোচর হয়েছে। দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৭ ; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১০ ও পৃ. ৫২।—সম্পাদক

পরিশিষ্ট২

সাহিত্য ও গণসংগ্রাম / চিন্মোহন সেহানবীশ

এ-সম্মেলনে যাঁরা জড়ো হয়েছেন তাঁদের কাছে 'সাহিত্য ও সমাজের নিবিড় সম্পর্ক, তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের অসারতা বা বাস্তবের অবিকল প্রতিফলনের নামে নৈরাশ্যবাদ ও বিকৃতি-বিলাসের বিষময়তা নতুন করে করে প্রমাণের দরকার নেই। এসব মেনেই তাঁরা এখানে এসেছেন, আর গণসংগ্রামে যোগদান ছাড়া সমাজের তথা সাহিত্যের যে মুক্তি নেই এ-সত্যও তাঁদের স্বীকার করতে বাধা নেই।

আমাদের প্রশ্ন হল সে-যোগদানের রূপ কি হবে? এর জবাব না নিয়ে যদি আমরা এখান থেকে যাই, তবে সম্মেলন অনেকটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে, কারণ তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকের কাছে এই প্রশ্নই হল আজ সব থেকে জরুরী।

আমাদের মধ্যে এ-সম্পর্কে দু'ধরনের চিন্তা দেখা যায়—যদিও আগেই মুখবন্ধ করেছি, গণসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকা ছাড়া সাহিত্য-শিল্পের যে এগোবার জো নেই এ-বিষয়ে উভয়েই একমত। একদল ভাবছেন গণসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রয়োজন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য—যে-অভিজ্ঞতা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ, ফলবান করে তুলবে। সে-সাহিত্য আবার গণসংগ্রামকে পুষ্ট করবে, এগিয়ে দেবে নূতন কর্মোদ্যোগের পথে। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার কর্মীর মতো সাহিত্যিক বা শিল্পীর গণসংগ্রামে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ সে-'প্রলোভন' এড়াতে না পারলে সেই বিরামহীন কর্মস্রোতের অতলে তলিয়ে যাবে সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সমস্ত প্রেরণা। এরকম 'সাহিত্যিক অপমৃত্যু'র নজীরও তাঁরা দেখান আমাদের আশপাশ থেকে।

অন্যদল বলেন, মজুর-কিষাণকে সংঘবদ্ধ করতে মজুর-কিষাণ সংগঠকেরা যে-কাজ করেন, শিল্পী-সাহিত্যিককেও তা করতে হবে। করতে হবে শুধু গণসংগ্রামের খাতিরেই নয়—সাহিত্যশিল্প সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা মনে রেখেও। তাঁরা বলেন অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগের নামে দূরত্ব রাখা চলবে না—বিশেষ

সুবিধা দাবী করা চলবে না। কারণ তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শুধু গণসংগ্রাম নয়—সাহিত্যও, কারণ ভাসা ভাসা অভিজ্ঞতা থেকে তৈরী হবে শুধু কৃত্রিম সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।

বাস্তবিক অন্য কর্মীদের মতো গণসংগ্রামের সৈনিক হলে শিল্প-সাহিত্যের স্রোত রুদ্ধ হবেই—এ-কথাটা বিচারসহ নয়। আরাগঁর পক্ষে সব থেকে ফলপ্রসূ সময় হল রক্তাক্ত প্রতিরোধের বছর কটি। স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভেসে এল কর্নফোর্ডের অবিস্মরণীয় কবিতা। নাৎসী-পদানত ফ্রান্সে পিকাসোর তুলি থামে নি যদিও অন্তরীক্ষচারীদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল অব্যাহত। কডওয়েল সম্পর্কে জর্জ টমসন বলেছেন, "It was not an accident that his most productive period as a writer coincided with his political activity in Popler." জুলিয়াস ফুচিকের কথা না হয় নাই তোলা গেল।

আসলে অফুরন্ত অবকাশ, নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার অনুকূল পরিবেশ না হলে সাহিত্যশিল্পের সৃষ্টি ব্যাহত হবে—এ-ধারণাটি ঠিক নয়। বরঞ্চ আজকের মতো তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের যুগে সব থেকে অনুকূল সেই পরিবেশকেই বলব যা সাহিত্যিকের শ্রেণীসচেতনতাকে সব চেয়ে বেশী শাণিত করে তুলতে সাহায্য করবে। আর যেহেতু আমরা জ্ঞান ও কর্মের নিবিড় পারস্পরিকতায় বিশ্বাসী, তাই কর্মস্রোত থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখেও পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ সচেতনতা লাভ করা সম্ভব মনে করি না। বিশেষ করে আমাদের মতো নিরক্ষরতার দেশে লেখক ও শিল্পীরা হলেন মধ্যবিত্তশ্রেণী উদ্ভূত। গোর্কির মতো নিপীড়িত শ্রেণী থেকে সাহিত্যিকের আবির্ভাব এখানে অনেক বেশী কঠিন। কাজেই আপন জীবনসংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতঃই লেখকের পক্ষে তীব্র সচেতনতা অর্জন করা স্বাভাবিক নয় (যদিও আমরা জানি সেই স্বতঃস্ফূর্ত চেতনাও সোশ্যালিস্ট চৈতন্য নয়)। তাই আমাদের মতো লেখক ও জনগণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের দেশে কর্মের দিক দিয়ে একাত্ম না হতে পারলে সাহিত্যের মুক্তি নেই। তাই বাইরের খানিকটা দূরত্ব রাখতে গেলে মনের দিক থেকেও ব্যবধান ঘুচবে না।

তাছাড়া যদি ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ সভার অবিশ্রান্ত কাজকর্মের কলের

যদি দু'চার বছর লেখা বন্ধও থাকে, তাতেই বা কি আসে যায়। ইতিমধ্যে সেই কাজের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মানসিকতার ক্ষেত্রে পলি পড়বেই—আগামী দিনে সোনালী ফসলের যা নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। তাই বৈশাখের রুদ্রদাহ দেখে বিহ্বল না হয়ে ভরসা রাখতে হবে আষাঢ়ের অকৃপণ দাক্ষিণ্যে।

চীনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। চীনও আমাদেরই মতো অক্ষর-জ্ঞানহীন—দারিদ্র্যের প্রচণ্ডতাও এক পর্যায়ের। সেখানে সাংস্কৃতিক উন্মেষে শিল্পী-সাহিত্যিকের ভূমিকা সম্পর্কে রাষ্ট্রনায়ক মাও সে তুং অত্যন্ত আস্থাশীল। তিনি বলেছেন আমাদের ফ্রন্ট দুটোই—সামরিক ও সাংস্কৃতিক এবং দুটো পরস্পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু ঠিক ফ্রন্টের মতো করেই শিল্পীকে সাহিত্যিককে দায়িত্ব অর্জন করতে হবে—লক্ষ্য স্থির রেখে সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হবে। শুনেছি সেখানে সংস্কৃতি-কর্মীদের দু-তিন বছরের জন্য কিষাণের আত্মীয়তা অর্জন করতে যেতে হয়। তার ফলে প্রথমটা সত্যই থেমে গিয়েছিল কলম আর তুলি, কিন্তু অত্যন্ত সাময়িকভাবে। তারপর এসেছে নতুন সৃষ্টির জোয়ার।

বুদ্ধিজীবীর পক্ষে কিষাণের মনের মধ্যে প্রবেশ করা, তাকে তার সংশয়, পিছুটান কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করার মতো আত্মীয়তা অর্জন করা দুরূহ, তা একটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে। চীনা একটি নারী-সংস্কৃতিকর্মীর অভিজ্ঞতার কথা। উত্তর চীনের এক গ্রামে তিনি তখন কিষাণদের সংঘবদ্ধ করছেন। সন্ধ্যার আকাশে চাঁদ দেখে তিনি একদিন বিহ্বল হলেন, কিন্তু সঙ্গের কৃষাণী সেই চাঁদ দেখেই প্রচণ্ড শীতের রাত্রির সম্ভাবনায় ভয়ার্ত হয়ে উঠল আসন্ন দুর্গতির কথা ভেবে। চীনা নারীকর্মী লজ্জিতা হলেন—অত্যন্ত রুক্ষ কঠোর বাস্তবের আঘাতে সংবরণ করলেন তাঁর বিহ্বলতা।

তবে কি শিল্পী-সাহিত্যিক শুধু মজুর-কিষাণের বর্তমান সচেতনতা নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকবেন। নিশ্চয়ই নয়। তিনি বুদ্ধিজীবী হিসাবে সেখানে আনবেন সোশ্যালিস্ট চৈতন্য, আর তারই ভিত্তিতে তাদের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করবেন। কিন্তু সোশ্যালিস্ট চেতনা মজুর-কিষাণেরা সহজভাবে গ্রহণ করবে শুধু তাদের আপনজনারই কাছ থেকে, গুরুমশায়ের কাছ থেকে নয়। তাই কবিকে, শিল্পীকে, সাহিত্যিককে ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত মজুর ও কিষাণ সভার

কিষাণের সহকর্মী হতেই হবে—তাদের বিপ্লবী কাজের দর্শকমাত্র নয়।

অন্য ট্রেড ইউনিয়ন বা কিষাণ-কর্মীর সঙ্গে তবে তফাৎটা হবে কোথায়? তফাৎ হবে দু'দিক থেকে। সাহিত্যিক বা শিল্পীর মন সংঘবদ্ধ মজুর-কিষাণের সংস্পর্শে এসে অলক্ষ্যে বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ হবে—যে-চেতনা হল নতুন সাহিত্যের বনিয়াদ। অন্যদিকে শিল্পী-সাহিত্যিক মজুর-কিষাণের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের মধ্যেও অলক্ষ্যে সংক্রামিত করবেন সেই তীব্র প্রচণ্ড অনুভূতি যা হল শিল্পী-সাহিত্যিকের বৈশিষ্ট্য। সে-অনুভূতি প্রশস্ত করবে আগামী বিপ্লবের পথ। বিপ্লবী-কবি এলুয়ার তাই বলছেন: "কবিরা বুঝতে পেরেছে যে সব মানুষই তাদের মতো সৌন্দর্যের প্রতি আবেগময় অনুভূতি পেতে পারে।" নাৎসী-অধ্যুষিত ফ্রান্সে জনসাধারণ ও সাহিত্যিক যে একই বিপ্লবী প্রচেষ্টার মধ্যে একাত্ম হতে পেরেছে, তারই উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: "এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা মানুষ সম্বন্ধে হতাশ হই নি; এক মুহূর্তের জন্যেও আমরা অত্যাচারিতদের মুক্তি এবং অত্যাচারীদের ধ্বংসের ভরসা ছাড়ি নি। মুক্তি তার দুর্গ ফ্রান্সকে ছেড়ে যায় নি। তার রক্ষীদের অনেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে, নিপীড়িত হয়েছে, নিহত হয়েছে এবং বাকী সকলে অন্ধকারে লড়াই চালিয়ে গেছে; কিন্তু তাদের সকলেরই হৃদয়ে ছিল একই উদ্দীপনা, ছিল একই আশা যা চিরন্তনের রঙে রাঙানো। কেউ আর বলত না 'আমি', বলত 'আমরা' আর কবিদের সম্মান যা প্রকাশ পেয়েছিল এবং যা টিঁকে থাকবে তা হল এই যে তারা বলেছে 'আমরা মানুষরা'। একথা তারা বলেছে সমগ্র পৃথিবীর সেই সমস্ত মানুষের হয়ে যারা নীচভাবে জীবনযাপন করতে আর রাজী নয়।"*

আমি জানি এ-প্রসঙ্গে বিপ্লবীর কাজের মধ্যেও কাজ-ভাগাভাগির কথা উঠবে, এই মুহূর্তে সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে মজুর-কিষাণ আন্দোলনে বিনাশর্তে আত্মনিয়োগ করার পথে নানা অসুবিধার কথা উঠবে, আত্মনিয়োগ করলেই সৎসাহিত্য সৃষ্টি হবে—এ মত যান্ত্রিকতাদোষদুষ্ট, এমন কথা উঠবে। এ সবই ঠিক; কিন্তু এ-সবের বিচার হবে প্রাথমিক সমীকরণের চেষ্টার পর। যেটা প্রথমে করবার সেটা হল প্রত্যেক শিল্পীকে সাহিত্যককে যুক্ত হতে হবে

* 'ফরাসী কবির জবানবন্দী', 'পরিচয়', চৈত্র, ১৩৫৫।

মজুর-কিষাণ-আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে। সৈনিক হওয়ার শিক্ষা সম্পূর্ণ হবার পর কথা উঠবে কাজ ভাগাভাগির, বিচার হবে নতুন ফসল ভালো না মন্দ, খতিয়ে দেখা যাবে লাভক্ষতি। ইতিমধ্যে সবাইকে যেতে হবে ফ্রন্টে।*

* পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৭০৯-১৩; ১৯৪৯ সালের ২২-২৪ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ সম্মেলনে পঠিত। এই প্রবন্ধটির বক্তব্যই পরবর্তীকালে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-প্রসঙ্গে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। দ্র. বর্তমান গ্রন্থের পৃ. ৩৫ ও ৬৫।—সম্পাদক

ঘোষণাপত্র

১. ধনবাদী সভ্যতার শেষ সংকটের এই চরম পর্যায়ে পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত। ইতিহাস আজ প্রত্যেক মানব-প্রেমিককে প্রশ্ন করিতেছে, আপনি কোন্ পক্ষে আছেন? আপনি কি মৃত্যুপথযাত্রী ধনবাদ-ফ্যাশিবাদের শিবিরে, না নবজীবনের জয়গানে মুখর সমাজবাদের শিবিরে? বাঙলা দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিককে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

২. ডলার-সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে ধনবাদী শিবির তৃতীয় মহাসমরের আয়োজনে মত্ত। পৃথিবীকে তাহা পুনরায় রক্তের প্লাবনে ডুবাইতে চায়। যুক্তিতর্ক, বিচার, বিবেক সবকিছু বজন করিয়া ধনবাদী সভ্যতা আজ একটি মৃত্যুবর্ষী এ্যাটম বোমার আকার ধারণ করিয়াছে। ভারতের শাসক-সম্প্রদায় নিরপেক্ষতার নামে এই আন্তর্জাতিক সমর-প্রস্তুতিকে সমর্থন করে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

৩. মানবতার বিরুদ্ধে এই হীন চক্রান্তকে ব্যর্থ করার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার নেতৃত্বে সমগ্র পৃথিবীর জনগণ ও ভারতের শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত যে শান্তির অভিযান চালাইতেছে, আমরা তাহাতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে সফল করিয়া তুলিব। আমরা ঘোষণা করিতেছি, বিশ্ব-মানবিকতার ঐতিহ্য বহনকারী বাঙলার শিল্পী ও সাহিত্যিক আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রত্যেক দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য অবিচলিত ভাবে লড়াই করিবেন।

৪. ধনবাদী সংস্কৃতি তাহার প্রথম যুগে মানুষকে বড় করিয়া দেখাইয়াছিল, পুরাতনকে পশ্চাতে ফেলিয়া মানুষকে নূতনের জন্য সংগ্রাম করিতে অনুপ্রেরিত করিয়াছিল। ধনবাদী সংস্কৃতির প্রথম যুগে আমরা দেখিতে পাই সামন্তবাদী জীবনযাত্রার সুকঠোর সমালোচনা, শাস্ত্রের স্থলে বিজ্ঞান, গোষ্ঠীর স্থলে জাতি, ক্ষুদ্রের স্থলে বৃহৎ, গ্রামের স্থলে বিশ্ব, আচারের স্থলে বিচার, অন্ধবিশ্বাসের স্থলে স্বচ্ছ যুক্তি, এবং পরলোকে স্বর্গসুখের পরিবর্তে ইহলোকে জীবন সম্ভোগের উন্মাদনা।

৫. কিন্তু [illegible] ধনবাদী সমাজে প্রগতির সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ধনবাদী সমাজে মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর একাধিপত্য শ্রমিকশ্রেণীকে ও শ্রমজীবী জনসাধারণকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া ক্রমশ অধিকতর দুর্গতির দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং ধনবাদের মধ্যে সৃষ্টি করে ক্রমবর্ধমান সংকট। জনসাধারণের বিক্ষোভ ধনবাদী সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইতে লাগিল। সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিক ও শিল্পী ধনিক ও পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর মানুষের স্বার্থান্ধতা, লোভ, লক্ষ্যহীনতা, নিষ্ঠুরতা, যৌনবিকৃতি, আত্মরতি ইত্যাদির নিখুঁত চিত্র আঁকিয়া কঠোরভাবে ধনবাদী সমাজের সমালোচনা করিতে লাগিলেন।

৬. আজ মুমূর্ষু ধনবাদের যুগে ধনবাদী সাহিত্য হইতে প্রগতিশীলতার সুর ও সত্যনিষ্ঠ সমালোচনার সুর অন্তর্হিত হইয়াছে। ধনবাদী সংস্কৃতি আজ আসন্ন মৃত্যুর বিকৃতিতে আচ্ছন্ন। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা। মানুষকে এতটুকু মর্যাদা দিতে তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। তাহার বিলাস মানুষের 'পশুত্ব' লইয়া। মৃত্যুই তাহার কাছে জীবনের একমাত্র সার্থক পরিণতি, আত্মহত্যাই বীরত্বের একমাত্র পরিচায়ক। বিজ্ঞানকে এবং প্রেম, বন্ধুত্ব, দেশপ্রীতি ইত্যাদি মানবিক মূল্যকে অস্বীকার করিয়া তাহা মানবের মনে দুজ্ঞের্যতা, রহস্যবাদ, দুঃখবাদ, ইত্যাদির পচা রোমান্টিক মোহজাল বিস্তার করিতেছে।

৭. বাংলা দেশের রামমোহন-মাইকেল-রবীন্দ্রনাথ একদা মানবের বিরাটত্বের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহিত্যে পাই অতীতকে পশ্চাতে ফেলিয়া নূতনের দিকে জয়যাত্রার প্রেরণা। মানবের মহৎ ভবিষ্যৎ, মহৎ চরিত্র, মহৎ কর্ম, মহৎ চিন্তা ও শক্তি—এই সকল ঐতিহ্য তাঁহারা বাংলা সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক ধনবাদী ভারতবর্ষের বাস্তব পরিণতি তাঁহাদের সেই সকল স্বপ্নকে ভাঙিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়াছে। পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্য ধনবাদী সমাজের ক্ষয়িষ্ণু ভাবধারায় আচ্ছন্ন। মধ্যবিত্তশ্রেণীর অহমিকা, আত্মকলহ, নৈরাশ্য, ভাববিলাস ও বিভ্রান্তি এই সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। অন্যদিকে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সামান্য একটু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা ছিল বলিয়া ধনবাদী ভাবধারা মধ্যবিত্তের মনে একটা মিথ্যা জাতীয়তাবাদী 'প্রগতিশীলতার' ও আশাবাদের মুখোশ পরিয়া দারুণ বিভ্রান্তি জাগাইয়াছে এবং মধ্যবিত্তের মারফৎ বাংলা সাহিত্যকে বিকৃত ও অভিভূত

করিয়াছে। আজ ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া ধনবাদী ভাবধারা সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল হইয়াছে এবং সাহিত্য ও শিল্পকে বিনাশের দিকে লইয়া যাইতেছে। বহু মধ্যবিত্ত লেখক নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই বুঝিতে পারিতেছেন, ধনবাদী সাহিত্যের আর কোনো ভবিষ্যৎ নাই। কিন্তু ধনিকশ্রেণীর উগ্র জাতীয়তাবাদী ফ্যাশিবাদী ভাবধারা এখনও নানারূপ ভেক ধারণ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে কলুষিত করিতেছে। আজ সকল প্রগতিশীল লেখকের কর্তব্য ফ্যাশিবাদী ভাবধারার সমস্ত মুখোশ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা এবং যেসকল সাহিত্যিক এই ভাবধারার বাহক তাঁহাদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে অভিযান চালানো।

৮. বাঙলার ধনবাদী সাহিত্যে ও শিল্পে শ্রমিকের গৌরবময় সংগ্রামের চিত্র স্থান পায় না। শ্রমিক-কৃষক-মানুষের হীন নিন্দাবাদে এই সাহিত্য মুখর। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার জয়স্তুতিতে ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের কুৎসা প্রচারে ধনবাদী প্রচার-সাহিত্যের ক্লান্তি নাই। ধনবাদী সাহিত্যিকদের কেহ কেহ আবার 'তৃতীয় শক্তি' সাজিয়া শ্রমিক-কৃষকের 'দাবীদাওয়া'র প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানান এবং 'অহিংস' ও 'উদার' মধ্যবিত্ত শ্রমিক-কৃষককে স্বখাত-সলিল হইতে 'উদ্ধার' করিতেছে—সযত্নে এই অপপ্রচার চালান। 'তৃতীয়-শক্তির' গোষ্ঠীভুক্ত সাহিত্যিক ও শিল্পীরা প্রচার করেন, তাঁহারা 'সৃষ্টির স্বাধীনতা' বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নন। তাঁহাদের মতে সাহিত্যে বা শিল্পে রাজনৈতিক মতবাদের স্থান নাই, তাহা একান্ত 'বিশুদ্ধ' ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, শিল্পীর আত্মপ্রকাশেই তাহা সিদ্ধ, তাহার সামাজিক সার্থকতার প্রয়োজন নাই, তাহাতে বিষয়বস্তুর মূল্য নিরর্থক, প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্যই একমাত্র বিচার্য। চিরন্তন সত্য ও সুন্দরের উপাসনার আড়ালে এই সকল লেখক ধনবাদের বেতনভুক প্রচারকের কাজই করিয়া থাকেন। মুখে সমাজ-বিপ্লবের সমর্থন ও কার্যত বিপ্লবের বিরোধিতা—এই বিভীষণ বৃত্তি 'তৃতীয় শক্তি'কে ভারতের নয়া ফ্যাশিবাদের উপযুক্ত দোসর করিয়া তুলিয়াছে।

৯. মৃত্যুধর্মী ধনবাদী-ফ্যাশিবাদী ভাবধারার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সাহিত্য ও শিল্প কিরূপে নবজন্ম লাভ করিবে ও পূর্ণতম বিকাশের দিকে অগ্রসর হইবে, ইতিহাস আজ তাহার সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতেছে। ধনিকশ্রেণীর ধনবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমজীবী

জনসাধারণ ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী অপূর্ব প্রতিভার ও বীরত্বের সহিত যে চূড়ান্ত মুক্তিসংগ্রাম চালাইতেছেন, তাহা সমগ্র মানবসমাজকে দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তি দিবে এবং সমাজবাদী সভ্যতা সৃষ্টি করিয়া শিল্প ও সাহিত্যকে অফুরন্ত বিকাশের সম্ভাবনা দান করিবে।

১০. ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে গণবিপ্লবের অভিযান চলিয়াছে, তাহারই মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি মানবের সৃষ্টিশীল শক্তির এক সর্বাঙ্গীণ নূতন অভ্যুদয়। এই সৃষ্টিশীল শক্তির মুক্তধারাই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সর্বপ্রকার প্রগতির ও মূল্যের একমাত্র উৎস। গণবিপ্লবই তাই আজিকার দিনের শ্রেষ্ঠ বাস্তব সত্য। সামাজিক বিকাশের সমস্ত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইহারই মধ্যে নিহিত।

১১. সাহিত্যে এই গণবিপ্লবের প্রতিফলন কেহই রোধ করিতে পারে না। ইতিহাসের অমোঘ বিধি ইতিমধ্যেই বাঙলাদেশে যে গণসাহিত্যের সূচনা করিয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক ভূমিকা হইল ধনবাদী সমাজের ও ধনবাদী সাহিত্যের প্রতিরোধ করা এবং গণবিপ্লবকে জয়যুক্ত করা। অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সাহিত্যেরও দুই শিবির গড়িয়া উঠিয়াছে, ধনবাদী সাহিত্যের শিবির ও গণসাহিত্যের শিবির।

১২. প্রগতিশীল সাহিত্যিকের স্থান এই গণবিপ্লবের ও গণসাহিত্যের শিবিরে। যেখানেই পাঁচজন শ্রমিক বা কৃষক সংঘবদ্ধ হইয়া ধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছেন, সেখানেই আমরা শুনিতে পাইতেছি মানবতার দুর্জয় শপথ—সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমরা শুধু নিজেদের শক্তির জোরে সমাজবাদী সমাজ, গণরাষ্ট্র, গণসাহিত্য ও গণশিল্প গড়িয়া তুলিব। ব্যাপক গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নূতন সাহিত্য ও শিল্পকে গড়িয়া তোলার জন্য একদিকে যেমন শ্রমিক ও কৃষক নিজেরাই আগুয়ান হইয়া আসিবেন, অন্যদিকে তেমনই বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকের পাশাপাশি থাকিয়া গণসাহিত্য ও গণশিল্প সৃষ্টির কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবেন।

১৩. আমাদের দেশে আজিকার দিনের গণসাহিত্য গণবিপ্লবেরই বাস্তব রূপায়ণ। গণবিপ্লবের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া এবং শ্রমিক-কৃষকের জীবনের সহিত একাত্ম না হইয়া যে সার্থক সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, একথা মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রগতিশীল সাহিত্যিক নিজেদের অভিজ্ঞতা হইতেই

ক্রমশ বুঝিতে পারিতেছেন। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিককে আজ জনগণের নিকটে যাইতে হইবে, তাঁহাদের সংগ্রামশীল জীবনকে নিখুঁতভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যের মধ্যে যে সরলতা, ঋজুতা ও মানবিক মূল্যবোধ আছে, ধনবাদী সাহিত্যিকগণ আজ তাহা পদদলিত করিতেছেন। প্রগতিশীল সাহিত্যিক এই সকল ঐতিহ্যকে অবলম্বন করিয়া গণসাহিত্য রচনা করিবেন। এই সাহিত্য হইবে জনগণের সম্পত্তি। জনগণ ইহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবেন। বিপ্লবের ধারালো অস্ত্ররূপে ইহা জনগণের সংগ্রামী চৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করিবে এবং সমাজবাদী সমাজের ক্রম-বিকাশকে ফুটাইয়া তুলিবে।

১৪. যে মানবতার সাধনা ধনবাদী সাহিত্যের প্রথম যুগে সাহিত্যিকের কল্পনা-বিলাস ছিল, আজ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ নিজের বাস্তব জীবনে সেই সাধনাকে মূর্ত করিতেছেন। সাধারণ মানুষ আজ বীরত্বের ও মহত্ত্বের চরম শিখরে আরোহণ করিতেছেন। আমরা এক নূতন এপিক যুগে বাস করিতেছি। সাহিত্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য তাই নির্দেশ দিতেছে, সাহিত্যিকে আজ বাস্তবতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। জনগণের বাস্তব জীবনেই আজ সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ মানবিক মূল্য খুঁজিয়া পাইবেন।

১৫. পুরাতন মানবতা—যাহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি আমরা বাঙলাদেশে রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাই—মানুষকে বড় করিয়া দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু এই দেখার মধ্যে দুটি গুরুতর অসম্পূর্ণতা ছিল। পুরাতন মানবতা মানুষকে নিজের আত্মার মধ্যে, একাকীত্বের মধ্যেই বড় করিয়া দেখাইত এবং অশুভের সহিত যে সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিয়া শুভকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে তাহা দেখাইত না। মুমূর্ষু ধনবাদের যুগে মানবতার নীতিও বিকৃত হইয়া মানুষকে পাপী, অপরাধী, ক্ষুদ্র ও করুণাযোগ্য বলিয়া চিত্রিত করিতেছে। প্রগতিশীল সাহিত্য নূতন সমাজবাদী মানবতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে। ধনিকশ্রেণীর ধনবাদী অশুভের বিরুদ্ধে তীব্র ও নিষ্করুণ সংগ্রামের চিত্র তাহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। মানুষকে তাহা দেখাইবে 'যোদ্ধা ও কর্মী' রূপে, ইতিহাসের স্রষ্টা ও নূতন সমাজের সংগঠক রূপে।

১৬. শ্রমজীবী জনসাধারণের বীরত্ব, মহত্ত্ব ও সংঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা যে নূতন সমাজের ও সভ্যতার পত্তন করিতেছে, তাহারই পূর্ণ বিকাশ হইবে

সমাজবাদী সমাজ ও সভ্যতায়। শ্রমিক ও কৃষক শুধু যোদ্ধা নন, তাঁহারা নূতন সভ্যতার রচয়িতা। শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামের ভিতর দিয়া কিরূপে সমাজবাদী সমাজের ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে, আজিকার সাহিত্য ও শিল্প হইবে তাহারই রূপায়ণ। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী, এই দুইয়েরই পূর্ণ সমন্বয় ঘটিবে সমাজবাদী বাস্তবতায়। এই সমাজবাদী বাস্তবতার পথেই সাহিত্য ও শিল্পকে অগ্রসর হইতে হইবে।

১৭. প্রগতিশীল গণসাহিত্যের বিরুদ্ধে ধনিকশ্রেণী, ধনিকরাষ্ট্র ও ধনবাদী সাহিত্যিক আজ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাইতে। ধনবাদী রাষ্ট্রের জেলখানা আজ অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করিতেছে, প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী কোন শিবিরে। সেন্সরশিপ, নিষেধাজ্ঞা, কুৎসা, অপপ্রচার, খানাতল্লাসি, গ্রেপ্তার ইত্যাদি সর্বপ্রকার অস্ত্র লইয়া ধনবাদ আজ প্রগতি-সাহিত্যকে আক্রমণ করিতেছে। আমরা এই আক্রমণকে প্রতিহত করিব ইহাই আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা। প্রগতিশীল গণসাহিত্য ও গণশিল্প মরিতে পারে না। ইতিহাস ইহার স্বপক্ষে। ইহার জয় অবশ্যম্ভাবী।*

---

* পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৫৬, পৃ. ৭০৩-৭০৮; প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে নানা বাক-বিতণ্ডার পর উপর্যুক্ত 'ঘোষণাপত্র'টি গৃহীত হয়। ১৯৪৯ সনের ২২ এপ্রিল থেকে ২৪ এপ্রিল কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনটি। পরবর্তীকালে 'প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা'-প্রসঙ্গ এই 'ঘোষণাপত্র'-টির কথা উল্লিখিত হয়েছে। দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৪, ৬১, ৮২।—সম্পাদক

কলকাতার তরুণ লেখক সম্মেলন / ধনঞ্জয় দাশ

সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় নয়, কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে শহরতলী বরাহনগরে গত ১৩ই অক্টোবর শতাধিক প্রতিনিধিসহ কলকাতার প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। যুব-সংস্কৃতিবিদ্‌দের এই সম্মেলনে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে আজকের সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত করতে হলে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, হঠাৎ যুব-সংস্কৃতিবিদ্‌দের এই সম্মেলন কেন? এর উত্তর প্রতিনিধি সম্মেলনে উত্থাপিত ঘোষণাপত্র ও নরহরি কবিরাজের দীর্ঘ আলোচনা থেকে শুরু করে সম্মেলনে উপস্থিত তরুণ সাহিত্যিকদের এবং প্রতিনিধি সম্মেলনের সভাপতি কবি রাম বসু-র অভিভাষণে ব্যক্ত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে।

বাঙলার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি আজ এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন। একদিকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চিরসাথী দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মুদ্রাস্ফীতি এ-দেশের জাতীয় জীবনকে কণ্টকিত করে তুলেছে, অন্যদিকে বাঁচার দাবী আজ বেয়নেটের ডগায় ছিন্নভিন্ন, বুটের তলায় নিষ্পেষিত আজ ভুখামানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা। মজুর-কৃষক-মধ্যবিত্তের স্বপ্ন-সাধ আজ রক্ত-নিমজ্জিত, লাঞ্ছিত। বিশেষ করে তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সংবেদনশীল মনে জনতার এই ব্যথা, মনুষ্যত্বের এই অবমাননা বিক্ষোভের ঝড় তুলছে প্রতিনিয়ত। বাঙলার তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের শতকরা নব্বই ভাগ ইতিহাসের এই গতিকে নীরব দর্শক হিসেবে গ্রহণ করছেন না, তাঁদের লেখনীর মুখে, তুলির টানে, সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে তাঁরা নির্যাতিত মানুষের পক্ষে আজ ঘোষণা করছেন তাঁদের সমর্থন—সে সমর্থন কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট, সংশয়াচ্ছন্ন। সাহিত্যক্ষেত্রে এই সব সামাজিক সমস্যার সার্থক রূপায়ণের পদ্ধতি সম্পর্কে এই তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক বন্ধুদের মধ্যে অনেকেরই স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকায়, এই সব সামাজিক সমস্যার সঠিক মর্মকথা উপলব্ধির জন্যে

কোনো সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা না থাকায়, সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আজ অনেকেই বিভ্রান্ত। এই সম্মেলন সেই বিভ্রান্তি দূর করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

সম্মেলনের সূচনায় খসড়া ঘোষণাপত্রে স্পষ্টই ব্যক্ত হল—১) আমরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি যে, লেখক অথবা শিল্পী স্বয়ম্ভূ বা নিরালম্ব নন। সমস্ত যুগ-জীবন, সমাজপ্রগতির রূপ তাঁদের সৃষ্টিকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে—তার উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' বলে একদল সাহিত্যিক যে ন্যক্কারজনক যৌনআবিল আর নৈরাশ্যপূর্ণ গল্পোপন্যাস, কবিতা প্রভৃতি প্রচার করেন, তাঁদের সেই 'স্বাধীনতা'য় আমরা বিশ্বাস করি না। শিল্পীর দায়িত্ব আছে সমাজের কাছে—সমাজের নিপেষিত সাধারণ মানুষের কাছে। কেননা তাঁর সৃষ্টি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক পটভূমি আর তৎকালীন সমাজ-জীবনের ছাপই বহন করে না, অপরপক্ষে সমাজগতির ধারাকে পরিবর্তিত করবারও একটা বিরাট কর্তব্য রয়েছে তার। এ-যুগের কোনো সৎ আর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিক তাঁর এই মহৎ দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না; ২) আমাদের বর্তমান জীবন ঠিক আগের মতোই সাম্রাজ্যবাদী নিস্পেষণে জর্জরিত, অনশন-অনাহার আমাদের নিত্যসঙ্গী, বেকারী আর ছাঁটাইয়ের বিভীষিকা জীবনের সব কিছু আশা-আনন্দকে গ্রাস করছে আজ। তরুণ শিল্প-সাহিত্যিকরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সবল কণ্ঠ তুলবেন; ৩) আমরা নিজেদের শান্তিকামী বলে ঘোষণা করতে চাই। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নিজেদের স্বার্থে ধর্মের উস্কানি দিয়ে যে দাঙ্গা বাঁধায়, সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী বাঁচবার শেষ আশায় যে আণবিক যুদ্ধের হুঙ্কার ছাড়ে, আমরা তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকরা তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। আমরা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর মারণাস্ত্র আণবিক বোমাকে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবার বিরুদ্ধে দৃঢ়মত ঘোষণা করছি; ৪) সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার কূপমণ্ডুকতা আজ আমাদের মানস-বিকাশকে রুদ্ধ করে রেখেছে, পুরনো দিনের ধর্মোন্মাদনা, বংশ-কৌলিন্যের মর্যাদা, প্রভুবাদ, নারীর দাসত্ব, মনুষ্যত্বের অস্বীকৃতি এখনও আমাদের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে। তরুণ লেখকদের প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করবে—এ আশাও আমরা দৃঢ়ভাবে করি; ৫) আজকে ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া-সাহিত্যের প্রতিক্রিয়াশীল ধারা (যেমন

মতবাদের ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী ভাবধারা ও 'বিশুদ্ধ শিল্পের' রণধ্বনি প্রভৃতি এবং শিল্প-আঙ্গিকের ক্ষেত্রে আঙ্গিককে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি) বাংলা সাহিত্যের গতিপথকে কলুষিত করছে, সাংস্কৃতিক জীবনকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন ; ৬) সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় আপসকামী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় হিন্দু-মুসলিম মিলিত সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র বাঙলা আজ দ্বিধা-বিভক্ত। শাসকচক্র আজ উভয় বাঙলায় বাংলা ভাষাকে বিকৃত করে, একটি ভাষাকে অন্য একটি ভাষাভাষী অধিবাসীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে এ-দেশের সৃষ্টিশীল শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির পথ রুদ্ধ করে দিতে চাইছে। তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিক উভয় বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐক্য চান, তাঁরা কায়েমী স্বার্থের এই ঘৃণ্য চক্রান্তকে ব্যর্থ করে বাঙলার বুকে গড়ে তুলতে চান নতুন ঐক্যবদ্ধ গণ-সংস্কৃতি ; ৭) নাট্যকলাকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা করি। সাধারণ মানুষের কাছে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্মকে পৌঁছে দেবার জন্যে বিভিন্ন প্রগতিশীল নাট্য-সংঘের সঙ্গে অবশ্যই সহযোগিতা করব। মাইকেল-দীনবন্ধুর ঐতিহ্যবহনকারী আমরা— এ-দায়িত্ব পালন করে আমাদের নাট্য-আন্দোলনকে আরও বলিষ্ঠ করে গড়ে তুলব ; ৮) এ-দেশের সমৃদ্ধ লোক-সংস্কৃতিকে আরও ব্যাপক ও গভীরভাবে অনুধাবন করে এবং এই উদ্দেশ্যে নির্যাতিত মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করে যে-ধারা এ-দেশের নির্যাতিত চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের আশা-আকাঙ্ক্ষার গানে মুখর, তার ভিতর আমরা নতুন প্রাণরস সঞ্চার করে তাকে আরও সমৃদ্ধিশালী লোক-সংস্কৃতিতে পরিণত করব ; ৯) আমরা সাহিত্যকে শুধু শ্লোগানের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে চাই না। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর অঙ্গাঙ্গী উৎকর্ষতাকে আমরা উন্নততর করে আমাদের সৃষ্ট শিল্প-সাহিত্যকে সার্থকতর করতে চাই। সহজ-সরল-উদ্দীপনাশীল কলাকৌশলের প্রয়োগ-নিপুণতাকে আমরা গ্রহণ করব, আঙ্গিক-সর্বস্বতা বা বস্তুনিষ্ঠার নামে শুধুমাত্র শ্লোগান-আমদানীকারক সাহিত্যকে আমরা নিকৃষ্ট বলে চিহ্নিত করব ; আমরা জানি আবহাওয়া আজ আমাদের অনুকূলে। আমরা এই অনুকূল আবহাওয়াকে গ্রহণ করব—সমস্ত প্রগতিশীল তরুণ সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা একটি মিলিত ফ্রণ্টে সামিল হব। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

ঘোষণাপত্রের উপর আলোচনা করতে উঠে নরহরি কবিরাজ বললেন :

সাহিত্যে আজ সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকরাও স্বীকার করছেন যে, সাহিত্যে সংকট আজ সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁরা এর সমাধানের কোনো পথ না বাতলে বলছেন যে 'এই সংকটই সত্য'। এই সাহিত্যিকরা শ্রেণী-সংগ্রামকে অস্বীকার করে অহিংস, আপসপন্থী সরকারের প্রচারক সাহিত্য-প্রয়াসকে আজকের সাহিত্য বলে চালাতে চাইছেন। আর একদল সাহিত্যিক প্রচার করছেন পলায়নী-মনোবৃত্তির। এঁরাই 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যের উদ্গাতা। অবশ্য শেষোক্ত ধরনের সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছু বিভ্রান্ত সৎ সাহিত্যিকও আছেন। আমাদের কাজ হবে এই সব বিভ্রান্ত সাহিত্যিককে সত্য পথে নিয়ে এসে তাঁদের রচনাকে জনগণমুখী করে তোলা।

এরপর নরহরিবাবু গত এক বছরে প্রগতিশীল সাহিত্য-বিচারের নামে যে অনাচার চলেছে তার সমালোচনা করে বলেন: কিছুদিন পূর্বে প্রচার চলেছিল যে, আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য বিশেষ কিছু নেই। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ঘৃণাভাবাপন্ন হয়েও অনেক সৎ সাহিত্যিক তখন শ্লোগানসর্বস্ব যান্ত্রিক সাহিত্য-সৃষ্টিকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। আজ আমাদের নতুনভাবে সব কিছু আবার বিচার করতে হবে। সৎ লেখকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে বাঙলার সজীব ও সুন্দর সংস্কৃতিকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব আমাদের। নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতের শহরে-গ্রামে মজুর-কৃষক-মধ্যবিত্তের যে নতুন গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু হয়েছে আমাদের নতুন বিষয়বস্তু হবে সেই ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারায় উদ্ভূত ভাব ও কল্পনার স্পষ্ট প্রকাশ। শুধু বিষয়বস্তুর দিকে নজর দিলেই চলবে না, আমাদের আঙ্গিকগত কলাকৌশলকেও আয়ত্ত করতে হবে।

শ্রীযুক্ত কবিরাজ ঐতিহ্যবিচার প্রসঙ্গে বলেন: মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে যেমন আমরা পাই সমাজের প্রতিফলন, তেমনি তাঁদের সাহিত্যেই আবার মিশে আছে হতাশাবাদ। তাই ঐতিহ্যবিচারে পুরনো দিনের সব কিছু নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে থেকে সত্য, সুন্দর, প্রাণবন্ত উপাদান সংগ্রহই হচ্ছে আজ প্রগতি সাহিত্যিকের কাজ। আগামী দিনের সাহিত্যে শ্রমিকশ্রেণীই হবে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতীক।

রাজনীতি ও সাহিত্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে নরহরিবাবু স্পষ্ট ভাষায় বলেন:

রাজনীতি ও সাহিত্যের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর নেই। কিন্তু তাই বলে রাজনীতি ও সাহিত্য এক জিনিস নয়। রাজনৈতিক শ্লোগানই সাহিত্য নয়, কিন্তু রাজনীতিকে বাদ দিয়েও কোনো সাহিত্য নেই। সমাজ বিবর্তনের আইনই মহৎ সাহিত্যে রসাভাসে স্পষ্ট। আমাদের কাজ হবে রাজনীতি ও সাহিত্যের সমন্বয়-সাধন।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণাপত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেন যে, সাহিত্যে শ্লোগান-সর্বস্বতা পরিত্যাগ করে শিল্পবস্তু ও আঙ্গিকের সমীকরণ করা একান্ত প্রয়োজন। এবং এজন্যে প্রথমেই প্রয়োজন শুধুমাত্র পুঁথিগত রাজনীতি ও শিল্পনীতি আয়ত্ত করা নয়, বহুবিস্তৃত জীবনধারার সঙ্গে সাহিত্যিকের জীবনও যোগ করা। আমাদের প্রগতি সাহিত্যিকদের পক্ষে এইটি একটি প্রাথমিক সমস্যা এবং এইটিই মূল সমস্যা। সভাপতি রাম বসু তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিককে জীবনধর্মী হতে আহ্বান জানান। আত্মকেন্দ্রিকতা পরি ত্যাগ করে জনজীবনের সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্মতার কথা ঘোষণা করেন তিনি। চিত্ত পাল, সুশীল গুপ্ত, সত্যব্রত ঘোষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিনিধিও আলোচনায় যোগদান করেন।

প্রকাশ্য সম্মেলনেও এই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেল সভাপতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। সম্মেলনের উদ্বোধন করতে উঠে 'দি নেশন'-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোহিত মৈত্র আহ্বান জানালেন তরুণদের বিপ্লবে শামিল হতে, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে, ব্যাপক ও বলিষ্ঠ গণ-সংস্কৃতি গড়ে তুলতে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ জোরের সঙ্গেই বললেন: আমরা যদি এগিয়ে যেতে চাই নতুন পথে তবে সাহিত্যিকের ধর্ম আমাদের অবশ্যই পালন করতে হবে। সাহিত্যের নামে ভেজাল আর চলবে না। জীবনের গান গাইতে হলে জীবনের শরিক হতে হবে সর্বপ্রথম।

তরুণ-সাহিত্যিকদের এই সম্মেলন নানা দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। যে-সংকট থেকে উদ্ধারের আশায় শুধু তরুণ শিল্পী-সাহিত্যিকই নন বহু প্রবীণ সংস্কৃতি-বিদ্‌ও আজ চিন্তাকুল, বরাহনগরে এই তরুণ সাহিত্যিক সম্মেলনে সেই সংকটের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি নিয়েই যে আলোচনা হয়েছে শুধু তাই নয়, সংকটের মূল উৎসমুখ সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে এবং তার সমাধানের পথ সম্পর্কেও

চিন্তা-বিনিময়ের এই প্রথম সূত্রপাত হল। আমাদের এই ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সাহিত্যের যে মূল দুর্বলতা—জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের ক্ষীণ যোগাযোগের দিক—সাম্রাজ্যবাদী, সামন্ততন্ত্রী ও ক্ষয়িষ্ণু পুরনো গণতান্ত্রিক ভাবধারার যুগপৎ আক্রমণে সাহিত্যের সেই দুর্বলতাই আজ এক দুস্তর সংকটের কারণে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশের প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা, বিশেষ করে তরুণ লেখকেরা, যাঁরা আমাদের দেশের সাহিত্যের সংকটের এই উৎসমুখ সম্পর্কে একমত, নীতিগতভাবে সাহিত্যের বিকাশের জন্যে তাকে জনজীবনমুখী হতে হবে বলে যাঁরা মনে করেন, এই সম্মেলনে তাঁরা অন্তত এই এক বিষয়ে সকলেই একমত হন যে, এই সংকট সমাধান করতে হলে আমাদের সকলকে শারীরিকভাবেই শ্রমজীবী জনগণের "জীবনে জীবন যোগ" করতে হবে; জনসাধারণের সঙ্গে থেকে তাঁদের জীবনের শরিক হয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হবে, তবেই সাহিত্যিকের পক্ষে জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব, তাঁদের আত্মীয় হওয়া সম্ভব।

আশা করা যায়, সম্মেলনের আলোচনার এই ফলাফল অতঃপর আমাদের তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার বিষয় হবে।*

* পরিচয়, 'সংস্কৃতি সংবাদ,' কার্তিক ১৩৫৭; পৃ. ৫৪-৫৯। নিবন্ধের শিরোনামে 'কলকাতা' ছিল, আমি শব্দটিকে 'কলকাতার' করেছি। নিবন্ধটি আমারই রচনা।—সম্পাদক

বুর্জোয়া দর্শনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

—আন্দ্রে ঝ্দানভ

প্রাচীন যুগের ভারতীয় দর্শন ও বস্তুবাদ

—রবীন্দ্র গুপ্ত

বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা

—বীরেন পাল

মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

—ব্রজেন রায়

মিশ্র অর্থনীতি

—যোগানন্দ বসু

আলোচনা :

সাহিত্য বিচারের মার্ক্সীয় পদ্ধতি

—উর্মিলা গুহ

দাম : পাঁচ সিকা

১

কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগে, অক্টোবর, ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত
তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী'-র প্রথম সংকলনের প্রচ্ছদপট

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক / প্রথম খণ্ড

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমালোচকদের মন্তব্য

"আলোচ্য পুস্তকের সম্পাদক ধনঞ্জয়বাবু বাঙলার শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মার্কসবাদী চিন্তাধারার বিকাশের নাতিদীর্ঘ পটভূমিকা যোগ্যতার সঙ্গেই তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে বঙ্গদেশের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী এবং তাত্ত্বিকেরা যেসব বিতর্ক উত্থাপন করেছিলেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি সংকলন করেছেন।... প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব আজকের দিনেও অস্বীকার করা যায় না,...ধনঞ্জয়বাবু নিষ্ঠার সঙ্গে যে দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন সেটিও একটি ঐতিহাসিক দলিল হয়ে থাকবে।...এইরূপ একটি প্রচেষ্টার যে প্রয়োজন ছিল এবং সম্পাদক যেভাবে সেই কর্তব্য পালন করেছেন তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে দ্বিধা নেই।"

"...প্রতিটি রচনাই এখন দুষ্প্রাপ্য ও তীব্র বিতর্কমূলক। এই সঙ্গে 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে' শীর্ষক শতাধিক পৃষ্ঠার যে রচনাটি ধনঞ্জয় দাশ লিখেছেন, প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের গবেষণার ক্ষেত্রে তা এক মূল্যবান সংযোজন। এই প্রথম মার্কসবাদী-শিবিরের সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সফলতা-ব্যর্থতার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস প্রকাশ্যে বেরিয়ে এলো। আমরা ...এই বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।"

"মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্য ও শিল্পকে বিচারের নানান সমস্যা নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশে ব্যাপক আলোচনা চলে আসছে।...এই আনুপূর্বিক বিচার-বিতর্কের একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণের উপাদান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও তার ধারাবাহিক, সুগ্রথিত, তথ্যনিষ্ঠ একখানি পুস্তক আমাদের হাতের কাছে নেই। এ দিকটা ভীষণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। 'মার্কসবাদী' নামক একটি সংকলনের নানা সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে নানা লেখা প্রকাশিত হয়।... কথিত বেআইনী একটা যুগের এই বিতর্কিত প্রসঙ্গগুলির...একটি সংকলন সম্প্রতি 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' নাম দিয়ে শ্রীধনঞ্জয় দাশ প্রকাশ করেছেন। ...একটা বিতর্ক-কণ্টকিত সময়ের যন্ত্রণাক্ষুব্ধ প্রশ্নগুলির ওপর লিখিত দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধগুলির এই সংকলন মার্কসবাদী চিন্তাধারার বিকাশের ব্যাপারে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তির দীর্ঘকালের একটা অভাব মেটালো। প্রধানত সাহিত্য ও

শিল্প-সংক্রান্ত…প্রশ্নে, ঐ সময়ের বিচার-বিতর্কের মূল্যায়নে আগ্রহী যে-কোনো ব্যক্তির পক্ষে এই বইখানি মূল্যবান বলেই গণ্য হবে। শ্রী দাশ এই বইয়ে ১০৪ পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।…শ্রী দাশের অসাধারণ শ্রমের গুরুত্বকে ছোট করে দেখা অনুচিত কাজ হবে বলেই আমার বিশ্বাস।…একথা স্বীকার করতে হয়—'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' সম্প্রতিকালের একটি উল্লেখ-যোগ্য প্রকাশন।…সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার বাঞ্ছিত লক্ষ্যের ও দৃষ্টিকোণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসাবে এই 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' পুস্তকখানির বহুল প্রচার কাম্য বলেই আমরা মনে করি।"

"ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বয়স অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে গেছে। পেরিয়ে গেছে ইতিহাসের নানা বাঁক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সময়ের অভিজ্ঞতা এই আন্দোলনকে যতটা প্রাজ্ঞ করে তুলতে পারত তা ঘটেনি। স্বভাবতই ··শিল্প সাহিত্যের বিষয়টি আরও আশাপ্রদ না হবারই কথা।…তবু যা হয়েছে, তারই একটা চেহারা তুলে ধরতে চেয়েছেন ধনঞ্জয় দাশ।…এই প্রয়াসের মধ্য থেকে গোটা ভারতবর্ষের শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে রাজনৈতিক ধারণার একটি পরিচয় পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।…ধনঞ্জয় দাশের এই প্রয়াস…সেই ঐতিহাসিক মর্যাদা দাবী করতে চায়।…ধনঞ্জয় দাশের ভূমিকা থেকে মনোযোগী পাঠক কিছু তথ্য পেয়ে যাবেন…। এই রচনাগুলি আজও মূল্যবান…আজকের মার্কসবাদী সমালোচকেরা এগুলিকে সামনে রাখলে বুঝবেন কতটুকু গ্রহণ করতে হবে, কতটুকুই বা বর্জনীয়।"

"…ধনঞ্জয়বাবু এরূপ সংকলনগ্রন্থ তৈরি করে ইতিহাসের একটি ইঙ্গিতবেই ধরে রাখতে চেযেছেন…এই কারণেই মার্কসবাদী—মার্কসবাদ-বিরোধী-অমার্কসবাদী—সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল পড়ুয়া লোকের কাছে এ-বইটি একটি মূল্যবান প্রকাশনা বলে গণ্য হবে।…মার্কসবাদে যাঁদের আস্থা নেই তাঁরাও কিন্তু এই প্রবন্ধগুলির গুরুত্ব না মেনে পারেন না।…ধনঞ্জয় দাশকে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিরূপেই দেখে'ছি। কিন্তু গবেষক হিসাবে এই প্রথম দেখলাম। প্রবন্ধগুলির নির্বাচন, কালানুক্রমিক বিন্যাস, প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য পরিবেশন,…প্রতিবেদনের সন্নিবেশ, বিতর্কিত বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ [illegible]… একথার সত্যতা প্রমাণ করবে।"